আমার জীবন

চতুর্থ ভাগ

নবীনচন্দ্র সেন

কলিকাতা,

২৫ নং বায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহে[illegible] ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

ও

সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩১৮।

নিবেদন।

'আমার জীবন' চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। পঞ্চম ভাগও মুদ্রিত হইতেছে। পঞ্চম ভাগে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে।

পঞ্চম ভাগের শেষে একটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করিব মনস্থ করিয়াছি। স্বর্গীয় পিতৃদেব তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাতে তাহাই সন্নিবেশিত হইবে।

বহুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে আমার এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া আমি তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ সকল পত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে পিতার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সকলের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে সমস্ত পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। তবে পিতার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকেই পিতার এই জীবনী নিয়মিত ভাবে পাঠ করিতেছেন। সেইজন্য এস্থলে আমার সেই বিনীত প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট করিলাম। পিতৃদেবের যে সকল বন্ধু তাঁহার ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃতী পুত্রগণ বা অন্য আত্মীয়বর্গের নিকটও আমার এই অনুরোধ উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা যদি কলিকাতা, ৫৫ নং চুনাপুকুর লেন, এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু মহাশয়ের নিকট অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ পত্রগুলি কিছুদিনের জন্য প্রেরণ করেন, তবে আমার এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইব। পত্রগুলি নকল করিয়া যত সত্বর সম্ভব ফেরত পাঠান যাইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই ভাগের মুদ্রণকালে আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। তিনি এবং আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু এই জীবনী মুদ্রণকালে আমার সহায়তা না করিলে, জানি না, কত দিনে ইহা প্রকাশিত হইত।

রেঙ্গুন,
চৈত্র, ১৩১৮। } শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র।

১। ফেনী।

৪। রাণাঘাট।



শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

আমার জীবন।

চতুর্থ ভাগ।

ফেণী।

ইহার কিছু দিন পরেই আমার ফেণী বদলি 'গেজেট' হইল। আমরা পূর্ব্বাহ্নে আহারের পর গো-যানের অপূর্ব্ব ট্রেণ খুলিয়া, স্মরণ হয়, ২৩শে নবেম্বর ফেণী রওনা হইলাম। বন্ধুগণ ও বহুতর লোক বহুদূর আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের বিদায় দিয়া যখন আমি গাড়ীতে উঠিলাম, এবং কিছুক্ষণ পরে একটা অচেনা বৃক্ষতলায় পৌঁছিলাম, হৃদয় হইতে সেই ওলাউঠা ভীতি নামিয়া গেল, এবং পথের উভয় পার্শ্বে খোলা মাঠের বিশুদ্ধ বাতাস লাগিয়া শরীরে এবং গ্রাম্য প্রাকৃতিক শোভায় নয়নে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। বড় আনন্দে সাতাইশ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া গভীর রাত্রিতে ফেণী পৌঁছিলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী সব-ডিভিসনাল অফিসার মহাশয়কে আমার জন্য ফেণী দীঘির পাড়ে তাঁবুখানি খাড়া করিয়া রাখিতে লিখিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে তাঁবুতে যাইতে অন্ধকারে এক ফুট কাদায় পড়িয়া গেলাম। শুনিলাম একমাত্র অফিসের সম্মুখ দিক ভিন্ন অন্য স্থান দিয়া রাস্তা হইতে দীঘির পাড়ে যাইবার পথ নাই। তখন স্ত্রীর গাড়ী ঘুরাইয়া সেই পথ দিয়া আনিল। রাত্রিতে শিবিরে শুইয়া ভাবিতেছিলাম শ্রীভগবানের কি অনুগ্রহ! বেহারে যখন তিন বৎসর শেষ হইয়া বদলি

আসন্ন হইল, তখন স্বামী স্ত্রী দুজনে ভাবিতাম যে বহু বর্ষ বিদেশে উড়িষ্যা বাঙ্গালা বেহার ঘুরিয়া কাটাইলাম। যদি বাড়ীর নিকটে ফেণী সবডিভিসনটি পাইতে পারি বড় সুবিধা হয়। শ্রীভগবান সেই আশা আজ পূর্ণ করিলেন। মনে কত আনন্দই হইয়াছে। আমি পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট থাকিতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এ সব-ডিভিসন খোলা হইয়াছিল। এ স্থানটী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা হইতে বহুদুরে, অথচ তিন জেলার রাস্তার সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। এখানে দিনে ডাকাতি হইত। আমার চেষ্টায় সব-ডিভিসন খোলা হয়, এবং এই স্থানটী নির্ব্বাচিত হয়। এ কারণে এ স্থানটীর উপর আমার একটুক আন্তরিক স্নেহ ছিল। আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম ইতিমধ্যে উহা একটী অন্য সব-ডিভিসনের মত একটা সুন্দর স্থান হইয়াছে। কিন্তু রাত্রিতে কাদায় পড়িয়া মনে কেমন একটা খট্‌কা পড়িয়াছে। অথচ রাত্রির অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র আমি শয্যা হইতে শিবিরের গবাক্ষের আবরণ উত্তোলন করিলে যে দৃশ্য নয়নে পতিত হইল, তাহাতে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। চারি পাড় প্রায় এক মাইল হইবে। জল নির্ম্মল,—নব শীতের আকাশের মত নির্ম্মল। তাহাতে প্রভাতানীলে লীলা করিয়া হিল্লোলমালা খেলিতেছে। কিন্তু জল শেয়ালা ও টপ্‌টপি পত্রে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ কুসুমরাজি ফুটিয়াছে। দীর্ঘিকার চারি পাড় পর্ব্বতাকার উচ্চ, এবং এরূপ জঙ্গলাবৃত যে তাহা হইতে রাত্রিতে শিবাকণ্ঠে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। পরে দেখিলাম দিবা ভাগেও ফৌজদারী কোর্টের অবমাননা করিয়া এ সঙ্গীতে দীর্ঘিকা মুখরিত হয়। শুনিলাম সময়ে সময়ে নেকড়ে বাঘও পেনাল কোড এবং পুলিস না মানিয়া তাহাতে আশ্রয় লইয়া সব-ডিভিসনাল অফিসারের

সঙ্গে রাজ্য ভাগ করে এবং ক্ষমতার পরীক্ষা করে। কেবল দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় চট্টগ্রাম-ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে গো-গৃহের মত দুই খানি কুড়িয়া ঘর ঝড়ে ধরাশায়ী হইয়াছে। শুনিলাম উহাই কাছারি এবং তৎপশ্চাতে তিতুমিরের কেল্লার মত একটা স্থান আস্তমুলি বাঁশের ঘেরা। শুনিলাম সেটা জেল। পশ্চিম পারে জঙ্গলের মধ্যে কয়েক খানি কুড়িয়া ঘর ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই খানি গো-গৃহ শত-তালি-যুক্ত হইয়া মাথা তুলিয়া আছে। শুনিলাম উহা পুলিস ষ্টেসন। তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম দীর্ঘিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ স্পর্শ করিয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তাহার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পারের পার্শ্ব দিয়া 'ছাগল-গাইয়া' থানার দিকে এবং উহার ও ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গম-স্থল হইতে নোয়াখালির দিকে দুই রাস্তা গিয়াছে। এই সঙ্গম-স্থানের নিকটে এক গর্ত্তের মধ্যে চারিখানি কুড়িয়া ঘরে সব-ডিভিসনাল অফিসার বাস করেন এবং প্রত্যেক মাসে বাড়ী ভাড়ার দরুণ গবর্ণমেণ্ট হইতে পঞ্চাশ টাকা গ্রহণ করেন। আমি নোয়াখালি থাকিতে চারি খানি কুড়িয়ার মূল্য তিনি আমার কাছে ষাট টাকা চাহিয়াছিলেন। মূল্যের কথা শুনিয়া উহা কিরূপ আমি বুঝিয়াছিলাম এবং কিনিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। তিনি উহা একজন মুসলমান মোক্তারের কাছে ষাট টাকাতে বেচিয়াছেন। আমি উহা না লইয়া ভাল করি নাই বলিয়া তিনি ও সকলে অনুযোগ করিলেন। এই 'দৌলতখানা' ভিন্ন ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বে আরও কয়েক খানি কুড়িয়া ঘর। উহা আমলা মোক্তারদের আবাস গৃহ। অনেকের গরুর ঘরও তাহা অপেক্ষা ভাল থাকে। দেখিয়া আমার হৃদয় ডুবিয়া গেল। কোথায় সে বেহার—একটী মহা-নগর! আর কোথায় ধান্য ক্ষেত্র বেষ্টিত এই জঙ্গলাকীর্ণ শেয়ালা সমাচ্ছন্ন স্থান। হাট বাজার পর্য্যন্ত আড়াই

মাইলের মধ্যে নাই। কেন এমন স্থানে সাধিয়া আসিলাম স্ত্রী ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আমার মনেও অনুতাপ হইল।

"কিন্তু হস্ত-চ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া বল ?"

যখন আপনি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি—তখন কাহার দোষ দিব ?

নূতন ফেণীর সৃষ্টি প্রকরণ। *

১। উপনগর।

ভাবিলাম রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর এবং পাণ্ডবেরা বার বৎসর বনবাস করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজা ছিলেন। আর আমি দরিদ্র তিন চারিটী বৎসর কি তাহা পারিব না ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি একটা মহাজন ও পণ্ডিত হইলে যেখানেই যাই সেখানে একটুক দাঁড়াইবার স্থান করিতে পারিব। মনে করিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেববাক্যের সার্থকতার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাকেও এখানে একটু দাঁড়াইবার স্থান করিতে হইবে ? গাইলাম—

"নগর থেকে কানন ভাল নাইকো হেথা কোলাহল"
ভক্তিভরে, উচ্চস্বরে, মন রে! একবার হরি বল!"

---

* ফেণীতে আমি অনুমান নয় বৎসর ছিলাম এবং বর্ত্তমান ফেণী আমি সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমার অনেক কার্য্য, শুনিয়াছি, পরবর্ত্তীরা ধ্বংস করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় যদিও ফেণীবাসীর পক্ষে উপাদেয় হইবে, উহা পড়িতে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে। এরূপ পাঠকেরা কেবল এই অধ্যায়ের হেডিং গুলি দেখিয়া গেলে, আমি ফেণীতে কি কি কার্য্য করিয়াছিলাম, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। কোন স্থানের জন্য কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এরূপ খাটিয়াছেন কিনা জানি না।

হরি বলিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সাইক্লোন এই গোশালা সকল ধরাশায়ী করিয়া আমার বড়ই সাহায্য করিয়াছিল। আমার কার্য্য-ভার গ্রহণ করা পর্য্যন্ত গৃহাদির পুনর্নির্ম্মাণ আমি স্থগিত রাখিয়াছিলাম। প্রথম স্থির করিলাম যে দীঘির চারিটি পাড় চারি হাত কাটিয়া নীচু করিব, ও তাহাদের পরিসর বৃদ্ধি করিব। তাহার চারি দিকে কাছারি ও আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিব। নাজির এষ্টিমেট দিলেন, কেবল মাটি কাটার কার্য্যে ছয় শত টাকা লাগিবে। দেখিলাম কাছারি পুনর্নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয় যে এষ্টিমেট মঞ্জুর করাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রায় তাহাতেই নিঃশেষ হইবে। এত টাকা কোথায় পাইব? কৌশল করিয়া কার্য্যটা নিলামে দিলাম। বলিলাম যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প টাকায় উহা করিবে তাহাকে লোকাল বোর্ডের কণ্ট্রাক্ট দিব। ডাক ছয় শত হইতে একবারে নব্বই টাকাতে নামিল। এই নব্বই টাকা লোকাল বোর্ডের টাকা হইতে দীঘির পাড়ে রাস্তার জন্য দিলাম। থাকিবার স্থান নাই। আমার তাঁবুর পার্শ্বে একখানি চাটাইয়ের ঘর এক জন শ্বেতচর্ম্ম ওভারসিয়ার প্রস্তুত করাইয়াছিল। সে চলিয়া গিয়াছে। এখন উহাতে কাছারি হইতেছে। আমার ভৃত্যরা তাহাতে আশ্রয় লইয়াছেন। শ্বেতচর্ম্মের ভয়ে বোধ হয় প্রভঞ্জন দেব এ কুড়িয়াখানি ধরাশায়ী করেন নাই। অন্যথা উহাতে বাঁশের খুঁটি মাত্র। চাটাইয়ের পুরাতন বেড়াতেও শত ছিদ্র। অতএব এক দিন মাত্র ফেণীতে থাকিয়া পাড় কাটার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মফঃস্বল যাইব স্থির করিলাম। কিন্তু কোথায় কিরূপে যাইব? কোন দিকে রাস্তা নাই। পাল্‌কির বেহারার বেতন অতিরিক্ত। মাইল প্রতি এক কি দেড় টাকা পড়িবে। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়েরা আগরতলার মহারাজার হাতী আনিয়া মফঃস্বল যাইতেন। তাহাতে আমিই বা

গেলাম। কিন্তু পত্নী হস্ত্যারোহণে যাইবেন কিরূপে? তাহা ছাড়া হাটের মধ্যে ভিন্ন তাঁবু ফেলিবার স্থান কোথায়ও নাই শুনিলাম। এখন হাটের মধ্যেই বা পত্নীকে দাখিল করি কিরূপে? একবার 'স্ত্রী-স্বাধীনতার' জন্য মাদারিপুরে গালি খাইয়াছি।

"হাট বাট মাঠ ফেরন্তু, ফেরন্তু বহুদেশ—"

উহা কাব্যে সম্ভব হইলেও কার্য্যে বোধ হয় বঙ্কিম বাবুও অনুমোদন করিতেন না। অবশেষে শুনিলাম 'করাইয়া' নামক একটী হাটে তখনও নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে। তাহাও আড়াই মাইল হাঁটিয়া গিয়া 'সিলোনিয়া' নদীতে নৌকায় উঠিতে হইবে। যাহা হউক তাহাই স্থির করিলাম। স্ত্রী পাল্কীতে গিয়া নৌকায় উঠিলেন। কিন্তু এই আড়াই মাইলই এরূপ অগম্য যে হস্তীতে যাইতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল। 'করাইয়ায়' দশ দিন থাকিয়া ফেণী ফিরিলাম। নদী হইতে ফেণীতে সন্ধ্যার পর হাঁটিয়া আসিতে প্রায় দ্বাদশটী আছাড় খাইলাম। তাহার পর যদিও বড় সাধ করিয়া নদীর জাল হইতে মৎস্য আনিয়াছিলাম তাহা লবণাভাবে খাওয়া হইল না; আড়াই মাইল না গেলে লবণ পাওয়া যায় না। এত রাত্রিতে কে যাইবে? সেই রাত্রি আছাড় মাত্র খাইয়া কাটাইলাম। 'করাইয়া' বাজারের পার্শ্বে একটুক স্থান করিয়া লইয়া শিবির ফেলিয়াছিলাম। সেখান হইতে তালুকদারী এক ঘোটকে গিয়া বড় ফেণী নদীর তীরে একটি স্থান দেখিয়া সেখানে তাঁবু পাঠাইতে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলাম। আর একদিন সেই চাটাইয়ের বাঙ্গালায় থাকিয়া আবার তাঁবুতে সেখানে নৌকাপথে গেলাম। এ দিকে ক্রমে ক্রমে পাড়ের মাটি কাটা শেষ হইল। মাটি কাটিবার সময়ে শত শত নরমুণ্ড বাহির হইতে লাগিল। দক্ষিণ পাড় নিকটবর্ত্তী গ্রামের কবর স্থান ছিল, এবং

ডাকাতেরা খুন করিয়া অন্য পাড়ে শব পুতিয়া রাখিত। উত্তর পাড়ের ঠিক মধ্য স্থলে বাঁশের মাচার উপর আমার বাসগৃহ প্রস্তুত করিলাম। তাহার সম্মুখে দীর্ঘিকার দিকে একটি গোল বারাণ্ডা, এবং পশ্চাতে ধান্য ক্ষেত্রের দিকে একটি চৌবারাণ্ডা বাহির করিলাম। দীঘির চারি পাড়ের ভিতর কিনারা দিয়া এক রাস্তা চালাইলাম। তাহার ভিতর পার্শ্বে জলের ধার দিয়া এক সারি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলাম। পাড়ের উপরে স্থানে স্থানে বৃক্ষের স্তবক (tope), এবং বাহির পার্শ্বে 'বোটানিকেল' উদ্যান হইতে আনিয়া নানাবিধ আম্র ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ঝাউ রোপণ করিয়া দিলাম। আমার আবাস গৃহের সম্মুখে দীঘির পার্শ্বে হৃদয়াকৃতি, পূর্ব্বদিকে দীঘির পাড়ে গোলাকৃতি, পশ্চাতে দীঘির পার্শ্বে ত্রিকোণাকৃতি, এবং পশ্চিম পার্শ্বে দীঘির পাড়ে চতুষ্কোণাকৃতি পুষ্পোদ্যান রোপণ করিলাম। পশ্চিমে বাগানের অপর দিকে রান্না-ঘর। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি পদ্মাকৃতি বেদি। তাহার পার্শ্বে 'পুলিন কুটির' এই নাম বাগান-শোভা শাকের দ্বারা রচিত পদ্ম পত্রের মধ্যে লিখিত হইল। বেদির মধ্য স্থলে ভূগর্ভে নিমজ্জিত একটি প্রকাণ্ড গামলায় পদ্মের সময় পদ্ম, অন্য সময়ে মরশুমি ফুল (season flower) ফুটিয়া থাকিত। প্রাঙ্গণের চারি সীমায় নানাবিধ ফুলের কেয়ারি। গৃহের চারি দ্বারের উভয় পার্শ্বে শেফালিকা ও গন্ধরাজ রোপণ করিয়াছিলাম। ফুলের সময়ে গন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। গৃহের উপর কাপড়ের ছাদ, এবং বাশের বেড়ায় উৎকৃষ্ট কাপড়ের পর্দ্দা দিয়াছিলাম, এবং তাহার উপর নানাবিধ ছবি ও গৃহ-সজ্জার উপকরণ বসাইয়াছিলাম। আলিগড় হইতে সতরঞ্জি আনিয়া সমস্ত গৃহতল আবৃত করিয়াছিলাম। এক কক্ষ Drawing room (বৈঠক খানা) এবং

তাহার পার্শ্বে শয্যা কক্ষ। পশ্চাতে চতুষ্কোণ বারাণ্ডা Dining room (আহারের স্থান), এবং সম্মুখের গোল বারাণ্ডা আমার কবি-গিরির বা লিখিবার স্থান। ইহারই সম্মুখে বিস্তৃত দীর্ঘিকার তরঙ্গায়িত সুনীল সলিলশোভা। আগরতলা রাজবংশের শাখা বিশেষের কোন পুণ্যবতী রাজকন্যা এই দীঘি কাটাইয়াছিলেন। সেই জন্য ইহা 'রাজার ঝি দীঘি' বলিয়া পরিচিত। পুণ্যবতীর পুণ্যরাশির ন্যায় অমৃতনিভ সলিল তরঙ্গে 'রাজবালা' নামাঙ্কিত তরণী (Life boat) হংসিনীর মত নৃত্য করিতেছে। তাহার বহির্ভাগ সবুজ ও অন্তর ভাগ শ্বেতবর্ণে চিত্রিত। দুই হাতে দাঁড় টানিয়া কখন বা স্ত্রীকে, কখন বা কোন বন্ধু বা অতিথিকে লইয়া, কখন বা একা সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত জলক্রীড়া করিতাম, এবং এই বোটের দ্বারা দীঘি এমন পরিষ্কার করাইয়াছিলাম ও পরিষ্কার রাখিতাম যে কোথায়ও একটি তৃণও পরিলক্ষিত হইত না। দূরে পূর্ব্ব প্রান্তে আকাশের গায়ে ত্রিপুরার পর্ব্বতমালা মেঘবৎ শোভা পাইতেছে। পশ্চাতের বারাণ্ডার সমক্ষে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নিত্য হরিৎ, পীত, শ্যাম, ও স্বর্ণ শোভায় হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি সঞ্চার করিতেছে। এই বারাণ্ডা বা কক্ষে আহার করিতে বসিয়া, এবং সন্মুখের গোল বারাণ্ডায় বিশ্রামার্থ বসিয়া কত ইংরাজ প্রাকৃতিক শোভার প্রশংসা করিতেন। পূর্ব্ব দিকের চারি তোরণ (gate) সমন্বিত গোল বাগানের পশ্চিম দিকে অতিথি অভ্যাগতের জন্য বৈঠকখানা ঘর এবং তাহার পূর্ব্বে আস্তাবল ইত্যাদি দীঘির উত্তর পূর্ব্ব কোণায় পূর্ব্বোক্ত রাস্তার পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত গৃহ ও উদ্যান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে বলা বাহুল্য আমার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। পশ্চিম পাড়ে নানা আকৃতির গৃহের দ্বারা কোর্ট, ট্রেজারি,

পুলিস ষ্টেসন, এবং উত্তর পশ্চিম কোণায় ইন্‌স্পেক্টারের গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র আকৃতি। প্রত্যেক ঘরের পনর কি বিশ চাল, নানারূপ কোণ ও চক্রে প্রত্যেক গৃহের স্বতন্ত্র শোভা। এ অঞ্চলে কি কোনও অঞ্চলে এমন কবিত্বপূর্ণ বাঁশের ঘর কেহ কখনও দেখেন নাই। বাঁশের কুটির যে এমন সুন্দর হইতে পারে এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চলে এ সকল ঘর লইয়া মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। বহু দূর হইতে দলে দলে লোক এ সকল ঘর দেখিতে আসিতে লাগিল।

২। বাজার।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক করিয়া যেন দাঁড়াইবার স্থান করিলাম। কিন্তু,—

"খুন হয়েছিনু বাছা! নুণ চেয়ে চেয়ে,
শেষে না মিলিল কড়ি আনিলাম চেয়ে।"

নুণ 'চেয়ে' না পাইয়াও এক রাত্রি যে অনাহারে ছিলাম তাহা বলিয়াছি। পশ্চিম দিকে 'পাঁচ গাছিয়া' খুব বড় হাট—আড়াই মাইল ব্যবধান। উত্তর দিকে 'দেওয়ানগঞ্জ', মুন্‌সেফির হাট—তাহাও আড়াই মাইল, এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে 'রাণীর হাট', তাহাও প্রায় তত দূর। অতএব এই আড়াই মাইল ব্যবধান না গেলে নুণটুকও পাওয়া যায় না। এ অভাব অনুভব করিয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ত্রিপুরার মহারাজার তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া হাটের জন্য উপরোক্ত তিন রাস্তার সঙ্গম-স্থলে একটি সুন্দর বিস্তৃত স্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিকে তিনটা হাট থাকাতে হাট মিলিল না। যাহা মিলিয়াছিল তাহা পুলিসের ও তাঁহার নিজের ভৃত্যদের অত্যাচারে উঠিয়া গিয়াছিল। এখন একখানি দোতালা

কুড়ে ঘর আছে। তাহাতে সীতাকুণ্ড যাত্রীদের জন্য চিড়ে ও গুড় মাত্র পাওয়া যায়। 'পাঁচ গাছিয়া' কি 'রাণীর হাট' ভাঙ্গাইতে গেলে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবের কথা। তাহাদের মালিকেরা আচন্দ্র-ভাস্কর পর্য্যন্ত না লড়িয়া ছাড়িবে না। একমাত্র উপায় যদি মুনসেফি শুদ্ধ দেওয়ানগঞ্জ হাট উঠাইয়া আনা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা চেষ্টা করিয়াছিলেন ফৌজদারির চোটে। ফলে এই হইয়াছিল মুনসেফের নামে ফৌজদারী কোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমা, এবং সব-ডিভিসনাল অফিসারের নামে মুন্‌সেফি কোর্টে মুনসেফি মোকদ্দমা বহুসংখ্যক উপস্থিত হইয়া একটি বহু বর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা সম্প্রতি ত শেষ হইয়াছে। দেওয়ানি পক্ষ তাহাতে জয়ী হইয়াছে। মুন্‌সেফি দেওয়ানে গঞ্জে রহিয়া গিয়াছে। আমি দেখিলাম যে সেই বীরত্বে কিছু হইবে না। আমি প্রথমতঃ মুনসেফকে হাত করিলাম। তখন যিনি মুন্‌সেফ, তিনি বড় ভাল মানুষ। বেচারি আপনি আমার কাছে কাঁদিয়া বলিল সেখানে সে দিন রাত্রি আপনার আমলা ও উকীলের ভয়ে জড় সড় থাকে। কোন কার্য্যের জন্য কোন পেয়াদাকে ডাকিলে সে বলে যে উকীল কি আমলার কায ফেলিয়া আসিতে পারে না। কারণ মুনসেফ দুই দিন মাত্র থাকেন। উকীল আমলা চিরস্থায়ী। অতএব মুনসেফ অপেক্ষা তাঁহাদের খাতির বেশী করিতে হয়। অতএব মুনসেফ সেখান হইতে মুনসেফি উঠাইয়া আনিতে পারিলে রক্ষা পায়। আর সেই কারণেই উকীল ও আমলারা এরূপ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। দেওয়ানগঞ্জ তাহাদেরই রাজ্য। ফেণীতে আসিলে তাহারা কেবল রাজ্যচ্যুত হইবে এমন নহে, ফেণীতে সব-ডিভিসনাল অফিসার ও পুলিসের ছায়াতে তাহাদিগকে নগণ্য ব্যক্তি হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব আমি মুন্‌সেফকে সম্মত করাইয়া

মুন্‌সেফি উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব কালেক্টারের কাছে পাঠাইলে, উকীল ও আমলারা তাঁহার ও জজের কাছে ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। কালেক্টার তদন্ত করিতে ফেণীতে আসিয়া দেওয়ানগঞ্জে গেলে তাহারা খুব কলা গাছ পুতিয়া ও গেট করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, এবং তাঁহার কাছে আমার প্রতিকূলে যথাসাধ্য বুঝাইল। বলিয়াছি লোকটী বড় দুর্ব্বলহৃদয় ছিলেন। তিনি সেই খোসামুদিতে ভুলিয়া গিয়া আমাকে বলিলেন যে সব-ডিভিসনাল অফিসের উপযুক্ত স্থান ফেণী নহে, তিনি উহা বরং দেওয়ানগঞ্জে কি অন্য কোন স্থানে উঠাইয়া লইবেন। তিনি তাহার জন্য স্থান দেখিতে লাগিলেন। দেওয়ানগঞ্জ বলিতে একটা ক্ষুদ্র ভরাট দীঘির এক পাড় মাত্র। তাহাতে একটা ক্ষুদ্র বাজার ও ঘরে ঘরে লাগা গরুর ঘরের মত মুনসেফের আফিস ও উকীল আমলার ঘর। ভরা পুষ্করিণীটির উপর তাঁহাদের পায়খানা এবং উহা তাঁহাদের ও তাঁহাদের মক্কেলদের মলমূত্রে পূরিত। আমার কালাচাঁদ কালেক্টর এখানেই সবডিভিসন 'হেড কোয়াটার' (কার্য্য স্থান) করিবেন! আমি দেখিলাম এই পদার্থশূন্য লোকের দ্বারা কিছুই হইবে না। তাঁহার ভাব দেখিয়া উকীল আমলারা উল্লম্ফন আরম্ভ করিল। আমি দেখিলাম তাঁহাদিগকে আমার পাকা হাত দেখাইতে হইবে। প্রথম স্থির করিলাম এক দিনে দেওয়ানগঞ্জের হাট ভাঙ্গাইব, দেখিব কালাচাঁদ কি করেন। এক হাটের দিন কিছু কিছু দূরে প্রত্যেক লোক-সমাগমের রাস্তায় কনেষ্টবল রাখিয়া দিলাম। তাহারা লোকদিগকে বলিয়াছিল যে দেওয়ানগঞ্জে হাটে না যাইয়া, সব-ডিভিসনে নূতন হাট বসিয়াছে, সেই হাটে যাইতে সব-ডিভিসনের হাকিম হুকুম দিয়াছেন। ফেণীর হাটে সমস্ত লোক উপস্থিত হইল। দেওয়ান গঞ্জ হাট একবারে লোক শূন্য। উকীল আমলাদের আনন্দের নৃত্য ভঙ্গ হইয়া আতঙ্কের ছুটাছুটি আরম্ভ হইল। অথচ

কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। রাস্তার উপর হইতে সাধাসাধি করিয়া, পরে পেয়দার দ্বারা জোর করিয়া, লোক লইতে চেষ্টা করিলেন, একটী প্রাণীও গেল না। সন্ধ্যার সময়ে একটি কনেষ্টবল ফেণী ফিরিবার সময়ে একটা দোকানে তামাক খাইতে গেলে, তাহার উপর কা কা করিয়া কাকের পালের মত উকীল আমলার পাল পাড়িলেন, এবং পুলিস দুষ্টামি করিয়া তাঁহাদের হাট ভাঙ্গাইয়াছে বলিয়া তাহাকে গালি দিয়া আক্রমণ করিলেন। গালিতে কনেষ্টবলের প্রতিযোগী তাঁহারা হইতে পারিবেন কেন? সে সুদ সমেত প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক উপহাস করিতে করিতে চলিয়া আসিলে,তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দলে বলে আমার কাছে আসিয়া নালিস করিলেন যে পুলিস হাটের লোকের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের বহুকালের প্রসিদ্ধ হাটটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি পুলিসের উপর চটিয়া লাল হইয়া ইন্স্পেক্টার ও সব ইন্স্পেক্টারকে তলব দিলাম, এবং কৃত্রিম কোপে তাঁহাদিগকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া এই অত্যাচারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা দুজনে তদ্রূপ কৃত্রিম ক্রোধে বলিলেন—"কোন্ মিথ্যুক পাজি এরূপ কথা আপনাকে বলিয়াছে, আমরা তাহার নাম চাহি, কারণ তাহার নামে আমরা অপবাদের ফৌজদারী নালিস উপস্থিত করিব। কোনও পুলিস দেওয়ানগঞ্জের আশে পাশে যায় নাই। দেওয়ানগঞ্জ মল-মূত্রের গঞ্জ। গন্ধের জন্য লোকেরা দেওয়ানগঞ্জের হাটে তিষ্ঠিতে পারে না। উকীল আমলা বাবুদের যেন উহা আতর গোলাপ হইয়াছে। ফেণীতে বাজার বসিতেছে শুনিয়া লোকেরা আপনি আনন্দের সহিত চলিয়া আসিয়াছে। কেবল একজন কনেষ্টবল কর্ম্মোপলক্ষে অন্যস্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে দেওয়ানগঞ্জে তামাক খাইতে বসিলে, বাবুরা তাহাকে মারপিট করিয়া, তাহার পেটি ও সরকারি কাগজ পর্য্যন্ত

কাড়িয়া লইয়াছেন ; কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস ঐ সকল কাগজে হাট ভাঙ্গিবার অবৈধ হুকুম আছে। অতএব কনেষ্টবল তাঁহাদের নামে ৩৫৩ ধারা মতে পুলিস বেদখলের এজেহার দিয়াছে।" "বড় গুরুতর ব্যাপার!"—আমি মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম। আর তাঁহাদিগকে বলিলাম যে কেহ অত্যাচার করিয়া হাট ভাঙ্গাইয়া থাকিলে তাঁহারা পুলিসে এজেহার দিন। উভয় মোকদ্দমার তদন্তের ভার ইন্‌স্পেক্টারের উপর দিলাম। ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন—"কে এজাহার দিবেন চলুন!" বাবুদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিষণ্ণ মুখে ইন্‌স্পেক্টারের পশ্চাতে চলিলেন, ঠিক যেন ফাঁসি কাষ্ঠে যাইতেছেন। তাহার পর আমরা পতি পত্নী দুজনে খুব হাসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, এবং বলিলেন তাঁহারা কোনও নালিস করিতে চাহেন না। আমি তখন আরও গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"তাও কি হয়। আপনারা যখন আমার কাছে বলিয়াছেন, তখনই নালিস হইয়াছে! উহা আর চাপা দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কনেষ্টবল যখন এজাহার দিয়াছে, তখন সে মোকদ্দমা ত আর বারণ করা যাইতে পারে না।" তাহার পর তাঁহারা অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত আমার কাছে কাঁদাকাটা করিয়া অব্যাহতি চাহিতে লাগিলেন। বহু অনুনয়ের পর আমি বলিলাম যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু ব্যাপার বড় গুরুতর! তাহার পর প্রায় পনর দিন যাবৎ পুলিস বেদখলের মোকদ্দমা তদন্ত হইল। এই পনর দিন তাহাদের আর ভয়ে আহার নিদ্রা ছিল না। এই কয়দিনেই ফেণীতে শুধু হাট নহে, একটা দৈনিক বাজার পর্য্যন্ত বসিয়া গেল, এবং বহুতর দোকানঘর প্রস্তুত হইয়া গেল। মহারাজার মোক্তারের দ্বারা কিছু টাকা আনাইয়া লইয়াছিলাম। প্রথম কয় দিন হাটে জিনিস পত্র সন্ধ্যার সময়ে যাহা অবিক্রীত থাকিত তাহা মোক্তার

কিনিয়া লইতেন। মাছ বাসায় বাসায় বিলি করিয়া মূল্য আদায় করা হইত, এবং অবশিষ্ট দ্রব্য পরের হাটে মোক্তার বিক্রয় করাইতেন। তদ্ভিন্ন দোকানদারদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য, জালজীবী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে অন্যান্য দ্রব্যের জন্য কিছু কিছু অগ্রিম দেওয়া হইল। এ সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে, এবং হাটে যাহাতে কোনওরূপ অত্যাচার না হয়, তাহা দেখিতে আমি একটা 'হাট কমিটি' নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এরূপ সুবন্দোবস্তের দরুণ অপর্য্যাপ্ত দ্রব্যাদি, এমন কি দশ মাইল দূর হইতে বড় ফেণীনদীর মৎস্য পর্য্যন্ত এ বাজারে ও হাটে আসিতে লাগিল। বাজারটী দুই চতুষ্কোণে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম দিকের চতুষ্কোণে আর একটি পুষ্করিণী কাটাইয়া উহাও ভরাট করিয়া সে দিকে গোহাটা প্রভৃতির স্থান করিয়া দিলাম। দুই পুষ্করিণীর পাড়ে নারিকেল, এবং বাজারের উভয় খণ্ডে বিলাতি কৃষ্ণচূড়া ও নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে টিনের ঘর ও পাকা দোকান প্রস্তুত হইতে লাগিল। যত দিন পুলিসের মোকদ্দমা তদন্তাধীন ছিল, তত দিন বাবুরা আসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমার কাছে কাঁদাকাটা করিতেন। পুলিস 'ছি ফরম' দিলে, এবং আমি উহা খারিজ করিয়া দিলে তাঁহাদের যম-যাতনা শেষ হইল। এক দিনে দেওয়ানগঞ্জের বাজার ভাঙ্গিয়া আনিয়াছি, ফেণী উপ-বিভাগে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

৩। মুন্‌সেফি পরিবর্ত্তন।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উকীল মহাশয়েরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। কালাচাঁদ তাঁহাদের সহায়। বাজার এরূপ কৌশলে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছি যে তিনি কোনওরূপ ফাঁক পাইলেন না।

তাহাতে তাঁহার জিদ আরও বাড়িয়াছে। আমি তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বরাবর জনসাধারণের পক্ষে মুন্‌সেফি উঠাইয়া আনিবার জন্য হাই-কোর্টে আবেদন পত্র পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। হাইকোর্ট জজ মিঃ গণের (Gun) মত চাহিলেন। ইনি ফেণী আসিলে আমি ও মুন্‌সেফ্ এই প্রস্তাবের অনুকূলে, এবং উকীল মহাশয়েরা ঘোরতর প্রতিকূলে, ও জজ নোয়াখালি ফিরিয়া গেলে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও যথাসাধ্য প্রতিকূলে বলিলেন। তিনি জজকে বলিলেন যে তিনি ফেণী হইতে সব-ডিভিসনের হেড কোয়া-টার উঠাইয়া লইতে রিপোর্ট করিয়াছেন। তাহাতে জজ ভয় পাইলেন। আমরা তৎপ্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টকে এক আবেদন পাঠাইলাম। গবর্ণমেণ্ট ফেণীতে জমী ও দীঘি ক্রয় করিতে, ও আফিসাদি নির্ম্মাণ করিতে অনুমান দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন খ্যাতনামা লয়েল (Lyall) সাহেব কমিশনার। তিনি আমার একজন নিতান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি তৎপূর্ব্বেই কালেক্টরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া জজকে লিখিয়াছিলেন। জজ এখন মুন্‌সেফি উঠাইয়া ফেণীতে আনিবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করিলেন। এদিকে উকীলেরাও সাধারণ লোকের ও তাঁহাদের নামে হাইকোর্টে ও গবর্ণমেণ্টে রাশি রাশি দরখাস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আমি এরূপ করিয়াছি যে এখন তাঁহারা নুণের জন্য খুন হইতেছেন। দেশের লোকে সকলে চাহে সমস্ত আফিস ফেণীতে একত্রিত হউক, কারণ তাহা সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর ও সুবিধাজনক। অতএব এরূপ হইয়াছে যে ফেণীর কি অন্য হাটের দোকনদার ও ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কাছে কোনও জিনিস বিক্রয় করিতেছে না। তাঁহাদের সময়ে সময়ে নিরম্বু একাদশী করিতে হইতেছে। মুন্‌সেফ মধ্যে মধ্যে আমার এখানে আসিয়া বলিতেন যে না খাইতে পাইয়া মারা গেলেন, এবং আমার এখানে খাইয়া

যাইতেন। হাইকোর্ট যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে মুন্‌সেফি ফেণীতে উঠাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত ফেণী বিভাগের লোক আনন্দে নাচিতে লাগিল। অপমানে উকীলদের ও তস্য মুরুব্বি কালাচাঁদের মুখ চুন হইয়া গেল। যে দিন দুর্গাপূজার জন্য মুন্‌সেফি বন্ধ হইবে সে দিন হাইকোর্টের আদেশ আসিয়া পৌঁছিল। জজ মুন্‌সেফকে লিখিয়াছেন যে মুন্‌সেফের কাছারি গৃহাদি ফেণীতে উঠাইয়া আনিয়া তার পর তিনি বাড়ী যাইতে পারিবেন। মুন্‌সেফকে সাহায্য করিতে আমাকে এক ডেমি-অফিসিয়াল পত্র লিখিয়াছেন। মুন্‌সেফ বেচারি বিপদগ্রস্থ। তিনি আসিয়া কাঁদকাঁদ ভাবে আমাকে বলিলেন যে কাছারি ফেণীতে উঠাইয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইতে হইলে তবে তাঁহার আর এ বন্ধে বাড়ী যাওয়া হইবে না। অতএব তাঁহার উপায় কি? আমি বলিলাম তাঁহার কোনও ভয় নাই। পর দিনই তিনি এবং উকীলেরা বাড়ী রওনা হইবার পূর্ব্বে কাছারি ফেণীতে উঠিয়া আসিবে। এক দিনে এক মাসের কার্য্য কেমন করিয়া হইবে,—তিনি বিস্ময়ের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম নিশ্চয় হইবে, তিনি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমি সেই সন্ধ্যার সময়ে ইন্‌স্পেক্টার ও সব ইনস্পেক্টারকে বলিলাম যে ফেণীর আশে পাশে যত গরুর গাড়ী আছে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং ফেণীর চারি দিকের লোককে বলিতে হইবে যে তাহারা যে মুনসেফি উঠাইয়া আনিবার জন্য এত কাল আগ্রহ করিয়াছে এখন তাহা উঠাইয়া আনিবার জন্য তাহাদের সকলকে এক দিন মজুরি করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে দেওয়ানগঞ্জে প্রায় পঞ্চাশ খান গাড়ী ও পাঁচ শত মজুর সমবেত। যাহারা কখনও মজুরি করে নাই তাহারাও গিয়াছে। লোকের আর আনন্দ ধরে না। তামাসা দেখিবার জন্য শত শত লোক উপস্থিত। নিকটস্থ সমস্ত গ্রাম লোকশূন্য হইয়াছে।

অনুমান আটটার সময়ে আমার গৃহের পশ্চাতের চৌ-বারাণ্ডায় বসিয়া স্বামী ও স্ত্রী দেখিতেছি প্রথম গরুর গাড়ীর ট্রেনে কাছারির জিনিস পত্র,এমন কি ঘরের বেড়া ও খুঁটি ইত্যাদি আসিতেছে। তাহার পর বড়ই কৌতুক দৃশ্য!—এক এক খানি আস্ত ঘর যেন হাঁটিয়া আসিতেছে এবং হরি-ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ হইতেছে। এত লোক জুটিয়াছে যে ঘরের চারি খানি চাল না খুলিয়া লোকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেছে। দূর হইতে দেখিতে চারি চালের নীচে চারি সারি লোক যেন সজীব খুঁটি বোধ হইতেছে। ঘর যেন হাঁটিয়া আসিতেছে। এ দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। রাস্তার দুই ধারে লোকারণ্য। গৃহ সকল এরূপ হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া নর নারী হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। হরি ধ্বনিতে ও 'বদর' ধ্বনিতে চারি দিকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া দেওয়ান গঞ্জের মুন্‌সেফী এরূপে ফেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই দিনই দিনে দিনে গৃহাদি ফেণী দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে উঠাইয়া, ও তাহাতে জিনিস পত্র সজ্জিত করিয়া, আমি ও মুন্‌সেফ উভয়ে জজের কাছে টেলিগ্রাফ করিলাম। শুনিলাম যখন লোকেরা হরিধ্বনি ও বদর-ধ্বনি দিয়া কাছারি ঘর ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিতে লাগিল, উকীল মহাশয়েরা দাঁড়াইয়া অপমানে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

তাঁহাদের অশ্রুপাত ও অপমান-ভোগ এখানে শেষ হইল না। মুন্‌সেফি খুলিলে তাঁহারা বাড়ী হইতে ফিরিলেন। প্রধান উকীলেরা ঢাকা অঞ্চলের লোক। কেহ ফেণীতে বাসা বাড়ী করিবার স্থান পান না! কয়েক দিন পদব্রজে পাঁচ মাইল হাঁটিয়া দেওয়ানগঞ্জ হইতে কাছারি করিলেন। কারণ গরুর গাড়ীও পান না। ফেণীর লোকেরা কেহ তাঁহাদের কাছে বাসা বাড়ীর জন্য জমী বিক্রয় করিতে কি বন্দোবস্তি দিতে চাহে না। যদি কেহ চাহে, সে এরূপ মূল্য ও খাজনা চাহে যে

তাহা দেওয়া অসম্ভব। অগত্যা বাজারের দোকান ঘরে তাঁহারা বাসস্থান লইলেন। তাঁহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। তখন আমার কাছে আসিয়া কাঁদা কাটা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে তাঁহারা আমাকে লোকের চক্ষে এত ক্ষুদ্র করিয়াছেন যে আমার কথা কেহ শুনিবে না। আমি তাঁহাদের সাধাসাধি করিয়া একটা গবর্ণমেণ্টের কাছারি উঠাইয়া আনিতে পারি নাই। তাঁহাদিগকে নিজের জমী দিতে প্রজাদিগকে আমি কেমন করিয়া বাধ্য করিব? তাঁহারা জেলার কালেক্টরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁহারা তাহা করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কালা কালেক্টর কি করিবেন? তিনি জোর করিয়া কাহারও জমী হস্তান্তর করিতে পারেন না। শেষে তাঁহাদের দুর্গতিতে ফেণীর পুলিসের ও আমলা মোক্তারদের পর্য্যন্ত দয়া হইল। সকলে আমাকে ধরিলেন। আমি ট্রাঙ্ক রোডের ধারে বাজারের অপর দিকে একটা সুন্দর স্থান পূর্ব্বেই মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা তাঁহাদের উচিত খাজানায় বন্দোবস্তি দিতে প্রজাদের বলিয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের এত নিকটে থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা একটা জঘন্য স্থান বাজারের উত্তর দিকে কিছুদূরে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সেখানে তাঁহাদের স্থান দিলে ফেণী দেখিতে অতি কদর্য্য দেখাইবে। আরও কিছুদিন দুর্গতি ভুগিয়া শেষে তাঁহারা আমার মনোনীত স্থানই স্থির করিলেন। কিন্তু একজন ঢাকা অঞ্চলের উকীল তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূর প্রকৃতির লোক। তিনি অতিরিক্ত টাকা স্বীকার করিয়া উক্ত কদর্য্য স্থানে তাঁহার বাসা নির্ম্মাণের বাঁশ বেত সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্য উকীলেরা সঙ্কটে পড়িয়া তিনি যাহাতে সেখানে বাসা নির্ম্মাণ করিতে না পারেন, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে বড়ই অনুনয়

করিলেন। আমি সেই দিনেই সেখান দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য নিশান খাড়া করাইয়া দিলে, তিনি আমার কাছে আসিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম সেখান দিয়া রাস্তা না করিয়া উপায়ান্তর নাই। তিনি কিছু টাকা সে প্রজাকে অগ্রিম দিয়াছিলেন। সে তাহা ফেরত দেয় না। অবশেষে তিনি লোকের উপহাস উদরস্থ করিয়া এবং এই টাকা দণ্ড দিয়া, অন্য উকীল-দের সঙ্গে আমার নির্ব্বাচিত স্থানেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলেন। আমার দেখাদেখি তাঁহারা ও আমার কোর্টের উকীল, আমলা, মোক্তারেরা সকলই সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ফেণী একটী সুন্দর উপনগর হইয়া উঠিল। তখন উকীল মহাশয়েরা পর্য্যন্ত আমার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের স্থানটী বড় মনোরম হইয়াছিল। দেওয়ানগঞ্জে মাত্র বাকী রহিল "পরিদর্শন বাঙ্গালাটী" উহা পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের। তাহাদের দরবার বৃহৎ ব্যাপার। এমন সময়ে জেলার পূর্ত্তকার্য্য গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রীক বোর্ডের হস্তে দিলেন। আমি তখনই সেই বাঙ্গালাটী সেইখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া ট্রাঙ্করোডের সংলগ্ন, দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আমার 'ফেসন' মতে বিচিত্র অবয়বে নির্ম্মাণ করিলাম এবং উহার ও আমার কাছারির মধ্যস্থলে সুগন্ধ পুষ্পের অর্থাৎ বকুল, নাগেশ্বর, চম্পক, কদম্ব প্রভৃতির একটি গোল স্তবক (tope) রোপণ করিলাম। বাঁশের কেল্লা জেলখানার পরিবর্ত্তে পাকা জেলের প্রস্তাব কিছুকাল যুদ্ধের পর মঞ্জুর করাইয়া উহা দীঘির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণার নীচে মাঠে নির্ম্মাণ করিলাম, কারণ পূর্ত্ত বিভাগের প্রভুরা বলিলেন যে পাকা গৃহ দীঘির ভরা মাটীর উপর স্থায়ী হইবে না। কিছুদিন পরে পশ্চিম পাড়ের পার্শ্বে একটা পাকা ট্রেজারিও নির্ম্মাণ করাইলাম।

(৪) ডিস্‌পেনসারি।

ডিস্‌পেনসারি ও একজন হস্‌পিটাল এসিস্‌টাণ্ট পূর্ব্ব হইতে ছিল। তবে ডিসপেনসারির শোচনীয় অবস্থা। স্থানটী কদর্য্য। রোগী থাকিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। এমন কি ঔষধ পর্য্যন্ত নাই বলিলেও চলে। ডাক্তার ডিস্‌পেনসারি হইতে বহুদূরে থাকেন। পরিদর্শক সকলে বহু কাল যাবৎ ছি ছি করিতেছেন। আমি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে প্রস্তাব করিলাম যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হয় দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ঘর খানি ও স্থানটী ভাল করিয়া ও ডাক্তারের বাসস্থান সেইখানে নির্ম্মাণ করিয়া দেন; কিম্বা দুই শত টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেন। ফেণীর উন্নতি সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রস্তাব লইয়া ডিঃ বোর্ডে আমাকে একটা যুদ্ধ করিতে হইত। উকীল মেম্বারদের বিশ্বাস যে আমি ডিঃ বোর্ডের সমস্ত টাকা ফেণীতে লইতেছি। তাঁহারা প্রথমতঃ বাৎসরিক দুই শত টাকার সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। আমি তাহাতে একটুক হাসিলে তাঁহারা মনে করিলেন তাঁহারা ঠকিলেন, তখন তাঁহারা গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য দুই হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। আমি তাহাতেও হাসিলে ইংরাজ কালেক্টর চেয়ারম্যান, (তখন কালাচাঁদ চলিয়া গিয়াছেন) বলিলেন—"এই দেখ নবীন বাবু হাসিতেছেন। তোমরা এ প্রস্তাবে ঠকিয়াছ।" তখন তাঁহারা আবার বাৎসরিক সাহায্যের জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। কালেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! আপনি এখন সরলভাবে বলুন, ইঁহাদের হার হইল না আপনার হার হইল"। আমি বলিলাম,—"ইঁহাদের নিশ্চয় হার হইল। এই বাৎসরিক সাহায্যই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সোজাসুজি তাহা চাহিলে এই প্রভুরা দিবেন না বলিয়া

আমি কৌশল করিয়া বিকল্পে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। এই সাহায্য চিরস্থায়ী হইল। গৃহাদির কার্য্যের জন্য আমি চাঁদা বাড়াইয়া টাকা জমা করিয়াছি আপনি আর পনর দিন পরে ফেণী গেলে সকলই নূতন দেখিবেন।” তখন সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সভ্য মহাশয়েরা বড় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—“সার! ইঁহার সঙ্গে পারিবার যো নাই।” আমি ফিরিয়া আসিয়া ডিস্‌পেনসারির পার্শ্বের পুষ্করিণীটীর সংস্কার করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে যে সকল নানা অবয়বের এবং নানাবিধ দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্ত্ত ছিল তাহা ভরাট করিয়া, এবং স্থানটী উচ্চ করিয়া, সেখানে ডাক্তারের সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিলাম এবং গৃহ খানি সম্পূর্ণরূপে আমার ‘ফেসন’ মতে সংস্কার করিয়া তাহার চারিদিকে পুষ্প ও ফলোদ্যান রোপণ করিয়া দিলাম। তাহার সম্মুখে ট্রাঙ্ক-রোড়ের অপর পার্শ্বে যে একটা কুৎসিত পদ্মপুকুর ছিল তাহার পাড় সকল ছাটিয়া ছুটিয়া উহাও একটা উদ্যান-সরোবরের মত করিয়া দিলাম। কালেক্টর আসিয়া প্রকৃতই বলিলেন—“নবীন বাবু! তুমি সত্য সত্যই এই কয় দিনে একটা fairy scene (অপ্সরাদৃশ্য) সৃষ্টি করিয়াছ।” তখন হইতে যে পরিদর্শক আসিতে লাগিলেন সকলই বাহবা দিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া আমি ‘ছাগল গাইয়া’ থানাতেও ডিস্‌পেনসারি খোলাইয়াছিলাম স্মরণ হয়।

(৫) এণ্ট্রান্স স্কুল।

আমি যখন ফেণীর ভার গ্রহণ করি তখন তথায় একটি মাইনর স্কুল, এবং তাহারও নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ছিল। স্কুল গৃহখানি ইংরাজদিগের মুরগীর ঘর বলিলেও চলে। শিক্ষকদিগের বেতন বাকী

পড়িয়াছে কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চাঁদা উশুল হইত না। মাইনর স্কুলও এক অপূর্ব্ব খিচুরি বা গরমাগরম সাড়ে আঠার ভাজা। ছেলেদের বয়সের সংখ্যা অপেক্ষা পুস্তকের সংখ্যা বেশী। বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব পাঠ্য পুস্তক সকলের দ্বারা ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, এমন তত্ত্বই নাই যাহা পঠিত হইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার ইংরাজী শিক্ষাও আছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বেতন পনর কি কুড়ি মুদ্রা। তাঁহার ইংরাজী জ্ঞানও সেই পনর কি কুড়ি মুদ্রানুযায়ী। তাঁহার নিজের ইংরাজী উচ্চারণ অপূর্ব্ব এবং ছাত্রদের অপূর্ব্বতর। এত শিক্ষাদান নহে বলিদান। যাহারা পাশ হইতেছে তাহাদের মধ্যে দুই এক জন কোন মতে কোন এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িতে যাইতেছে; অবশিষ্ট পেয়াদাগিরি বা কনষ্টেবলগিরির উমেদার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাসার চাকর পাইবে না। কিন্তু পেয়াদাগিরি কি কনষ্টেবলি একটা খালি হইলে দুই শত লোকে উমেদার হইবে এবং বিনা পয়সায় বাসার চাকরি করিতে সম্মত হইবে। যাহাদের তাহাও জুটে না, তাহারা "টন্নিগিরি" করে এবং মিথ্যা মোকদ্দমায় দেশের সর্ব্বনাশ ঘটায়। যাহাদের সেই শক্তিও নাই সে রাণী এলিজাবেথের সময়ের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া হাকিমদের কাছে বেনামী পত্র লেখে। এক জন মেথর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ঢাকায় ইংরাজদের চাকরি করিয়া সুন্দর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিল। ইহার ছাত্রবৃত্তি পাশের ফলে সেই ব্যবসা ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে ভূসম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে। এখন আর কিছুই নাই। তাহার দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া আমি তাহাকে "একটিং" পেয়াদার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সমস্ত আফিস বিদ্রোহী হইল। কেহ তাহার হাত হইতে কাগজ খানি পর্য্যন্ত লইতে চাহে না। মুন্‌সেফ চেষ্টা করিলেন, তাঁহার আফিসেও

সেরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অবশেষে তাহার একটী ভাইকে স্কুলের বাগানের মালী নিযুক্ত করিয়া দিয়া একটী পরিবারকে অনশন হইতে রক্ষা করি।

ফেণীতে একজন মাত্র মালী ছিল, সে সমস্ত আফিসে, বাজারে ও হাটের কায করিয়া মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা পাইত। কায কর্ম্ম করিয়া গিয়া দুপুর বেলা সে রামায়ণ পড়ে। দেখিতে একটি ভদ্রলোকের মত। এক দিন তাহার পুত্রটীকে আমার কাছে আনিল। বয়স উনিশ কি বিশ, সুন্দর ছেলে। আমি তাহাকে দেখিয়া আমার নিজ বাসায় চাকর রাখিতে চাইলে তাহার পিতা করজোড়ে বলিল,—"কর্ত্তা তারে লিখাইছি।" আমি মনে করিলাম—"তাহার মাথাটী খাইয়াছ।" পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের পর তাহার পেয়াদাগিরির চেষ্টা বিফল বুঝিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত করিল। কিন্তু প্রাইমারী শিক্ষা তাহার পক্ষে মহামারী হইয়াছে। সে তাহা পারিবে কেন? কিছুদিন পরে তাহার পিতা আসিয়া এক দিন আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে তাহার ভাই মরিয়া গিয়াছে। জায়গা জমী সব পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব তাহার পুত্রকে তাহার কার্য্যে রাখিয়া তাহাকে ছুটী দিলে সে গিয়া কৃষি করিবে। তাহার পুত্র তাহা পারে না। পুত্রটী তখন ক্ষেত্রতত্ত্ব পোড়াইয়া তাহার পৈতৃক ব্যবসা ভূমিতত্ত্ব ও ভূমিমালীত্ব ধরিল। তাহার পর বেশ কায করিতে লাগিল।

এক দিন একটী মৎস্যজীবিনী তাহার চৌদ্দ পনর বৎসরের এক পুত্র লইয়া আসিয়া আমার পায়ের উপর ফেলিয়া বলিল যে সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছে, 'মাইনর' পড়িতে চাহে। এই ছেলেটীও দেখিতে ভদ্রলোকের মত। আমি তাহাকে আমার বাসায় রাখিয়া পড়িতে দিলাম। কিন্তু স্কুলে

ও আমার গৃহে বিদ্রোহ উপস্থিত। স্কুলে উকীল মোক্তার ও আমলার ছেলেরা তাহার সঙ্গে বসিতে চাহে না। বাসায়ও ভৃত্যেরা কবুল জবাব দিল তাহার সঙ্গে তাহারা এক চালের নীচে খাইবে না কি থাকিবে না। হতভাগ্য শিশু উঠানে আহার করিত এবং আমার বাইরের ঘরে এক স্থানে শুইয়া থাকিত। সুন্দর জ্যোৎস্না, অধিক রাত্রি হইয়াছে,—আমি মফঃস্বল হইতে আসিতেছি। প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে আমি ধীরে ধীরে অশ্ব চালাইয়া আসিতেছি। দীঘির পাড়ের উপর উঠিলে সুন্দর সঙ্গীতের স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুমধুর বালককণ্ঠ গগন ব্যাপিয়া উঠিতেছে! আমার বৈঠকখানার নিকটে আসিয়া বুঝিলাম সে বালকটী নির্জ্জনে গাইতেছে—

"তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না?
তোমরা সবে যাবে,
সমাদর পাবে,—
আমি গেলে পিতা কথা কবে না।"

আমার বোধ হইল যেন তাহার অবস্থায় ব্যথিত হইয়া সে প্রাণ খুলিয়া গাইতেছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। আমি চুপি চুপি ঘোড়া হইতে নামিয়া স্ত্রীকে ডাকিলাম। উভয়ে তাহার গান শুনিতে গাগিলাম। উভয়ের চক্ষে জল আসিল। স্ত্রী বলিলেন—"কিন্তু কি করিবে? তুমিত মফঃস্বল চলিয়া গিয়াছিলে। হতভাগার বিরুদ্ধে সমস্ত সব-ডিভিসন দাঁড়াইয়াছে। উকীল মোক্তারেরা তোমার কাছে আসিয়া বলিবে—যে তাহাকে রাখিলে এই স্কুলে তাহাদের ছেলেরা পড়িবে না। বাসায় চাকরেরাও জবাব দিয়াছে তাহাকে রাখিলে তাহারাও চাকরী ছাড়িয়া দিবে।" আমি তখন বুঝিলাম সেই মনস্তাপে

বালক ঐ গীত ধরিয়াছে। গীত ত নহে, যেন প্রত্যেক অক্ষরে ও মূর্চ্ছনায় তাহার হৃদয়ের শোণিত নির্গত হইতেছে। আমিও প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম, সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। স্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল। দেখিলাম তাহাকে রাখিলে এ দিকে স্কুল ভাঙ্গিয়া যায়, অন্যদিকে ভৃত্য-শূন্য হই। তখন তাহাকে আমি বড় স্নেহের কণ্ঠে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম এবং বিদায় দিলাম। বিদায়ের সময়ে সেও কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। একটী নিরপরাধী শিশুর প্রতি যে ধর্ম্ম ও সমাজ এরূপ অত্যাচার করিতে পারে তাহার অধঃপতন হইবে না কেন?

ইহার কিছু দিন পরে, তেমনি প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্না রাত্রি। গ্রাম্য প্রকৃতি নির্ম্মল-রজত-বরণ-মণ্ডিতা হইয়া চারি দিকে কি শান্তির হাসি হাসিতেছেন! আমি মুগ্ধ প্রাণে সেই শোভা দেখিতে দেখিতে নৌকায় মফঃস্বল হইতে ফেণী ফিরিতেছি। আমাদের নৌকার সম্মুখ দিক হইতে সুমধুর বালককণ্ঠ-নিসৃতঃ সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে নৌকা অগ্রসর হইলে, সে কণ্ঠ যেন সেই বালকের বোধ হইতে লাগিল। বালক এক খানি ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গিতে শুইয়া গান করিতেছে, ডিঙ্গির সম্মুখে জাল বসান রহিয়াছে। আমার আদেশ মতে আরদালি জিজ্ঞাসা করিল—"কে রে! গোপাল না কি?" তাহার নাম গোপাল। সে তাড়িত-সংস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে ও আরদালি দাদা। বাবা কি নৌকায় আছেন—?" আরদালি বলিল—"হাঁ।" তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া বলিল—"নৌকা একটুক রাখ।" আমিও নৌকা রাখিতে বলিয়া দাঁড়াইলাম—"গোপাল, গোপাল," বলিয়া ডাকিলাম। তাহার ক্ষুদ্র নৌকা খানি নক্ষত্র বেগে আমার নৌকার দিকে ছুটিয়া আসিল।

আমার নৌকা সেই নৌকা ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহার নৌকা আমার নৌকার সংলগ্ন করিয়া সে কতকগুলি মাছ নৌকায় আরদালির কাছে দিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম তাহার মুখে সেই বিষাদ নাই, সুন্দর মুখ খানি এখন প্রসন্ন, হাসি হাসি। আমি তাহার মুখ খানি বাম হাতে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরে গোপাল, তুই এখন কি করিতেছিস্।" সে হাসি মুখে উত্তর করিল—"বাবা—আপনার উপদেশ মতে একখানি জাল কিনিয়াছি এবং নদীর এই স্থানটী বন্দোবস্তী লইয়া এখানে জাল বসাইয়া থাকি।" আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম—"বেশ করিয়াছিস্, এখন তোদের কোন কষ্ট নাই?" উত্তর—"না বাবা, আমরা মায়ে ছেলেয় বেশ আছি। আমরা মায়ে ছেলেয় মার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।" তাহাকে একটি টাকা দিতে আরদালীকে বলিলে সে বলিল সে টাকা লইবে না। না লইলে আমি দুঃখিত হইব বলিলে টাকা লইয়া আবার আমাকে নমস্কার করিয়া তাহার নৌকায় গিয়া উঠিল। আমার নৌকা চলিল, যতক্ষণ দেখা গেল সে ও আমি স্থির নয়নে জ্যোৎস্নায় পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার প্রাণেও যেন কি একটা আনন্দের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, কারণ এ শিশুটি শিক্ষা বিভ্রাট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

এরূপে নিম্ন জাতীয় ছেলেগুলি কর্ত্তাদের প্রাথমিক বা সাংঘাতিক শিক্ষার ফলে এক দিকে মারা যাইতেছে,—অন্য দিকে উচ্চ জাতীয় ছেলেদেরও মাইনর শিক্ষার দ্বারা কিছুই লাভ হইতেছে না। অতএব মাইনর স্কুলটী এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করিতে ভদ্র লোকেরা সকলে আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। ফেণীতে এখন অনেক ভদ্র লোক। তাহাদের ছেলেদের উপায় কি হইবে। আমারও একমাত্র সন্তান একটী পুত্র।

মাদারিপুরে কেবল মাইনর স্কুল ছিল বলিয়া ভাই ছুইটীকে বাড়ী পাঠাইয়া মাটি করিয়াছি। অন্য দিকে ফেণী বিভাগ কেবল কৃষকের বাসস্থান বলিলেও হয়। অর্দ্ধেক বিভাগের জমীদার ত্রিপুরার মহারাজা—এবং অপরার্দ্ধের জমীদার কুর্জ্জন (Courjon) সাহেব। উভয়েই ঘোরতর ঋণগ্রস্থ। তাহার পর অল্প কয়েক জন সামান্য তালুকদার, অন্য সকলেই কৃষক। টাকা পাইব কোথায়? বাহিরে ভিক্ষা করিয়া চারি শত টাকা মাত্র পাইলাম। তাহার পর ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করিয়া সব-ডিভিসনে বাহির হইলাম। শীতের সময়ে যেখানে যেখানে শিবির পড়িত, সেখানে তালুকদারদের ও অবস্থাপন্ন কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে ডাকিয়া যে যাহা দেয়, মুষ্টি ভিক্ষা পর্যান্ত লইয়া আর নয় শত টাকা তুলিলাম। এক পাপীষ্ঠ ব্যবসায়ীর সত্তর হাজার টাকার মহাজনী ও প্রকাণ্ড কারবার আছে। অনেক পীড়াপীড়ির পর দশ টাকা মাত্র স্বাক্ষর করিয়া দিল, তাহারও তিন টাকার বেশী কিছুতেই উশুল করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি সে কোথায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে একবার সমস্ত দিন উপবাসে পড়িয়া ছিল। বয়ঃ ষাট বৎসর। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার পুত্র তাহাকে এক মুষ্টি চাউল, একটা বাতাসা ও এক ঘটী জল আনিয়া দিল। সে চীৎকার করিয়া এই কুপুত্র তাহার সংসার ডুবাইবে বলিয়া গালি দিতে দিতে চাউল মুটো চাউলের এবং বাতাসাটী বাতাসার মটকায় রাখিয়া দিল। তার পর কেবল এক ঘটী জল পান করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। আর এক মুসলমান জমীদার ও মহাজন, তাহারও ষাট সত্তর হাজার টাকার মহাজনী আছে। শুনিলাম দশ দিন নির্য্যাতনের পর বিশ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিল এবং তাহাও আর দশ দিন যাবত আমার শিবিরের বাহিরে ধন্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া কোন মতে অব্যাহতি না পাওয়াতে দিয়াছিল।

রূপচাঁদের কি মাহাত্ম্য! যাহার নাই সে দুঃখী, কিন্তু যাহার আছে সে পাপিষ্ঠ।

যাহা হউক পুরাতন মাইনর স্কুল গৃহে ফেণীর এণ্ট্রান্স স্কুল খুলিলাম। উপরোক্ত মতে যে তের শত টাকা চাঁদা পাইয়াছিলাম, তাহার দ্বারা ফেণী দীঘির পূর্ব্ব দিকে বিস্তীর্ণ একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া তাহাতে মাটির দেওয়াল তুলিয়া কুড়িটী কোণ ও চাল সমন্বিত একটি বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম এবং মাটির দেওয়াল ও 'পিলার' এরূপভাবে নির্ম্মিত ও রঞ্জিত করিয়াছিলাম যে কাহারও সাধ্য নাই যে উহা ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা বলিয়া মনে না করিবে। তাহার সম্মুখে হৃদয়াকৃতি একটি সরোবর কাটাইয়া তাহার তীরে ফুল ও ক্রোটনের উদ্যান রোপণ করিয়াছিলাম, এবং উদ্যানের বাহির দিয়া হৃদয়াকৃতিতে স্কুল প্রবেশের রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার দুই পার্শ্বে নারিকেলের দুইটী সুন্দর স্তবক এবং স্কুল গৃহের দুই পার্শ্বে "বোটানিকেল গার্ডেন" হইতে আনীত বহুমূল্য আম্র লিচু ও নানাবিধ ফলের কলমের স্তবক রোপণ করিয়াছিলাম। পশ্চাতে প্রকাণ্ড খেলার প্রাঙ্গণ। তাহার চারি ধারে আয়ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ আম্র, পনস ও ফলবান বৃক্ষ এবং বকুল, চম্পক, অশোক, নাগেশ্বর প্রভৃতি ফুলের বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম। প্রাঙ্গণের চারি কোণায় চারিটী বিলাতী কৃষ্ণচূড়া রোপিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন হাতার চারি সীমাতে ঐরূপ ফল ও ফুল বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল।

স্কুলে নানাবিধ নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিলাম। অন্যান্য স্কুলে নয় দশটী ক্লাস, ক্লাস ডিঙ্গাইতে ডিঙ্গাইতে ছেলেদের ইহ কাল শেষ হইয়া যায়। আমি মোটে ছয়টী ক্লাস মাত্র খুলিলাম। কেবল শেষ ক্লাসে দুইটী মাত্র বিভাগ রাখিলাম। যাহারা প্রথম আসিয়া ভর্ত্তি

হইবে তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইবে, এবং প্রথম বিভাগের উপযুক্ত হইবা মাত্র বৎসরের মধ্যেই সেই বিভাগে উন্নীত হইবে। তাহার পর প্রত্যেক শ্রেণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম (Big boys & little boys section) বড় ছেলের ভাগ ও ছোটছেলের ভাগ। যাহারা বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি মাইনর ইত্যাদি পাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বয়স বেশী, চরিত্রও কলুষিত। তাহাদের সঙ্গে যাহারা কেবল ইংরাজী স্কুলে পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিযোগিতা বড় কঠিন হয় এবং সংস্রবও দূষণীয়। কেবল তাহা নহে। বড় ছেলেগুলি বাঙ্গালাতে অঙ্ক ও ইতিহাস শিখিয়া এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আসে যে ইংরাজী স্কুলের ছোট ছেলেরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। অতএব আমাদের দুই বিভাগের জন্য পারিতোষিকও স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলাম। এই ব্যবস্থা নিবন্ধন উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। ছোট ছেলেরা কোন বিষয়ে বড় ছেলেদের অপেক্ষা পরীক্ষায় নম্বর বেশী পাইলে—প্রায়ই পাইত—বড় ছেলেদের প্রাণে আঘাত লাগিত। অন্য দিকে বড় ছেলেদের দ্বারা ছোট ছেলেদের চরিত্র কলুষিত হইবার কোন অবসর ছিল না। এই প্রতিযোগিতা প্রত্যহ সজীব রাখিবার জন্য আমি প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যহ নম্বর দেওয়ার নিয়ম করিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক শনিবার এক এক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা হইত। ইহার ফল সোমবার দিন আমি বিশেষ করিয়া দেখিতাম। যদি কোন বিষয়ে কোন শ্রেণীর ফল সন্তোষজনক না হইত, তবে সেই বিষয়ের শিক্ষককে তজ্জন্য দোষী করিতাম এবং সেই বিষয়ের অধ্যয়নের সময় বেশী করিয়া দিতাম। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শনিবার ব্যায়ামের, পরিচ্ছন্নতার এবং চরিত্রের জন্য নম্বর দেওয়া হইত এবং সাপ্তাহিক নম্বরের মোট, পরীক্ষার ফল ও

শিক্ষকের মন্তব্য একখানি বহিতে লিখিয়া ছাত্রের দ্বারা তাহা অভিভাবকের কাছে পাঠাইতাম এবং ছাত্র তাহা অভিভাবকের স্বাক্ষর করাইয়া আনিত। অতএব স্কুলে ও গৃহে দুই দিকে ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিত এবং এ সকল নিয়মের ফল যে কি শুভময় হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না।

পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আমি নূতন নিয়ম করিয়াছিলাম। এখন প্রত্যেক শ্রেণীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক। ইহাতে যে কেবল নূতন নূতন পুস্তক কিনিয়া অভিভাবকদের রক্ত শুষ্ক হয় তাহা নহে, ছাত্রদেরও প্রত্যেক শ্রেণীতে নূতন নূতন ভূগোল, ইতিহাস, এবং ব্যাকরণ পড়িবার ফল এই হয় যে কিছুই ভালরূপ শিক্ষা হয় না! আমি নিয়ম করিয়াছিলাম এই সকল বিষয়ে একই পুস্তকের এক এক ভাগ এক এক শ্রেণীতে —পঞ্চম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত—পঠিত হইবে। তাহার পর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে এন্‌ট্রান্সের নির্দ্ধারিত পুস্তক সকল পঠিত হইবে। নিম্নতম শ্রেণীতে বাঙ্গালার শিশুরক্তশোষী পাঠ্যপুস্তক লেখকদের ছাই ভস্ম পড়িতে না দিয়া রামায়ন পড়িতে দিয়াছিলাম। তাহা হইতে আপত্তিজনক অংশ সকল আমি নিজে শিক্ষকের হস্তের বহি হইতে বাদ দিয়াছিলাম। তিনি ছাত্রদের হস্তের বহি হইতে বাদ দেওয়াইয়া দিয়াছিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা কি আনন্দের সহিত উহা পাঠ করিত!

অধ্যাপনা সম্বন্ধেও আমি নিয়ম করিয়াছিলাম যে প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য ও অঙ্ক লইয়া অবশিষ্ট সময় অন্য শ্রেণীর সাহিত্য পড়াইবেন। নিম্নশ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার ভার অল্প বেতনের নিম্ন শিক্ষকদের উপর রাখিলে তাঁহাদের দ্বারা কিছুই ভাল শিক্ষা হয় না, এবং সেখানে উচ্চারণ ইত্যাদি বিগড়াইলে

পরে তাহা সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কারণে যে সকল ছাত্র মাইনর পাশ করিয়া আসে তাহাদের ইংরাজী উচ্চারণ এরূপ বিগড়াইয়া যায় যে তাহারা বি, এ, এম, এ পাশ করিয়াও উহা শুধরাইতে পারে না। ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত, আমি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকের হাতে এবং অঙ্ক শিক্ষার ভার চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ করা শিক্ষকের হাতে দিয়াছিলাম। চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস বাঙ্গালায় শিক্ষা হইত। ইহাতে এক দিকে শিক্ষকের বেতন কম লাগিত, অন্য দিকে ছাত্রদের রক্তশোষণ কম হইত। এ সকল বিষয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ইংরাজী স্কুলে পড়াইয়া কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয় আমি বুঝি না। Island is a piece of land surrounded by water সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মুখস্থ করিতেছে অথচ একটি অক্ষরও বুঝে নাই। যদি বাঙ্গালাতে বলি যে একখণ্ড ভূমির চারিদিকে জল থাকিলে তাহাকে দ্বীপ বা island বলে, এবং তাহা একটি নক্সায় দেখাইয়া দিই, সে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে, এবং চিরদিন উহা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অঙ্ক বাঙ্গালায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কত সুবিধা তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। এণ্ট্রান্সে যে দেশের ইতিহাস নির্ব্বাচিত হয়, তাহার একটা সরল বাঙ্গালা ইতিহাস নিম্ন শ্রেণীতে পড়িয়া দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজীতে তাহার পর সেই ইতিহাস শিক্ষা করিতে কত সুবিধা তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মোটকথা আমি চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজীকে দ্বিতীয়ভাষা (Second language) করিয়া সমস্ত বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ব্যায়ামের ব্যবস্থাও কিছু নূতন রকমে করিয়াছিলাম। মধ্যে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রামের (Recreation) জন্য প্রত্যহ সময় দিয়াছিলাম। শীত-

কালে এই বিশ্রাম সময়ে এবং স্কুলের পর ছেলেরা 'ক্রিকেট' খেলিত তাহার জন্য আমি Great Eastern Hotel (গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল) হইতে ভাল ব্যাট্ বল, লেগিং (পায়ের চর্ম্মাবরণ) ও দস্তানা আনাইয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বড় ও ছোট ছেলেরা দুইভাগে খেলিত। গ্রীষ্মের ও বর্ষার সময়ে সেরূপ খেলিবার সুবিধা হইত না। অতএব বিশ্রাম সময়ে ছেলেরা গৃহে আমাদের দেশীয় মতে বুকডন ইত্যাদি করিত। এই খেলা ও ডনের সময়ে শিক্ষকদের থাকিতে হইত। এ কারণে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষকেরা বিশ্রামের সময়ে ও স্কুলের পর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমাদের কত কিছু শিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর খেলার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া কত উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সেরূপ শিক্ষক স্বপ্ন হইয়াছে। এখন যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা সকলেই প্রায় উহা একটা 'বেগার' কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কোন মতে দিনটা গণাইতে পারিলে হয়। ছাত্রদের অসচ্ছরত্রের এবং শিক্ষকদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের কথা এখন প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না হইবে কেন? শিক্ষকের যদি ছাত্রের প্রতি ও সহানুভূতি না থাকে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা থাকিবে কেন? এক দিন হেড মাষ্টার আমাকে বলিলেন যে ছাত্রেরা ব্যায়াম করিতে চাহে না। তাহারা বলে খেসারির ডাল খাইয়া কি ব্যায়াম করা যায়? আমি বুঝিলাম যে এই ওস্তাদি তাঁহার নিজের। আমি সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিলাম। পরদিন কোর্টে এক দল ছাত্র এক দরখাস্ত হস্তে উপস্থিত। তাহাতে লেখা আছে যে তাহারা ব্যায়াম করিতে পারিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন পারিবে না?" উত্তর—"খেসারির ডাল খাইয়া কি ব্যায়াম করা যায়?" আমি বলিলাম—"বটে! আচ্ছা খেসারির ডাল খাইয়া বেত খাইতে পারা যায় কি না আমি দেখিব।"

কোর্টের বেত্রাঘাতের ত্রিকোণ কাষ্ঠ আনিতে আমি আর্দালিকে আদেশ করিলাম। ছাত্রেরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, এবং মোক্তার আমলারা চমকিয়া উঠিলেন। কাষ্ঠখানি কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, প্রত্যেক ছেলেকে কুড়ি বেত দেওয়ার আদেশ দিলাম। তাহারা চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমার কোর্টের মোক্তার আমলারা, এবং দীঘির অপর পার হইতে মুনসেফের উকীল আমলারা আসিয়া দোহাই দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যখন আমার কোর্টের সম্মুখে আসিয়া পর্য্যন্ত এমন কথা বলিয়াছে তখন আমি কখনও এই দুর্ব্বিনীত ছাত্রদিগকে ক্ষমা করিব না। তখন তাহারা কাঁদিয়া বলিল যে এ কথা বলিতে এবং দরখাস্ত দিতে হেডমাষ্টার মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি এ দরখাস্ত লেখাইয়া দিয়াছেন। ছাত্রদের ব্যায়াম করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। স্কুলের ব্যায়ামের সময়ে শিক্ষকদের থাকিতে হয় বলিয়া তাঁহারা এই ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। অভিভাবকেরা বলিলেন তাঁহারা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না। ছেলেদের এমন হিতকর কার্য্যে কেহ প্রতিবন্ধকতা করিবে না। আমি তখন ছেলেদের সাবধান করিয়া বিদায় দিয়া হেডমাষ্টারকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফেণী ত্যাগ করিতে আদেশ প্রেরণ করিলাম। সন্ধ্যার সময়ে প্রধান উকীল মোক্তারেরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার গৃহে উপস্থিত। তিনি অধোবদনে কাঁদিয়া আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমি ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলাম তিনি ভবিষ্যতে যদি এরূপ ব্যবহার করেন আমি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ডিরেক্টরকে জানাইব যেন তিনি গবর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্য না পান। বলা বাহুল্য তাহার পর হইতে আমি যে কয় বৎসর ফেণী ছিলাম খেসারির ডাল খাইয়া বেশ ব্যায়াম চলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ছেলেদের স্বাস্থ্য এত ভাল হইল যে

তাহাদের, তন্মধ্যে আমার পুত্রের, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি দেখিলে মনে আনন্দ হইত।

এই সকল নিয়মের ফলে সামান্য বেতনের শিক্ষকের সাহায্যে ফেণী স্কুলের ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। সেই কৃষকের দেশে, যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প, এরূপ ফল আশাতীত। স্কুলের এরূপ সুনাম বাহির হইয়াছিল যে অন্যান্য এণ্ট্রান্স স্কুলের ছাত্রেরা এই স্কুলে আসিতেছিল। শুধু তাহা নহে, পূর্ব্ব বঙ্গের স্বনামখ্যাত স্কুল ইন্‌স্পেক্টর বাবু দীননাথ সেন পরিদর্শনে আসিয়া এ সকল নিয়মাবলী ও আমার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে তিনি প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর একজন সারথি হইলেও তিনি উহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এত দূর যে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্রকে কোনও স্কুলে পড়িতে দেন নাই। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া তিনি আমার প্রণালীমতে শিক্ষা দিতেছেন। আমি বলিলাম যে এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। তিনি প্রত্যহ লক্ষ শিশুর মুণ্ডপাত করিতেছেন, অথচ এই শিশুমেধ যজ্ঞ হইতে আপনার পুত্রকে সরাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, তিনি কি করিবেন। শিক্ষা-প্রণালীতে তাঁহার হাত নাই। উহার পরিচালনে মাত্র তাঁহার অধিকার। তিনি বলিলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রকেও রামায়ণ পড়িতে দিয়াছেন, এবং যেরূপ বাদ দিয়া আমি পড়াইতে দিয়াছি, সেরূপ একখানি রামায়ণ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমি ছাপিলে শিশুদের বড়ই উপকার হইবে। তাহাদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার এমন বহি আর নাই। আমি বলিলাম শিক্ষা বিভাগে উহা পাঠ্য না করিলে সাধারণ লোক উহা অঙ্গহীন রামায়ণ বলিয়া কিনিবে না। অথচ

মুদ্রাঙ্কনে বহু ব্যয় হইবে। তিনি বলিলেন আমি একখানি বহি ছাটিয়া ছুটিয়া পাঠাইলে তিনি উহা ছাপাইয়া দিবেন। সর্ব্বশেষ আমার নিয়মাবলীর একখণ্ড প্রতিলিপি তিনি চাহিলেন। আমি বলিলাম যখন যে নিয়ম আবশ্যক বোধ হইয়াছে, আমি তখন উহা লিখিয়া পাঠাইয়াছি। একস্থানে সমস্ত নিয়ম নাই। তিনি বলিলেন যে আমার সমস্ত নিয়ম সঙ্কলন করিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত হেড মাষ্টারদের আহ্বান করিয়া এক সভাতে উহাদের আলোচনা করিয়া সমস্ত স্কুলে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। ঢাকা ফিরিয়া গিয়া আমাকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। তখন আমি সমস্ত নিয়মগুলি সঙ্কলন করিয়া পাঠাইলাম। তিনি সেই গ্রীষ্মের অবকাশে পূর্ব্ববঙ্গের হেড মাষ্টারদের ঢাকায় আহ্বান করিয়া বহুদিন যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহাদের আলোচনা করেন। যাঁহারা বহুদিন যাবৎ শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা একপ্রকার রামপ্রসাদের 'চোকবাঁধা বলদের মত' এক পথই মাত্র দেখেন এবং সেই পথেই ঘুরিতে থাকেন। সেই পথ প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী। তাহার বাহিরে তাঁহারা কিছুই দেখেন না এবং দেখিতে চাহেনও না। তথাপি তাঁহারা আমার কোনও কোন নিয়ম অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে দীননাথ বাবু ডিরেক্টরের কাছে এক রিপোর্ট করিলেন, এবং তাহার এক নকল আমার কাছে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর সেই রিপোর্টের কি হইল জানি না। দীনবাবুও কিছু দিন পরে পূর্ব্ববঙ্গকে একটি অমূল্য রত্নহীন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা না হউক, শক্তি-সম্পন্ন মনস্বী ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই।

(৬) দীঘি সংস্কার।

ফেণীর "রাজাঝির" বা 'রাজনন্দিনীর' দীঘির জল এমন চমৎকার ছিল যে একজন রাজসাহী নিবাসী ইনস্পেক্টর আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ও তাঁহার সমস্ত পরিবার 'মেলেরিয়া' রোগে কঙ্কালশেষ হইয়া ফেণীতে আসিয়া কেবল এই দীঘির জল খাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব সাধারণেরও সেরূপ ধারণা ছিল। আমিও প্রায় আট বৎসর ফেণী ছিলাম কিন্তু কখনও মাথা ব্যথা পর্য্যন্ত আমার কি আমার পরিবারবর্গের হয় নাই। অন্য স্থান হইতে পীড়িত হইয়া কেহ ফেণী আসিলে সে জলেই ভাল হইয়া যাইত। কি পুণ্যবতীই এই দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, চারিদিকের গ্রামের ও ট্রাঙ্ক রোডের যাত্রী শত শত লোক প্রত্যহ তাহার জল পান করিত। উহা ফেণীর জীবন ও শোভা উভয় বলিলেও হয়। কিন্তু বহু পুরাতন দীঘি বলিয়া তাহার জল গ্রীষ্মের সময়ে বড়ই কমিয়া যাইত। এজন্য তাহার সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে এই বিস্তৃত সরোবরের সংস্কার করিতে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা লাগিবে। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যগণ ফেণীর জন্য এত টাকা চাহিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বসিয়া থাকিবেন। অতএব আমি প্রথমে কেবল আঠার শ টাকার এষ্টিমেট পাঠাইলাম, এবং একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর তাহা মঞ্জুর করাইলাম। এই কার্য্য শেষ হইবার সময়ে রিপোর্ট করিলাম যে আর দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া আরও এক ফুট না কাটাইলে এ আঠার শ টাকা জলে গেল, এ টাকাও তাঁহারা বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর তিক্ত মুখে মঞ্জুর করিলেন। উহা নিঃশেষ হইবার সময়ে আবার রিপোর্ট করিলাম, আরও এক হাজার টাকা না দিলে এই

আটত্রিশ শ টাকা জলে গেল। নোয়াখালি অঞ্চলে একরূপ গাজীর গান আছে তাহার নাম "চৌধুরীর লড়াই"। নোয়াখালির এক চৌধুরী জমীদার ত্রিপুরা বংশের এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ইহা তাহারই 'ইলিয়ড' বা রামায়ণ। এ প্রস্তাব লইয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও একটা "চৌধুরীর লড়াই" হইল। স্বয়ং ইংরাজ কালেক্টর-চেয়ারমেন পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষের সেনাপতি। আমি অভিমন্যুর মত একবারে সপ্তরথীর দ্বারা আক্রান্ত হইলাম। প্রশ্ন হইল তিন বার এষ্টিমেট না পাঠাইয়া আমি প্রথমবারেই কেন পাঁচ হাজার টাকার এষ্টিমেট দেই নাই? উত্তর—আমি ত সর্ব্বজ্ঞ নহি, এবং একজন বিরাট ইঞ্জিনিয়ারও নহি, মৎস্যও নহি যে জলের নীচের মাটির অবস্থা আমি দেখিব। দিব্য চক্ষুও আমার নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব যে এত টাকা লাগিবে? চেয়ারমেন চটিয়া বলিলেন যে আমি সকল কার্য্যে কূটনীতি খাটাইয়া থাকি। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম তাহা হইলে আমি ইংরাজ রাজমন্ত্রী হইবার উপযুক্ত। তিনিও হাসিলেন। তাহার পর আমি দৃঢ় কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি কেবল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারমেন নহেন, আপনি কালেক্টর-মাজিষ্ট্রেট ও আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী। আপনার ও আমার মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ শোভা পায় না। আপনি মধ্যস্থের মত থাকিয়া এই মেম্বর মহাশয়দের আমাকে আক্রমণ করিতে দেন। আমি যদি তাঁহাদের পরাস্ত করিতে না পারি, আপনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন।" তিনি এই ভর্ৎসনায় নরম হইয়া চুপ করিলেন। তার পর আমি তীব্র শ্লেষাস্ত্রে অপর রথীদিগকে ধরাশায়ী করিলে তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা তর্কে পরাভূত হইলেও আর টাকা মঞ্জুর করিবেন না। আমি বলিলাম তাহাতে আমার কিছু আপত্তি নাই। ফেণীর দীঘি

আমি ফেণী হইতে বদলি হইলে পকেটে করিয়া লইয়া যাইব না। গরিব করদাতাদের আটত্রিশ শ টাকা যদি তাঁহারা জিদ করিয়া ফেণী নদীর জলে নিক্ষেপ করেন, এবং দীঘিটী এই অবস্থায় রাখেন, উহা তাঁহাদেরই একটা সৎকীর্ত্তি বলিয়া চিরদিন পরিচিত হইবে। তখন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক পড়িল। ইনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু এবং তিনিই আমার কথা মতে এ সকল এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে কত টাকাতে এরূপ একটা পুরাতন দীঘির সংস্কার হইতে পারিবে তাহা পূর্ব্বে বলা অসাধ্য ছিল। কায হইতে হইতে ইহার আভ্যন্তরীন অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। আর এক হাজার টাকার কার্য্য না হইলে দীঘিটী বড় শোচনীয় ও হাস্যকর অবস্থায় থাকিবে। তখন চেয়ারমেন বলিলেন—"আচ্ছা, এই এক হাজার টাকাও মঞ্জুর করা যাউক। কিন্তু যদি নবীন বাবু আর খুনাখুনিও করেন আর টাকা আমরা দিব না। এই টাকার দ্বারা কার্য্য শেষ করিতে হইবে।" আমি দীর্ঘ ধন্যবাদ দিলাম। কেবল টাকা পাইলাম তাহা নহে, তাহার সঙ্গে একটা 'ডিনার'ও পাইলাম। চেয়ারমেন মিঃ মেকফারসন মনে করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কূটনীতি কথায় চটিয়াছি। মিটিংএর পর উঠিয়া যাইতে আমাকে বলিলেন যে আমাকে সে দিন থাকিয়া রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গে ডিনার খাইয়া যাইতে হইবে। নোয়াখালির প্রায় সমস্ত ইংরাজ কালেক্টরই আমাকে এরূপে নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং আমার প্রতি-নিমন্ত্রণ ফেণীতে গ্রহণ করিতেন। দীঘির সংস্কার কার্য্য শেষ হইল। বহুকালের শেয়লা ইত্যাদি উন্মূলিত হইয়া দীঘির জল এমনই নির্ম্মল হইল, ও তাহার এমনই শোভা হইল যে তাহা দেখিলে প্রাণ শীতল হইত।

এরূপে নিজ ফেণীর সৃষ্টি প্রকরণ শেষ হইল। ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে জঙ্গলাবৃত এবং শেয়লা সমাচ্ছন্ন একটি দীঘি সর্ব্বস্ব যে ফেণী আমি

পাইয়াছিলাম, ডাক বাঙ্গালার সম্মুখে ইংরাজ পরিদর্শক অশ্ব বা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই ফেণী দেখিয়াই বলিতেন—"O what a charming place!"—কি সুন্দর স্থান! ইতিমধ্যে তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দীঘির সলিলসীমায় যে সকল নারিকেল ও পাড়ে ও তদ্‌বহির্ভাগে, স্কুলে ও বাজারে যে সকল ঝাউ মিশ্রিত ফল ফুল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম তাহারা এখন মাথা তুলিয়া সমস্ত স্থানটিকে একটি নবজাত উপবনের শোভা প্রদান করিয়াছে। প্রথমতঃ কমিশনার লায়েল সাহেব আসিয়া সমস্ত স্থান বেড়াইয়া দেখিয়া আনন্দে শত মুখে আমার কার্য্যের ও রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বিভিন্ন আকৃতির এতগুলিন বাঁশের গৃহ দেখিয়া আমাকে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন আমি এরূপ গৃহ কি কোথায় দেখিয়াছিলাম। উত্তর—এরূপ বাঁশের ঘর ত আর কোথায়ও নাই। কোথায় দেখিব? তিনি বলিলেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট না হইয়া আমার ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে যাওয়া উচিত ছিল। সর্ব্বশেষ স্কুল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এরূপ একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে এক টাকশাল টাকা (mint of money) কোথায় পাইলেন?" আমি—"আপনি কত টাকা ব্যয় হইয়াছে মনে করেন।" তিনি—"বিশ হাজার টাকার কম এরূপ একটা গৃহ হইতে পারে যে আমি ত বিশ্বাস করি না।" আমি বলিলাম যে জমী, গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যান সকল মিলিয়া নয় শ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। আমি—"আপনি গৃহটি পাকা মনে করিতেছেন?" তিনি আবার বিস্ময়ে—"তা নহে ত কি?" আমি—"উহা মাটির নির্ম্মিত।" "মাটি!" বলিয়া তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। "মাটির এমন

সুন্দর ঘর হইতে পারে?” আমি বলিলাম—“আপনি লাঠির দ্বারা দেয়াল খোঁচাইয়া দেখুন।” তিনি দেখিলেন সাদা চূণের বর্ণের অভ্যন্তরে মাটি। তখন পিলার শ্রেণীর দিকে চাহিয়া, তাহাদের সেই সুগোল গঠন, সেই প্রসারিত কার্ণিস, এবং সিমেণ্টের মত বর্ণ দেখিয়া বলিলেন—“অন্ততঃ এগুলি সিমেণ্টের।” আমি—“আমি এত টাকা কোথায় পাইব। এগুলিনও মাটির।” এবার তিনি অবিশ্বাস করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি যখন লাঠির অগ্রভাগ দিয়া পরীক্ষা করিয়া মাটি দেখিলেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার পর উদ্যান, বৃক্ষস্তবক, ক্রীড়াঙ্গন, এবং সর্ব্বশেষ স্কুলের শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব-শেষে আমার ছেলের মুখে একটা ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া স্কুলে ইংরাজ শিক্ষক কেহ আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ নাই শুনিয়া আমার ছেলের ইংরাজী উচ্চারণের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং কত আদর করিলেন। হায়! সেই সকল সহৃদয় ইংরাজ আজ কোথায়?

তাঁহার বিদায়ের সময়ে মেনসন্ কমিশনার হইয়া ফেণী দর্শন করিতে আসেন। মিঃ কুকের পূর্ব্বে তিনি নোয়াখালির কালেক্টর ছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে দীঘির কোণায় আসিয়াই বিস্ময়ের সহিত চারিদিক চাহিয়া বলিলেন—“আমি কি ফেণী দেখিয়া গিয়াছিলাম, আর আজ কি ফেণী দেখিতেছি! আপনি কি কোনও ইন্দ্রজাল জানেন? আপনি কেমন করিয়া এত অল্পকালের মধ্যে ইহার এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন? আমি চট্টগ্রামে আপনার কার্য্যের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ফেণীর যে এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমি কখনও মনে করি নাই।” তিনি অন্যান্য সাহেবদের ন্যায় এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া

ফেণী দেখিতে চলিলেন এবং যতই দেখিতে লাগিলেন, ময়তাল বৃক্ষের যে জলপ্রণালী বসাইয়াছি, তাহা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আমার প্রত্যেক কার্য্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার 'এজেলাসে' আসিয়া বসিয়া পরিদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি কাগজ পত্র দেখিবেন কি, স্থিরনেত্রে সরোবরের সলিলের দিকে চাহিয়া আছেন। গভীর নীলামৃতবৎ সলিল রাশি শীত সমীরণে ঈষৎ লহরী তুলিয়া নাচিতেছে, এবং রবিকরে কি শান্ত-মহিমার হাসি হাসিতেছে! সলিলবক্ষে স্থানে স্থানে আমার পালিত নানাবিধ মরালদল বিচিত্র কুসুম রাশির মত ভাসিতেছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া কলকণ্ঠে দীর্ঘিকা পূর্ণিত করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার 'রাজবালা' তরণী (life boat) হিল্লোলে ভাসিতেছে, নাচিতেছে। একটি লোক তাহা ভাসাইয়া সরোবরের বক্ষে যে সকল পত্র তৃণাদি বাতাসে উড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিতেছে। তীরস্থিত নারিকেল তরুশ্রেণীর শীর্ষ শ্যাম চামরের মত মৃদুমন্দ অনিলে ঈষৎ দুলিতেছে। তিনি দেখিতেছেন, আর যেন কি এক বিষাদে তাঁহার নেত্র সিক্ত হইয়া আসিতেছে। পরে শুনিলাম যে তিনি শেষবারে যখন ফেণীতে আসেন, তখন তাঁহার স্ত্রী সঙ্গিনী ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে চট্টগ্রামে হারাইয়া শোকে বড়ই অভিভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই স্মৃতিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইতেছিল। আমি তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম আমার এজে-লাস তাঁহার কেমন লাগিতেছে। তিনি যেন স্বপ্নোত্থিতবৎ উত্তর করিলেন—"আমি এমন সুন্দর এজেলাস, এবং তাহার সম্মুখে এমন মনোহর দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।" পরিদর্শনের পর আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া ফেণী থানার 'পরিদর্শন কক্ষে' থাকিতে অনুরোধ

করিলেও তিনি থাকিলেন না। তখন পাবলিক ওয়ার্কের বাঙ্গালা দেওয়ানগঞ্জে ছিল। তিনি সেখানে যাইবেন বলিলেন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না, কারণ থানার পরিদর্শন কক্ষ আমি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। যাইবার সময়ে তিনি আমার কার্য্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমার 'প্রোমোশনের' সময় নিকট হইয়াছে। যদি তিনি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এক লাইন চীফ সেক্রেটারীর কাছে লিখিলে আমি উপকৃত হইব। তিনি বলিলেন—"আমি নিশ্চয় বাঙ্গালায় গিয়াই চীফ সেক্রেটারীকে পত্র লিখিব, এবং আপনি এখানে কি যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন তাহা জানাইব। যদি এমন কার্য্যক্ষম ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী 'প্রোমোশন' না পায়, তবে তাহা গবর্ণমেণ্টেরই কলঙ্ক।" পরে শুনিলাম যে তিনি কিছুই আহার না করিয়া সমস্ত রাত্রি সেই বাঙ্গালায় কেবল রোদন করিয়াছিলেন। কারণ শেষবার ফেণীতে আসিয়া সস্ত্রীক সেই বাঙ্গালাতেই ছিলেন। এমন পত্নী-প্রাণ পতি অল্পই দেখিয়াছি। চট্টগ্রামে তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পরও তিনি বহু বৎসর কালেক্টর ছিলেন। তিনি প্রত্যেক রবিবার পুষ্পের দ্বারা তাঁহার পত্নীর কবরের পূজা করিতেন, এবং তাহার উপর মস্তক রাখিয়া রোদন করিতেন। তাহার পর তিনি ফেণীর পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া প্রায় দশ বার পৃষ্ঠা পরিদর্শন মন্তব্য লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে আমার বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নোয়াখালির জজ মিঃ গন্ (Gun) একবার 'কেমেরা' আনিয়া ফেণীর নানা স্থানের ও আমার গৃহের ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে অবশেষে আমার ও আমার পুত্রের ফটো পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছুটীর সময়ে তাঁহার স্থলে একবার আমার বন্ধু মিঃ আহমদ জজ হইয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন যে ফেণী ছাড়িয়া তাঁহার নোয়াখালিতে যাইতে ইচ্ছা করিত না। তিনি একবার আসিলে কয়েক দিন না থাকিয়া যাইতেন না। সমস্ত অপরাহ্ণ ও রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত আমার গৃহে কাটাইতেন। দুইটি বেহালার সঙ্গে নির্ম্মল গান করিত। সে আট নয় বৎসরের শিশু মাত্র। তিনি তাহার শিশুকণ্ঠের গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, এবং প্রত্যেকটী গানের পর তাহাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতেন। কখনও বা রাত্রিতে দীঘিতে নৌকা ভাসাইয়া গায়কদের গাইতে ও বাজাইতে আদেশ করিতেন, এবং ডাক বাঙ্গালায় কিম্বা আমার গৃহে বসিয়া সে সঙ্গীত শুনিতেন। কখন বা তিনি ও আমি নৌকায় ভাসিয়া ভাসিয়া পারস্থিত সঙ্গীত শুনিতাম। কি আনন্দেই রাত্রি গভীর হইতে গভীরতরা হইয়া উঠিত, উভয়ের কেহ টের পাইতাম না। এরূপে আরও কত বন্ধু ফেণী দেখিতে, এবং কবি কিরূপে থাকে তাহা দেখিতে আসিতেন। দেখিতে দেখিতে আমার গৃহ-খানি চারিদিকে পুষ্পোদ্যান এবং লতায় ক্রোটনে সজ্জিত হইয়া এমন সুন্দর হইয়াছিল, যে উহাকে দেখিলে বৈষ্ণব কবিদের একটা কবিতা মনে পড়িত।

"লতার উপর লতার বাঁধনি,
তাহার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে,
কালায় মজাল কুল।"

একবার এক মাসের জন্য চট্টগ্রাম হইতে এলেন সাহেব (C. G. H. Allen) নোয়াখালির কালেক্টর হইয়া আসেন। ইনি এখন কলিকাতা করপোরেসনের চেয়ারম্যান। ইনি নোয়াখালি পৌঁছিয়াই, একদিন হঠাৎ দুই প্রহর রৌদ্রে ফেণীতে উপস্থিত। পূর্ব্বে কোনও

খবর দেন নাই। আমি সংবাদ পাইয়া ডাক বাঙ্গালায় যাইয়া দেখি তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে তিনি আফিস পরিদর্শন করিতে আসেন নাই। তিনি ফেণীর ও ফেণী-নির্ম্মাতার এত প্রশংসা শুনিয়াছেন যে তিনি উভয়কে একবার দেখিতে মাত্র আসিয়াছেন। তাঁহার এত আগ্রহ তিনি আমার নিষেধ না শুনিয়া ও এক মিনিটও বিশ্রাম না করিয়া, সেই মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ফেণী দেখিতে চলিলেন। প্রথম গৃহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি আপনার গৃহ?" উত্তর—"না, উহা আমার আফিস।" দ্বিতীয় গৃহ দেখিয়া—"এটি আপনার গৃহ?" উত্তর আবার—"না, উহা ট্রেজারী।" তৃতীয় গৃহ দেখিয়া—"এটি আপনার গৃহ?" উত্তর—"না, উহা পুলিস ষ্টেশন।" অবশেষে উত্তর পারের মধ্যস্থলে গিয়া বলিলেন—"এটি নিশ্চয় আপনার গৃহ।" উত্তর—"হাঁ।" প্রশ্ন—"আমি গৃহখানির অভ্যন্তর একবার দেখিতে পারি কি?" উত্তর—"আমি তাহাতে পরম সম্মান মনে করিব।" তখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন, এবং বহুক্ষণ আমার সেই গোল বারাণ্ডায় বসিয়া বিস্তীর্ণ সরসী-শোভা দেখিয়া দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ ও প্রশংসা করিলেন। তাহার পর উঠিয়া স্কুল দেখিতে যাইতে দীঘির উত্তর পূর্ব্ব কোণায় একটি বিশাল বটবৃক্ষ একটি গোলাকার উচ্চ মৃত্তিকা বেদির উপর দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বৃক্ষটি অতি পুরাতন। পাড়ের মাটি কাটিয়া নীচু করিবার সময়ে আমি বৃক্ষটি না কাটিয়া তাহার চারি দিকের মাটি গোলাকার করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, এবং মাটীর বেদিকার গায়ে দূর্ব্বা লাগাইয়া দিয়াছি। দেখিলে বৃক্ষতলস্থ বেদিটি যেন শ্যাম গালিচা সমাচ্ছন্ন বোধ হইত। বৃক্ষের ডালে বহুবিধ বিহঙ্গেরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং ডালে ডালে মধ্যাহ্ন-ছায়ায় বসিয়া গান

করিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বৃক্ষতল ও বৃক্ষবেদিকার শোভা দেখিলেন, এবং বলিলেন যে এতক্ষণে একটি বিষয় অপূর্ণ রাখিয়াছি বলিয়া তিনি বলিতে পারেন। যদি এই বেদির উপরিভাগ প্রস্তর খণ্ডে সাজাইয়া তাহাতে 'ফারন্' (fern) লাগাইয়া দিতাম, তবে এই স্থানটির কি শোভাই হইত! আমি বলিলাম পাথর কোথায় পাইব? তিনি দূরস্থ পর্ব্বতমালা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—উহাতে কি পাথর (rock) নাই। আমি বলিলাম—থাকিলে আপনি নিশ্চয় এ অভাব অনুভব করিতেন না। সমস্তই মাটির পাহাড়। তাহাতে 'ফারন্' (fern)ও নাই। এই বলিয়া আমি বলিলাম যে এখানেই ইউরোপিয়ান ও বাঙ্গালির পার্থক্য। তিনি বলিলেন তিনি বুঝিলেন না। আমি বলিলাম কোনও স্থানে কখনও যদি একজন ইউরোপিয়ান কিছুদিন বাস করিয়া থাকেন সে স্থানটি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। সে স্থানটির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য ও শ্রী থাকে। তিনি বলিলেন—"তাহা জানি না। কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি যে এ স্থানটি কোনও ইউরোপিয়ান ইহার অপেক্ষা সুন্দর করিতে পারিত না।" তাহার পর স্কুল দেখিয়া তিনিও লায়েল সাহেবের মত চমৎকৃত হইলেন। তাহার সমস্ত বিষয়ের কতই প্রশংসা করিলেন। ফিরিয়া রাস্তার উপর আসিয়া বলিলেন—"কই আমি আপনার ছেলেকেত দেখিলাম না। আমি তাহাকে না দেখিয়া যাইব না।" আবার ফিরিয়া স্কুল গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেডমাষ্টার আমার শিশু পুত্রকে ডাকিয়া দিলে, তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর করিলেন, এবং বলিলেন—"আমি ইচ্ছা করি তুমি তোমার পিতার যোগ্য পুত্র হইবে।" ইঁহার মহত্ত্বের কথা পরে আরও বলিব। এরূপে যিনি ফেণী আসিতেন তাঁহারই মুখে স্থানটির প্রশংসা-স্রোত বহিত! সেনিটারী কমিশনার আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি একটি ক্ষুদ্র নরককে একটি

ক্ষুদ্র স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন।" শ্রীরামপুরবাসী একজন মুনসেফের ভৃত্য আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার্টিফিকেট দিয়াছিল— 'বাপ! এ জায়গার আর সব লোকগুলির কোনও ফূর্ত্তি নাই। যত ফূর্ত্তি এই বাবুটির! এঁর হুকুমে যেন মাটি ফেটে বাড়ী, ঘর, গাছ, বাগান উঠে।"

(৭) রাস্তা ও খাল।

যখন ফেণী পৌঁছিয়া গো-যান হইতে অবতীর্ণ হইয়াই কর্দ্দমে পতিত হইয়াছিলাম, তখন ফেণীর উপরিভাগের রাস্তার অবস্থা সহজে বুঝা যাইতে পারে। কেবল ট্রাঙ্ক রোড ও নোয়াখালির রাস্তা ভিন্ন আর কোনও রাস্তাই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাগল-গাইয়া রোড় ও তস্য শাখা পরশুরাম রোড যাহা ছিল তাহাতে শীত ভিন্ন অন্য ঋতুতে যাতায়াত অসম্ভব ছিল। তাহাদের প্রস্থতা এবং উচ্চতা এরূপ যে শীত ঋতুতে অশ্বপৃষ্ঠে গমনও আশঙ্কাজনক ছিল। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে পার্ব্বত্য বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ মাটির উচ্চ বেড়া প্রস্তুত হইয়াছে। পুল নাই কেন, এবং রাস্তা অসংখ্য স্থানে ভাঙ্গা কেন? পার্ব্বত্য বন্যা পুল উড়াইয়া লয়; এবং বৎসর বৎসর রাস্তা স্থানে স্থানে ভগ্ন করে। তদ্‌ভিন্ন রাস্তার দৈর্ঘ্যের এক অর্দ্ধ বন্যাতে প্রত্যেক বৎসর ভাঙ্গিয়া ফেলে। এ সকল কারণে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রায় এ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা এই দুই রাস্তায় ব্যয় করিয়া এখন উহাদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইয়া হতাশভাবে সন্দেশ খাইতেছেন।" ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে তিনি তাঁহার ও উপরিস্থ কর্ত্তাদের সমস্ত "ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুই রাস্তার উপর নিঃশেষ করিয়া এখন 'তোবা' করিয়া বসিয়া আছেন। স্থির করিয়াছেন পাকা 'কজওয়ে' ভিন্ন এ অঞ্চলে রাস্তা হইতে পারে না, এবং

'কজওয়ে' এত ব্যয় সাধ্য যে তাহা অসম্ভব। পার্ব্বত্য বন্যার সময়ে আমি নৌকায় গিয়া দেখিলাম যে রাস্তায় জল অবরুদ্ধ হইয়া তাহার এক পার্শ্বে যেন অনন্ত বিস্তার মহাসাগর হইয়াছে। জলে লহরি খেলিতেছে, এবং তাহার আঘাতে স্থানে স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া ভীম গর্জ্জনে ও ভীষণ বেগে জলরাশি ছুটিয়াছে। কিন্তু রাস্তার অন্য পার্শ্বে এক বিন্দু জলও নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার বে-ইঞ্জিনিয়ারী স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম যে রাস্তার উচ্চতাই সমস্ত অনিষ্টের কারণ। তাহারই জন্য বন্যার জল নির্গত হইতে না পারিয়া এরূপ এক ভূমধ্যসাগর সৃষ্টি করে, এবং প্রত্যেক বৎসর রাস্তার এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটাইয়া থাকে। আমি প্রস্তাব করিলাম যে রাস্তার উচ্চতা খর্ব্ব করিয়া উহার পরিসর ও সেলমি (Slope) বৃদ্ধি করিলে, এবং ভাঙ্গা কয়েক স্থানে মাত্র জলনির্গমের জন্য পুল প্রস্তুত করিলে অতিরিক্ত বন্যার সময়ে বৎসরে দুই এক দিন রাস্তার উপর দিয়া জল গড়াইতে পারে, তাহার কোনও বিঘ্ন হইবে না। আমার প্রস্তাব শুনিয়া প্রথম ইঞ্জিনিয়ার ও ডিঃ বোর্ডের সভ্যগণ উপহাস করিলেন। বলিলেন যদি এত সহজে এই দুই রাস্তা রক্ষা করা যাইতে পারিত, তবে তাঁহারা তাহাতে এত অর্থ ধ্বংস করিতেন না। যাহা হউক আমি উপর্য্যুপরি জিদ করাতে, আমার প্রস্তাব রাস্তার এক অংশে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু টাকা তাঁহারা অনিচ্ছায় মঞ্জুর করিলেন, এবং কার্য্যভার আমার হস্তে দিলেন। সে বৎসর সে অংশের উপর দিয়া বন্যা একদিন মাত্র গড়াইল, কিন্তু আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না। রাস্তার উচ্চতা কম, বিস্তৃতি বেশী, এবং বিস্তৃত পার্শ্বের উপর চাপড়া বসান থাকাতে, জল রাস্তার উপর দিয়া গড়াইয়া গেল। তাহাও রাস্তার অন্যাংশ বন্যা অবরোধ করার ফল। ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার বাবুর চক্ষু খুলিল এবং বোর্ডের কর্ত্তাদেরও জ্ঞান চৈতন্য হইল। তাহার পর দুটি রাস্তারই

এরূপভাবে রূপান্তরিত করিলে বন্যা দুই এক স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া এবং কোনও কোনও স্থান ডুবাইয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। রাস্তার কোনও ক্ষতি হইল না। পরের বৎসর ভগ্ন স্থানে ছোট পুল নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, আমি যত বৎসর ফেণী ছিলাম, আর কখনও বন্যা রাস্তা ডুবাইয়াছিল না, কিম্বা কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিয়াছিল না। রাস্তাও এমন বিস্তৃত ও সুন্দর হইয়াছিল যে আমি ঘোরতর বর্ষার সময়ে গাড়ীতে তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছি। অথচ এ সকল কার্য্যে অতিশয় সামান্য ব্যয় মাত্র হইয়াছিল। তখন উপহাসের সময় উত্তীর্ণ—ধন্যবাদের সময় আসিল। তাহার পর ছাগল-গাইয়ার একজন সম্পত্তিশালী ব্যবসায়ীকে ধরিয়া পঁয়ত্রিশ শ টাকা ব্যয়ে ছাগল-গাইয়া রাস্তার মহুরি নদীর উপর কাষ্ঠের পুল নির্ম্মাণ করিয়া এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ করিলাম। অসম্ভব এরূপে অতি সহজে সম্ভব হইল।

আমার পূর্ব্বে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা গ্রাম্য রাস্তায় ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু কোনও গ্রাম্য রাস্তার চিহ্নও নাই। যত পুরাতন গ্রাম্য পথ আছে তাহার উপর বিশ পঞ্চাশ টাকার মাটি বর্ষার পূর্ব্বে এখানে সেখানে দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা বর্ষার সময়ে ধুইয়া গিয়া পথের অবস্থা পূর্ব্বের মত হইয়াছে। আমি আমার বেহারের প্রণালী অবলম্বন করিয়া বৎসর দুই একটি করিয়া প্রকৃত রাস্তা নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু এখানের লোকের সংস্কার বাড়ীর কাছে রাস্তা হইলে বাড়ী 'বেপর্দ্দা' হইয়া যায়। ফেণী আসিয়াই প্রথম শিবিরে যাইতে যে পথে বহু আছাড় খাইয়াছিলাম, প্রথমতঃ সে রাস্তাটি প্রস্তুত করিলাম। একটি লোকের বাড়ীর কাছে রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইলে সে রাস্তার লাইনের উপর চিত হইয়া পড়িল, এবং বলিল তাহার গলা না কাটিলে সেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে পারিব না। কোনওরূপে বুঝাইয়া না পারিয়া অগত্যা

তাহাকে মড়ার মত সেখান হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। রাস্তা প্রস্তত হইল। কেবল তাহার বাড়ীর নিকটে একটা ছোট পুল বাকী আছে। সে একদিন আসিয়া করযোড়ে বলিল—"কর্ত্তা! যদি নালাটার উপর আপাততঃ একটা বাঁশের পুলও দিতে আদেশ করেন, তবে বড় ভাল হয়। নদী হইতে আমার বাঁশগুলিন গাড়ীতে আনিতে পারিতেছি না।" তাহার উপরোক্ত কীর্ত্তির কথা বলিলে সে হাসিয়া বলিল—"কর্ত্তা! উমি-লোক বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি এ রাস্তায় আমাদের কত উপকার হইয়াছে।"

এক গ্রাম্য রাস্তার সঙ্গে আর এক গ্রাম্য রাস্তা যোগ করিয়া, আমি এরূপে চারি দিকে দীর্ঘ দীর্ঘ রাস্তা প্রস্তত করাইয়াছিলাম। বড় ফেণী নদীর সঙ্গে যেখানে সমুদ্রের সঙ্গম সেই দিকে প্রায় বার মাইল দীর্ঘ এক রাস্তা এরূপে প্রস্তত করাইতেছি। দুটি গ্রামের মধ্য স্থানে একটা ধান ক্ষেতের উপর দিয়া অল্প রাস্তা প্রস্তত করাইলে পথ সংক্ষেপ ও সোজা হয়। কিন্তু প্রথমতঃ সে দিক দিয়া প্রস্তাব করিলে ধান্য ক্ষেত্রের মূল্য না দিয়া উপায়ান্তর নাই। দুটি গ্রাম্য রাস্তা এই ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আমি এই দুইটাতে নিশান পুতিয়া দিলাম। একটা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব গ্রামবাসীরা বলে পশ্চিম গ্রামের রাস্তাই প্রচলিত রাস্তা, এবং পশ্চিম গ্রামবাসীরা এ বিপদ পূর্ব্ব গ্রামের ঘাড়ে ফেলিতে চাহে। আমি একের বিপক্ষে অন্যকে এরূপে খেলাইতে লাগিলাম। শেষে বলিলাম আমি নিরপেক্ষ ভাবে উভয় রাস্তা প্রস্তত করিব। তখন তাহারা সেই কালাচাঁদ কালেক্টরের কাছে আপিল করিল। তিনি শাসন কার্য্যে একে অপটু, তাহাতে আবার আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বলিয়া লোকের কাছে প্রতিপন্ন হইতে তাঁহার বড় আগ্রহ। লোকের উপর এই ঘোরতর অত্যাচারের জন্য কেন গবর্ণ

মেণ্টে আমার প্রতিকূলে 'জুলুমবাজ' বলিয়া রিপোর্ট হইবে না তাহার কৈফিয়ত চাহিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম যে বার মাইল রাস্তা দুই দিকে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কেবল এ স্থানে মাত্র কয়েক চেন প্রস্তুত হইবার বাকী। দুই গ্রামের বিবাদের জন্য পারিতেছি না। তখন আদেশ আসিল—"কালেক্টরকে তাহারা মধ্যস্থ মানে কি না রিপোর্ট করিবে।" তিনি মনে করিয়াছিলেন তিনি এ বিবাদ মিটাইয়া আমার অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি কত শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইবেন। কিন্তু গ্রামবাসী-দের কাছে কালাচাঁদের প্রতিপত্তি অন্য রকম। তাহারা তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতে অসম্মত বলিয়া দরখাস্ত দিলে, আমি উহা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহার যেমন গাল তেমন চড় পড়িল। লজ্জায় আর কথাটি না কহিয়া তিনি কাগজ পত্র চুপে চুপে ফিরিয়া পাঠাইলেন। এখন তাঁহাকে জব্দ করিবার সময় আমার। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে তিনি ত কোনও আদেশ না দিয়া কাগজ পত্র ফেরত পাঠাইয়াছেন। আমি এখন এ রাস্তার কি করিব? তিনি লজ্জায় তখন আর একটি কথা না বলিয়া সশরীরে ফেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে তাঁহার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া কর। তুমি সেই রাস্তাটা লইয়া আর গোলযোগ করিও না। তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।" আমি বলিলাম—"তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আমার কি সুখ? তিনি কথায় কথায় প্রকাশ্য চিঠিতে আমাকে গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দেন। এবারও তাহাই করিয়াছেন। আমি কেমন করিয়া এ গোলযোগ মিটাইব? লোকেরা আমাকে গ্রাহ্য করিবে কেন? তিনি তখন একবারে মাটি হইলেন, এবং বলিলেন—"দোহাই তোমার, আর আমাকে লজ্জা দিও না।" আমি তাহার পর উভয়

পক্ষকে ডাকাইয়া তাহাদের মধ্যে খুব একটা লড়াই লাগাইয়া দিলাম। সর্ব্বশেষ বলিলাম যদি তাহাদের কোনও গ্রাম দিয়া রাস্তা না লইয়া উভয় গ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে তাহাদের কোন আপত্তি আছে কিনা? তাহারা মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল তাহাদের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু ধান ক্ষেত দিয়া কেমন করিয়া লইব? তাহারা বলিল তাহাদের নিজের জমী যাহা পড়িবে তাহারা ছাড়িয়া দিবে, এবং অন্যের যাহা পড়িবে তাহারা মূল্য দিয়া পারে, কিম্বা বদল দিয়া পারে, তাহা লইয়া দিবে। তখন সেই মধ্য পথেই রাস্তা প্রস্তুত হইল। বুদ্ধদেবের 'মধ্য পথ' অনেক সময়ে ভাল। জমীর মূল্য দিতে হইলে অন্যূন হাজার টাকা দিতে হইত। কিছু দিন পরে যখন আমি অশ্বারোহণে সেই পথ দেখিতে দেখিতে আনন্দে অধীর হইয়া শিবিরে যাইতেছি, অন্য গ্রামবাসীদের ন্যায় এই দুই গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া আমাকে কত কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল, এবং যাহাতে শীঘ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলগুলি নির্ম্মিত হইয়া রাস্তাটি গাড়ী চলার উপযুক্ত হয় তাহার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। তাহারা বলিল এখন তাহাদের গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা লইলেও তাহারা আপত্তি করিবে না। এত দিনে তাহারা রাস্তার উপকারিত্ব বুঝিয়াছে

বর্ষার সময়ে ফেণীর মত স্থানে নৌকা যাতায়াতের বড় প্রয়োজন ও সুবিধা। একটা গাছ কুঁদিয়া এ অঞ্চলে নৌকা প্রস্তুত হয়, তাহাকে 'কোঁদা' বলে। আমি বলিতাম 'কুন্দনন্দিনী'। এ সকল 'কোঁদা' চারি আঙ্গুল জলের উপর দিয়াও চলিয়া যায়। বর্ষার সময়ে ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়া অবলীলাক্রমে চলে। কিন্তু যেখানে মাঠে এরূপ জল থাকে না সেখানে চলাচলের জন্য লোকের বাড়ীর ও রাস্তার গড় খালের ও নদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া আমি দশ পনর মাইল দীর্ঘ নৌকা চলাচলের জন্য খাল খুলিয়া দিয়াছিলাম। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ও ট্রাঙ্ক

রোডের এক পার্শ্বের গড় এরূপ খুলিয়া দিয়া ঠিক রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে ‘কোঁদা’ চলিবার খাল করিয়া দিয়াছিলাম। বর্ষার সময়ে এ সকল খাল দিয়া চলিতে কি সুবিধা ও আনন্দ বোধ হইত তাহা আর কি বলিব? ইচ্ছা হয় নৌকায় বসিয়া প্রকৃতির গ্রাম্য শোভা দেখ। ইচ্ছা হয় রাস্তায় উঠিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া সেই শোভা দেখ। পূর্ব্বে নৌকাতে নোয়াখালি কি অন্য কোন স্থানে যাইতে যে সময় লাগিত, তাহার অর্দ্ধেক সময়ে এ সকল খালে যাওয়া যাইত।

ছোট ফেণী নদীর একটি ‘বাঁক’ছিল, তাহা নৌকায় ঘুরিয়া আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিত। বাঁকটি ঠিক একটি বেগুনের মত। তাহার বোঁটাটি এক বিঘা জমীর বেশী হইবে না। সেরূপ ফেণী সহরের অন্য দিকে ‘কতুয়া খালের’ও একটা তদপেক্ষা ছোট বাঁক ছিল। দেখিলাম এ সামান্য বাঁকগুলি কাটিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহি। তাহার জন্য লাল ফিতা গলায় বাঁধিয়া কত প্রভুর দ্বারস্থই হইব! আমি চুপে চুপে এই উভয় বাঁকের গলার উপর দিয়া গ্রাম্য রাস্তা প্রস্তুত করিলাম, এবং তাহার সমস্ত মাটি একপার্শ্ব হইতে তুলিলাম। বর্ষার সময়ে এই রাস্তার গড় দিয়া নদীর জল ছুটিল, এবং দেখিতে দেখিতে নদী এ পথে প্রবাহিত হইল। এ সংবাদ আমার এক শ্রীমতী মানিনী ইংরাজ কালেক্টর—ইহার কথা পরে বলিব—শুনিয়া আমার উপর এক নিশিত শর ত্যাগ করিলেন। তিনি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া আমি এ দুটি নদীর বাঁক কাটাইয়া গবর্ণমেণ্টের অবমাননা করিয়াছি। আমার কৈফিয়ত সহজ—আমি নদীর বাঁক কাটি নাই। লোকের সুবিধার জন্য গ্রাম্য রাস্তা করিয়াছিলাম মাত্র। নদী স্ব-ইচ্ছায় রাস্তার গড় কাটিয়া বাহির হইয়াছে। আমি কেমন করিয়া তাহার গতি রোধ করিব? কমিশনার তখন

লায়েল সাহেব। তিনি কৈফিয়ত পড়িয়া না কি একটা "অশ্লীল হাসি" হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এরূপে এক একটী রাস্তা প্রস্তত করিয়া ডিঃ বোর্ডের হাতে অর্পণ করিতাম। তাহার প্রত্যেকটি প্রস্তত করিতে ডিঃ বোর্ডের কেবল জমীর ক্ষতিপূরণ দিতেই বহু সহস্র টাকা যাইতে পারিত, অথচ কোন দিন কেহ তাহার জমী সম্বন্ধে কখনও একটি কথা বলে নাই। লোকে ক্রমে ক্রমে রাস্তার ও খালের উপকারিতা এত বুঝিয়াছিল যে তাহারাও বেহারের লোকের মত নিজে অনেক ক্ষতি সন্তুষ্টির সহিত স্বীকার করিত। শুধু তাহা নহে, এ সকল খাল ও আমার অন্যান্য কার্য্য সম্বন্ধে বেহারের মত এখানেও কত গীত বাউলে সুরে লোকেরা বাঁধিয়াছিল। এ সকল গীত সর্ব্বত্র সব ডিভিসনে গীত হইত। যাঁহারা লোকের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ও উৎপীড়ন করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! এ সকল কার্য্যের ফলে যে ফেণী 'হেড কোয়াটারে' প্রথম রাত্রিতে পৌছিয়া রাস্তাভাবে কর্দ্দমে পতিত হইয়াছিলাম, সেই ফেণীর সমস্ত-উপবিভাগে আমি শেষের কয় বৎসর ঘোড়ার গাড়ীতে সপরিবারে শিবিরে শিবিরে গমন করিয়া বেড়াইয়াছি। ক্রমে ক্রমে সুন্দর সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া রাস্তার পার্শ্বে ডিঃ বোর্ডের বাঙ্গালা প্রস্তত করাইয়া লইয়াছিলাম। তাহার এক একটির চারি দিকে স্থানীয় দৃশ্যাবলী অতুলনীয় ছিল। স্বয়ং কমিশনার একবার শিকার করিতে গিয়া এক বাঙ্গালায় প্রায় সপ্তাহ কাল থাকিয়া তাহার কতই প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার একটী শিবিরের স্থান বড়ই সুন্দর ছিল। তাহার নাম 'আমলি ঘাটা'। পার্ব্বত্য শৈলমালা ভেদ করিয়া বড় ফেণীনদী যেখানে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে সেখানেই 'আমলি ঘাটা'। এখানে একটি অনুচ্চ পর্ব্বত উক্ত নদী তীরস্থিত।

তাহার সানুদেশ সমতল। তাহাতে সপ্তাহে একবার পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতির বাজার বসিয়া থাকে। তাহারা দুই তিন দিনের ব্যবধান হইতে বহু পর্ব্বত বাহিয়া এই বাজারে পার্ব্বত্য কার্পাস ও তরকারী ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসে, এবং বিনিময়ে লবণ, শুষ্ক মৎস্য, ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায়। বাজারের দিন স্থানটির বড় শোভা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য নর নারীতে পূর্ণ হইয়া থাকে। রমণীদের বিবিধ বর্ণের স্বহস্ত-নির্ম্মিত পুরু পরিধেয়, এবং অর্দ্ধ অনাবৃত বক্ষে লাল সালুর বক্ষ আচ্ছাদনের জবা-কুসুম-প্রভা বাজারের বিচিত্র শোভা বিধান করে। আমি এই পর্ব্বত শিরে আমার শিবির স্থাপন করিতাম। হাটের দিনটা পতি পত্নী পার্ব্বত্য নর নারীদের সঙ্গে বড় কৌতুকে কাটাইতাম। কখন বা নৌকায় তাহাদের পাড়ায় বেড়াইতে যাইতাম। সরল শৈল সন্তানদের আদর অভ্যর্থনা কি সরল ও হৃদয়স্পর্শী! আমাদের জটিল সভ্যতা, যাহা পাশ্চাত্যানুকরণে দিন দিন আরও জটিলতর হইতেছে, তাহাদের সরল সভ্যতার পার্শ্বে কি কৃত্রিমই বোধ হইত। ইহাদের হৃদয়ে যেন চির-প্রসন্নতা ও চির-শান্তি বিরাজিত। এডেম এবং ঈভ প্রকৃত অবস্থায় যে বাস্তবিক স্বর্গসুখে ছিলেন, তাহা ইহাদের দেখিলে উপলব্ধি হয়। এই বাজার পর্ব্বতের নীচে। এই বাজারের সুবিধার জন্য ত্রিপুরার মহারাজার পক্ষ হইতে একটী সুন্দর সরোবর কাটাইয়া দিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেক বৎসর এখানে পূরা দশ দিন শিবিরে কাটাইতাম। পূর্ব্বে এ স্থান প্রায় অগম্য ছিল। পরে ইহার নিকটেই একটা বাঙ্গালা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম।

ঈশ্বর গুপ্ত একবার বড় দেমাক করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"যদ্যপি এ রসে শুনি বিরসের ধ্বনি,
শোব না এ ভবগৃহে, ছোঁব না লেখনি।"

আমার এ "রসে" আমার সেই মানিনী "বিরসের ধ্বনি" তুলিয়াছিলেন। আমি গ্রাম্য রাস্তার নাম দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট রাস্তা প্রস্তুত করিতেছি বলিয়া তিনি যে লায়েল সাহেবের কাছে একবার আমার ছুটীর সময়ে নালিস করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লায়েল তাহা গ্রাহ্য না করাতে তখন তিনি জিদ করিয়া এ সম্বন্ধে আমার প্রতিকূলে দীর্ঘ দীর্ঘ রিপোর্ট করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা লায়েল লোকেল ওয়ার্ক ইন্‌স্পেক্টার মিলস্ (Mr. Mills) সাহেবকে তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। তিনি আমার কৃত কয়েকটি রাস্তা, খাল, ও বাঙ্গালা দেখিয়া আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট দিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত লিখিলেন যে এমন সুন্দর ও সুপ্রণালীতে প্রস্তুত গ্রাম্য রাস্তা তিনি আর কোথায় দেখেন নাই।

(৮) আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে।

আমি ফেণী উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের লাইন ফেণীর সাত মাইল পশ্চিম দিক দিয়া স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এই রেলওয়ে মনোনীত না হওয়াতে, উহার নির্ম্মাণ তাঁহারা একরূপ অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষম লায়েল সাহেব কমিশনার হইয়া আসিলে আমি এই লাইনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তখন এ সকল স্থান একপ্রকার অজ্ঞাত দেশ ছিল। গো-যান মাত্র এ অঞ্চলে একমাত্র চলাচলের ভরসা। এ গোযানও একপ্রকার সত্যযুগের নিদর্শন বলিলেও চলে। তাহাতে ভ্রমণ জন্মান্তরীণ কুকর্ম্মের ফলভোগ বিশেষ। আমি সেই জন্য কবি-কল্পনা খাটাইয়া একখানি চাটাইয়ের পাল্কী প্রস্তুত করিয়াছিলাম। চারিদিকে চাটাইয়ের বেড়া, তাহাতে গবাক্ষ ও দ্বার, এবং গবাক্ষে নীলবর্ণের নেটের পর্দ্দা। জলপথেও চলিবার একমাত্র উপায়

কোঁদা,—আমি বলিতাম—"কুন্দনন্দিনী"। একটি মাত্র বৃক্ষ কুঁদিয়া এই নৌকা প্রস্তত। তাহার উপর বাঁশের 'ছপ্পর'। উহাতে চলা একপ্রকার সিন্দুকের মধ্যে চলা। আমি তাহার জন্যও কবি-কল্পনা-প্রসূত একটি স্বতন্ত্র ছপ্পর প্রস্তত করিয়া লইয়াছিলাম। সামান্য গো-শকটের কি কোঁদার উপর এই 'ছপ্পর' বসাইয়া বড় আরামে যাওয়া যাইত। আমি জলপথে কি স্থলপথে যে দিকে যাইতাম, আমার এই দুই কল্পনা-সৃষ্ট লোকের এত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে আমার এই দুই বংশনির্ম্মিত কাব্যের দ্বারা আমি এ অঞ্চলে অমরতা লাভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক লায়েল সাহেব এঅঞ্চলবাসীদিগকে বলীবর্দ্দ ভ্রাতৃ যুগলের (Bullock Brothers & Co.) এবং 'লগি' সঙ্কলিত 'কুন্দনন্দনীর' মন্থর গমন হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি নিজে একবার বড়ই দুর্ভোগ ভুগিয়াছিলেন। তিনি ফেণী হইয়া কুমিল্লা যাইবেন। ফেণীতে অশ্বারোহণে বেলা নয়টার সময় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কি সঙ্গে ভৃত্যেরা আসে নাই দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে, তিনি তাহাদের ফেণী নদীর অপর পারে রাখিয়া আসিয়াছেন। ফেণী নদীর মধ্যে চর পড়িয়াছে, জোয়ারের সময় ভিন্ন গোরুর গাড়ী পার হওয়া অসম্ভব। জোয়ারও সে দিন বেলা বারটার পূর্ব্বে সেখানে আসিবে না। তাহার উপর সেই ঘাট ফেণী আফিস হইতে সাত মাইল ব্যবধান। অতএব আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তাঁহার ভৃত্যেরা দুইটার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিবে না। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন যে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে ইন্‌স্পেক্টর অফ লোকেল ওয়ার্ক মিল সাহেবকে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ভৃত্যগণ সহ আসিয়া পঁহুছিবেন। আমি বলিলাম তাহা অসম্ভব, কারণ বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে নদীতে জোয়ার আসে

না। তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দেখা যাউক।" দেখা গেল। এগারটা বাজিয়া গেল। আফিস পরিদর্শন করিতেছেন; আর থাকিয়া থাকিয়া তৃষিত চাতকের মত রাস্তার দিকে চাহিতেছেন। কিন্তু মেঘরূপী ভৃত্যমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আমি আবার বলিলাম—"তাহাদের দুইটার পূর্ব্বে পৌছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আমি কিঞ্চিৎ 'হুইস্কি' যোগাইতে পারি কি?" তিনি একটু নীরব থাকিয়া আমার মুখের দিকে সহাস্যে চাহিয়া বলিলেন—"একটু খানি মাত্র, যদি আপনি ইচ্ছা করেন।" আমার গৃহ হইতে 'ডিকেণ্টারে' হুইস্কি ও সোডা আনিল। তিনি সত্য সত্যই একটুক খানি হুইস্কিতে এক গেলাস সোডা লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। বলিলেন—"উৎকৃষ্ট হুইস্কি, কেলনারের গ্রিন্ সীল।" কি আশ্চর্য্য! কেমন করিয়া চিনিলেন! আমাদের কাছে সকল প্রকার 'হুইস্কিই' নীলাম্বরের বড়ি বা হোমিওপ্যাথিক টিংচারের মত অভিন্ন। আমি তখন তাঁহার প্রাতঃকালের আহারের ব্যবস্থা করিতে চাহিলে আবার সেরূপ কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন—"কেবল দুই খানি চপাটি, আর 'একটুকু' কারি যদি দিতে পারেন, আমাকে মিষ্টি দিবেন না।" ইহাঁদের বিশ্বাস আমরা বাঙ্গালিরা কেবল মিষ্টি খাইয়া থাকি। আমি হাসিয়া বলিলাম—"ভয় নাই, আমি মিষ্টি দিব না।" আমার ভৃত্য অভয়চরণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা বিখ্যাত পাচক। তজ্জন্য কেহ কেহ একজন ডেপুটি কালেক্টরের বেতন দু শ আড়াই শ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। অভয়চরণ নিজে রন্ধন বিদ্যায় একজন 'রেঙ্গলার'। সে যাট টাকার চাকরি করিত। এখন বৃদ্ধ বলিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া বাড়ী যাইতেছিল। স্ত্রীকে রন্ধন বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমি তাহাকে সামান্য বেতনে রাখিয়াছি। অভয়চরণ দিনে তিনবার

স্নান করে। দীঘির কোণের গোল বেদির উপর 'বোধি বৃক্ষ' তলায় বসিয়া তিনবার আহ্নিক করে। তাহার রন্ধনশালা ও উপকরণ সকল পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করে। আর রন্ধন কার্য্য তাহার এক তপস্যা বিশেষ। রাত্রি প্রভাতে স্নান করিয়া রন্ধনের উপকরণ লইয়া রাত্রির আহারের জন্য আয়োজনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। কারণ প্রাতঃকালে আমি মাংসাহার করি না। মাসের পর মাস সে প্রত্যহ একটা নূতন খাবার প্রস্তুত করিত। অভয়চরণ সাহেবের জন্য প্রাতের আহার (ব্রেক্ ফাষ্ট) প্রস্তুত করিয়া দিল। তিনি দুইটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া মিল সাহেব আসিলে আহার করিয়া মহা আনন্দে কাছারি আসিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি আমার পুরাতন বন্ধু অভয়চরণকে কোথায় পাইলেন? সে আমাকে চমৎকার ব্রেক্ ফাষ্ট দিয়াছে। আমি অনেক দিন এমন ব্রেক্ ফাষ্ট খাই নাই। সে আমার ও ডেম্পিয়ারের পাচক ছিল। বড় বেশী বেতন বলিয়া আমরা তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এমন পাচক আমি আর দেখি নাই।" পরে শুনিলাম তিনি তাহাকে চারি টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। যাহা হউক সে দিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি বলিলেন—"নবীন বাবু! বিভাগীয় কমিশনার আমার এই ঘাট পার হইতে ও এ পথে চলিতে যখন এরূপ বিভ্রাট ঘটিতেছে, তখন সাধারণ লোকের কি কষ্টই না জানি হয়। এত দিনে তোমার রেলওয়ের প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝিলাম। আমি আজ হইতে তাহার জন্য যুদ্ধ করিব। তুমি আমার সহায় হইবে।" এই রেলওয়ে লাভ হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট উহা অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তিনি ইহার ভাবী বাণিজ্যের অঙ্ক সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলের সঙ্কলনের ভার আমার উপর পড়িল। চট্টগ্রামের কেহ কেহ

এই রেলওয়ে অসম্ভব জানিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে লায়েল সাহেব ও নবীন বাবু রেলওয়ে আনিয়া ফেলিবে। এ সময়ে আমি প্রস্তাবিত লাইনের নক্সা আনাইয়া দেখিলাম যে লাইন ফেণীর সাত মাইল পশ্চিম ও নোয়াখালির বিশ মাইল পূর্ব্ব দিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উহাতে কোন স্থানেরই সুবিধা হয় নাই। তদপেক্ষা একেবারে আকাশের উপর দিয়া লইলেই হইত। আমি তখন বহু অন্বেষণের পর দেখিলাম, এই লাইন পূর্ব্বে সরাইয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশ ও ফেণী দিয়া লাকসাম লইলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ত কথাই নাই, রেলওয়ে কোম্পানীর ও গবর্ণমেণ্টের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। বর্ত্তমান লাইন যেখানে ফেণী পার হইয়াছিল, সে স্থান ফেণী ও মহুরী নদীর সঙ্গমের নিম্নে হওয়াতে স্থানটি এতাদৃশ বিস্তৃত যে কেবল এখানে পুলের জন্য দশ লক্ষ টাকা 'এষ্টিমেট' হইয়াছে। লাইন পূর্ব্বদিকে সরাইয়া ফেণী ও মহুরী নদীর উপর স্বতন্ত্র পুল দিলে এই দুই স্থানে নদীর এত অল্প পরিসর যে দুই লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় লাগিবে না। তাহার পর পর্ব্বতপ্রান্ত দিয়া লাইন আসিলে রাস্তার ব্যয়েরও অনেক লাঘব হইবে। অনেক স্থলে কেবল পর্ব্বত মূল সমান করিয়া দিলেই হইবে। অন্য দিকে যেখান দিয়া লাইন জরিপ হইয়া গিয়াছে উহা চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমে সমুদ্রের তটভূমি। সেখানে সমুদ্রতীরস্থ বাঁধের মত একটা পর্ব্বত পরিমাণ রাস্তার প্রয়োজন হইবে।

এতাবৎ বিষয় লিখিয়া আমি পূর্ব্ব লাইন পরিবর্ত্তন করিয়া এ লাইন গ্রহণ করিতে রিপোর্ট করিলাম। তখন নিষ্কর্ম্মা কালাচাঁদ আবার কালেক্টর হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন ভিন্ন কর্ম্ম নাই। তিনি এই কর্ম্ম ফেলিয়া এক পা গৃহের কি শিবিরের বাহিরে যাইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার চীন আমেরিকায় নোয়াখালির

জাহাজ চালাইবার বিখ্যাত উদ্যোগ এবং ফেণী হইতে আফিস উঠাইয়া লওয়ার ব্রত নিষ্ফল হওয়াতে, তিনি এই হতভাগ্য দেশের কোনও কর্ম্মেই আর হস্তক্ষেপ করেন না। অতএব আমাকে উত্তর দিলেন যে রেলওয়ের লাইনের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্রব নাই। তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তখন আমি ফেণী মহুরীর সঙ্গমস্থলে শিবির স্থাপন করিয়া আমার ডায়ারিতে (Diary) উপরোক্ত বিষয় সকল লিখিলাম। ডায়ারি কমিশনারের কাছে যায়। তাহা কালাচাঁদের চাপিয়া রাখিবার সাধ্য নাই। তিনি আমার চতুরতা দেখিয়া এ প্রস্তাবের প্রতিকূলে ডায়ারির পার্শ্বে তীব্র ভাষায় লিখিলেন যে তাঁহার নিষেধ না মানিয়াও আমি নিজের কার্য্য ফেলিয়া এই অপ্রাসঙ্গিক কার্য্যে আমার সময় নষ্ট করিতেছি। লায়েল সাহেব উক্ত ডায়ারি পাওয়া মাত্র নাচিয়া উঠিলেন, তিনি আমাকে বহু প্রশংসা করিয়া ও ধন্যবাদ দিয়া এক ডিঃ ওঃ পত্র লিখিয়া আমার কাছে এই লাইন সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র রিপোর্ট চাহিলেন। আমি ডিঃ ওঃ উত্তরে লিখিলাম যে কালেক্টরের কাছে আমি স্বতন্ত্র রিপোর্ট করিয়াছিলাম, তিনি উহা কমিশনারের কাছে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। তখন কমিশনর আমাকে লিখিলেন যেন আমি রিপোর্টের আরম্ভে লিখি যে তাঁহার আদেশ মতে আমি এই রিপোর্ট করিতেছি। আমি তখন আমার পূর্ব্ব রিপোর্টের আর এক নকল এই সকল ডিঃ ওঃ পত্র সহ কলেক্টারকে উপহার পাঠাইলাম। তিনি এ অপমান গলাধঃকরণ করিয়া এবার কথাটি না কহিয়া রিপোর্ট কমিশনারকে পাঠাইলেন; তিনি এই লাইন সমর্থন করিয়া আমার রিপোর্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে, এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উহা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত সচিব একখানি নক্সাতে এই লাইনটী নীল পেন্‌সিলে টানিয়া দিয়া লিখিলেন তিনি যত দূর দেখিতেছেন

এই লাইনটী পূর্ব্ব লাইন অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতর। তবে এ পথে রেলওয়ে করিতে কোনও বিঘ্ন আছে কিনা তাহা জরিপ করিয়া দেখিবার জন্য "রেলওয়ে কার্য্যে অশেষ পারদর্শী" সুপারিণ্টেণ্ডেট ইঞ্জিনিয়ার মেজর ষ্টোরীকে নিয়োগ করিয়াছেন। লায়েল সাহেব আমাকে এ সংবাদ দিয়া মেজর ষ্টোরীর সঙ্গে ফেণী ঘাটে গিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে সাক্ষাৎ করিতে এবং আমার লাইন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লিখি-লেন। আমাকে উক্ত মেপ দেখাইয়া মেজর ষ্টোরী বলিলেন যে চট্টগ্রাম হইতে ফেণী তীর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তিনি মোটামুটি দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে পূর্ব্বের লাইন অপেক্ষা আমার প্রস্তাবিত লাইন অনেক শ্রেষ্ঠ ও সহজসাধ্য হইবে। অবশিষ্ট ভাগে কোনও বিঘ্ন আছে কিনা তিনি নক্সা দেখিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তখন আমি বলিলাম বিঘ্নের মধ্যে ফেণী নগরের উত্তরে 'কালীধরের বিল' এবং দক্ষিণ দিকে 'গুণবতীর বিল' মাত্র আমার আশঙ্কার বিষয় আছে। এই দুইটী বিল বহু মাইল ব্যাপী প্রকাণ্ড জলা। চৈত্র বৈশাখেও সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না। তবে এই দুই স্থানে লাইন যদি বিলের এক পার্শ্ব দিয়া লওয়া যায় তবে সম্ভবতঃ আর কোনও বাধা হইবে না।

তিনি চট্টগ্রাম ফিরিয়া গিয়া সেখান হইতে জরিপ করিতে করিতে কালীধরের বিল পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার শিবিরসহ ফেণীতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে পূর্ব্বে তিনি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত লাইন সেরূপই পাইয়াছেন। এই লাইনে আমার রিপোর্টের লিখিত কারণে যথার্থই বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ের লাঘব হইবে। কিন্তু 'কালীধরের বিল'—ভয়ানক ব্যাপার! দেখিলাম তিনি আকক্ষ কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার উচ্চ ঘোটকের কর্দ্দমাক্ত কলেবর

দেখাইয়া খুব হাসিলেন। তাহার পর তিনি প্রায় এক পক্ষ কাল বহু পরিশ্রম করিয়া এবং প্রত্যহ প্রায় ঐরূপ অবস্থায় ফেণীস্থ শিবিরে ফিরিয়া, একদিন অপরাহ্ণে আমাকে আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে, তিনি একটি কার্য্যযোগ্য (workable) লাইন পাইয়াছেন। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। ফেণী হইতে 'গুণবতী' গিয়া লিখিলেন যে সে পর্য্যন্ত কোনও বিঘ্ন পান নাই, কিন্তু 'গুণবতীর' পর 'কালীধরের' বিলের অপেক্ষাও আর এক গভীরতর ও বৃহত্তর বিল পাইয়াছেন, এবং উহা তাঁহাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। আমি ভাবিলাম এখানেই বুঝি পালা শেষ হয়। আমি লিখিলাম আমার আশা আছে তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভা ও পারদর্শিতার বলে তিনি এই 'বিল'ও অতিক্রম করিতে পারিবেন। লিখিলাম বটে, লোকের মুখে এই বিলের যেরূপ বর্ণনা শুনিতে লাগিলাম, উহা অতিক্রম করা কেবল রামায়ণের মহাবীরের সাধ্য। তবে তিনি একটি ক্ষুদ্র সাগর-শাখা মাত্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আর ইনি সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব আমি নিরাশ হইলাম না। কিছু দিন পরে তিনি চাঁদপুরে পঁহুছিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমি এ অঞ্চল হইতে চলিয়া যাইতেছি। চট্টগ্রাম হইতে 'লাকসাম' পর্য্যন্ত আপনার মনোনীত লাইন পূর্ব্ব লাইন হইতে অধিকতর সুবিধার ও অল্পতর ব্যয়-সাধ্য বলিয়া আমি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছি, এবং 'লাকসাম' হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত যে লাইন পূর্ব্বে জরিপ হইয়া রহিয়াছিল, উহা সামান্য পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আমি মনোনীত করিয়াছি।" ফেণীতে একটি আনন্দের ধ্বনি উঠিল। লায়েল সাহেবও আমাকে আনন্দ প্রকাশ (Congratulate) করিয়া পত্র লিখিলেন।

তাঁহার অবিরাম চেষ্টায় 'আসাম বেঙ্গল' রেলওয়ে মঞ্জুর হইল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। ফেণী অংশের ইঞ্জিনিয়ার হইয়া মিঃ ব্রাউনজার (Mr. Brounger) ফেণী আসিলেন। তিনি বহু রেলওয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য করিয়াছেন, এবং এক জন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি আমার ফেণীর কার্য্য দেখিয়া বড়ই প্রশংসা করিতেন, এবং বলিতেন যে আমার ফেণীস্থ বাঁশের গৃহ সকলের আকৃতি অনুকরণ করিয়া চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর রেলওয়ের গৃহাবলীর নক্সা (Plan) প্রস্তুত করিতেছেন। আমার স্কুল গৃহের অবয়বের ও বাঁশের ছাউনির তিনি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। দ্রুতবেগে রেলের কার্য্য আরম্ভ হইল, আর আমি এ সময়ে ফেণী হইতে স্থানান্তরিত হইলাম। আমার নিষ্ফল জীবন। সকল সবডিভিসনেই আমি ফুলের উদ্যান ও ফলবান বৃক্ষাদি রোপন করিয়াছি। কিন্তু তাহাদের ফুল কি ফল দর্শন পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। ফেণীতে গো-যানে পর্য্যটনের সুখভোগই আমার অদৃষ্ট-লিপি ছিল। রেলওয়ে ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন?

ইহার তিন বৎসর পরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে খুলিল। আমি তখন অলিপুরের ডেপুটী কালেক্টর। সেই বৎসর পূজার বন্ধে এই রেল-পথে বাড়ী গিয়াছিলাম। ফেণী ষ্টেসনে ফেণীর আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক এবং মফঃস্বল হইতেও বহু লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। ষ্টেসন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল লোক পূর্ণ হইয়াছে। সকলের মুখেই আনন্দব্যঞ্জক কৃতজ্ঞতার কথা। আমার পরবর্ত্তী ডেপুটী বাবুও আসিয়াছেন। এই 'সিদ্ধ বিদ্যার' কীর্ত্তির কথা পরে বলিব। আমার প্রতি লোকের এ ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন যে ফেণীর লোক আমাকে দেবতার মত ভক্তি করে। বঙ্কিম বাবুর ভ্রাতা সঞ্জীব বাবুর পুত্র এখানে পুলিস ইন্স্পেক্টার হইয়া আসিয়া-

ছেন। তাঁহার সঙ্গে এই অভ্যর্থনায় প্রথম পরিচয় হইল। দেখিলাম তিনি চট্টোপাধ্যায় বংশের মত স্পষ্টবাদী। তিনি বলিলেন—"সকলকে আর করে না। যে ভক্তির উপযুক্ত কার্য্য করে তাহাকে করে।" সিদ্ধ বিদ্যার মুখ চূণ হইয়া গেল। তিনি লোকের কাছে বড়ই অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি তখন পূর্ব্ববৎ ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন যে আমার মত খ্যাতনামা অফিসারের স্থানে আসিয়া তাঁহার কার্য্য করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে। ভদ্রলোকের অন্তর্দাহে আমার দুঃখ বোধ হইল। আমি সঞ্জীব বাবুর পুত্রকে তাঁহার প্রতি আর অস্ত্রাঘাত না করিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বিদায় হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ট্রেন খুলিলে স্কুলের ছাত্রগণ ট্রেনের সঙ্গে ছুটিল। আমি তাহাদের কত নিষেধ করিতে লাগিলাম। তাহারা তাহা শুনিল না। তাহারা এবং ফেণীর বহু লোকেরা স্ত্রীর গাড়ী গুলজার করিয়া তুলিয়াছিল। এই পথে যত বার আসিয়াছি প্রায় প্রত্যেক বারই ফেণীর লোক জানিতে পারিলে আমার প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একজন রেলওয়ে ভূমি গ্রাহক (Railway Land acquisition) ডেপুটী কালেক্টর ফেণী ষ্টেসনে আমার গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তিনি নীরবে এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ট্রেন খুলিলে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। যখন পর্ব্বত মূল দিয়া ট্রেন ছুটিতেছিল, এবং আমি আনন্দে অধীর হইয়া গাড়ী হইতে এক দিকে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতমালার ও অন্য দিকে সমুদ্রের শোভা দেখিতেছিলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার শেষ কাব্য কি?" আমি বলিলাম—আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ফেণী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এই লাইন। উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই কবির উপযোগী। মিঃ ব্রাউনজার আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই লাইন নির্ব্বাচন করিয়া আমি রেলওয়ের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যয় লাঘব করিয়াছি। ইহার কিছুকাল

পরে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এবং লায়েল সাহেবকে সাক্ষ্য মানিয়া গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না। কোনও গৌরাঙ্গ এই কার্য্য করিলে 'ইংলিশমেন', 'পাওনিয়ারে', দুন্দুভিধ্বনি হইত, এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাকে লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতেন। একজন তৈলব্যবসায়ী বঙ্গচন্দ্র হইলেও কিঞ্চিৎ কৃপা ভিক্ষা পাইত। কিন্তু আমি না গৌরাঙ্গ, না তৈলিক কৃষ্ণাঙ্গ।

একটি মানের পালা।

আমি যখন ফেণী স্কুল স্থাপনের উদ্যোগে বিব্রত সে সময়ে আমার কালাচাঁদ কালেক্টর বদলি হইলেন, এবং তাঁহার স্থলে একটি নীচ প্রকৃতির গোরাচাঁদ উপস্থিত হইলেন। ইনিই কোনও অনামা রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলে, আমার কার্য্যের দ্বিতীয় বৎসরে আমি মাগুরা সব-ডিভিসনে প্রেরিত হইয়াছিলাম, এবং ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মত কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলাম। কারণ তিনি দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। ইনি প্রথম ফেণীতে আসিয়া আমার সঙ্গে সে কারণে খুব সদ্ব্যবহার করেন। এমন কি আমার ঘরে আসিয়া আমার পুত্রকে কোলে করিয়া বসিতেন, এবং গৃহের ও গৃহসজ্জার কত প্রশংসা করিতেন। তিনি বরাবর বলিতেন যে তিনি এরূপ গৃহ ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট অট্টালিকায়ও থাকিতে চাহিবেন না। কেবল নোয়াখালি ফিরিয়া যাইবার সময়ে আমাকে বলিলেন—"আমার সরল অন্তঃকরণে আপনাকে বলা উচিত যে আমি শুনিয়াছি আপনি এখন সার্ভিসের মধ্যে একজন দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আপনি সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল-পক্ষ এবং প্রজার অনুকূল-পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন।" আমি বুঝিলাম নোয়াখালির সার্টিফিকেট কার্য্য উপলক্ষ করিয়া কালাচাঁদ এরূপে তাঁহার মন বিষাক্ত করিয়াছেন। আমি বলিলাম—"আপনাকে একথা কে বলিয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি। যদি সত্য সত্যই আমি তাহাই করি, আমি কি উচিত কার্য্য করি না? গবর্ণমেণ্ট অসীম ক্ষমতাশালী, এবং প্রজারা নিতান্ত দরিদ্র। অতএব দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করা ধর্ম্মতঃ

উচিত। তাহা ছাড়া রাজার ও প্রজার স্বার্থ অভিন্ন। যাহাতে প্রজার মঙ্গল হয়, তাহাই আমি গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল বলিয়া জানি।" তিনি আর কিছু বলিলেন না। কালাচাঁদের ইংলণ্ড আমেরিকার সঙ্গে ষ্টীমার চালাইয়া নোয়াখালির বাণিজ্যের উন্নতির খেয়ালের মত ইঁহার খেয়াল হইল যে তিনি এক কৃষি-প্রদর্শনী মেলা করিয়া নোয়াখালির কৃষির উন্নতি করিবেন। এই খেয়ালের কারণও আমি। ফেণীতে অশ্বপৃষ্ঠে বেড়াইতে বাহির হইলে, দেশের যে দিন দিন একমাত্র কৃষিই উপজীবিকা হইতেছে, বিদেশীয় ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতায় যে দেশের সকল ব্যবসায় প্রায় ধ্বংস হইয়াছে, কৃষি ও কৃষকের বৃদ্ধির সহিত গোচারণের জমি পর্য্যন্ত কর্ষিত হইয়া গো জাতি যে কঙ্কাল-শেষ হইতেছে, সমস্ত দেশে অন্ন জলের জন্য যে হাহাকার উঠিতেছে, এ সকল কথা আমি তাঁহাকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতাম। প্রত্যেক বৎসর বাৎসরিক রিপোর্টেও তাহা লিখিতাম। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে কৃষি-প্রদর্শনীর দ্বারা কৃষির ও গো জাতির উন্নতি হইবে। কিন্তু আমি জানি যে সর্ব্বত্র কৃষি প্রদর্শনীর অর্থ বাই খেমটার নৃত্য ও ঢলাঢলি। তিনি যেই এ প্রস্তাব মুখ হইতে বাহির করিলেন, অমনি আমার ১ নং মুরুব্বি খোসামুদির তৈল মর্দ্দনে উহা গরম করিয়া তুলিলেন। কালেক্টর সদর বিভাগে হুকুম প্রচার করিলেন যে প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চাইত সাত টাকা করিয়া গ্রাম হইতে টেক্স তুলিয়া দিবে। আমার কাছে পত্র আসিল যে আমিই নিজে কৃষির উন্নতির জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, অতএব এ কার্য্যে তিনি আমার যোগ ও সাহায্য (co-operation) চাহেন। আমি এই মাত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তেরশ টাকা চাঁদা স্কুলের জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। আবার চাঁদা কি প্রকারে তুলিব? তাঁহার শ্বেত-চর্ম্ম, তাঁহার বক্ষে সিভিল সার্ভিসের অভেদ্য বর্ম্ম আছে। তিনি পঞ্চায়েত হইতে এরূপ অবৈধ টেক্স

তুলিলে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু আমি কৃষ্ণচন্দ্র সে পথে গেলেই আমার 'অধীন (subordinate) সার্ভিসে' আমার কৃষ্ণ পক্ষ উপস্থিত হইবে। আমি স্কুলের জন্য ফেণী নগর হইতে চাঁদা তুলিয়াছিলাম না। অতএব নিজে পঞ্চাশ টাকা দিয়া এবং ফেণী নগরবাসী হইতেও অতিরিক্ত চাঁদা আমার এই বিপদ দেখাইয়া তুলিয়া তাঁহার কাছে আড়াই শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম, এবং আমি যে সম্প্রতি স্কুলের জন্য চাঁদা তুলিয়া সঙ্কটে পড়িয়াছি তাহাও লিখিলাম! তিনি সদর বিভাগে সাত হাজার টাকা তুলিয়াছেন, আর আমি আড়াই শত টাকা মাত্র পাঠাইলাম। তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। আগে আমার কাছে 'ডেমি' পত্র লিখিতে 'My dear Nabin Babu' (প্রিয় নবীন বাবু!) সম্বোধন করিতেন। এ টাকা পাইবামাত্রই আমার কাছে এক পত্র আসিল তাহার সম্বোধন—Babu ! (বাবু!) মাত্র। আর তাহাতে লেখা আছে —"আমার স্কন্ধের উপর দিয়া অন্য জেলার কর্ম্মচারীদের কাছে পত্র লেখা আপনার অভ্যাস দেখা যাইতেছে। আপনার মত যোগ্য এবং পুরাতন কর্ম্মচারীর জানা উচিত এরূপ কার্য্য অবৈধ না হইলেও অনুচিত।" আমি বুঝিলাম, যে উৎপাতের ভয়ে আমি সমস্ত মুল্লুক ছাড়িয়া পৃথিবীর এই অজ্ঞাত ও নিভৃত কোণায় মনের শান্তির ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য আসিয়াছি, আমি আবার সেই উৎপাতে পড়িলাম। একটা দুর্জ্জয় শ্বেত মানের পালা আরম্ভ হইল। তিনি মনে করিয়াছেন, আমি আড়াই শত মাত্র টাকা পাঠাইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও অপমান করিয়াছি। আমি যথাশাস্ত্র মানভঞ্জনের চেষ্টা করিলাম। বলিলাম শ্রীমতি আমাকে ক্ষমা কর।

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদী
হরতি তিমিরমতি ঘোরং",

তাহাতে মানের নিবৃত্তি হইল না। তখন আর এক ডিগ্রি চড়াইয়া বলিলাম—"দোহাই তোমার—

"ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নং",

"দোহাই তোমার! তুমি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! তোমার এ দুর্জ্জয় মান হইলে আমি যে ধনে প্রাণে মারা যাই।" তাহাতেও মানের বন্যা থামিল না। সর্ব্বশেষে বলিলাম

"দেহি পদপল্লভমুদারম"।

শ্রীমতী বলিলেন—"কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার 'ডেমি' পত্রগুলিন বেশ। কিন্তু তোমার অফিসিয়ল পত্রগুলিন বেজায় কড়া।" আমি বলিলাম—"হে গৌরচন্দ্র! উহার 'কড়াত্বের' দুটি কারণ। প্রথমতঃ আমি ইংরাজী ভাল জানি না, এবং তজ্জন্য আমি বড় লজ্জিত ও দুঃখিত। দ্বিতীয়তঃ এই উপবিভাগের চার পাঁচ লক্ষ লোকের অদৃষ্ট আমার হস্তে। (বাইবেল কোট করিয়া লিখিলাম) তাহাদের মঙ্গলের জন্য উপরিস্থদের কপাটে কেবল বারংবার নহে, একটুক কড়াভাবে আঘাত না করিলে, আমার বিশ্বাস তাঁহাদের দৃঢ় কপাট অবারিত হয় না।" তিনি তদুত্তরে লিখিলেন—"হে কৃষ্ণচন্দ্র! আপনার এই উভয় কৈফিয়তই আপনার চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ বিহারের পর চাতুরালী মাত্র। যদি সত্য হইত আমি উহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতাম। কিন্তু উহা সত্য নহে। প্রথমতঃ ইংরাজীর উপর আপনার যেরূপ অধিকার, এবং আপনি উহা যেরূপ জলের মত ব্যবহার করিতে পারেন, অনেক ইংরাজ তাহা পারেন না। আর দ্বিতীয়তঃ আমি স্বীকার করি যে আপনি একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মচারী, কিন্তু আপনি যাহা করেন তাহার কেবল বাবু এন, সি, সেনকে গৌরবান্বিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।"

সে সময়ে স্বনামখ্যাত অস্থিরমতি Skrine (স্ক্রীণ) সাহেব ত্রিপুরা জেলার কালেক্টর। তিনি জনরবে শুনিতে পান যে পার্ব্বত্য কুকিয়া আমাদের প্রান্তসীমাবাসীদের আক্রমণ করিবে, এবং তৎসম্বন্ধে আমি কি কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার 'ডেমি' পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহার নকল একখণ্ড শ্রীমতীর কাছেও পাঠাইয়াছিলাম, এবং তিনি তাহার অনুমোদন করিয়া এবং তাহার জন্য আমাকে প্রশংসা পর্য্যন্ত করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। সেই কথার ধুয়া ধরিয়া, আমি তাঁহার স্কন্ধের উপর দিয়া চন্দ্রাবলী 'স্ক্রীণের' কুঞ্জে গিয়াছিলাম—আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া!—বলিয়া, তিনি উপরোক্ত তীব্র মানের অস্ত্র আমার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে উপরোক্ত সকল কথা লিখিলে তিনি নীরব হইলেন। কমিশনার লায়েল সাহেব বিভাগীয় নানা বিষয়ে আমার কাছে 'ডেমি' পত্র লিখিতেন। এমন সময়ে তাঁহার এক পত্র উপস্থিত। উহার উত্তর দিব কি না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি শ্রীমতীর কাছে পাঠাইলাম। তিনি এবার লাঙ্গূল সঙ্কুচিত করিয়া লিখিলেন যে তাঁহাকে না জানাইয়া কমিশনারের পত্রের উত্তর দেওয়াতে তাঁহার আপত্তি নাই। যাক্। চিরদিনই কাণা চোকে কুটা পড়ে। তাহার পর হঠাৎ পুরীর কালেক্টর হইতে আমার কাছে এক 'ডি ও' উপস্থিত। তিনি পুরীর রাজার হস্ত হইতে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দির উঠাইয়া লইবার জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহেন। তিনি শুনিয়াছেন যে মন্দির সম্বন্ধে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অতএব আমার মত চাহিয়াছেন। আমি এই পত্রেরও উত্তর লিখিয়া মানিনীর নিকট পাঠাইলাম। তিনি এবার লাঙ্গূল আরও কুঞ্চিত করিয়া লিখিলেন—"আমার নিজ জেলার বহির্ভূত বিষয়ে অন্য জেলার কর্ম্মচারীর পত্রের

উত্তরও আমার অনুমতি ছাড়া আপনি দিতে পারেন। কিন্তু পুরীর মন্দির সম্বন্ধীয় এই বিচক্ষণ পত্রখানি আমার কাছে পাঠানতে আমি এত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়াছি যে তজ্জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

শ্রীমতীর মান এরূপে দুই চারি ডিগ্রি নামিলে নোয়াখালির 'কৃষি-প্রদর্শনী' আরম্ভ হইল। কৃষির উপকারার্থ রঙ্গমঞ্চ (theatre) খুলিতেছে। তাহাতে আরম্ভে অভিনীত হইবার জন্য মানিনীর গৌরব ঘোষণা করিয়া একটা উপক্রমণিকা রচনা করিয়া পাঠাইতে আমার কাছে আমার ১ নং মুরুব্বির ও সবরেজিষ্ট্রার বাবুর দুই অনুরোধ পত্র আসিল। তিনি নিজেও আমার 'কবি গিরির' কথা শুনিয়া প্রদর্শনীতে সশরীরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যের বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চের সাহায্য করিতে এক স্বহস্ত-লিখিত নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। বিধাতা যখন বাম হন, তখন সকলই বাম হয়। সেই সময়ে আমার বাম শ্রীচরণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে আমার চলিবার শক্তি নাই। অতএব যাইতে অক্ষম বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি রোগের কথা বিশ্বাস করিলেন না। মান আবার ভীষণ ভাবে চাগিয়া উঠিল। তাহাতে অন্যরূপে আর এক স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া একবারে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত করিল। শারীরিক রোগ নিবন্ধন উপক্রমণিকাও লিখিতে পারিলাম না। উহাও অবজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার উপর আমি গোপনে এক বন্ধুর কাছে 'কৃষি প্রদর্শনীর' একটা বর্ণনা পাঠাইলাম। বিজ্ঞাপন পত্রে ছিল যে বাঁশে ও গাছে তেল দিয়া—বোধ হয় এই তৈলের প্রস্তাবও আমার মুরুব্বির,—তাহাতে লোক উঠিতে (অবশ্য কৃষির উপকারার্থ) দেওয়া হইবে। আমার প্রেরিত বর্ণনাটি এরূপ—

"কিবা 'কৃষি প্রদর্শন'! পক্ক রম্ভা অগণন,
চারিদিকে করে ঝলমল!

গাছে তেল, বাঁশে তেল, স্থানে অস্থানেতে তেল,
তেলের ভাণ্ডার 'বজলল' !"

'বজলল' বলা বাহুল্য আমার মুরুব্বির নাম। বন্ধু এ কবিতাটি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। উহা নোয়াখালিতে প্রচারিত হইল, এবং চারিদিকে উহার আবৃত্তির ও হাসির তুফান ছুটিল। মুরুব্বি বিদ্রূপে জর-জর হইয়া, উহা শ্রীমতীর কাণে তুলিলেন, আবার আমার কপাল ভাঙ্গিল। এবার মান দুর্জ্জয়ের উপরে একবারে ৯০ ডিগ্রিতে উঠিল। তৎক্ষণাৎ আমার কাছে আবার 'বেবু' সম্বোধনে এক পত্র আসিল—"বাবু! আমি এক বড় বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছি। আপনি আপনার এলেকার সব-রেজিষ্ট্রারদের প্রত্যেক দলিলের রেজেষ্টারী ফিসের উপর আপনার স্কুলের জন্য ।০ আনা করিয়া টেক্স উশুল করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই কথা সত্য কিনা আমি জানিতে চাহি।" ইহার অর্থ—"এবার তুমি যাবে কোথায় ? তুমি আমার কৃষিপ্রদর্শনীর জন্য পঞ্চায়েত হইতে টৈক্স লইতে পারিলে না, এখন বাবু এন্, সি, সেনকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য যে স্কুল স্থাপন কয়া হইয়াছে তাহার জন্য কেমন করিয়া এ টেক্স উশুল করিতেছ ?" আমি শান্তভাবে উত্তর দিলাম—"আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা একটা 'কালা মিথ্যা কথা' (black lie)। কোন্ পাজি (blackguard) আপনাকে এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার নাম পাঠাইবেন। আমি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ উপস্থিত করিতে চাহি। আপনি ইংরাজ এবং আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী। আপনি অবশ্য এরূপ পাজি পৃষ্টদংশককে (rascally back biter) ঘৃণা করিবেন।" এই উত্তর পাইয়া শ্রীমতী মান করিলেন—"বটে! আচ্ছা রসো কালাচাঁদ! তোমার চাতুরালি ধরিয়া দিতেছি।" আবার পত্র আসিল—"বেবু! তোমার স্কুলের

জমার হিসাবটা আমার কাছে প্রতি ডাকে পাঠাইবে।” আবার তাঁহার সংবাদদাতার নাম চাহিয়া প্রতি ডাকে উহা প্রেরিত হইল। উহাতে কোনও সবরেজিষ্ট্রার হইতে সিকি পয়সাও জমা নাই। তখন শ্রীমতী ভাবিলেন—“আচ্ছা শঠ চূড়ামণি! এবার ধরা পড়িবে দেখ”। পত্র আসিল—“বেবু! আপনি যেরূপ চতুর (clever) এরূপ টাকা জমা দেওয়ার পাত্র আপনি নহেন। অতএব আমার কাছে প্রতি ডাকে স্কুলের খরচের হিসাব পাঠাইবেন।” তাহাও প্রতি ডাকে আবার তাঁহার সংবাদ দাতার জটিলা কুটিলার নাম চাহিয়া পাঠাইলাম। এবার মানিনীর মুখ চূণ হইয়া গেল। এবার আর কথাটি না কহিয়া শুধু একটি মোড়ক মাত্র দিয়া হিসাবের বহিখানি ফেরত পাঠাইলেন। এক পালা শেষ হইল। এরূপ কত পালাই চলিয়াছিল। লোকটা এতদূর নীচতা আরম্ভ করিয়াছিল যে ফেণী দীঘিতে বর্ষার জল নির্গমের জন্য যে পাইপ বসাইলাম উহা অপব্যয় বলিয়া তাহার খরচ আমাকে দিতে আদেশ দিয়াছিল, এবং তাহা লইয়া আর এক পালা লড়িয়া পরাস্ত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি তিন মাসের ছুটী লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাই। কতক স্বাস্থ্যের জন্য, কতক বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত, রাজপুতানা ও বোম্বাই অঞ্চল দেখিবার জন্য এই ছুটী লইয়াছিলাম। দার্জিলিং, বৈদ্যনাথ, এলাহাবাদ, কানপুর, বিঠুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার, লাহোর, বরদা, বম্বে, পুণা, নাসিক, নর্ম্মদা, জব্বলপুর বেড়াইয়া স্ত্রীর কাছে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম উহা সুরেশ প্রথম সাহিত্যে, পরে পুস্তকে ‘প্রবাসের পত্র’ নাম দিয়া ছাপিয়াছেন। মিঃ দেখিলেন ছুটীর সময়ে পথ পরিষ্কার (coast is clear)। অতএব তিনি ফেণীতে আসিয়া এবং নিজ ফেণীতে ও ফেণীর এলেকায়

এক মাস যাবৎ থাকিয়া আমাকে তোপে উড়াইবার জন্য গোলা গুলি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমি পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছি বলিয়া লোকে বলিলে—তিনি বলিতেন—"হুঁ হুঁ! সে মন্ত্রী হইবার জন্য আগরতলা গিয়াছে।" ইহার কারণ তিনি আগরতলা রাজ্যের ঘোরতর অনিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার জন্য পারেন নাই। সে কথা স্থানান্তরে বলিব। পশ্চিম অঞ্চল ও আগরতলার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য বই ত নহে। আফিসের প্রত্যেক রেজিষ্টারীর প্রত্যেক অঙ্ক এবং প্রত্যেক ফৌজদারী ও কালেক্টরী মোকদ্দমার প্রত্যেক নথির প্রত্যেক হুকুম খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া একরাশি নোট লিখিয়া লইয়াছেন। লাহোরে গেলে এ সকল সংবাদ আমার কাছে ফেণী হইতে পৌঁছিল। আমি উত্তর ও পশ্চিম ভারত দর্শন করিয়া চট্টগ্রাম ফিরিয়া কমিশনার লায়েল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি গ্রাম্য রাস্তার নাম দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন।" আমি বুঝিলাম আমার অসাক্ষাতে শ্রীমতী আমার প্রতি এ অস্ত্রত্যাগ করিয়া ডিঃ বোর্ডের টাকা অপব্যয় করিয়াছি বলিয়া আমার বদলির প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি কমিশনারকে তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাচীরে লম্বিত চট্টগ্রাম বিভাগের নক্সার কাছে গিয়া দুইটি রাস্তা পেন্‌সিলে চিহ্নিত করিয়া দেখাইলাম যে কতকগুলিন গ্রাম্য রাস্তা যোগ করিয়া আমি এ দুটি রাস্তা প্রস্তুত করাইতেছি। তিনি তাহাদের উপকারিত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীমতীর এ ক্রূর কটাক্ষও নিষ্ফল হইল। আমার বদলি হইল না। ফেণীতে সশরীরে শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে আবার অবতীর্ণ হইলাম দেখিয়া তিনি যে সকল মাল মসলা এই কয়মাস জমা করিয়াছিলেন তাহা গড়িয়া পিটিয়া আরও একমাস পরে আমার কাছে তাহার ইন্‌স্পেকসন (পরিদর্শন)

মন্তব্য পাঠাইলেন। দেখিলাম উহা দ্বাত্রিংশৎ ফণা-শীর্ষ একটি নাগ-পাশ। অন্ততঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন তাই। আমার প্রতিকূলে অবৈধ কার্য্যের জন্য তিনি বত্রিশটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মোকদ্দমার নথি হইতে এই সকল অভিযোগ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত নথি তিনি লইয়া গিয়াছেন। সেই সকল নথি ফেরত চাহিলে তিনি লিখিলেন যে তিনি নথি ফেরত দিবেন না। তাঁহার আশঙ্কা নথি পাইলে এই অত্যন্ত চতুর (too clever) লোকটি তাহার বক্ষের উপর তিনি যে 'বত্রিশ সিংহাসন' পাতিয়াছেন, তাহা এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি লিখিলাম তাহা হইলে আমি কৈফিয়ত দিতে অক্ষম। তিনি লিখিলেন যে অমুক তারিখের পূর্ব্বে আমি যদি কৈফিয়ত না দিই, তবে তিনি গবর্ণমেণ্টে আমি কৈফিয়ত দিতেছি না বলিয়া রিপোর্ট করিবেন। আমি লিখিলাম যে তাহা হইলে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া লেখেন যে নথি ফেরত দিতেছেন না বলিয়া আমি কৈফিয়ত দিতে পারিতেছি না, এবং এ সমস্ত চিঠির নকল যেন সে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দেন। তাহার পরে তিনি 'তোবা' করিয়া এক দিন লিখিলেন—

"Babu ! thank god, I am transferred to Krishnagar and am relieved from the painful duty of controlling a subordinate like yourself"—"বাবু! আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে আমি কৃষ্ণনগর বদলি হইয়াছি, এবং আপনার মত একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর শাসন করা রূপ কষ্টকর বর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

কিন্তু ইহাতেও এ পালা থামিল না। তিনি যাইবার সময়ে কালাচাঁদ দ্বিতীয়বার নোয়াখালির কালেক্টর হইয়া আসিলে এ বিষয়ে কমিশনার

ও গবর্ণমেণ্টে আমার প্রতিকূলে রিপোর্ট করিয়া তাঁহার মান রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া যান। কালাচাঁদ আবার পূর্ব্বোক্ত পালা দ্বিতীয়বার অভিনয় করেন। তিনি আমাকে খুব ধমকাইয়া বার বার লিখিলেন যে নথি ছাড়া আমাকে কৈফিয়ত দিতে হইবে। আমি ভাবিলাম—"গোরাচাঁদের ধমক গ্রাহ্য করি নাই, তুমিত কালা-চাঁদ।" শেষে তিনি যখন দেখিলেন যে নথি না দিয়া কৈফিয়ত দিতেছি না বলিয়া উপরে রিপোর্ট করিলে তিনিই বেকুব হইবেন, তখন অগত্যা নথি গুলিন পাঠাইলেন—"never consenting consented"। আমি তখন এই বত্রিশ দন্তই ভাঙ্গিয়া দিলাম। আমি দেখাইলাম যে এই বত্রিশ অভিযোগই শ্রীমতীর আইন ও বাঙ্গালা বুঝিবার ভুল !! কালা কালেক্টর আমাকে পরে বলিয়াছিলেন যে আমার কৈফিয়ত পড়িয়া তিনি বড়ই হাসিয়াছিলেন। আমি শ্রীমতীকে একবারে কলহান্তরিতা নায়িকা, বা হীরা মালিণী সাব্যস্ত করিয়াছিলাম—

"বাতাসে বাঁধিয়া দড়ী কোন্দল ভেজায়।"

কালা কালেক্টর বলিলেন—"you made him a perfect fool." তিনি তখন বুঝিলেন যে কেন শ্রীমতী নথি পাঠাইতেছিলেন না। ইনি এই কৈফিয়ত তাঁহার কাছে কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার মতে উহা কমিশনারের কাছে পাঠাইলে বড় সুবিধা হইবে না। এমন শঠ চূড়ামণি কালাচাঁদের সঙ্গে "হাম অবলা অখলা" শ্রীমতী আর কি করিবেন। তিনি তিক্ত মুখে আর কথাটি না কহিয়া উহা ফেরত পাঠাইলেন, এবং এইখানে এই দুর্জ্জয় মানের পালা শেষ হইল। শ্রীমতী তাহার পর শুনিলাম কৃষ্ণনগরের এক ডেপুটির সঙ্গে আমার কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন—"he is a dreadful man,"—"একটী ভয়ানক লোক!" সে সময়ে যিনি

ফেণীর মুন্‌সেফ ছিলেন, তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীমতীর সঙ্গে যে সকল পত্র লেখা লেখি হইতেছিল, তাঁহাকে দেখাইতাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে ইংরাজের সঙ্গে কেমন করিয়া ঝগড়া করিতে হয় তিনি শিখিলেন। শ্রীমতী অফিসিয়াল কিছু না পাইয়া, আমার কাছে কর্কশ 'ডেমি' লিখিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন যে কিছু একটা অসম্মানের কথা আমি লিখিলে তিনি এক বারে গবর্ণমেণ্টের দ্বারে তাঁহার অপমান করিয়াছি বলিয়া কাঁদিয়া উপস্থিত হইবেন। মুন্‌সেফ বাবু একদিন বলিলেন—"আপনি বেচারিকে শালা ডাকিতেও humbly and respectfully (বিনয় ও সম্মানপূর্ব্বক) ডাকেন, তখন বেচারী আর কি করিবে?"

পাগ্‌লা মিয়া।

একদিন পুলিস হইতে রিপোর্ট আসিল যে 'পাগ্‌লা মিয়া' নামক এক জন প্রসিদ্ধ ফকির উক্ত পুলিসের এলেকায় পর্ব্বতের পাদমূলে এক গ্রামে বহুকাল যাবৎ আছেন। গ্রামটি বদ্‌মায়েসের একটা পীঠস্থান। পাগ্‌লা মিয়াকে নোয়াখালি ও কুমিল্লা অঞ্চলের লোকেরা দেবতার মত ভক্তি করে। তিনি নিজে নির্লিপ্ত। পাগলের মত ব্যবহার করেন, তাই তাঁহার নাম পাগ্‌লা মিয়া। কিন্তু যে বাড়ীতে থাকেন সে বাড়ীর অধিকারীর উপঢৌকন ইত্যাদিতে মাসিক প্রায় একশ টাকা আয় হয়। যে তাঁহাকে দর্শন করিতে যায় তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, টাকা পয়সা উপহার দিয়া থাকে। এ কারণে এই গ্রামস্থ চোরেরা সিঁদ দিয়া তাঁহাকে অস্থাবর সম্পত্তির মত এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে চুরি করিয়া লইয়া যায়। এরূপে তিনি এক প্রকার চোরা মালের মত হইয়াছেন। এখন এ চোর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া এরূপ শত্রুতা হইয়াছে যে তাহাদের হইতে গুরুতর সংখ্যায় শান্তি রক্ষার জামিন মোচলকা না লইলে আশু ঘোরতর শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা।

কোর্টে এ বিচিত্র রিপোর্ট কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টারের দ্বারা পঠিত হইলে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মোক্তার প্রভৃতির মুখে পাগ্‌লা মিয়ার ফকিরি সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান শুনিলাম। দেখিলাম তাঁহারা সকলে তাঁহার পরম ভক্ত। তিনি পাগলের মত কথা বলেন, এমন কি লোককে প্রহার পর্য্যন্ত করেন। তথাপি সেই পাগলের প্রলাপ বাক্য ও প্রহার হইতে অনেকে না কি তাহাদের মনোগত বিষয়ের সফল উত্তর পাইয়া থাকে। একজন বৃদ্ধ মোক্তারকে তিনি পাদুকা লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রহার করিতে তাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু ইহাতেই না কি পাদুকার

আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছিলেন। এক দিন বহু লোক উপস্থিত। ফকির নানারূপ পাগলামি করিতেছেন। সকলে চূড়ামণি মহাশয়ের মত তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নিযুক্ত আছেন। এমন সময় ফকির ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ধর! টান! বাঁধ! সাহাদের 'স্লুপ' মারা যাইতেছে।" এরূপ বলিতে বলিতে তিনি নিজেও যেন স্লুপের (চট্টগ্রাম দেশীয় ক্ষুদ্র জাহাজ) দড়ী টানিতেছিলেন, এবং লোকদিগকেও টানিতে বলিতেছিলেন, ও না টানিলে প্রহার করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ এরূপ পাগলামি করিয়া বলিলেন—"রক্ষা পাইয়াছে।" ছাগল গাইয়ার সাহারা ব্যবসার দ্বারা একপুরুষে ধনী হইয়াছে। তাহাদের কাছে এ খবর গেল। তাহাদের একখানি 'স্লুপ' নারায়ণগঞ্জ হইতে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসিতে ঠিক সে সময়ে ঝটীকাগ্রস্ত হইয়া আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। সে অবধি তাহারা ফকিরের বড় ভক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক এ বিচিত্র মোকদ্দমা লইয়া আমি সঙ্কটে পড়িলাম। পেনেল কোডের কর্ত্তারা যেন নরকে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ সম্ভবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই, যাহা পেনেল কোডে নাই। কিন্তু তাঁহাদের কল্পনাও এরূপ ফকির চুরি পর্য্যন্ত উঠে নাই। ফকিরকে আপাততঃ ত্রিপুরার মহারাজার ফুলগাজির কাছারিতে আনিয়া রাখিতে আমি পুলিশে অর্ডার পাঠাইলাম। তাঁহাকে ফেণীতে আনিয়া চোরের হাত হইতে উদ্ধার করিতে দেশ শুদ্ধ লোক আমাকে ধরিয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করা আমি উচিত মনে করিলাম না। আমি নিজে ফুলগাজি গেলাম এবং একখানি পাল্কি উপস্থিত রাখিলাম। আমি ফুলগাজি কাছারিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে কাছারির দেউড়ির একটা কক্ষের চারি দিকে

লোকারণ্য। কত লোকই ফকিরকে দর্শন করিতে আসিয়াছে, এবং পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। আমার সেই চট্টগ্রামের পোতন ফকিরের দৃশ্য মনে পড়িল। ফকির সামান্য অশিক্ষিত মুসলমান। খর্ব্বাকৃতি, শুষ্কদেহ, পৌঢ়। শরীরে তৈলাক্ত মসৃন আভা। তখন তিনি মৌনাবলম্বী। শুনিলাম তাঁহার দুইভাব। মাসের ১৫ দিন পাগলামি করেন, এবং অন্য ১৫ দিন মৌনাবলম্বনে থাকেন। এখন তাঁহার সে ভাব। নীরবে ধ্যানস্থ ভাবে তস্‌পি (স্ফটিকের মালা) জপিতেছেন। আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে পুলিসের দারগা বলিল—"ফকির সাহেব! ফেণীর হাকিম আসিয়াছেন।" তিনি মাথা তুলিয়া আমার দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন। আমি সেলাম করিয়া স্থির নয়নে তাঁহাকে দেখিলাম। তাঁহার আকৃতি ও ভাব দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। আমি বলিলাম—"পুলিস রিপোর্ট করিয়াছে যে আপনি কতকগুলি বদ্‌মায়েসের হাতে পড়িয়াছেন। তাহারা আপনাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে চুরি করিয়া লইতেছে, এবং এখন আপনাকে লইয়া তাহাদের হাঙ্গামা খুন হইবার উপক্রম। অতএব আপনার অভিপ্রায় কি আমি জানিতে আসিয়াছি।" তিনি কেবল একটি মাত্র কথা বলিলেন—"আল্লা তোমার ভাল করুক!" শুনিলাম মৌনাবলম্বন সময়ে এ কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না। আহারাদিও কেহ মুখে তুলিয়া দিলে খান। না হয় অনশনে থাকেন। কিছু চাহেন না, কিছু বলেন না। এমন কি আসন ত্যাগ করেন না। শৌচ কার্য্যাদি পর্য্যন্ত করেন না। তিনি নীরব রহিলেন দেখিয়া আমি আবার বলিলাম—"আমি ফেণীতে আপনার জন্য দরগা প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রস্তুত। আপনার যদি ফেণী যাওয়া মত হয়, তবে পাল্কী প্রস্তুত, আপনি পাল্কীতে গিয়া উঠুন। অন্যথা আপনি যাহাদের হাতে ছিলেন তাহারাও উপস্থিত

আছে। আপনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন'।" এই কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। সমবেত লোকেরা তাহাতে মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। পাল্কী ফেণী ছুটিল। আমি আমার শিবিরে গেলাম।

তাঁহাকে আপাততঃ একটি মুসলমান মোক্তারের বাসায় রাখিয়া তাঁহার জন্য বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আম্র-পনস বেষ্টিত আশ্রমের মত একটী স্থানে বাঁশের একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলাম। অন্য দিকে সেই বদমায়েসেরা গিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার প্রতিকূলে দরখাস্ত করিল যে আমার ফেণীর বাজার মিলাইবার জন্য আমি বলপূর্ব্বক পাগ্‌লা মিয়াকে তাহাদের অধিকার হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি। মাজিষ্ট্রেট আমার 'সেই মানিনী।' তিনি আমাকে জব্দ করিবার আর একটী অস্ত্র পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। আমার কাছে তীব্র ভাষায় কৈফিয়ত তলব হইল। বদমায়েসেরা নৃত্য করিতে লাগিল। আমি উপরোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলাম। তখন ফকিরের পাগলামি ভাব আরম্ভ হইয়াছে। আমি ও মুন্‌সেফ একদিন অপরাহ্ণে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি। তিনি প্রলাপ বকিতেছেন ও ছুটাছুটি করিতেছেন। মধ্যে একবার বলিয়া ফেলিলেন —"মিয়া নোয়াখালি যাইবে।" একটি লোককে এক কঞ্চির বাড়ি দিয়া বলিলেন—"ওরে শালা চল্!" সে হাসিতে লাগিল। পরের দিন প্রাতে ডাকে ফকিরকে নোয়াখালি পাঠাইবার আদেশ আসিল। আমি অপরাহ্ণে তাঁহার কাছে এ আদেশের কথা বলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আবার সেরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে একবার বলিলেন—"না, মিয়া যাইবে না।" আমি লিখিলাম যে ফকিরের যেরূপ পাগল ভাব, বল প্রয়োগ ভিন্ন তাঁহাকে নোয়াখালি পাঠান

আমার অসাধ্য। তিনি নিজে চাহিতেছেন না। কোন্ আইন মতে আমি বল প্রয়োগ করিয়া পাঠাইব, তাহা আমি জানি না। গরুর গাড়ীতেত পাঠান যাইবেই না। কারণ পড়িয়া তাঁহার হাত ঠেঙ্গ ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা। পাল্কীতে পাঠাইতে আশি টাকা আবশ্যক। আমি এ টাকা কোথায় পাইব? তখন মানিনী আমাকে এক 'ডি. ও.' পত্র লিখিলেন যে আমি শিক্ষিত লোক হইয়া এরূপ Humbug (ভণ্ডামি) বিশ্বাস করিতেছি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, এবং ভারতবাসীর শিক্ষা যে কিরূপ অসার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি তদুত্তরে লিখিলাম যে সম্ভবত আমার শিক্ষা অপূর্ণ। তবে 'হমবগ' (ভণ্ডামি) বুঝিবার শক্তির অভাব কেবল আমার নহে। ইউরোপ আমেরিকা এখন 'যোগদর্শন' লইয়া উলট পালট খাইতেছে। তাঁহাদের শিক্ষা আমার মত অপূর্ণ হইতে পারে না। তখন তিনি পাগ্‌লা মিয়ার নামে উন্মাদের আইন (Lunatic Act) মতে কার্য্য করিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। আমি লিখিলাম যে পাগ্‌লা মিয়া উন্মাদ বলিয়া পুলিস কি কেহ আবেদন উপস্থিত না করিলে আমার উক্ত আইন মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। লোকে পাগ্‌লা মিয়াকে এরূপ ভক্তি করে যে দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিবে, তথাপি তাঁহার প্রতিকূলে উন্মাদ বলিয়া কখন রিপোর্ট কি দরখাস্ত করিবে না। তখন মানিনী লিখিলেন—"পাগ্‌লা মিয়া উন্মাদ বলিয়া আমি তোমার কাছে সংবাদ দিতেছি। অতএব এখন তুমি আইন মতে কার্য্য কর।" এরূপ নীচপ্রকৃতির ইংরাজের উপরও ভারত-শাসনের ভার ন্যস্ত হয়। হায়! আমাদের অদৃষ্ট! তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ফকিরের প্রতিকূলে উন্মাদের আইনমতে এক মোকদ্দমা (Proceeding) উপস্থিত করিলাম। বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম তাঁহার এক 'চাচত' ভাই আছে। তাহাকে আনাইয়া, এবং তাঁহার

সংরক্ষণের জন্য তাহার জামিন মোচলকা লইয়া, তাঁহাকে নামতঃ তাহার জিম্মা করিয়া দিলাম। সে হাতে স্বর্গ পাইল। কারণ পাগ্‌লা মিয়ার মাসে অনূান একশত টাকা আয়। আমি তাঁহাকে ফেণীতে আনিয়াছি শুনিয়া চারি দিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আরও ছড়াইয়া পড়িল, এবং দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। তৎসঙ্গে তাঁহার আয়ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু মানময়ীর অনিদান মান ইহাতেও থামিল না। তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমি কখনও তাঁহার আদেশ পালন করিব না, এবং এবার তিনি আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার একটা মাহেন্দ্রক্ষণ পাইবেন। পাগ্‌লা মিয়া সম্বন্ধে আমি কি করিয়াছি তাহা জানিবার জন্য তিনি নথি তলব দিলেন। তাহা প্রেরিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে আমি একটা চালাকি খেলিয়াছি, কিন্তু তাহা এরূপ আইন সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে যে তাহাতে সূচ্যগ্রও চালাইবার ফাঁক নাই। তখন নিরাশ হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নথি ফেরত দিলেন এবং এরূপে মানের এ পালাও নিষ্ফল হইল। কালাচাঁদ ধরা দিলেন না। তখন ফেণীব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল।

কিন্তু মানময়ী ইহাতেও থামিলেন না। এই পাগ্‌লা মিয়ার ব্যাপারটা কি, আমি সত্য সত্য তাঁহাকে এক ভাইয়ের জিম্মায় দিয়াছি কি না তাহা "গোপনে অনুসন্ধানের" জন্য স্বয়ং পুলিস সাহেবকে পাঠাইলেন। পুলিস সাহেব অনেকেই গর্দ্দভ। ইনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন বৃহৎ কলেবর ও স্ফীত উদর, বুদ্ধিখানিও তথৈবচ। "গোপন অনুসন্ধানে" কিছু ফাঁক না পাইয়া এক দিন তিনি আমাকে মুখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি একজন এত বড় শিক্ষিত লোক হইয়া কি 'ফকিরি' বিশ্বাস করি।

আমি। আপনি কি করেন না?

তিনি। কদাচ না?

আ। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখাইব যে আপনি করেন।

তি। আপনি কখনও পারিবেন না।

আ। ঐ যে কৃষকেরা হাল চষিতেছে, উহাদের সঙ্গে আপনার কিছু মানসিক প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে, তাহারা অশিক্ষিত, আমি শিক্ষিত। (সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল)।

আ। অর্থাৎ আপনার কতকগুলিন মানসিক শক্তি শিক্ষার দ্বারা বিকশিত হইয়াছে, উহাদের হয় নাই?

তি। হাঁ।

আ। এখন উপর দিকে চলুন। ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডফরিণের সঙ্গে আপনার কিছু মানসিক প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে। তিনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক ও বাগ্মী।

আ। অর্থাৎ তাঁহার মনের কতকগুলিন শক্তি বিকশিত হইয়াছে, যাহা আপনার হয় নাই।

তি। হাঁ।

আ। আচ্ছা রাজমন্ত্রী গ্লেডষ্টোনের ও লর্ড ডফরিণের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে। লর্ড ডফরিণ অপেক্ষা গ্লেডষ্টোন শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক ও বাগ্মী।

আ। গ্লেডষ্টোন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক ও বাগ্মী হইতে পারে কি?

তি। পারিবে না কেন, মানুষের শক্তির অনন্ত বিকাশ হইতে পারে।

আ। আচ্ছা, গ্লেডষ্টোন ও সেক্ষপিয়ারের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে কি ?

তি। আছে। সেক্ষপিয়ার একজন জগতের সর্ব্বপ্রধান কবি। গ্লেডষ্টোন কবি নহেন।

আ। অর্থাৎ কবিত্ব একটা শক্তি মানুষের মনের আছে, যাহা সেক্ষপিয়ারে বিকশিত হইয়াছিল গ্লেডষ্টোনে হয় নাই।

তি। হাঁ।

আ। সেক্ষপিয়ার হইতে উৎকৃষ্টতর কবি ভবিষ্যতে হইতে পারে কি ?

তি। কেন পারিবে না ? মানুষের মনের শক্তি অসীম, অনন্ত।

আ। তবে মানুষের মনের শক্তি অনন্ত এবং তাহার বিকাশও অনন্ত। এক একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, শ্রেষ্ঠ গায়ক। ঈশ্বরের কৃপায় ও অনুশীলন দ্বারা এক একজনের এক একটি শক্তির বিকাশ হইয়া তিনি অন্য লোক হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। এ ফকিরেরও মনের অনন্ত শক্তির মধ্যে মনে করুন একটি বিশেষ শক্তি, ইংরাজিতে যাহাকে occult power বলে, ঈশ্বরের কৃপায় ও সাধনায় বিকশিত হইয়াছে, যাহা আমার কি আপনার হয় নাই। অতএব ইহাতে অবিশ্বাসের বিষয় কি আছে।

তি। ও! আপনি এভাবে ফকিরি বিশ্বাস করেন।

আ। ইহার অন্য ভাব নাই। আমাদের একটা যোগশাস্ত্র বা Yoga Philosophy আছে যাহা লইয়া এখন ইউরোপ এবং আমেরিকা আন্দোলিত। তাহাতে মানুষের শক্তি বিশেষের অনুশীলনের উপায় লিখিত আছে। আমাদের সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা সে উপায়ে সাধনার দ্বারা সে শক্তি বিকাশের চেষ্টা করে। কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়। যেমন একজন প্রধান চিত্রকর যাহা চিত্র করিবে আপনি আমি পারিব না,

একজন প্রধান রাজনৈতিক রাজ্যের বিষয় অনেক দেখিবে ও বুঝিবে যাহা আপনি আমি দেখিব ও বুঝিব না, তদ্রূপ এই সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও ফকির এই বিশ্বের সূক্ষ্ম নীতি বা তত্ত্ব যেমন দেখিবে ও বুঝিবে আমরা দেখিব কি বুঝিব না। ইহাতে অবিশ্বাসের কথা কি আছে?

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, তাঁহার 'গোপন অনুসন্ধানের' শুভাগমনের কথা আমাকে খুলিয়া বলিয়া মানিনী মহাশয়কেও এরূপ বুঝাইবেন বলিয়া ফেণী হইতে বিজয়া করিলেন। হয়ত 'মানিনী' শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারীর সুরে গাহিয়াছিলেন—"আহা মরি! হরি! হরি! কেন বা মান করেছিলাম।" কিছুতেই কালাচাঁদ ডেপুটিটাকে জব্দ করিতে পারিলেন না।

দেখিতে দেখিতে পাগ্‌লা মিয়ার প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহার তত্ত্বাবধারণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের একটা কমিটী গঠন করিয়া দিলাম। পাগ্‌লা মিয়া খুব সুখে ও সম্মানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বলিয়াছি তাঁহার জীবনে দুই পক্ষ—পাগলামি পক্ষ ও ধ্যান পক্ষ। পাগলামির পক্ষে সমস্ত ফেণী সহর ছুটিয়া বেড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে আমার গৃহেও আসিতেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকের শ্রেণী থাকিত। তাহারা এ পাগলামির মধ্য হইতে নাকি তাহাদের মনোগত কথা বুঝিতে পারিত। তাঁহার গৃহ বা দরগা দিন রাত্রি নর নারীতে পূর্ণ থাকিত। বাজারে পাগলামি করিতে করিতে দোকানদারদের কত জিনিস কত লোককে বিলাইতেন। পাছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমি তাহাদের দ্রব্যাদির মূল্য তাঁহার আয়ের টাকা হইতে দিতে আদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু কেহ প্রাণান্তে তাহা লইত না। বরং যে দোকানদারের দোকান হইতে এরূপে জিনিস বিলাইতেন, সে তাহাকে ভাগ্যবান মনে করিত। ফলতঃ দেখিতে দেখিতে

ফেণীর বাজারেরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার উপহারের জন্য লোক প্রত্যহ যে সকল দ্রব্যাদি কিনিতে লাগিল তাহাতেও বাজারের অনল্প শ্রী বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহার উপর শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমি একটা মেলার সৃষ্টি করিলাম। পূর্ব্বে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ফেণীতে ঢাকাই আমদানি বাই খেম্‌টার নৃত্য মাত্র হইত। প্রথম বৎসর আমি এই নৃত্য দেখিয়াছিলাম। তাহাদের যেমন রূপ, তেমনি নৃত্য, আর বলিতে হইবে না তেমনি ভাষা। আমি আগাগোড়া হাসিয়াছিলাম। বলিয়া না দিলে তাহাদিগকে তৈলাক্ত আফ্রিকার আমদানি বলিয়া ভ্রম হইত। অথচ এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উকীল মোক্তার বাবুদের চারিশত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আমি তাহাদের নৃত্য বা লম্ফ দেখিতে দেখিতেই তাহার ইতি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। পরের বৎসর সরস্বতী পূজার সময়ে 'বাসন্ত উৎসব' নাম দিয়া একটা বাৎসরিক মেলা গঠিত করিলাম। হিন্দুরা সরস্বতী পূজা বাজারের কেন্দ্র স্থলে করিলেন, এবং পাগ্‌লা মিয়ার দরগার সম্মুখে সামিয়ানা খাটাইয়া মুসলমানদের জন্য "মৌলুদ সরিফ্" বা শ্রীশ্রী মহম্মদের জন্ম বৃত্তান্ত পাঠের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এরূপে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এই মেলা উপলক্ষে একটা সমপ্রাণতা সঞ্চারিত হইল। এমন কি মুসলমানেরা হিন্দুদের সরস্বতী পূজার আসরে সঙ্গীতে যোগ দিলেন, এবং হিন্দুরাও 'মৌলুদ সরিফে্র' আসরে ভক্তির সহিত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করিলেন। আজকাল দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের একটা ধূয়া উঠিয়াছে। উহা বাঙ্গালির নব্যতম হুজুগ। কিন্তু আমিই প্রকৃত প্রস্তাবে বহুপূর্ব্বে দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের সূত্রপাত করিয়াছিলাম। আমি ঢাকাই আমদানি বন্ধ করিয়া নোয়াখালির এক নর্ত্তকীকে পেশোয়াজ্ পরাইয়া বাই খাড়া করিলাম, এবং যে বেদেদের মেয়েরা হাটবাজারে গাইয়া

নাচিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্য হইতে ছুটিকে কাউনসিলের ফাঁকা অনরেবল মেম্বরদের নির্ব্বাচন প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করিয়া, এবং উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্বর্গ প্রদাতা সাবানের দ্বারা তাহাদের বাহ্যিক বহু বর্ষ সঞ্চিত তৈল জাত অশ্লীলতা বিদূরিত করিয়া যাত্রার দলের একটি গায়কের ও বাদকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে এক পক্ষের মধ্যেই উভয়কে অতিরিক্ত সাবান সেবার ও শিক্ষার দ্বারা উর্ব্বশী মেনকাত্ব প্রদান করিয়া আসরে উপস্থিত করিল। বাইজী তিলোত্তমা, কারণ তিনি একাধারে বাই, খেমটা, যাত্রা ও থিয়েটার। তিনি সকল প্রকার সঙ্গীতে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাহার উপর সোনায় সোহাগা—তিনটিই সুন্দরী এবং তিনটিই ষোড়শী। তিনটাই স্থানীয় কীর্ত্তি (Indigenous production)৷ ঢাকাই আমদানি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও কেবল ফেনীতে বন্ধ হইল এমন নহে, এ অঞ্চলেই বন্ধ হইল। ইহাদের খুব প্রসার হইল, এবং দেখিতে দেখিতে নোয়াখালি ও কুমিল্লাতে আরও দল সৃষ্টি হইল। অথচ এই মহৎ স্বদেশ প্রেমিকের কার্য্য সম্পাদন করিতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ মুদ্রা মাত্র ব্যয় হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে। আমার মেলার উদ্দেশ্য ছিল—স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি। সপ্ত দিবসব্যাপী মেলা। চারি দিকের হাট বাজার এই সপ্তাহে বন্ধ। ফেনীর দোকানদারদের দুর্গোৎসব। দিবসে বাণিজ্যের বাজার, আর রাত্রিতে আনন্দের বাজার। প্রত্যহ রাত্রিতে স্থানীয় বাই, খেমটা, স্থানীয় যাত্রারা স্থানীয় কবির বা কপির গান, গাজির গান, চৌধুরীর লড়াই গান, যাহা নোয়াখালির নিজস্ব (Indigenous)! সর্ব্ব শুদ্ধ ব্যয় দেড় শত মুদ্রা। অতএব হে স্বদেশ প্রেমিক দেশীয় শিল্পের উন্নতিকারীর দল! হে চারি আনা মূল্যে ভারত উদ্ধারের দল! আমার ও কলিকাতার অভিনেত্রী স্রষ্টা গিরীশ ভায়ার দুইটি মূর্ত্তি কলিকাতার গড়ের মাঠে যথা শাস্ত্র তোমাদের স্থাপিত করা উচিত।

পাগ্‌লা মিয়ার প্রতিষ্ঠা দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং এরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। স্থানীয় মুসলমান সব-রেজেষ্ট্রারের এক পুত্র আজন্ম বাতব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহারা পতি পত্নী পাগ্‌লা মিয়াকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া সেই পুত্রের সঙ্গে তাঁহাকে এক গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এরূপে দুই তিন দিন গেলে পাগ্‌লা মিয়ার ভাই আসিয়া আমার কাছে এ সংবাদ দিল। আমি সব-রেজেষ্ট্রারকে ডাকাইলাম। তিনি বলিলেন যে ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রের রোগের কিছু উপশম হইয়াছে। সে হাত পা নাড়িতে পারিতেছে। আর দুই চারি দিন ফকিরকে তাঁহার গৃহে থাকিতে দিলে তাঁহার পুত্র নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। তিনি বড় অনুনয় করিলে আমি সম্মত হইলাম। ইহার দুই তিন দিন পরে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে ফকির আর তাঁহার ঘরে থাকিতে অসম্মত হইয়া তাঁহাদের পদানত পতি পত্নীর হাত ছাড়াইয়া যেমনি উঠানে নামিতেছিলেন অমনি সিড়ি হইতে পড়িয়া নিজে বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, ও সে অবস্থায় দরগায় আনীত হইয়াছেন। সব-ডিভিসনে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল, এবং সকলে দরগার দিকে ছুটিল। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন স্থানটি লোকারণ্য হইয়াছে। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাহাকার করিতেছে, কেহ সব-রেজেষ্ট্রারকে গালি দিতেছে। দেখিলাম তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অচল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। তিনি সকরুণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার বলিলেন পূর্ণ বাতব্যাধি। তিনি দেখিতে দেখিতে ধ্যানস্থ বা যোগস্থ হইলেন। আমার বোধ হইল যেন তিনি পতি পত্নীর কাতর ক্রন্দনে আপন শরীর হইতে রোগীর অঙ্গে ক্রমাগত কয়েক দিবস তাড়িত-ক্ষেপ করিয়া আপনার শরীর এরূপ তাড়িত শূন্য করিয়াছিলেন যে আর সামলাইতে পারেন নাই। এরূপে অনুমান সপ্তাহ

কাটিয়া গেল। একদিন কাছারিতে খবর আসিল যে পাগ্‌লা মিয়া লীলা সম্বরণ করিতেছেন। কাছারি ভাঙ্গিয়া আমরা গেলাম, তাঁহার ভাই ও কয়েক জন মোক্তার বলিল যে আজ তাঁহার কিছু হইবে না। গত রাত্রিতে ফকির একবার অকস্মাৎ বলিয়াছিলেন তিনি বুধবার এত ঘণ্টার সময়ে কৈলাস যাইবেন। আজ সোমবার। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। তাঁহার ভাই বলিল যে প্রাতঃকাল হইতে তিনি দক্ষিণ হস্তের মুঠি লইয়া বরাবর আমার গৃহের দিকে দেখাইতেছিলেন। সে তখন চেঁচাইয়া বলিল—"বাবু আসিয়াছেন। আপনি কি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহেন ?" তখন তিনি আমার দিকে চাহিয়া মুঠি খুলিলেন। দেখিলাম তাহাতে নিকটস্থ মাটির বাসন ভাঙ্গা এক টুকরা চাঁড়া। ইহার অর্থ কি ? আমাদের সকলের মনে এই ধারণা হইল যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সমাধির উপর একটি পাকা দরগা নির্ম্মিত হয়। আমি বলিলাম যে তাঁহার আদেশ আমি প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। দেখিলাম আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তাহার পর বুধবার ঠিক তাঁহার প্রতিশ্রুত সময়ে,তাঁহার সংখ্যাতীত ভক্তদের শোকাশ্রু লইয়া, তিনি "কৈলাসধাম "চলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে আমার বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। ছাগল গাইয়ার সাহাদের কাছে পত্র লেখা মাত্র তাঁহারা সমাধি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকার করিলেন। তিনি যে বাঁশের গৃহে ছিলেন, এবং যেখানে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়াছিলাম, এবং তদুপরি বাঁশের গৃহের অনুকরণে সাহাদের ইষ্টক নির্ম্মিত অষ্টকোণ সমন্বিত সুন্দর মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সেই সমাধি মন্দিরে এখনও বহু লোকের নিত্য সমাগম হয়, এবং বহু উপহার সমাধিতে প্রদত্ত হয়। সাধুলোক চিরজীবী।

ফেণীর শাসন।

(১)

'জলচরের' অত্যাচার।

আমি কোনও সব-ডিভিসনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ, কি প্রকারের মোকদ্দমা তাহাতে অধিক হয়, ও কি কারণে হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতাম। সব-ডিভিসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় রিপোর্ট পাঠ করিতাম, এবং যত লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত—জমীদার, পুলিস ও অন্যান্য ভদ্রলোক—সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিতাম। এরূপে উক্তরূপ মোকদ্দমাধিক্যের যাহা কারণ তাহা স্থির করিয়া, তাহার উপর পদক্ষেপ করিয়া দৃঢ়ভাবে বসিয়া থাকিতাম। ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, গবর্ণমেণ্ট, হাইকোর্ট যাহা বলুন, নীরবে তাহা উপেক্ষা করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য যাহা স্থির করিয়াছি তাহাতে অবিচল থাকিতাম। কিছুদিন ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রে আমার আসন টলটলায়মান হইয়া যখন তাহা দৃঢ় হইত, তখন সব-ডিভিসনে এরূপ শান্তি স্থাপিত হইত, আমার ফৌজদারী কার্য্য এরূপ কমিয়া যাইত যে আমি আমার সমস্ত সময় লোকহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিতাম। এখানেও আমাকে অনেক ঝড়, বজ্র অবিচলিত ভাবে সহিতে হইয়াছিল।

আমার এই কর্ত্তব্য দৃঢ়তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চট্টগ্রামের কমিশনার লায়েল সাহেব আমার দুইজন বন্ধুকে দুইবার বলিয়াছিলেন—"নবীন বাবু যাহা ধরেন, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বিপক্ষতা করিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া তিনি ছাড়েন না। এরূপ অবাধ্য ও একগুঁয়ে (head-strong and stub-

born) না হইলে নবীন বাবু কোন্ কালে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিতেন।" আমি বলিয়াছিলাম—"লায়েল সাহেবেরা কত ডেপুটীকেই ডিঃ মাজিষ্ট্রেট করিয়াছেন,—(তখন পর্য্যন্ত তৈলসেবী রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ কেহই ডিঃ মাজিষ্ট্রেট হন নাই)—কেবল আমিই বাকী। আপনি লায়েল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমি যে এরূপ আচরণ করিয়া থাকি, তাহা কেবল যে সাত আট লক্ষ লোকের সুখ দুঃখ আমার হস্তে গবর্ণমেণ্ট অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য নহে কি ? অন্যথা তাঁহাদের ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিয়া কি কারণে আমি আমার উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া থাকি ? আমার উন্নতির অপেক্ষা লোকহিতে আমার অধিক আনন্দ। এই আত্ম-বলিদান-মূলক প্রকৃতির জন্য দায়ী আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি নহি।"

যাহা হউক আমি স্থির করিলাম যে ফেণীর অশান্তির কারণ—(১) ত্রিপুরার মহারাজার প্রতিকূলে প্রজাদের বিদ্রোহ, (২) পুলিসের অত্যাচার ও অকর্ম্মণ্যতা, (৩) মুন্‌সেফি পেয়াদার অত্যাচার। ত্রিপুরারাজ্যের উপর বুঝি বিধাতার কোনও রূপ অভিশাপ আছে। আমি একটি দিনও ইহার সুখশান্তির কথা শুনিলাম না। সে কথা পরে বলিব। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সঙ্গীতে, সাহিত্যে ও চিত্রবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। তিনি এ সকল কলা-বিদ্যায় এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে রাজকার্য্যে তিনি পাঁচ মিনিট সময় মাত্রও নিয়োজিত করিতেন না। ইহার উপর তিনি পূর্ব্ববঙ্গচন্দ্র বিশেষের হস্তে পুতুল হইয়াছিলেন। ইহাদের স্বার্থ-সাধনার জন্য ইহারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল যে তিনি একটুক চেষ্টা করিলে, যদিও তাঁহার মূর্ত্তিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ত্রিপুরা জাতির মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। তিনি এই

ফাঁদে পড়িলেন। বিক্রমপুর হইতে বহু অর্থব্যয় করিয়া পণ্ডিত পুঙ্গবদের আমদানি করা হইল। ইহাঁরা ব্যবস্থা দিলেন যে তিনি ক্ষত্রিয়। তাঁহার সংস্পৃষ্ট জল ইহারা উদরে বোঝাই করিলেন, এবং পরে বেগতিক দেখিয়া 'পদ্মার পারে' গিয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে একটা দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। মহারাজার স্থানীয় সভাপণ্ডিত, কর্ম্মচারী এমন কি ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত এ জলাচরণ ভয়ে পলায়ন করিল। ষড়যন্ত্র-কারীদের মনোরথ পূর্ণ হইল। এই জলপ্লাবনে পালে পালে তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া এই কর্ম্মচারীদের স্থান গ্রহণ করিল। আমি ইহাদের 'জলচর' (water fowl) আখ্যা দিয়াছিলাম। ফেণীর অর্দ্ধেক এলেকা মহারাজার জমীদারি। এ 'জলচরগণ' প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন মন্ত্রীদের কল্যাণে প্রজাদের বন্দোবস্তি মাত্রই ছিল না। কাযেই খাজনার অঙ্ক জলচরদের স্বেচ্ছাধীন; তাহার উপর খাজনা দিলে দাখিলা দেওয়ার নিয়ম ত্রিপুরা রাজ্যের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য। আমি আমার প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিয়াছিলাম যে সেই সময়ে এ সকল কারণে রাজা প্রজার সম্বন্ধ এই দাঁড়াইয়াছিল;—জলচরেরা লাঠির জোরে যাহা লইতে পারে, এবং প্রজা লাঠির জোরে যাহা না দিতে পারে। কাযে কাযেই ত্রিপুরা রাজ্যের জমীদারির অন্তর্গত ছাগল গাইয়া থানায় ও পরশুরাম আউট পোষ্টে সে সময়ে আগুন জ্বলিতেছিল। এত মোকদ্দমা হইয়াছিল যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধঘণ্টা সময় মাত্র স্নানাহারের জন্য রাখিয়া সূর্য্যোদয় হইতে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত—কখন রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত—কাছারি করিতেন। আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সপ্তাহ মধ্যে মহারাজার পাঠানগড় কাছারির নিকটে জলচর রাজকর্ম্মচারী ও স্থলচর প্রজাদের মধ্যে বলপূর্ব্বক ধান কাটা উপলক্ষে একটা যুদ্ধ হইয়া-

ছিল। তাহাতে উভয় পক্ষে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিল, এবং একটি খুন ও কয়েকজন লোক আহত হইয়াছিল। ফেণীতে থাকিবার স্থানাভাবে আমি তখন 'করাইয়া হাটের' নিকট তাঁবুতে ছিলাম। সংবাদ পাইবা মাত্র আমি ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্রদেবের মত দশ মাইল পথ চলিয়া একেবারে পাঠান গড় কাছারির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তখন জলচর দলের সেনাপতি—দুই দেওয়ান কাছারিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের আড্ডা কুমিল্লায়। তাঁহারা বলিলেন তাঁহারা এ বিভ্রাটের কিছুই জানেন না। আমি বলিলাম—"তাহা ঠিক। আপনারা কেবল নিষ্কাম ভাবে কাছারিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সঞ্জয় মুখে এ 'অমৃত সমান' যুদ্ধ বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন।" উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, ভীমোদর; তাহা না হইলে দেওয়ানজি পদের শোভা হইবে কেন? আমার এই তীব্র বিদ্রূপে দেখিলাম তাঁহাদের উদর মণ্ডলে একটা ভূমিকম্প হইল। আমি বলিলাম যে হস্তীর সম্মুখে সম্মুখে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পদব্রজে গিয়া তাঁহাদের আমাকে ঘটনার স্থান দেখাইতে হইবে। তাঁহারা আবার বলিলেন, যে তাঁহারা কিছুই জানেন না। সেই দিনমাত্র আসিয়াছেন। দেখিলাম ভয়ে তাঁহাদের কণ্ঠ তালুকা শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহারা আমার ক্রোধ দেখিয়া কাঁপিতেছিলেন। আর বাড়াবাড়ি না করিয়া তাঁহাদিগকে পুলিসের পাহারায় রাখিয়া আমি ঘটনার স্থান দেখিতে গেলাম। প্রহরীকে বলিয়া গেলাম যে তাঁহারা যদি কোনও রূপে পলায়ন করিতে চাহেন সে যেন বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না করে। স্থান দর্শন করিয়া আমি তাঁবুতে ফিরিলাম। পর দিবস কনেষ্টবল আসিয়া বলিল যে উভয় দেওয়ান দুই পাল্কীতে পলায়ন করিয়া একেবারে পাহাড়ে মহারাজার এলেকায় প্রবেশ করিয়াছেন। পাল্কীতে কে,—লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, বেহারারা বলিয়াছে—"তুমি মুন্সির বধূ ও পুত্রবধূ।" তাঁহারা পলায়ন করিবেন,

এবং প্রজারা দেওয়ানজিদের পলায়ন দেখিয়া ভয়ে মৃতবৎ হইবে, ইহা আমারও উদ্দেশ্য ছিল। সব-ডিভিসনব্যাপী হাসির তুফান ছুটিল।

এরূপ হাঙ্গামা সম্বন্ধে আমার নীতি এই যে আমি জমীদার পক্ষীয় লাঠিয়ালদের অপেক্ষা স্বয়ং জমীদার ও তাঁহার কর্ম্মচারীর উপর হাত চালাইয়া থাকি। কেবল লাঠিয়ালদের শাস্তি দিলে কোনও ফলই হয় না। এক দল জেলে যায়; তাহাদের স্থান আর একদল গ্রহণ করে। জমীদারের কিছু অর্থব্যয় হয় মাত্র। ত্রিপুরার মহারাজা স্বাধীন। তাঁহার গায়ে হাত দিবার সুবিধা নাই। আমি তৎক্ষণাৎ উভয় দেওয়ানের নামে হাঙ্গামা নিবারণ না করার, ও তাহার সংবাদ না দেওয়ার অপরাধে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া একেবারে ওয়ারেণ্টের আদেশ দিলাম। পুলিস উভয় পক্ষের কয়েক জন লাঠিয়াল মাত্র যথাশাস্ত্র রজত মুদ্রা উদরস্থ করিয়া চালান দিল। দেওয়ানেরা উকীল প্রমুখ সশরীরে কোর্টে আসিয়া ধরা দিলেন। এই মোকদ্দমায় তাঁহাদের কয়েক মাস নানাস্থানের জলপান করাইলাম; ও অসহনীয় দুর্গতি ভোগাইলাম। তাঁহারা প্রকাশ্য কাছারিতে অশ্রুপাত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অতঃপর তাঁহারা কখনও লাঠি ধরিবেন না। তাঁহাদের ভাল মন্দ আমাকে জানাইয়া আমার পরামর্শ মতে কার্য্য করিবেন। তখন লাঠিয়ালদের শাস্তি দিয়া তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলাম। অন্যপক্ষে প্রজাদের বলিলাম যে যত দিন তাহারা লাঠি না ধরিবে ততদিন আমি এরূপে তাহাদের অনুকূলে থাকিব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা লাঠি ধরিবে, সে মুহূর্ত্তেই আমি তাহাদের উপর খড়্গ-হস্ত হইব। তাহারাও উপরোক্ত মতে প্রতিজ্ঞা করিল। এরূপে এই এক মোকদ্দমায় মহারাজার এলেকা এরূপ ঠাণ্ডা হইয়াছিল যে আমার আট বৎসর ফেণী অবস্থিতি কাল আর কখন একটা সামান্য মারপিটের মোকদ্দমাও রাজা প্রজায় হয় নাই।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থির ধীর শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে পুলিসের কাবেহ "অপ্রতিহত প্রভাব" ছিল। তাহার উপর তাঁহার জন্য এক কনেষ্টবল কবুতর আনিতে গিয়া একটি লোককে প্রহার করে। তিনি তজ্জন্য কনেষ্টবলকে ধন্যবাদ না দিয়া জরিমানা করেন। ইহাতে ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার কোনও কার্য্য না করিবার জন্য পুলিসকে আদেশ প্রচার করেন। ইহার ফলে তিনি এক দিকে যেরূপ পুলিসের কাছে হতমান হন, অন্য দিকে সেরূপ পুলিসের প্রভাব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজাগণ পুলিসের প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। লবণ পরীক্ষা করা পুলিসের একটা শাস্ত্র সঙ্গত উপার্জ্জনের উপায়। ফেণীর সব ইন্‌স্পেক্টর এক হাটে এ পরীক্ষা এরূপ অতিরিক্তভাবে আরম্ভ করেন যে হাটের লোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কনেষ্টবলকে এক কর্ম্মকারের কয়লা ভিজাইবার গর্ত্তে, উৎকোচের পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট মুষ্ঠি প্রয়োগ করিতে করিতে, নিক্ষেপ করে। কার্য্যটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; কারণ উভয়ে এরূপ ঘন নিবিড় কৃষ্ণাঙ্গ যে তাঁহাদের বর্ণ রঞ্জিত করিবার শক্তি অঙ্গারোদকের ছিল না। সেক্ষপিয়ার ইহাকে "হাস্যকর অতিরিক্ত" (ridiculous excess) কার্য্য বলিয়াছেন। রঙ্গলাল তাহার অনুবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"কোন্ মূঢ় চিত্র করে, পদ্ম দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?"

কদাচ না। এই কৃষ্ণ বর্ণের শোভা বাড়াইতে কয়লার সাধ্য কি? এই ঘটনা আমি যাইবার অল্প দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এরূপ অরাজকতা নিবন্ধন, এবং ফেণী লুসাই পর্ব্বত সান্নিধ্য, এবং লুসাই আতঙ্কে আতঙ্কিত সবডিভিসন বলিয়া, উহা ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে উহার ভার দেওয়ার জন্য

কমিশনার গবর্ণমেণ্টকে জিদ্ করিয়া লিখিয়া দিলেন। আমি বড় সঙ্কটে পড়িলাম। প্রমাণ কেবল যুগল পুলিস। ভ্রমেও সত্য কথা বলা অনেক পুলিসের ধর্ম্ম নহে। তাঁহারা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গিয়া নিরীহ মেষশাবকের মত অকারণ প্রহারিত, রঞ্জিত, এবং ছিন্ন পুলিস-পরিচ্ছদ হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য ভূভারতে কে বিশ্বাস করিবে? যাহারা শাসন-কার্য্য হইতে বিচার-কার্য্য বিভিন্ন করিতে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি করিতে বলেন? পুলিস আত্ম-দোষ গোপনার্থ মিথ্যা বলিয়াছে এবং ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া যদি আসামীদিগকে অব্যাহতি দেই তবে পুলিস সাধারণের চক্ষে এরূপ হতমান হইয়া পড়িবে যে শাসনকার্য্য কেন্দ্রভ্রষ্ট হইবে। ঘটনাটিও অমূলক নহে। অতএব আমি আসামীদের এরূপ কঠিন দণ্ড বিধান করিলাম যে তাহাতে সব্‌ডিভিসন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু এরূপ ভাবে পুলিসের কার্য্যের ও প্রমাণের তীব্র সমালোচনা করিলাম যে আপিল আদালত তাহা পাঠ করিয়া আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্য দিকে এরূপ সমালোচনায়, এবং বিচার সময়ে পুলিসের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনায় সমস্ত পুলিসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে প্রত্যেক মাসে এরূপ পুলিস বেদখলের ও প্রজার প্রতি পুলিসের অত্যাচারের দুই চারি নম্বর মোকদ্দমা হইতেছিল। ইহার পর আমি যে আট বৎসর ছিলাম, আর একটী মোকদ্দমাও হয় নাই।

এবার মুন্সেফীর পদাতিক প্রভুদের পালা। আমি ইহাদিগকে infantry বলিতাম। ইহাদের যে এখন দেশব্যাপী কিরূপ অত্যাচার তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে জানে না। সূর্য্যের প্রতাপ সহ্য

হয়, কিন্তু রবিকরতপ্ত ক্ষুদ্র বালুকা অসহ্য। যেখানে ডিক্রীদার দেখিল যে দায়িকের সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায় হইবে না, সেখানে পদাতিক মহাশয় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া, কিম্বা যেখানে দায়িক তাঁহাকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতে অসম্মত হইল, এ উভয় স্থানে, দায়িক বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বেদখল করিয়াছে বলিয়া তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এরূপ মোকদ্দমাও পূর্ব্বে মাসে দুই চারি নম্বর উপস্থিত হইত। লোকে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সময় সময় পদাতিককে পদাঘাতে আপ্যায়িত করিয়া পদাতিক নাম সার্থক করিত। একারণে তাঁহারা প্রত্যেক ডিক্রীজারির সময়ে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বলিয়া থানাতে এজাহার দিয়া একজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইতেন। গোদের উপর বিস্ফোটক! একে ত পদাতিকের দক্ষিণা দিতে লোকের প্রাণান্ত, তাহার উপর আবার 'কনিষ্ঠ বুল' মহাশয়ের—(জনবুলের ছোট ভাই)—লাল পাগড়ির দক্ষিণা! এরূপে পদাতিক ও কনেষ্টবলদের আয় মুন্সেফের সেরেস্তাদার অপেক্ষাও অধিক দাঁড়াইয়াছিল। আমি সব্‌ডিভিসনের ভার লইয়াই দেওয়ানী ডিক্রী-জারিতে পুলিসের সাহায্য বন্ধ করিলাম। পেয়াদারা উত্তম মধ্যমের ভয়ে মুন্সেফকে গিয়া ধরিল। তিনি আসিয়া আমার উপর ধন্না দিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি এত ভাল লোক ছিলেন যে পেয়াদাদের ভয়ে পর্য্যন্ত ভীত থাকিতেন। তিনি বলিলেন, দায়িকেরা পদাতিকদের "হাড় গুড়" করিবে। আমি বলিলাম যে পেয়াদারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাত্র করিলে লোকে কেন এরূপ করিবে? পদাতিকের অস্থি-পঞ্জর-চূর্ণ আহার্য্য নহে, এবং তাহার সহিত দায়িকের মাধ্যাকর্ষণ-মূলক কোনও রূপ সংঘটনের কথা বিজ্ঞানে নাই। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা করিলে আমি পেনাল কোডের দ্বারা পদাতিক-পঞ্জরাভিলাষীদের পঞ্জর

পরীক্ষা করিব। মোটের উপর আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে তাঁহার আদেশ পালনের জন্য পুলিসের সাহায্য লওয়া তাঁহার পক্ষে গ্লানির কথা। দেখিলাম তিনি পেয়াদাদের অত্যাচারের কথা বড় বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই আমার হাতে প্রথম পেয়াদা বেদখলের মোকদ্দমায় এ রহস্যের উদ্ভেদ হইল। মোকদ্দমা বেশ প্রমাণ হইয়াছে। আসামী জবাব দিয়াছে যে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পেয়াদা অন্য লোকের গরু ক্রোক করিয়াছিল, এবং তাহার কাছে ঘুস লইয়া ছাড়িয়া দিয়া শেষে আসামীর কাছেও ঘুস চাহে। সে দিতে অসম্মত হওয়াতে দায়িকের চক্রান্তে তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এজলাসের সম্মুখে এক বেঞ্চের কোণায় বসিয়া একজন বৃদ্ধ মোক্তার হাসিতেছেন। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আর একজন মোক্তার হাসিয়া বলিল যে বৃদ্ধ প্রকৃত অবস্থা কি তাহা জানেন। প্রথমোক্ত মোক্তার তাঁহার উপর মহা ক্রোধ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে থামাইলাম, এবং তাঁহার সাক্ষ্য লইতে চাহিলাম। তিনি অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া অব্যাহতি চাহিলেন, কারণ তিনি কখনও সাক্ষ্য দেন নাই। নিজেও অবস্থাপন্ন লোক এবং পক্ষদের কাহাকেও তিনি চিনেন না। এ সকল কারণে আমি বরং তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলাম। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়াতে বরং ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম নাই। অগত্যা তিনি প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া বলিলেন যে তিনি একদিন তাঁহার বাসার সম্মুখের পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সমক্ষে টাঙ্ক রোডের উপর একটা গোলযোগ হইল। আসামী যেরূপ বলিয়াছিল পেয়াদা একটী লোক হইতে কিছু লইয়া তাহার

গরু ছাড়িয়া দিয়া উপস্থিত আসামীর কাছে কিছু চাহে এবং সে নিঃস্ব বলিয়া না দেওয়াতে তাহাকে ধমকাইয়াছিল। তিনি স্নান করিয়া গিয়া এ অত্যাচারের কথা তাঁহার প্রতিবাসী দ্বিতীয় মোক্তারকে বলিয়াছিলেন। তিনিও সে সময়ে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। এ ঘটনার স্থান কোর্ট হইতে কয়েক হস্ত ব্যবধান মাত্র। পেয়াদার এরূপ স্থানে এরূপ নির্ভয় ভাবে এ অত্যাচারের ব্যাপার শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। পদাতিক মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী। তখন পূর্ব্ববঙ্গের মোক্তারগণ দলে বলে উঠিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিয়া লিলেন,— "সকল পেয়াদাই এরূপ করিয়া থাকে। এ ঘটনার পর আর করিবে না। ইতিমধ্যেই ধর্ম্মাবতারের কার্য্যকলাপে পেয়াদারা মহাভয় পাইয়াছে।" আমি মোকদ্দমাটি ডিস্‌মিস্ করিয়া তখনই পেয়াদার প্রতিকূলে মুন্সেফের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য মোকদ্দমা স্থাপন করিলাম, এবং তাঁহার দুই মাস কাল শ্রীঘর-বাসের ব্যবস্থা করিলাম। বলা বাহুল্য তাহার পর আর পেয়াদা বেদখলের কি প্রজার প্রতি পেয়াদার অত্যাচারের মোকদ্দমা আমার আট বৎসর ফেণী অবস্থিতি কালে হয় নাই। তখন সমস্ত নোয়াখালি জেলার আমলা উকিল ত ঢাকা-জেলাবাসী ছিলেনই, পেয়াদারা পর্য্যন্ত সে অঞ্চলবাসী। এমন কঠিন ষড়যন্ত্র যে নোয়াখালি-জেলাবাসীরা পেয়াদার কার্য্য পর্য্যন্ত পাইত না। আগাগোড়া একদল, এবং সে কারণে পেয়াদাদের এরূপ অপ্রতিহত প্রতাপ ও অকথ্য অত্যাচার। আমি জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এ ষড়যন্ত্র উদ্ভেদ করি এবং তাহার ফলে আমার সময় হইতে নোয়াখালিবাসীর চাকরির আরম্ভ হয়।

(২) ঘর পোড়া নিবারণ।

ফেণীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎপাত ছিল—গৃহদাহ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চট্ট-গ্রামে এ গুরুতর অপরাধের প্রাবল্যের এবং তন্নিবারণের জন্য সর্ব্বত্র আমার নিয়োগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেখানে ইহার নাম—"বেনাকানন" (torch law)। যখন কাহারও সঙ্গে কাহারও শত্রুতা হইল, কি মোকদ্দমা হইয়া আইন কানন মতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়াই শেষ হইল, তখন এই "বেনাকাননের" দ্বারা পরাজিত পক্ষ প্রতি-হিংসার পরিতৃপ্তি করিত। অনেক স্থলে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের এরূপে সর্ব্বস্বান্ত করিত। আমি ফেণী আসিবার কিছুদিন পরে এক জন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন যে সপ্তাহ পূর্ব্বে ফেণী হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে পনর মাইল পথ তিনি কেবল গৃহদাহের আলোকে গিয়াছিলেন। কি ভয়ানক কথা! তাঁহার কথা অমূলক বোধ হইল না। সন্ধ্যার পর দীঘির পারে বসিয়া আমি সেই শীতের সময়ে চারিদিকে দিকদাহের মত অগ্নিকাণ্ড দেখিতাম। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম যে লোকে অগ্নিভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। অনেকে রাত্রিতে নিদ্রা যায় না। কেহ কেহ সমস্ত শীত গৃহের ছাউনি খুলিয়া রাখে। চট্টগ্রামে প্রত্যেকের বাড়ী একটী মাটির ঘর আছে। তাহাতে কোনও মতে যথাসাধ্য কথঞ্চিৎ সম্পত্তি অগ্নিদেবের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারে। এ অঞ্চলে মাটির ঘর একেবারে নাই। সমস্ত গৃহ পার্ব্বত্য বাঁশের বেড়ার এবং "শন" নামক এক প্রকার পার্ব্বত্য ঘাসের ছাউনির দ্বারা নির্ম্মিত। শনের দাহিকাশক্তি বারুদের মত বলিলেও হয়। একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গও তাহাতে বিক্ষিপ্ত হইলে এমন প্রবলবেগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে যে তাহা নির্ব্বাপণ করা

অসাধ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক গৃহস্থের সমস্ত ঘর, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একটী পাড়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। মোকদ্দমা করা নিষ্ফল, কারণ এ অপরাধ এত সহজে এবং গোপনে সম্পাদিত হইতে পারে যে কে আগুণ দিয়াছে তাহা প্রমাণ করা অসাধ্য। গৃহের বহুদূরে থাকিয়া তীরের দ্বারা অগ্নি নিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট। কিম্বা গভীর রাত্রিতে চালে আগুণ গুঁজিয়া দেওয়াও সহজ। অপরাধী অদৃশ্য হইবার বহুক্ষণ পরে আগুণ জ্বলিয়া উঠে। কিছু খরচান্ত করাইয়া যথাশাস্ত্র এক "সি" ফারম্ প্রেরণ করিয়া রিপোর্ট করে যে বহুমতে গুপ্ত অনুসন্ধানে কে পোড়াইয়াছে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। অথচ গৃহস্বামী বিলক্ষণ জানেন কে তাঁহার শত্রু, এবং তাঁহার এরূপে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। কিন্তু আয়নার ছবি, ধরিবার যো নাই। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির প্রতিকূলে বদ্মায়েসি মোকদ্দমা করিয়াও শমন করিবার উপায় নাই। কারণ আইন কর্ত্তা প্রভুর কার্য্যবিধির বদ্মায়েসির ধারা হইতে তাহার শেষ সংশোধনের সময়ে—সংশোধনই বটে!—Dangerous character (ভয়ানক চরিত্রের লোক) কথাগুলি বাদ দিয়া কেবল যাহারা হরণ ও অপহরণ অপরাধের জন্য সন্দিগ্ধ তাহাদের জন্যই এই অস্ত্রটি রাখিয়াছেন। ইহার ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে কতকগুলি বদ্মায়েস গৃহদাহ একটা ব্যবসা করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের শত্রু মিত্র নাই। ইহারা গ্রামে গিয়া বলে, আমাকে তোমরা চাঁদা করিয়া এত টাকা তুলিয়া দেও, না হয় তোমাদের বাড়ীঘর পুড়াইয়া দিব। যখন গৃহদাহ অপরাধ প্রমাণ করা অসাধ্য এবং নালিস করিলেও ফল হয় না, তখন এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য চাঁদা না দিয়া উপায়ান্তর নাই। প্রকাশ করিলে পাছে সে জন্য বাড়ী পুড়াইয়া দেয়, এজন্য প্রাণান্তে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া দূরে থাকুক কেহ প্রকাশ পর্য্যন্ত করিতে চাহে না।

একটা লোক দক্ষিণ অঞ্চলে এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল যে লোকে আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি শিবিরে থাকিবার সময়ে আমাকে গোপনে সংবাদ দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া ফেণী পাঠাইলে লোকের মনে সাহস ও ভরসা হইল, এবং পালে পালে বহুগ্রামের লোক সাক্ষ্য দিতে লাগিল। আমি তাহাকে ভয় প্রদর্শন ও অপহরণ (criminal intimidation and extortion) অপরাধের দুই অভিযোগে চারি বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদের আদেশ দিলাম। কিন্তু আপিলে জজ তাহাকে পরিষ্কার খালাস দিলেন,— এমনি ইংরেজ আমলের সুবিচারের গতি! তিনি বলিলেন, ইংরাজ রাজ্যে একটী লোক এরূপ ভাবে প্রকাশ্যে চাঁদা তোলে তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হায় রে আমার ইংরাজ রাজ্য ও তস্য ধর্ম্মাবতার! সে ফিরিয়া আসিয়া যাহারা তাহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিল একে একে তাহাদের বাড়ী পোড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এক বাড়ীতে তাহার জন্য আমি বাঘধরা কলের মত কল পাতিলাম। খালাস হইয়া সে এতদুর নির্ভয় হইয়াছিল যে সে পূর্ব্বে "নোটিশ" দিয়া বাড়ী পোড়াইতে আরম্ভ করিল। এক বাড়ীতে চারিদিকে গ্রামবাসী ও পুলিসকে গোপনে রাখিলাম। সে বেণা হস্তে আগুণ দিবার জন্য যখন মই লাগাইয়া এই গৃহস্থের চালে উঠিয়াছে, কারণ চাল মাটি হইতে লাগাল পাওয়া যায় না, তখনই চারিদিক হইতে লোক আসিয়া "গাছে তুলে দিয়া বঁধু কেড়ে নিলে মই!" মই সরাইয়া দীর্ঘ বাঁশের দ্বারা তাহা কে এরূপ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যে সে নামিতে না পারিয়া একে বারে ঘরের তুলিতে (শীর্ষভাগে) গিয়া আশ্রয় লইল। এ অবস্থায় পুলিস তাহাকে গেরেপ্তার করিয়া একেবারে আমার কাছে ফেণীতে লইয়া আসিল। প্রহারে তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। আমি শিকারের

অপেক্ষায় ছিলাম। সে অপরাধ একরার করিল। আমি তাহাকে এবারে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়া সেই ধর্ম্মাবতারের কাছেই প্রেরণ করিলাম, এবং আমার রায়ে লিখিলাম যে এবার ইংরাজ রাজ্যে ইহার অত্যাচারের কাহিনী তিনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করিবেন। প্রমাণ এত পরিষ্কার যে বিশ্বাস না করিবার উপায় নাই। এবার তিনি সেই অবিশ্বাস-যোগ্য অপরাধের জন্ত তাহার পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন। আনন্দে সমস্ত সব্‌ডিভিসন নাচিয়া উঠিল; 'ঘর পোড়া'দের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

কিন্তু সকল "ঘর পোড়াকে" এরূপে ধরিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এই ভয়ের উপর আমি এই ভীষণ পাপ নিবারণের আর তুই উপায় উদ্ভাবন করিলাম। যে সকল নরপিশাচ শত্রুতা উদ্ধারের জন্ত এরূপ মহাপাপ করে তাহারা প্রায়ই পূর্ব্বে ধম্‌কাইয়া থাকে, কারণ কাহার দ্বারা গৃহদাহ হইল গৃহস্বামী না জানিলে প্রতিহিংসার পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্তি হয় না। যাহাতে সে শুনিতে পায় এজন্য প্রায়ই তাহার আত্মীয় কি প্রতিবেশীর কাছে বাহাদুরি করিয়া পাপীরা বলিয়া থাকে—"সে কেমন করিয়া চালের নীচে থাকে দেখিব।" যেখানে গৃহদাহ হইতে লাগিল, সেখানে আমি পুলিসকে এ ভয় প্রদর্শনের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট করিতে কঠিন আদেশ দিলাম। তাহার ফলে প্রায়ই এরূপ ভয় প্রদর্শনের রিপোর্ট গৃহদাহের রিপোর্টের সঙ্গে আসিতে লাগিল, এবং আমি ভয় প্রদর্শনের জন্ত "সামারি" মতে তিন তিন মাস শ্রীঘরের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। ইহার উপর আপিল নাই। 'অমৃত বাজারের' শিশির ও মতি দাদারা "সামারি" বিচারের যতই নিন্দা করুন, ইহা অনেক সময়ে দেশ রক্ষার অমোঘাস্ত্র। আর জিজ্ঞাসা করি ইহাই কি দেশের চির-প্রচলিত প্রথা নহে? পূর্ব্বে যে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে কি জমিদারে এ

সকল মোকদ্দমা বিচার করিত, তাহাতে কি একটা প্রকাণ্ড নথি প্রস্তুত হইত ? তাহাদের বিচার কার্য্যটা কি কেবল মুখে মুখে হইত না ? হায় ! তখন গ্রামে কত সুখ শান্তি ছিল। লোক তখন মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ঘোরতর অধর্ম্ম বলিয়া জানিত। দেশের সেই অসভ্য অবস্থা, আর আজ এই মোকদ্দমা-দগ্ধ সভ্য অবস্থা !

যাহারা এত সাবধান যে এরূপ ভয় প্রদর্শনও না করিয়া গোপনে নিজে বা ব্যবসায়ী "ঘর পোড়া"র দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আইন-বহির্ভূত উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'নামজাদা' চোর ও জীবিকা-শূন্য লোক। অতএব বদ্‌মায়েস বলিয়া তাহাদের এক বৎসরের জন্য সচ্চরিত্রের জামিন মোচলকা তলব করিয়া শ্রীঘর-বাস ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে বরং ফল আরও বিষম হয়। এই শীতের সময়ে ঘর পোড়াইতেছে, কি চুরি করিতেছে বলিয়া যদি তাহাদের কয়েদ করিলাম, তাহারা পরের শীতে খালাস হইয়া আসিয়া, যাহারা সাক্ষী দিয়াছে, তাহাদের বাড়ী ঘর অগ্নিদেবকে উপহার দিবে। তখন তাহাদের আবার বদ্‌মায়েস বলিয়া আইনমতে কয়েদ করা যায় না। আইন কর্ত্তা প্রভুদের মত এই যে এক বৎসর কয়েদ খাটিয়া তাহারা যে সংশোধিত হইয়া আসিল, তাহার পরীক্ষার জন্য তাহাদের কিছু সময় দেওয়া উচিত। ও হরি ! জেলে গিয়া কি কেহ কখনও সংশোধিত হয় ? বরং তাহার বিপরীত হয়। চোর বদ্‌মায়েসের সঙ্গে মিশিয়া, ও সমভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিয়া ভাল মানুষও পাকা বদ্‌মায়েস হইয়া আসে। এ সকল কারণে আমি বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমার উপর বড় নারাজ। আমি এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব্‌ডিভিসনে কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু মাদারিপুরের মত এমন ডাকাতের স্থানে, বেহারের মত এমন চোরের স্থানেও আমি বদ্‌মায়েসি

মোকদ্দমা করি নাই। দেশের অবস্থানভিজ্ঞ কোন কোন শ্বেতাঙ্গ প্রভুর শাসনের কয়েকটি (axiom) সূত্র আছে। শতকরা শাস্তি বেশী হইলে, বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমা বেশী হইলে, পশুর উপযোগী বেত্রাঘাত বেশী হইলে শাসনকার্য্য ভাল হইল, এবং যে কর্ম্মচারী বিবেককে ও মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন করিয়া এ সকল সূত্র পালন করিল, তাহার উন্নতির পথ সমুজ্জ্বল, এবং সে ঐ প্রভুর কাছে একজন দক্ষ কর্ম্মচারী। ছোকরা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এ সকল ধূয়ার ক্রীতদাস। কিন্তু আমাকে বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমা মোটেই করি নাই বলিয়া এই সূত্রভঙ্গ অপরাধের জন্য নিতান্ত পেড়াপিড়ি না করিলে, আমি এ পথের পথিক হই নাই। এ সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্র প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। পুলিসে যে বদ্‌মায়েসের রেজেষ্টারী আছে, তাহাতে প্রকৃত বদ্‌মায়েস ছাড়া আর সকলেরই নাম আছে। উহাই আমাদের অকর্ম্মণ্য পুলিসের ও শাসন-জ্ঞানশূন্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের সম্বল। কোথায়ও চুরি হইল, ঘর পোড়া গেল, সে অঞ্চলের যে সকল লোকের নাম এই মহামূল্য রেজেষ্টারীতে আছে, তাহাদের লইয়া কিছু দিন টানাটানি করিয়া কিছু দক্ষিণা আদায় করিলেই পুলিস-তদন্ত শেষ হইল। তদ্ভিন্ন মাসিক ও ত্রৈমাসিক তাহার চরিত্র তদন্ত বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুলিসের বাঁধা ফিস্ ত আছেই। আমি এই অপূর্ব্ব রেজেষ্টারীর আশে পাশে ত কখন যাই না। আমি নিজে সব্‌ডিভিসনে শিবিরে ভ্রমণ সময়ে লোকের কাছে তদন্ত করিয়া সকল প্রকারের বদ্‌মায়েস সম্প্রদায়ের একটী তালিকা (Black book) প্রস্তুত করি। এরূপ 'কৃষ্ণ কাব্যের' সাহায্যে মাদারিপুরে আমি নদী-ডাকাতের দলকে দল ধরিয়াছিলাম। এখানেও ঘর পোড়া ও অন্য বদ্‌মায়েসদের এরূপ এক তালিকা প্রস্তুত করিলাম। যে দিকে পরিভ্রমণে যাইতাম সে দিকের দলকে দল ধরিতাম। গ্রামের লোককে শিখাইয়া দিতাম যেন তাহাদের চরিত্র ভাল

বলিয়া আমার কাছে প্রথমবার বলে। তাহারা সেরূপ বলিলে বদ্‌মায়েস-দের এক 'লেক্‌চার' দিতাম—"দেখিতেছিস্! তোরা এ বেচারিদের বাড়ী ঘর পোড়াইয়া, চুরি করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছিস, আর ইহারা তোদের বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছে। অতএব এবার তোদের ছাড়িয়া দিলাম। আমি আবার ছয় মাস পরে আসিয়া যদি তোদের বদ্‌মায়েসির কথা গোপনেও কাহারও মুখে শুনি, তবে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করিব।" ইহার আশ্চর্য্য ফল হইত। ছয় মাস পরে গেলে গ্রামবাসীরা বলিত যে বাস্তবিক এ বদ্‌মায়েসদের ইতিমধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাদের আবার ধরিয়া আনিলে তাহারা গ্রামবাসীদের পায়ের উপর পড়িয়া বলিত—"দাদা! তোরা বল, আমরা এখন ভাল হইয়াছি কি না, চাষবাস করিয়া ও মুজুরি করিয়া খাইতেছি কি না।" লোকেরাও তাই বলিত। আমি আবার তাহাদের সেরূপ "লেক্‌চার" দিয়া ছাড়িয়া দিতাম।

তাহা ছাড়া যাহারা ঘোরতর দুষ্ট লোক, তাহাদের নামে নামমাত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া পুলিসে তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট পাঠাইতাম। কিন্তু গোপনে পুলিসকে বলিয়া দিতাম যে দুই চারি দিন পরে পরে বরাবর যেন হঠাৎ তাহাদের বাড়ীর উপর পড়িয়া একটা তোলপাড় করে; অথচ তাহাদের যেন পলায়নের পথ রাখিয়া পলায়ন করিতে দেয়। বাঘে খাওয়ার চাইতে, খাইবে—সে ভয় বেশী। এ বদ্‌মায়েসেরা এরূপে বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হইয়া খাইতে শুইতে পারিত না। এরূপে ভয়ে ভয়ে কিছু দিন কাটাইয়া, শেষে পুলিসের রিপোর্ট আসিত যে তাহারা পলায়ন করিয়া আকায়াব রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছে। আমিও তখন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া ফেলিতাম। সেখানে দুই তিন বৎসর থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইহারা

বেশ ভাল অবস্থাপন্ন হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিত। তাহার পরে আমি সে অঞ্চলে গেলে তাহারা আপনা হইতে আসিয়া আমাকে তাহাদের বিদেশ অবস্থিতির ও অর্থোপার্জ্জনের ইতিহাস বলিত, ও কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। গ্রামের লোকেরাও তাহাদের সুখশান্তির জন্য ও ইহাদের এরূপে উদ্ধারের জন্য কত ধন্যবাদ দিত। আমি সূত্রধারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের জিজ্ঞাসা করি এ শাসন কি ভাল নহে? বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার করিয়া এই হতভাগ্যদের জেলে দিলে কি ফল হইত? ইহারা আরও কঠিন বদ্‌মায়েস হইয়া ফিরিয়া আসিত, এবং দেশের পক্ষে আরও ঘোরতর অশান্তির বিষয় হইত।

---

(৩) পঞ্চায়েত দ্বারা তদন্ত প্রণালী।

গুরুতর অপরাধ নিবারণ সম্বন্ধে এ সকল উপায় অবলম্বন করিয়া, সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে পঞ্চায়েতের দ্বারা তদন্ত প্রথা পূর্ণ মাত্রায় এখানে প্রচলিত করিলাম। এই প্রথা অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প মাদারিপুরে করি, কিন্তু সেখানে চালাইবার সময় পাই নাই। বেহারেও পূর্ণ মাত্রায় চালাইতে পারি নাই, কারণ সেখানে পঞ্চায়েতগণ প্রায়ই নিরক্ষর। সেজন্য আমি বক্সি নিয়োজিত করাইয়া তাহাদের কার্য্য চালাইবার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম। কি সুন্দর ভাবে কার্য্য চলিতেছিল! কিন্তু কৃষ্ণ দেশীয় লোকের প্রচলিত কোনও প্রণালী ষোল আনা গ্রহণ করিলে শ্বেত শাসনকর্ত্তাদের সম্মান থাকে না। তাঁহারা বক্সির স্থলে "দফাদার" নামক দিল্লীর লাড্ডু সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক প্রায়ই ফেণীর পঞ্চায়েত মোটামুটি লেখা পড়া জানে। এখানে সামান্য জমীর, সমাজের

ও পারিবারিক বিবাদ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা আমি পঞ্চায়েতের কাছে রিপোর্টের জন্য পাঠাইতে লাগিলাম। হুকুমনামায় আদেশ থাকিত—(১) পঞ্চায়েতগণ মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবে। (২) তাহা না পারে তবে তাহার অবস্থা সমস্ত পঞ্চায়েত মিলিয়া রিপোর্ট করিবে। ইহার ফল এই হইল যে শতকরা ৭৫টি মোকদ্দমা গ্রামে আপোষ হইয়া যাইতে লাগিল। বাকি ২৫ সম্বন্ধে যাহা রিপোর্ট আসিত, আমি কোর্টে একটু পীড়াপীড়ি করিলে তাহারও অনেক মিটিয়া যাইত। অবশিষ্ট শতকরা দশ পনরটা যাহা বিচারে আসিত, তাহাতেও প্রায় পঞ্চায়েতের রিপোর্ট সত্য প্রমাণিত হইত। সহজে বুঝা যাইতে পারে যে মোক্তার ও উকিলগণ এই প্রণালীর ঘোরতর বিপক্ষ হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র এ প্রথার প্রতিকূলে দোহাই কুটেন, কারণ এত মোকদ্দমা মফঃস্বলে মিটিয়া গেলে তাঁহাদের অন্ন মারা যায়। এখন 'প্রাইমারী' বা মহামারি শিক্ষার কল্যাণে সকল জাতির লোক লেখা পড়া শিখে। উদ্দেশ্য পেয়াদাগিরি, কি "কনেষ্টবুলি"। তাহাও অধিকাংশের জোটে না। ইহারা হয় "টন্নি"। দেশ টন্নিতে মোক্তারে ছাইয়া গিয়াছে। গ্রামে দুটি লোকের মধ্যে একটুক সামান্য বিবাদ হইলে দুই পক্ষেই অমনি ছার-পোকার মত 'টন্নি' বা মোক্তার জুটিল, এবং নানা মিথ্যা প্রলোভনে উত্তেজিত করিয়া দুই পক্ষের দ্বারাই অতিরঞ্জিত মিথ্যা মোকদ্দমা উপ-স্থিত করিল। মোকদ্দমা উপস্থিত করিতেই যখন পক্ষরা দেখিল যে প্রত্যেকের পাঁচ সাত টাকা ব্যয় হইল, এবং তাহাদের বলিদানের পাঁঠার অবস্থা হইল, তখন গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে তাহাদের মাথা কতক শীতল হইল। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েতেরা উভয়কে দুকথা বুঝাইয়া বলিলে তাহারা সহজেই বিবাদ মিটাইয়া ফেলে।

এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব। একবার আমি জলপথে নোয়াখালি

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভায় যাইতেছি, এক স্থানে খালের ধারে বহুত লোক সমবেত। আমার নৌকা নিকট হইলে তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! লাল মিয়া মোক্তার হইয়া আসিয়াছে দুই মাসও হয় নাই। সে ইতিমধ্যে ছয়টি মোকদ্দমা এই দুই তিন গ্রাম হইতে দায়ের করাইয়াছে। সে আমাদের উৎসন্ন করিতেছে।" বিচিত্র কথা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা তাহার কথায় মোকদ্দমা করে কেন? তাহারা বলিল যে সে এরূপ প্রলোভন দেখায় যে লোক তাহাতে ভুলিয়া এবং তাহার কথামতে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া জেরবার হইতেছে। তাহারা আমার নৌকা আটকাইয়া আমার পায়ে পড়িয়া দোহাই দিতে লাগিল। তাহারা বলিল ইতিপূর্ব্বে তাহাদের গ্রাম হইতে কোনও মোকদ্দমা হয় নাই। লাল মিয়ার জালে ভবিষ্যতে না পড়িতে নিষেধ করিয়া আমি হাসিয়া চলিয়া গেলাম। ফেণী ফিরিয়া দেখিলাম সত্য সত্যই সে মোক্তার হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সেই স্থান হইতে ছয়টি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। আমি তাহাকে তাহার প্রতিকূলে গ্রামবাসীর নালিশের কথা বলিলে সে তোতলাইতে তোতলাইতে বলিল—"ধ—ধ—ধর্ম্মাবতার! তা—তা—রা—না—না—লিশ না—ক—ক—রিলে, আমি কি জো—জো—জোর করিয়া না—না—লিশ করাইতে পা—পা—রি?" আমি বলিলাম সে অন্য স্থানের কোর্টে গিয়া মোক্তারি করিতে চাহিলে আমি অনুমতি দিব, কিন্তু এখানে তাহার মোক্তারির বার্ষিক সার্টিফিকেট সে আর পাইবে না। তখন সে চাঁদপুর কোর্টে চলিয়া গেল। তাহার জন্য পরের বার নোয়াখালি যাইলে গ্রামবাসীরা আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

যাহা হউক মোক্তারগণ আমার এই পঞ্চায়েত দ্বারা তদন্তের প্রথার প্রতিকূলে সর্ব্বত্র মাথা কুটেন। তাঁহারা বলেন যে পঞ্চায়েতগণ

ঘুস লইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু এ কথাটা তাঁহাদের স্বার্থ প্রণোদিত কল্পনা মাত্র। ইংরাজ রাজ্যের কল্যাণে এখন প্রত্যেক গ্রামে দুই চারিটি দল, এবং এ সকল পঞ্চায়েতও দুই চারি দলের লোক। এরূপ পাঁচ জন হইতে একটা সম্মিলিত মিথ্যা রিপোর্ট সামান্য মারপিট মোকদ্দমায় আদায় করিতে কত টাকা ঘুসের আবশ্যক ? তদ্ভিন্ন কোনও পক্ষ পঞ্চায়েতের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হইয়া আপত্তি করিলে আমি সেই মোকদ্দমার তলব দিয়া নিজে তদন্ত করি, এবং বিচার করি। এ কথা পঞ্চায়েতও জানে, পক্ষরাও জানে। কোনও পঞ্চায়েতদের রিপোর্ট মিথ্যা হইলে যে তাহাদের লইয়া টানাটানি করি, তাহাও তাহারা জানে। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েত মিথ্যা রিপোর্ট দিতে সাহস করিবে কেন ? পক্ষরা যখন জানে পঞ্চায়েত রিপোর্ট অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে না, আপত্তি করিলেই কোর্ট আবার মোকদ্দমা তদন্ত করিবে, তখন পঞ্চায়েতকে ঘুসই বা দিবে কেন ? এরূপ বিপক্ষ দলের পাঁচ জন লোক মিলিয়া মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়াও অসম্ভব। ফলতঃ আমি যে পঞ্চায়েতের কাছে মোকদ্দমা পাঠাই, তাহা কেবল আপোষ করাইয়া দিবার জন্য। তাহাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আমি কোনও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করি না। যেখানে পঞ্চায়েতদের এক সম্মিলিত রিপোর্ট না আসিয়া, দুই তিন রিপোর্ট আসে, সেখানে ত আমি নিজে প্রমাণ তলব দিয়া তদন্ত করি। এরূপ অবস্থায় পঞ্চায়েতদের কোনওরূপ অন্যায় আচরণের সম্ভাবনা নাই। আমি দেখিয়াছি কিছু দিন এভাবে কার্য্য করিলে পরে মোক্তারগণ পঞ্চায়েতদের কাছে মোকদ্দমা তদন্তের জন্য পাঠাইতে নিজে প্রার্থনা করেন। ফেণীর মোক্তারেরা শেষে এই প্রথার ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহাদের প্রাপ্য কিছু কম হইয়াছিল, তথাপি দেশের পক্ষে এই

প্রথা প্রভৃত মঙ্গলদায়ক বলিয়া তাঁহারা ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন।

আমি আর একটী নিয়ম অবলম্বন করি বলিয়া তাঁহাদেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত পাইয়াই নানা কারণে বহু-পরিমাণ ডিস্‌মিস্‌ করেন। আমি দেখিয়াছি যে তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস এবং ইহাও একটী শাসনসূত্র যে এরূপ করিয়া দরখাস্ত ডিস্‌মিস্‌ করিলে, খুব ভারি হাতে শাস্তি দিলে, কার্য্যবিধি মতে বেশী মাত্রায় শান্তিরক্ষার জামিন মোচলকা ও সচ্চরিত্রের জামিন মোচলকা লইলে এবং জমী সম্বন্ধীয় বিবাদে দখলের মোকদ্দমা স্থাপন করিলে, অপরাধের সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং ভাল শাসন হয়। আমি দেখিয়াছি এই সকল নীতির বরং বিপরীত ফল হয়। দরখাস্ত পাইয়াই ডিস্‌মিস্‌ করিলে লোকের মনে বিশ্বাস হয় যে সামান্য মোকদ্দমা হাকিম লয় না তখন নিজেরা লাঠি গ্রহণ করে, এবং গুরুতর ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সামান্য অপরাধেও গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে গেলে মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। একটুক সামান্য বিবাদ হইলেও টন্নিরা বুঝাইয়া দেয় যে নালিশ যে একটা করিলেই ক্ষতিপূরণ পাইবে ও অপর পক্ষের শাস্তি হইবে। একটা উদাহরণ দিব। বলিয়াছি আমার বন্ধু চন্দ্রকুমার নোয়াখালির মুন্সেফ। তিনি পূজার বন্ধের পরে চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ফেণী নদীর ঘাট পার হইয়া তিনি প্রভাত সময়ে বেড়াইতে বেড়াইতে পদব্রজে ফেণী আসিতেছেন। একটী মুসলমানের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইল। সেও ফেণী আসিতেছে। তিনি তাহার কাছে আমার কার্য্যের সংবাদ লইতে লাগিলেন। সে স্থানীয় উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিল এবং বলিল আমি এমন সুন্দর সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়াছি যে, মানুষে কখনও কল্পনা করিতে পারে

নাই। বিচার কার্য্য সম্বন্ধে সে বলিল যে বড় সুবিধা নহে, আমার বড় দয়া, আমি শাস্তি বড় কম দিয়া থাকি, সে জন্য লোকে খরচ করিয়া মোকদ্দমা করিতে চাহে না। কেবল এ কারণে আমার বদনাম হইতেছে। সে চন্দ্রকুমারকে চেনে না। চন্দ্রকুমার বলিলেন—"তুমি বুঝি টন্নি।" উত্তর—"আজ্ঞা হাঁ"। সে তাহার পর বলিল—"টন্নিরা তাঁহার ভয়ে ফেণীতে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। টন্নি না হইলে লোকেরা মামলা মোকদ্দমা চালাইবে কিরূপে ? কাযে কাযে মোকদ্দমা একেবারে কমিয়া যাইতেছে।" চন্দ্রকুমার তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় হাসিলেন। ফেণী-নগরের সীমায় আসিয়া সে তাঁহাকে সেলাম করিয়া এক বৃক্ষতলায় দাঁড়াইল। সেই বৃক্ষতলা টন্নিদের দপ্তর। আরও দুই একটি লোক সেখানে শিকার অন্বেষণে বসিয়া আছে। সে আর আসিবে না বুঝিয়া আমার আবাসগৃহ ফেণীর কোন্ স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছি বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে সে দীঘির উত্তর পারে গোল বারেণ্ডা ও বাগান বেষ্টিত বাড়ীর কথা বলিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি তাঁহার বাসায় যাইছেন ?" উত্তর শুনিয়া সে তাঁহার পায়ের উপর পড়িল এবং বলিল—"দোহাই আপনার ! এ সকল কথা তাঁহার কাছে বলিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি নিজে তাঁহার বিচারের দোষ দিই না। তিনি একজন বড় ভাল বিচারক। এমন হাকিম ফেনী আসে নাই।" চন্দ্রকুমার হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে তিনি একথা আমার কাছে বলিলেও আমার তাহাকে চিনিবার ত কোনও সম্ভাবনা নাই। সে বলিল—"হুজুর ! না ! তাঁহার কোনও দৈব শক্তি আছে। যাহা কেহ ধরিতে পারে না, তিনি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলেন। আপনি এ কথা মুখের বাহির না করিতেই তিনি আমাকে ধরিয়া ফেলিবেন।" চন্দ্রকুমার আমার বাসায় পৌঁছিয়া হাসিতে হাসিতে এ গল্প করিলেন।

আমি তাহার চেহারা সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাস্তবিকই তথনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম—সে লোকটি টন্নির শিরোমণি। তাহার উৎপীড়নে মোক্তারগণ ও মক্কেলেরা অস্থির। সে কত লোককে ঠকাইয়াছে। আমি কিছু দিন হইতে তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় আছি, কিন্তু লোকটি এমন চতুর, কিছুতেই তাহাকে পাকড়াও করিবার সুযোগ পাইতেছি না। ইহার অল্প দিন পরে একটি স্ত্রীলোক হইতে সে তাহার গহনা বিক্রয় করাইয়া এক দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য ঠকাইয়া টাকা আনিয়া কিছুই করে নাই বলিয়া একজন উকিল আমাকে গল্পচ্ছলে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিলে, কেবল সে স্ত্রীলোক নহে, আরও এক রাশি নালিশ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল। তাহাকে পূর্ব্বোক্তটীর বিচারে ২ বৎসরের কারাবাসের আদেশ দিয়া অন্য অভিযোগ সকল বিচারাধীন রাখিলাম। বলা বাহুল্য ইহার পর টন্নিদের ফেণীর সীমান্ত বট-তলার দপ্তরও বন্ধ হইল।

দরখাস্ত প্রাপ্তিমাত্র অধিক সংখ্যায় ডিস্মিস্ না করিলে, নালিশ করিলেই একটা কিনারা হইবে বলিয়া বিশ্বাস নিবন্ধন সামান্য বিবাদও লোকেরা কোর্টে উপস্থিত করে এবং এ কারণ মোক্তারদের বড় বেশী ক্ষতি হয় না। কোনও রূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবারও প্রয়োজন হয় না। অতএব গুরুতর অপরাধের সংখ্যা কমিয়া যায়। সচ্চরিত্রের জামিন মোচলকার যে কিছু ফল হয় না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শান্তি রক্ষার জন্য জামিন. মোচলকার ও ভূমি দখলের মোকদ্দমার প্রশ্রয় দিলে, এমন কি ভূমি সম্পর্কীয় বিবাদের মোকদ্দমা অবাধে গ্রহণ করিলে, বরং ঘোরতর শান্তিভঙ্গই ঘটিয়া থাকে, এবং গুরুতর অপরাধের মোকদ্দমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। লোকে মনে করে জমীতে ধান চাষ করিতে গেলে বিপক্ষ যদি কিছু গোলযোগ করে তথনই একটা মারপিটের, কি নিতান্ত

শান্তিভঙ্গের জামিন মোচলকার, কি দখলের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ফৌজদারী কোর্টের দ্বারা জমীটা সহজে দখল পাইবে। কারণ দেওয়ানী মোকদ্দমা বহুব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। ফৌজদারী মোকদ্দমা বৃদ্ধির ও হাঙ্গামা খুনের ইহাই একটি বিশেষ কারণ। এরূপ অবস্থায় প্রতিপক্ষ ছুটিয়া আসিয়া সামান্য মারপিট না করিয়া হয়ত সেই চাষের সময়ে হাল-চালকের, কি তাহার পৃষ্ঠ-পোষকের মাথায় এক লাঠি প্রহার করিল, আর সেখানেই একটা খুন হইল। অন্যথা উভয় পক্ষ মারামারি আরম্ভ করিল, দুই দিক হইতে আরও লোক যোগ দিল, এবং কোনও পক্ষে পাঁচজনের বেশী হইলেই একটা হাঙ্গামা মোকদ্দমা উপস্থিত হইল এবং পুলিসের একটা শিকার জুটিল। ভূমি সম্বন্ধীয় বিরোধ পাইলেই পুলিসের পোয়া বার। কারণ এরূপ মোকদ্দমায়ই উৎকোচটা অতিরিক্ত মাত্রায় আদায় করা যায়। এজন্য শাস্ত্রানুসারে পাঁচজন কোনও পক্ষে না থাকিলেও পুলিসে নিজে দুই এক জনের নাম যোগ করিয়া দিয়া একটা হাঙ্গামার এজেহার গ্রহণ করে, এবং একটা খণ্ড প্রলয় আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য দণ্ডবিধি মতে পাঁচ জন না হইলে পুলিস গ্রহণীয় হাঙ্গামা (rioting) মোকদ্দমা হয় না। একটা মারপিটেও পাঁচ জন আসামী হইলেই একটা শাস্ত্রসঙ্গত হাঙ্গামার মোকদ্দমা হইল। অথচ এরূপ শত শত মোকদ্দমা কোর্টে উপস্থিত হইয়া মারপিট বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পুলিসের হাতে পড়িলেই এই তিল গিয়া তাল হয়। অতএব আমি এরূপ মোকদ্দমা পূর্ব্বে পুলিসকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতাম, কিন্তু ইদানীং পুলিসের প্রতি এরূপ কোনও আদেশ প্রচার করা আমাদের পক্ষে পুলিসের কর্ত্তারা ‘হারাম’ বলিয়া ‘গোলাকার’ (Circular) আদেশ প্রচার করিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে পুলিসের গোলাকার জিনিসটা প্রাপ্তির পক্ষে ঘোরতর অন্তরায় উপস্থিত হয়। তা কর্ত্তাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া

আমি অন্য উপায়ে উহার 'নির্ব্বাণ' ঘটাইয়া থাকি। যে পুলিস এরূপ মারপিটের মোকদ্দমা হাঙ্গামা সাজাইয়া গ্রহণ করে, আমি কোর্টে তাহাকে বাঁনর সাজাইয়া থাকি। দুই এক মোকদ্দমায় এরূপ দুর্গতি ভোগ করিলে পুলিস আর এ পথের পথিক হয় না। আমি যেখানে গিয়াছি সেখানে যে পুলিসের মোকদ্দমা কমিয়াছে, তাহার ইহাই একটি প্রধান কারণ। এ সকল মোকদ্দমাই পুলিসের কার্য্য। অন্যথা চুরি ডাকাতি ও গৃহদাহ ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ কিনারা করা বর্ত্তমান পুলিস অনেকে তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না। কারণ একদিকে তাহাতে কিছুই দক্ষিণা পাওয়া যায় না, অন্য দিকে উহাদের 'আস্কারা' (প্রমাণ) করিতে যে বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রম আবশ্যক ছোট কি বড় দারোগা সাহেবদের পঞ্চক্রোশের মধ্যেও অনেকের তাহা নাই। শান্তি-রক্ষার ও দখলের মোকদ্দমা এ সকল কারণে আমি প্রশ্রয় দিই না বলিয়া আমার কাছে প্রায় উপস্থিত হয় না। যাহা হয় তাহাও আমি পঞ্চায়েতদের কাছে রিপোর্টের জন্য পাঠাইয়া দিয়া থাকি; এবং উহা সেখানেই প্রায় আপোষ হইয়া যায়।

সবডিভিসনের পর সবডিভিসন শাসনে আমার এ সকল নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। ফেণীতে তাহা পূর্ণ মাত্রায় অবলম্বন করাতে মোকদ্দমার সংখ্যা এরূপ কমিয়া গেল যে আমার কি পুলিসের কিছুই কার্য্য রহিল না। আমি যেখানে গিয়াছি সেখানের পুলিসের আমার উর্দ্দু পরীক্ষার প্রশ্নের লিখিত সেই "ফাকা দরফাকা" (উপবাসের উপর উপবাসের) অবস্থা ঘটে। এখানে তাঁহাদের একেবারে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। কিছু দিন খাটিয়া পূর্ব্বের জঞ্জাল পরিষ্কার করিলে এবং আমার শাসন প্রণালী পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত করিয়া তুলিলে আমার এক কি দুই ঘণ্টার বেশী কায রহিল না। অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার

আমাকে বাহবা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মানিনী ম্যাজিষ্ট্রেটের সন্দেহ হইল যে আমি অপরাধ গোপন করিতেছি। অন্যথা একটা সবডিভিসন এরূপ শান্তিপূর্ণ ও গুরুতর অপরাধ শূন্য হইতে পারে না। আমার কাছে এক কৈফিয়ৎ তলব হইল। তাহার একটা ভিন্দিপাল গোছের উত্তর পাইয়া সেই স্ফীতোদর পুলিস সাহেবকে আর একবার গোপন অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার শ্রম এবারও পণ্ড হইল। শ্রীমতী কালাচাঁদ ডেপুটীকে কোনও মতে ধরিতে পারিলেন না।

"রৈবতক কাব্য।"

"Out of evil cometh good."—

শ্রীভগবানের লীলা দুর্জ্ঞেয়। তিনি আমাদের ঘোরতর অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও আমাদের মঙ্গল বিধান করেন। আমি ঘোরতর বিপন্ন হইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র বদলি না হইলে আমার সেই যৌবন-সুলভ-বিলাস-বাসনা-পূর্ণ-হৃদয়ে ভক্তির পবিত্র ছায়া পতিত হইত না; আমার হৃদয়ে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইত না, আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না। শ্রীক্ষেত্রে যাইতে যাইতে সেই সকল অতুলনীয় মন্দির মালা স্থানে স্থানে দেখিয়া সর্ব্বশেষ শ্রীমন্দিরের চূড়া সুদূর আকাশ-পটে দর্শন করিয়া, পন্থাবাহী যাত্রীদের ও আমাদের পাল্কী-বাহকদের "জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!" ধ্বনি শুনিয়া, ও সভক্তি আনন্দাশ্রু দেখিয়া, আমরাও পতিপত্নী অশ্রুপাত করিলাম। আমার হৃদয় কি এক অজ্ঞাত ভক্তির ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল। তাহার পর জগদ্‌-বিস্ময়কর শ্রীমন্দির ও ভারতপূজিত বিগ্রহত্রয় দর্শন করিয়া আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমি শ্রীক্ষেত্রে কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবা মাত্র শ্রীমন্দিরের ভার প্রাপ্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে এই ভার ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আপনার হস্তে রাখিতেন। উৎসবের পর উৎসব ও অসংখ্য যাত্রীর ভক্তি-গঙ্গা-প্রবাহ দেখিয়া বিশেষতঃ শ্রীরথযাত্রার সময়ে আমি বালকের মত কাঁদিয়াছিলাম। কিরূপে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী আমার বক্ষের উপর পড়িয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া, তাহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে বলে, সমস্ত যাত্রীর দর্শন বন্ধ করিয়া আমি কিরূপে তাহাকে শ্রীমন্দিরের

মধ্যে লইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাই, এবং কিরূপে তাহার আত্মীয়-গণকে পুলিসের দ্বারা অন্বেষণ করিয়া আনিয়া তাহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে চলিয়া গেলে, দর্শন মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারস্থ সোপান-পার্শ্বে কৃত্রিম সিংহে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া আমি ভাবিলাম যে যদি একটি যুবতী কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য ভক্তিতে এরূপ আত্মহারা হইয়া একজন অজ্ঞাত পুরুষের বক্ষে এরূপ পড়িতে পারে, তবে এরূপ রমণীরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাঁহাকে লইয়া যে ব্রজলীলা করিবে, রাস-রাত্রিতে আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞান-হীনা হইয়া তাঁহাকে যে শ্রীভগবান্‌জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। উৎসবে উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তির প্রবাহে আমার পাষাণ হৃদয়ও কৃষ্ণভক্তিতে আর্দ্র হইল। সেই সময়ে আমি ভাগবতের একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতাম এবংউদ্বে-লিত হৃদয়ে একাকী নির্জ্জন সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া সমুদ্রের লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে আমি কৃষ্ণলীলার লহরী ধ্যান করিতাম। এ উদ্বেলিত হৃদয়ে আমি শ্রীক্ষেত্র হইতে মাদারিপুর, মাদারিপুর হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বেহার সবডিভিসনে স্থানান্তরিত হইয়া যাই। বেহার বুদ্ধদেবের আদি লীলাভূমি। তাঁহার বিহার স্থলবলিয়াই ইহার নাম 'বিহার' বা বেহার। বেহার নগরের প্রান্তস্থিত শৈলশিখরে এখনও একটী বৌদ্ধ মন্দির এবং শৈল অঙ্কে যে বেদিতে বসিয়া শ্রীবুদ্ধদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। এ সকল বেদির নামই 'বিহার'। মন্দিরটী বলা বাহুল্য এখন মসজিদে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত 'গিরিব্রজপুরের' ও বৌদ্ধ

গ্রন্থোক্ত 'রাজগৃহের' বর্ত্তমান নাম 'রাজগির'। রাজগির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ উভয়েরই ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র, এবং উভয় লীলার স্মৃতি তাহার অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। গিরিব্রজপুর মহাভারতের বিখ্যাত মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী। মহাভারতোক্ত পঞ্চগিরি বেষ্টিত গিরিব্রজপুরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। সেই পঞ্চ শৈলগিরি এখনও সেই প্রাচীন নামে অভিহিত। যে স্থানে গিরি-মূলবাহী পঞ্চানন নদ পার হইয়া অর্জ্জুন ও ভীম সমভিব্যহারে শ্রীকৃষ্ণ সেই শৈলদুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ পাদস্পর্শে পবিত্রিত স্থানে এখনও একটী মেলা হইয়া থাকে, এবং এখানে প্রতিবৎসর বহু যাত্রী পঞ্চানন নদে অবগাহন করিয়া সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী প্রদান করে। জরাসন্ধের যে মল্লভূমিতে তাহাকে ভীম কর্ত্তৃক হত করিয়া শ্রীভগবান্ জরাসন্ধের সেই রোমহর্ষণ রাজমেধ-যজ্ঞ নিবারণ করিয়া কিঞ্চিন্ন্যূন শত নরপতিকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন, সেই মল্লভূমি মসৃণ মৃত্তিকা বন্ধুর উপলখণ্ডের বক্ষে এখনও বর্ত্তমান। এই শৈল পরিখা বেষ্টিত ভীষণ দুর্গের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ইতিহাসের 'রাজগৃহের' ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকা স্তূপ স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেব নিরঞ্জনাতীরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আসিয়া রাজগৃহের সেই শৈল কক্ষে ধ্যানস্থ থাকিতেন, এবং তাঁহার তিরোধানের পর যে কক্ষে তাঁহার সার্দ্ধ দুই শত শিষ্য সম্মিলিত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের আদি গ্রন্থসকল প্রণয়ন করেন, সেই কক্ষও এখন শোচনীয় অবস্থায় বিদ্যমান। তাহার বর্ত্তমান নাম "সোনভাণ্ডার"। ইউরোপের কোন স্থান হইলে আজ এই দুই কক্ষ, এই ঐতিহাসিক নিদর্শন সকল, কি মহিমার সহিত রক্ষিত হইত! এতদ্ভিন্ন বেহারে এমন গ্রাম নাই যাহাতে ভগ্ন বৌদ্ধ মন্দিরের একটি স্তূপ, এবং তৎস্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির

ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয় না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ ব্রডলি (Broadley) এই সকল দেখিয়া বহুবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং যাইবার সময়ে উহা বেহারের স্কুল লাইব্রেরিতে দান করিয়াছিলেন। আমি এই সকল গ্রন্থ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলাম এবং রাজগিরে প্রথমবার শিবিরবাসকালে মহাভারতের মূল উপাখ্যানভাগ আর একবার পাঠ করিলাম। এতদিন ইংরাজের শিষ্যত্বের কল্যাণে আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে মহাভারত খানি একটি অদ্ভুত গল্প মাত্র। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ কেহ ছিলেন না। থাকিলেও তিনি একজন কূটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিক ছিলেন মাত্র। "বঙ্গদর্শন" একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বিসমার্ক (Bismark); অর্জ্জুনের রথে বসিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শীতকালে রাজগিরে শিবিরে বসিয়া মহাভারত পড়িতে পড়িতে আমার প্রথম ধারণা হইল যে মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য (stupendous epic) নহে, উহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য। উহা মহাকাব্য হইলেও উহার প্রত্যেক শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে ইতিহাস প্রবাহিত। সেই প্রাচীন গিরিব্রজপুর কল্পনার সৃষ্টি নহে, উহা মগধরাজ্যের ঐতিহাসিক রাজধানী। তাহার অস্থি পঞ্জর সকলই আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাভারতে তাহার যে ভৌগলিক নির্দ্দেশ (Geography) আছে, তাহা এখনও বর্ত্তমান। তাহার বহির্ভাগে সেই বৌদ্ধ-ইতিহাসের রাজগৃহের ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপরাশি ও গিরিগুম্ফা এখনও তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস নীরবে দর্শকের নয়নে উদ্ঘাটিত করিতেছে। তখন দুটি মহামূর্ত্তি আমার হৃদয়ে আকাশে পূর্ণিমাসন্ধ্যার পূর্ণচন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ। বুঝিলাম অন্তর্‌বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে

খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই নাম **মহাভারত**। বুঝিলাম মহাভারত ভরতবংশের ইতিহাস নহে, মহাভারত মহা ভারত-সাম্রাজ্য (the great Indian Empire.)। এই সাম্রাজ্যের নাম 'ধর্ম্মরাজ্য' ; ইহার সম্রাটের নাম 'ধর্ম্মরাজ' ; যে মহাক্ষেত্রে ইহা স্থাপিত হয়, তাহার নাম "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র"। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীতোক্ত অনাসক্ত বা নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই জন্য ইহার নাম ধর্ম্মরাজ্য। বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্যই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য। বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না। বুঝিলাম তিনি এবং তাঁহার শ্রীমুখের গীতোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে সেই মহা-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। চতুর্ব্বর্ণ, 'গুণকর্ম্মবিভাগ' মূলক না হইয়া, জন্মগত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রাধান্যে ভারত আবার জীবঘাতী যাগ যজ্ঞের জীব-রক্তে প্লাবিত হইতেছিল। তখন—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধে রহহ শ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া তাঁহার বিষাণ নিনাদে বর্ণভেদ উড়াইয়া দিয়া যে মহাসাম্যবাদ ও কর্ম্মবাদ প্রচার করেন, তাহা সহস্র বৎসর ভারত প্লাবিত করে। এখনও তাহা অর্দ্ধাধিক মানবের ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতবর্ষের রূপান্তরিত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—আজ শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা। বঙ্গের বরপুত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কৃপায় এখন কাহারও জানিবার বাকী নাই যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পূজার

জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা যে তিন মণ্ডল কল্পনা করিয়াছিলেন, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা এই তিন মণ্ডলেরই আকৃতি মাত্র। সুভদ্রার বিবাহ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র অর্জ্জুনকে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের প্রধান অস্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া, হিন্দু শাস্ত্রকার শ্রীবুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতারে ও শ্রীক্ষেত্রকে বিষ্ণুক্ষেত্রে পরিণত করিবার সময়ে উক্ত তিন মণ্ডলাকৃতিকে এই তিন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের মধ্যস্থলে যেমন সঙ্ঘ অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণ বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, তেমন শ্রীকৃষ্ণ ও বলের অবতার অর্জ্জুনের মধ্যে সুভদ্রা। বুঝিলাম অতিমানুষিক শক্তিবলে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গে ধর্ম্ম, রাজ্য, ও সমাজ সংস্কার করিয়া এবং তিনই নিষ্কামত্বের উপর স্থাপিত করিয়া এই মহাধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে অন্য সকলে অবতার, আর "কৃষ্ণ স্তু ভগবান্ স্বয়ং"। অন্য সকলে অবতার,—কারণ তাঁহারা এক এক সংস্কার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্ব্বপ্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোনও অবতার বা ধর্ম্ম-প্রচারক করেন নাই। তাই তিনি পূর্ণ ভগবান্। আমি এই দুই মহামূর্ত্তি দেখিলাম, এবং ভক্তিতে অধীর হইয়া তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণত হইলাম। একদিকে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এবং অন্য দিকে 'অমিতাভ' অঙ্কুরিত হইল।

এই সময়ে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটি পত্রযুদ্ধ চলিতেছিল। যোদ্ধা একপক্ষে "পিগট হেষ্টি মিষ্টি কথার" রেভেরেণ্ড হেষ্টি, অন্য পক্ষে 'রাম শর্ম্মা' নামধারী বঙ্কিমচন্দ্র। আমি বঙ্কিম বাবুকে লিখিলাম যে একজন ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী খৃষ্টান মিশনারীর সঙ্গে এই নিষ্ফল পত্রযুদ্ধে তাঁহার মহামূল্য সময় নষ্ট না করিয়া, তিনি যদি

তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম্ম, গঙ্গোত্তরী বেদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, কিরূপে গঙ্গা সাগরে পরিণত হইয়াছে, তাহার একটি দার্শনিক ইতিহাস (philosophical history) লেখেন, তবে উহা তাঁহার প্রতিভার ও শক্তির একটি যুগান্তরকারী কার্য্য হইবে। খৃষ্টানদের ধর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'বাইবেল' দেখাইয়া দেন। মুসলমানদের ধর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'কোরাণ' দেখাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম কি,—তাহা যদি অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমাদের এমন কোনও গ্রন্থ নাই যে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি। আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষক অনন্ত, ধর্ম্ম-গ্রন্থও অনন্ত। এ কারণে আমরা আমাদের ধর্ম্মের কিছুই শিখিতে কি আপন সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারি না। লিখিয়াছিলাম যে, এই ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবুদ্ধের প্রাধান্য আসিবে, কারণ আমার ধারণা হইয়াছে যে তাঁহাদের আমরা চিনিতে পারি নাই। বঙ্কিম বাবু এ পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে আমি যে বৃহৎ কার্য্য (grand work) তাঁহার দ্বারা করাইতে চাই, উহা শেষ জীবনে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্যের জন্য যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। তাহার পর আমি সুহৃদ্‌বর প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লিখিলাম। তিনিও পারিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিলেন। কিন্তু আমি কেমন অস্থির ও আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে কি এক মহাভাব, মহা আকাঙ্ক্ষা, ও মহা আবেগ সঞ্চারিত হইয়া আমাকে পাগলের মত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার আহারে, বিহারে, আফিসের কার্য্যে কিছুতেই মন যাইতেছিল না। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। আসনে, শয্যায়, বিচারালয়ে, অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণে, সকল সময়ে এই দুই মহামূর্ত্তি ও তাঁহাদের অমানুষিক লীলা আমার হৃদয়ে জাগিতে

ও নয়নাগ্রে ভাসিতে লাগিল। আমি এই আত্মহারা ভাবে কি এক অচিন্তনীয় আবেগের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিন খানি কাব্যের প্রস্তাবনা লিখিলাম—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'। রৈবতকের প্রথম তিন সর্গ লিখিয়া বঙ্কিম বাবুর কাছে উপরোক্ত ব্যাকুলভাব উল্লেখ করিয়া সকল কথা লিখিলাম। তিনি আমার প্রস্তাবনা (plot) এবং রৈবতকের লিখিতাংশ দেখিতে চাহিলেন। আমি পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েক মাস পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীতে তিনি জাজপুর হইতে উহা ফিরাইয়া দিয়া আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহাতে প্রথম লেখেন—

"You have planned a new 'Mahabharat' indeed—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্ম রামায়ণ। It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that you execute with the same grandeur as you have planned, you will perfectly justify yourself. Properly executed, the poem will of course take its rank as the greatest in the language."

"I warn you, however, not to be too confident of success; of popularity I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century."

এরূপে কার্য্যটী বড় কঠিন বলিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে উহা আগা গোড়া লিখিতে নিষেধ করেন—

"Blank verse is recognised as proper to Epic poetry in English—but it is certainly very unsuited to Bengalee

epics. M. S. Dutta alone has been able to make something of it—but even his success has been achieved at a lamentable sacrifice of grammar, idiom and perspicuity. Even in English, it gives to even such a poem as the "Paradise Lost" a weary uninformity which makes it very dismal reading. * * * *. If you continue the poem, my advice is that you should change the ছন্দ at every chapter, and let it generally be rhyme."

প্রথম তিন সর্গ ভিন্ন আর সমস্ত সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা আমারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার পর কাব্যের দীর্ঘতা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া লেখেন—

"Lastly will your poem be historically and politically true? I have advised you to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are concerned, but I am hardly bold enough to advise you to do so in the case of large national movements. Now I believe that it is not historically true, either that Krishna set himself against Brahmanical authority (there was never a greater Champion of it)—or that the Brahmans ever coalesced with the non-Aryans in order to put down the Kshatriyas."

তাহার পর অভিমন্যুর মৃত্যু লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাব্য লিখিতে নিষেধ করেন। কারণ—

"the death of Abhimanyu does not materially either retard or accelerate the main action or even its second stage, viz, the establishment of the Empire." পত্রের উপসংহারে লেখেন—"You will thus see I have thus tried to act towards you honestly and conscentiously.

I do not write to dissuade you from the attempt—but I warn you of the difficulties. The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them."

রৈবতক কাব্যের হস্তলিপির প্রথম সর্গের নিম্নে লিখিয়াছেন—

REMARKS ON CHAPTER I

Krishna preached, if he preached any thing, devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him up against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give a new character to Krishna, which this chapter does.

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ তখন এক সর্গ ছিল। তাহার নীচে লিখিয়াছিলেন—

The reflective, contemplative, descriptive, and senti mental portion in the earlier part of this chapter need be curtailed. They interfere with the action. The latter part (বর্ত্তমান তৃতীয় সর্গ) is excellent.

অন্যান্যবিষয়ে তাঁহার সঙ্গে এক মত হইয়া কেবল আমার কাব্যের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলাম। দুটি বিষয়ে আমি ইতিহাসের প্রতিকূলে যাইতেছি বলিয়া তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন—প্রথমতঃ আমি শ্রীকৃষ্ণকে Religious Reformer (ধর্ম্ম-সংস্কারক), এবং মহাভারত (the great Indian Empire) স্থাপক বলিয়া তাঁহাকে new character (নূতন চরিত্র) দিতেছি। দ্বিতীয়তঃ ইহা historically and politically untrue (ঐতিহাসিক ও

রাজনৈতিক ভাবে অসত্য) যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশক্তির বিরোধী ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা অনার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। এ পত্রের উত্তরে আমি তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যদি ধর্ম্মসংস্কার বা ধর্ম্ম সংস্থাপন, এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল না, তবে তাঁহার লক্ষ্য কি ছিল? ভাগবতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরেই বৈদিক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ঘোরতর কর্ম্মবাদ প্রচার করেন? ইহার অর্থ যদি ধর্ম্ম সংস্কার না হয়, তবে কি? কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সমর্থকনারী (champion) হইলে ভাগবতের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধার্ত্ত কিশোর কৃষ্ণকে এক মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষা দিয়াছিল না কেন? কৃষ্ণ সখা বনবাসী পাণ্ডবদের দুর্ব্বাসা ঋষির সশিষ্য জব্দ করিতে যাওয়ার, এবং কৃষ্ণের শাক ভোজনে তাঁহার পরাভবের অর্থ কি? ভৃগুমুনির কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিবার অর্থ কি? কৃষ্ণ-পাণ্ডবদের পঞ্চগ্রাম ভিক্ষাপর্য্যন্ত নিষ্ফল করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটাইয়া ভারত নিক্ষত্রিয় করিল কে?—কর্ণ! কর্ণ কে? দুর্ব্বাসার মন্ত্রজাত কুন্তীর কানীন পুত্র। এই মন্ত্রজাত পুত্রের অর্থ কি? সূর্য্য কি মানুষীর গর্ভে এরূপে পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন? ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুরদের অভিশাপ ক্ষত্রিয়াবশিষ্ট কৃষ্ণের বংশের ধ্বংসের এবং দুর্ব্বাসার অভিশাপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুর অর্থ কি? মুষলের ও দুর্ব্বাসার পায়সের গল্প কি বঙ্কিম বাবু বিশ্বাস করেন? আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃষ্ণের অপমৃত্যু ঘটাইল কে?—অনার্য্য জরাব্যাধ! ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের ফলভোগ হইল কেন?—আবার অনার্য্য ব্যাধেরা যাদবদের সর্ব্বস্ব এমন কি রমণীদের পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল কেন? তাহার পর ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতকে হত্যা করিল কে?—তক্ষক! তক্ষক কি সর্প, না অনার্য্য নাগপতি তক্ষক? অনার্য্য তক্ষক পরীক্ষিতকে

হত্যা করিলেন কেন? তাহাও আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে। এরূপে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের অভিশাপ কার্য্যে পরিণত করিবার অস্ত্র,—অনার্য্য! ইহার কারণ কি? সর্ব্বশেষ জনমেজয়ের সর্পশত্রের অর্থ কি সাপ পোড়ান, না পিতৃহন্তা নাগজাতির সঙ্গে রাজ্যোদ্ধারার্থ যুদ্ধ? এই যুদ্ধে নাগজাতিকে কে রক্ষা করিয়াছিল?—আস্তিক! আস্তিক কে?—ব্রাহ্মণ জরৎকারু ঋষির পুত্র। তাহার মাতা কে?—অনার্য্য নাগরাজ বাসুকীর ভগ্নী জরৎকারু! ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুর তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি কি সাপ বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সাপের গর্ভে মানুষ আস্তিক জন্মাইয়াছিল? এবম্বিধ ঘটনাবলীর অর্থ কি এই নহে যে দুর্ব্বাসা প্রমুখ এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন, এবং অনার্য্য জাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া সবংশ তাঁহার বংশের এবং সমগ্র ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন? দুর্ব্বাসা যে কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন, বঙ্কিম বাবু এ কথা পরে কৃষ্ণচরিত্রে স্বীকার করিয়াছেন—যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রকমসকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। উপসংহারে লিখিয়াছিলাম যে তিনি যখন এরূপ তীব্র ভাবে এ কাব্য লিখিতে বারণ করিতেছেন, তখন উহা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আমি পরিত্যাগ করিলাম।

এই তীব্র সমালোচনায় ভগ্ন-সাহস হইয়া পড়িলাম। বঙ্কিমবাবুর উত্তর পাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমার বন্ধু প্রফুল্লের মত চাহিয়াছিলাম। আমি এরূপ কাব্যে হাত দিতে সাহস করিয়াছি বলিয়া প্রফুল্ল দুর্ব্বাসার মত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর শাণিত বিদ্রূপ ও গালি বর্ষণ করিলেন। তাহার পর আমার অদৃষ্ট বন্ধু ঢাকার সুনামখ্যাত

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়েরও মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেবল তিনি মাত্র আমাকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি আপনার কাব্য-সূচনীর এক খোষখত নকল করাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেইটি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পড়িয়াছি। Conception extraordinarily grand. Execution ঠিক তেমনই হইবে কিনা সে বিষয় সংশয় আছে। মহাভারতরূপ কাব্য সমুদ্রকে আবার সাঁচে ঢালিয়া নূতন করিতে যাওয়া বড় স্পর্দ্ধার কথা, পারিলে অসামান্য সুখের কথা। আমি গৌরব না বলিয়া সুখ বলিলাম। কারণ এখনকার দিনে বেণে ও মুদির দোকানেও যশ ও গৌরব খরিদ করিতে পাওয়া যায়। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন কি? এই কাব্যের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পাইব কি? এতদিন বাঁচিব কি?"

আবার কয়েক মাস পরে, ১৮৮৩সালের ১৩ই মে তারিখে, বঙ্কিম বাবু আমার উক্ত পত্রের উত্তরে আমার উত্থাপিত প্রশ্নাদির কোনও উত্তর না দিয়া কেবল এই মাত্র লিখিলেন—

"I do not quite understand why you should feel any diffidence in carrying on the Roibatak. My own plan is never to seek the opinions of others, and as I have found by experience that my interference in the way of advice or criticism has spoilt many a fine work. I give none myself. It is a rule with me at present to pass no opinion on contemporary productions. Genius—even mere latent,—must work out its conception."

আর লিখি কি না লিখি করিতে করিতে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভাগলপুরে বদলি হইয়াই তিন মাস

ছুটীর দরখাস্ত করিলাম, এবং ছুটী মঞ্জুর হইলে বাড়ী চলিয়া গেলাম। এরূপে যদিও বৎসরের অধিক চলিয়া গিয়াছে এবং এরূপ নিরুৎসাহ পাইয়াছি, তথাপি আমি এক মূহূর্ত্তও এই বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। অবশেষে সেই অজ্ঞাত আবেগে ইচ্ছাহীন পুতুলের মত চালিত হইয়া আমি আবার 'রৈবতক' লিখিতে আরম্ভ করি, এবং এই তিন মাস ছুটীতে কয়েক সর্গ লিখিয়া ফেলি। তাহার পর নোয়াখালীতে কয়েক সর্গ লিখি, এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফেণীতে উহা প্রায় শেষ করিয়া আমি গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ি। প্রথমার্দ্ধ নকল করাইয়া সেই বৎসরই প্রেসে পাঠাই। স্মরণ হয় শেষ দুই এক সর্গ মাত্র লিখিবার বাকী ছিল। দীর্ঘ কাল রোগে ভুগিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ১৬ই আগষ্ট ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ফেণীতে এই কাব্য সমাপ্ত করি। প্রথম প্রেস প্রায় বৎসরকাল উহা ফেলিয়া রাখিয়া দুই সর্গ মাত্র ছাপিয়া ফেল হয়। তখন উহা বসু প্রেসে অর্পণ করি, এবং বাকী অর্দ্ধাংশও প্রেসে পাঠাই। প্রুফ দেখিবার ভার কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ভ্রাতা আমার পরম সুহৃদ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করি। ঈশান যেমন সুপুরুষ, তেমন সহৃদয়। ঈশান নিজেও কবি এবং তাহার কবিতা তাহার হৃদয়ের মত সুমধুর, সুকোমল ও সরল। কল্পনাপ্রবণ কবি-হৃদয় চিরদিনই কুটিল সংসারের ক্রীড়া-কন্দুক! মধুসূদনের শোচনীয় মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।"

তিনি নিজেও সেই দুঃখে মরিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা ঈশান তাঁহার পূর্ব্বেই ততোধিক দুঃখে মরিয়াছিল। তবে তাহার মৃত্যু প্রেমিক কবির মৃত্যু।

ঈশান প্রথমার্দ্ধের মুদ্রিতাংশ ও হস্তলিপি প্রেস হইতে লইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে আমাকে লিখিলেন—

"শনিবার রাত্রে বসু প্রেস হইতে তোমার 'রৈবতকের' হস্তলিপি ও মুদ্রিত অংশের এক এক ফরমা লইয়া তবে বাড়ী যাই। * * রৈবতকের তৃতীয় সর্গের কিয়দংশ মাত্র বাদে (উহা যন্ত্রস্থ ছিল) ১০ সর্গের আদ্যোপান্ত "এক নিশ্বাসেই" পড়িয়াছি। অধিক সময় লইতে পারিলাম না, কেন না হস্তলিপি শীঘ্রই প্রেসে পাঠাইতে হইবে। রৈবতক কেমন হইয়াছে, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি আমা অপেক্ষা ঢের লিখিয়াছ—ঢের ভাবিয়াছ—ঢের পড়িয়াছ—ঢের বুঝিয়াছ; তোমার শিরায় শিরায়—মেদে মেদে—অস্থিতে অস্থিতে কবিতা—তোমার জীবন কাব্যপূর্ণ,—তুমি সাহিত্যের কবি,—তুমি সংসারের কবি,—তোমার কবিতা কেমন, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা বই আর কি? আমি তোষামোদ করিতেছি না,—প্রাণের কথা বলিলাম। তোমার কবিতা আমার প্রতিভা,—আমি তোমার কবিতা না পড়িলে কাব্য লিখিতে পারি না। তোমার কাব্য না ভাবিলে আমার কল্পনা জাগে না। আমি প্রকৃতি দেখিয়া,—প্রণয়ে ডুবিয়া,—যে কবিতা বুঝি নাই,—তোমার কবিতায় তাহা সহজেই বুঝি। জানি না ইহা কাহার বন্ধন! সত্যই আমার মনে হয় যে আমাদের জীবনে এমন একটি একটি উৎস আছে যাহা স্বতঃই একমুখী হইতে চাহিতেছে। নবীন! ইচ্ছা করে তোমার আমার প্রাণের মিলন জগতকে দেখাইয়া যাই। কিন্তু দেখাই কি করিয়া? আমি আমার যে কাব্যখানি তোমায় উৎসর্গ করিব তাহার ভূমিকায় একথা প্রাণের সাধে বলিব। তোমার জীবনী আমার কাছে

আদ্যোপান্ত পাঠাইও। জানি না তোমার অপর বন্ধু বান্ধব কেমন! কিন্তু স্থির জানিও যে মুগ্ধা রমণী প্রাণেশ্বরের প্রতি যেরূপ আসক্তা, আমি বুঝি তাহার কিছু মাত্র ন্যূন নহি। জানিও যে তোমার জীবনের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার মত বুঝি আর কেহ পারে নাই। তোমার কবিত্বের কেবলমাত্র মোহিণী শক্তি অনেকে বুঝিয়াছে, কিন্তু তাহার মহত্ব, দেবত্ব, বুঝি অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছে। তুমি বুঝিও যে তোমার জীবনী পড়িবার ও রাখিবার যদি কেহ উপযুক্ত হয়, তবে সে আমি। আমার ইচ্ছা করে যে তোমার কোন পুস্তকের ভূমিকা লিখি, কিন্তু পাছে আমার নাম তোমার কাব্যের সহিত মিশাইলে তোমার কাব্যের গৌরব হ্রাস হয় তাই ভরসা করিতে পারি না।

হা! ঈশান! তুমি আজ কোথায়? তোমার পত্র পড়িতে পড়িতে আমি যে শিশুর মত আকুল হৃদয়ে কাঁদিতেছি, তুমি কি দেখিতেছ? আমার যে জীবনী তখনই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং যাহা তুমি এরূপ আকুল হৃদয়ে দেখিতে চাহিয়াছিলে, বিশ বৎসর পরে সেই জীবনী লেখা শেষ হইতেছে, আর তুমি আজ কোথায়? "তোমার নাম আমার কাব্যের সহিত মিশাইবার" জন্যই এই রৈবতকের ভূমিকায় তোমার নাম লিখিয়া রাখিয়াছি এবং তোমার এ অপার্থিব বন্ধুতার স্মৃতি এই জীবনীতে জড়িত করিয়া রাখিবার জন্য তোমার এই প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ঈশান তাহার পর লিখিয়াছিলেন—

"রৈবতক সত্য সত্যই এক বৃহৎ ব্যাপার। রৈবতক তোমার তরঙ্গায়িত হৃদয় সমুদ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি। রৈবতকের এই কয় সর্গে তুমি দেখাইয়াছ যে তোমার মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড জিনিস ঢুকিয়াছে। আমি রৈবতক পড়িতে পড়িতে যেন স্বপ্ন দেখিতেছি যে একজন উন্নত কবি বিস্ফারিত নেত্রে শূন্য পানে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষের উপর

সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ভাসিয়া রহিয়াছে। রৈবতকের গাম্ভীর্য্য আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষাও মহামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।” তাহার পর তিনি “পোড়ামুখী” “ঠোন্‌কা” প্রভৃতি শব্দগুলিন পরিবর্ত্তন করিতে অনুমতি চাহেন। ঠাট্টা তামাসার ভাব রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন করিতে আমি অনুমতি দিয়াছিলাম। তাহার পর ঈশান দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশের নকল পাইয়া এবং ধীরে ধীরে আবার সমস্ত রৈবতক পাঠ শেষ করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী হুগলী হইতে লেখেন—

“আমি তোমার ‘রৈবতক’ আদ্যোপান্ত পড়িলাম, এক নিশ্বাসে পড়িতে বলিয়াছিলে তাহাই করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে বিস্মিত, মোহিত, উত্তেজিত ও ভক্তিগদগদ হইয়াছি। কিন্তু কেবল গুণ গাহিবার সময় এখন নহে। এখন যাহাতে পৃথিবীর লোকে রৈবতকের গুণ গায়, যাহাতে সে গুণ-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে চির-জীবন আনন্দে বিভোর হইতে পারি, তাহার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছি। তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি স্থানে স্থানে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভারি ভারি নিতান্ত দুরূহ কথাগুলি এমনি জলের মত বুঝাইয়াছ, ইংরাজ Roorki Ganges Canal লইয়া যেরূপ অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়া ক্রীড়া করিয়াছে, তুমিও কূটতত্ত্ব লইয়া তাহাই করিয়াছ। পড়িতে পড়িতে তোমাকে বুকে করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। এক্ষণে আমার বক্তব্য বলি।

“সত্য সত্যই তুমি একখানি নূতন মহাভারত লিখিয়াছ। কিন্তু প্রাচীন মহাভারতের চরিত্র ও তোমার মহাভারতের চরিত্র এক নহে। মহাভারতের কৃষ্ণ দেবতা—তোমার কৃষ্ণ বিসমার্ক, নয় গ্ল্যাডষ্টোন, নয় রিসিলু, মহাভারতের কৃষ্ণ মুখব্যাদান করিয়া ব্রহ্মাণ্ড দেখান, মহাভারতের কৃষ্ণ ধ্যানবলে ত্রিকালজ্ঞ। মহাভারতের কৃষ্ণের কার্য্যে হিন্দুর দেবত্ব

আছে। তোমার কৃষ্ণের কার্য্যে দেবত্ব যে একেবারে নাই তাহা নহে, ‘পলিটিকত্বতে’ সে দেবত্ব স্থানে স্থানে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি জানি যে প্রাচীন কথা ইংরাজি ফাসানে না সাজাইলে এখনকার পাঠকের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি কৃষ্ণকে বিসমার্ক, না হয় চাণক্য পণ্ডিত করিতে চাও?” তাহার পর ব্যাসদেবের চরিত্র আরও ফুটাইতে লিখিয়া, দুর্ব্বাসা চরিত্রের ঐতিহাসিকতা কি জিজ্ঞাসা করিয়া ঈশান লেখেন—“তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে যেখানেই শাপ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যে সেইখানেই দুর্ব্বাসার নাম।” এই সময়ে ‘প্রচার’ পত্রিকায় বঙ্কিমবাবুর ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রকাশিত হইতেছিল। তাহার যে অধ্যায়ে কৃষ্ণের ‘আদর্শ মানবত্বের’ ব্যাখ্যা ছিল, উত্তরে আমি তাহার প্রতি ঈশানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম, এবং অন্যান্য কথারও উত্তর লিখিলাম। ঈশান তাহার উত্তরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী হুগলী হইতে লিখিলেন—“আমার প্রধান আপত্তি কৃষ্ণ চরিত্র। তুমি যে বঙ্কিম বাবুর নজির দেখাইয়াছ তাহা আমি মানি না। বঙ্কিম বাবু নিজে দেবতা গঠিতে জানেন না, তিনি কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ নরনারী চরিত্র গঠিতে জানেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁর নজির আমি গ্রহণ করি না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও রৈবতক ছাপানের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নাম গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।” সকলেরই এরূপ প্রতিকূল মত দেখিয়া ভয়ে আমার নাম গোপন করিতে চাহিয়াছিলাম। ঈশান সর্ব্বশেষ লিখিয়াছেন—“আমি তোমার রৈবতক পড়িতে পড়িতে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছি। ইন্দ্রনাথ বাবুর সহিত খুব তর্ক চলিতেছে।” ভাবিলাম যদি ‘রৈবতকের’ প্রুফ দেখিতে দেখিতে ঈশানের মত লোক “হিন্দুধর্ম্ম লইয়া মাতিয়া উঠিয়া থাকে” তবে আর রৈবতকের কৃষ্ণ কেমন করিয়া বিস্‌মার্ক বা গ্লাডষ্টোন হইলেন। তাহার পর ঈশান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৫শে

জানুয়ারী হুগলী হইতে লিখিলেন—"তোমার পত্র খানি পড়িয়া অনেক-ক্ষণ ভাবিলাম যে প্রকৃত দেব-চরিত্র কি? যাহা অমানুষিক তাহা বাস্তবিক ভেল্কি কি না? ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্রের চরিত্র, সীতার চরিত্র, বুদ্ধের চরিত্র, চৈতন্যের চরিত্র, খৃষ্টের চরিত্র মনে হইল। মনে হইল যে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ ছাড়া দেবত্ব আর কি হইতে পারে? এ কথা সত্য, তোমাতে আমাতে এ বিষয়ে মতভেদ নাই। * * আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে খানিকটা যোগবল ঢালিলে কি হয়? অবশ্যই খুবই কৌশলে ঢালিতে হইবে। তুমি বোধ হয় Lord Lyttonর Zanoni নভেল পড়িয়াছ। তাহাতে যে অমানুষিক কাণ্ড আছে, সেইরূপ একটা কিছু করিলে হয় না কি?" ঈশান এ সকল কথার উত্তর পাইয়া লিখিলেন—"রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের অঙ্কুর মাত্র সে কথা আমি তখন ভাবি নাই,—এখন ভাবিতেছি। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে অধিক পাকা করিলে চলিবে না বটে।" সকল গোল মিটিল; 'রৈবতকের' অপরিবর্ত্তিত ভাবে ছাপা আরও এক বৎসরে শেষ হইয়া উহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে প্রকাশিত হইল। আমি জানিতাম 'রৈবতক' রচনা আমার জীবনের একটি নিষ্ফল পর্ব্ব। উহার এক কপিও বিক্রয় হইবে না; উহার এক অক্ষরও কেহ পড়িবে না।

প্রথম পত্র পাইলাম প্রফুল্লের। বলা বাহুল্য উহা তীব্র বিদ্রূপ ও শ্লেষে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় সর্গ 'ব্যাসাশ্রম' বঙ্কিম বাবু বাদ দিতে লিখিয়া-ছিলেন। কিন্তু আমার পত্নী উহা কিছুতেই বাদ দিতে, কি পরিবর্ত্তন করিতে দেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রফুল্লের কেবল এ সর্গটী মাত্র ভাল লাগিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে রামায়ণের পর এমন আশ্রমের বর্ণনা তিনি আর পড়েন নাই। সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্য এক দিকে এবং এই সর্গটি এক দিকে। সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্য পোড়াইয়া ফেলিয়া কেবল

এই সর্গটি রাখিলেই যথেষ্ট। একবার ভাবিলাম এই পত্রখানি বঙ্কিম বাবুর কাছে পাঠাইয়া দি। কবিবর হেমবাবু 'রৈবতক' উপহার পাইয়া ভাষার এবং কবিত্বের খুব প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"তোমার এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তুমি যেরূপ জলের মত চালাইয়াছ,আমার বিশ্বাস যে এত দিনে নাটক লিখিবার ভাষা সৃষ্ট হইল। তজ্জন্য আমি তোমাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। কিন্তু তুমি কৃষ্ণকে যে ভাবে দাঁড় করাইয়াছ, তিনি দেশের হৃদয়ে সে ভাবে দাঁড়াইতে পারিবেন কি না আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আমার মতে সাদা সিদে 'সুভদ্রা হরণ' লিখিলে ভাল হইত।" হা অদৃষ্ট! সুভদ্রা হরণ লেখা যে রৈবতকের' উদ্দেশ্য নহে তাহা কি হেমবাবুও বুঝিলেন না? কেবল আমার দাদা অখিলচন্দ্র রায় রৈবতকের, বিশেষতঃ বিষ্ণুর ধ্যানের ব্যাখ্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কিছু দিন পরে প্রকাশকের পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন 'রৈবতক' বেশ কাটিতেছে। ইতিমধ্যে আফগানিস্থান হইতে পর্য্যন্ত কমিসেরিয়েট ডিপার্টমেণ্টের একজন 'রৈবতক' চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আরও কিছু দিন পরে "সাধারণীতে" বহু প্রবন্ধে ইহার এক দীর্ঘ ও বিচক্ষণ সমালোচনা বাহির হইল। সমালোচনার ভাষার লীলাতরঙ্গ স্বয়ং 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয় বাবুর ভাষার মত। উহা তাঁহার রচনা কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লিখিলেন যে উহা তাঁহার রচনা নহে। যিনি রচনা করিয়াছেন তিনি তাঁহার একজন কৃতী শিষ্য এবং "নবীন রসে টলটলায়মান।"

একদিন বন্ধু ঈশানের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে—"সাবধান, তুমি 'ভারতীকে' 'রৈবতক' উপহার দিও না। সে দিন রবি ঠাকুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তোমার 'রৈবতকের'

উপর ভারি চটা। তুমি 'ভারতীকে' 'রৈবতক' উপহার দিলে খুব গালি খাইবে।" একটি লোক সাঁকো পার হইতেছে। নিকটে একটি পাগল দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি পাগলকে বলিল—"দেখ্ পাগ্‌লা। সাঁকো নাড়িস্ না।" পাগল বলিল—"ভাল মনে করিয়া দিয়াছিস্। তবে একবার নাড়িয়া দেখি।" আমারও পাগলের মত মনের ভাব হইল। আমি ঈশানকে লিখিলাম—"আমার কোনও বহি আমি 'ভারতীকে' উপহার দিই নাই। কিন্তু তুমি যখন এরূপ লিখিয়াছ তখন 'রৈবতক' অবশ্য পাঠাইব। রবি বাবু যদি সরল অন্তঃকরণে 'রৈবতকের' প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেন তাহাতে আমারই উপকার। আর যদি বিদ্বেষ জৃম্ভিত নির্জ্জলা গালি দেন, তবে অন্ততঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা কি তাহা বুঝিব, কারণ রবি বাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। বিশেষতঃ মন্ত্রিবর জলধর মেয়ে মানুষের 'বাপান্তের' যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তুমি জান।" আমি ইহার পর একখণ্ড 'রৈবতক' 'ভারতীকে' উপহার পাঠাইতে প্রকাশককে লিখিলাম। 'রৈবতক' প্রকাশিত হইবার প্রায় দেড় বৎসর পরে 'ভারতীতে' দেড় পৃষ্ঠা সমালোচনা বাহির হইল। তাহার যেমন ভাষা, তেমন ভাব, তেমন—দাদা কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায়—'হৃদয়িকতা'! তাহাতে লেখা আছে 'রৈবতকের' কৃষ্ণ নবীন বাবুর মত "নবীন রসিক"। তাঁহার অপরাধ যে তিনি সত্যভামা ঠাকুরাণীর শয্যাকক্ষে গিয়া গীতা প্রচার করেন নাই। এই রসপূর্ণ সমালোচনা এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে যে বৃহৎ কাব্য 'রৈবতক' খানি "আগা গোড়া নচ্ছার"। ঈশান হো হো করিয়া হাসিয়া লিখিলেন—"তুমি ঠিক বলিয়াছিলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ধরা পড়িয়াছে।" ভারতী সম্পাদিকাকে যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি কখনও দেখি নাই, তথাপি রূপে গুণে তাঁহাকে বঙ্গভাষার মূর্ত্তিময়ী ভারতী বলিয়া আমি শ্রদ্ধা করি। বুঝিলাম এ সমালোচনা তাঁহার নহে।

"বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া কোন্দল ভেজান" যাঁহাদের প্রকৃতি, এরূপ কোনও 'সোণার চাঁদ' বা 'বিবিজান' ভারতীর অন্তঃরাল হইতে এই চোরা কুটিল কটাক্ষ বাণে আমাকে 'লবেজান' করিয়াছেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে পশ্চিম বেড়াইয়া আবার এলাহাবাদে কংগ্রেস দেখিতে যাই। সেখানে একজন খর্ব্বাকৃতি, মস্থণ-তালুকা কৌতুক মূর্ত্তি লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া 'সাধারণীতে' 'রৈবতকের' সমালোচনা আমার কেমন লাগিয়াছিল চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করেন। প্রথম আশ্বাসবাণীর জন্য আমি লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, তিনিই সেই সমালোচনার লেখক ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। সে অবধি দরিদ্র ঠাকুরদাস আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রেণীভুক্ত হন।

এমন কাব্যরসজ্ঞ সমালোচক ও লেখক বঙ্গদেশে দু এক জন ছাড়া আর নাই। সাহিত্যসেবীর চির সহচর দরিদ্রতা রাক্ষসী অকালে বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জের এই সুরভি ফুলটি হরণ করিয়াছে। ঠাকুরদাস 'রৈবতকের' একজন প্রগাঢ় রসজ্ঞ ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তদ্বিপরীত আর একজন সাহিত্যসেবী এলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন—"আপনার 'পলাশির যুদ্ধের' মত 'রৈবতক' আমার ভাল লাগে নাই। আপনি এই ভরা যৌবনে হরিনামের মালা গ্রহণ করিলেন কেন? তিনি 'অবকাশরঞ্জিনীর' অনেক কবিতা মুখস্থ আওড়াইলেন, এবং তিনি আমার খণ্ড কবিতার পক্ষপাতী বলিলেন। যদিও তাঁহারও খর্ব্ব মূর্ত্তি খানি প্রেমিকের উপযোগী নহে, এবং উহা দেখিয়া কোন রমণীর "যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া সাগর পার" সম্ভাবনা নাই, তথাপি এখন প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তিনি একজন প্রেমের কবি। তাঁহার সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন।

তিনি তদপেক্ষাও প্রেম-কবিতার পক্ষপাতী। আমি তাঁহাদের বলিলাম—“এক দিন আসিবে যখন আপনাদেরও হরিনাম ভাল লাগিবে।” বহু বৎসর পরে আমার কুমিল্লায় অবস্থিতি কালে অকস্মাৎ একদিন ইঁহার এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন আমার ভবিষ্যৎ বাণী ঠিক হইয়াছে। তাঁহার দিন আসিয়াছে। এখন তাঁহার হরিনাম ভাল লাগে। তাঁহার পত্রে আমার ও আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস ঢালিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে এই কাব্য তিন খানি তাঁহার জীবনের সহচর। নিদ্রার সময়েও তাঁহার বালিসের নিচে থাকে। যাহা হউক ঠাকুরদাসের পূর্ব্ব সমালোচনায় ও এলাহাবাদের আলাপে আমার হৃদয়ে ঘোরতর নিরুৎসাহ ও নিরাশার মধ্যে একটু আশার ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। এলাহাবাদ কংগ্রেসের সভাক্ষেত্রে বেড়াইতে গেলাম। সেখানেও সর্ব্বত্র ‘পলাশির যুদ্ধের’ প্রণেতা বলিয়াই আদৃত হইলাম, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধিক শিক্ষিত ও ভাবুক তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে রৈবতকের কাছে “পলাশির যুদ্ধ” কিছুই নহে। দেখিলাম তাঁহারা রৈবতকের বড়ই পক্ষপাতী। কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত বলিলেন,—“রৈবতক বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এত দিনে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়াছি ও বুঝিয়াছি। আপনি তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন।” একজন ভদ্রলোক এরূপ ক্ষেপিয়াছিলেন যে তিনি আমার চিহ্ন রাখিবার জন্য আমার আলোয়ানের হাসিয়ার একটা সুতা ছিঁড়িয়া রাখিয়াছিলেন।

বোধ হয় ইহার কিছু দিন পরে, ঠিক স্মরণ নাই, ‘সাহিত্য’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতে প্রথম হইতে রৈবতকের একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচক্ষণ সমালোচনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আমি তখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের সম্পাদক কি সমালোচককে চিনিতাম না।

তাঁহাদের নামও শুনি নাই। সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আমাকে পত্র লিখিয়া এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য সমালোচনা সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। আমি উহার অন্তরের সহিত প্রশংসা করিয়া লেখকের নাম জানিতে চাহিলে তিনি লিখিলেন তাঁহার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতার একজন প্রধান ধনবানের পুত্র, এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী। লক্ষ্মী সরস্বতীর এমন সম্মিলনের কথা আর শুনি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম এই সমালোচনা কলিকাতার কোন সাহিত্য সভায় হীরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক পঠিত হয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সভায় সভাপতি ছিলেন, এবং তিনি এই সমালোচনার বিপরীত মত প্রকাশ করাতে সভাতে তাহা লইয়া খুব একচোট্ বাক্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্যই সমালোচনাটি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।

আবার ইহার কিছু দিন পরে Calcutta Review পত্রিকায় New-Bengali Literature (নুতন বাঙ্গলা সাহিত্য) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ্ শীল। তিনি তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন কি তৎপূর্ব্বে তাঁহার নামও শুনি নাই। দেখিলাম তিনি 'রৈবতক' কাব্যের মূলতত্ত্ব বা কেন্দ্রস্থ ভাব যেরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অল্প কথায় অথচ অদ্ভুত ভাষার ঝঙ্কারে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন আর কোনও সমালোচক পারেন নাই। প্রবন্ধের এ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

The grandeur of the situation fails description. A dim pre-historic vista—a hundred surging peoples and mighty kingdoms, in that dim light clashing and warring with one another like emblamatic dragons and crocodiles and griffins on some Afric shore,—a dark polytheistic creed and inhuman polytheistic rites,—the

astute Brahmin priest fomenting eternal disunion by planting—distinctions of caste, of creed and of political government on the basis of Vedic revelation—the lawless brutality of the tall blonde Aryan towards the primitive dark-skinned, scrub-nosed children of the soil—the Kshatrya's star, like a huge comet brandished in the political sky, casting a pale glimmer over the land—the wily Brahmin priests jealous of Kshatrya ascendancy, entering into an unholy compact with the Non-Aryan Naga and Dashuya hordes, and adopting into the Hindu Pantheon the Asuric Gods of the latter, the trident bearing Mahadeva with troops of demons fleeting at his back or that frenzied Goddess of war Kali with her necklace of skulls—the Nor-Aryan Nagas and Dashuyas crouching in the jungles and dens like the fell beasts of prey—and in the foreground the figure of the half divine legislator Krishna, whom Bishnu, the Lord of the Universe, guides through mysterious visions and phantasms,—unfurling, in the fulness of his destiny, the flag of the Universal religion of Baishnavism to hurl down the Brahmanic priesthood and their cruel vedic ritualism, and to establish in their place the kingdom of God in Mahabharat,—one vast Indian Empire, a realised universal human brotherhood, enbracing Aryan and Non-Aryan in bonds of religious, social and political unity, a grand design, scenic pomp, an antique as well as modern significance like this what national epic can show?

বুঝিলাম আমার 'রৈবতক' রচনার শ্রম সফল হইয়াছে। 'রৈবতক' বঙ্গদেশের মনীষিগণের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। তাহার উচ্চ লক্ষ্য নিষ্ফল হয় নাই। হা ভগবন্! তোমার কার্য্য তুমি কর। "নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন"—যখন ভারতের অদ্বিতীয় বীরকেশরী অর্জ্জুনও তোমার এরূপ "নিমিত্ত মাত্র", তখন আমি ক্ষুদ্র তৃণের আর কথা কি? তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া শক্তি ও সাহস না দিলে, আমি এত নিরুৎসাহের মধ্যে কখনও এ কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না। কিন্তু এমন বিচক্ষণ সমালোচকেরও কি ভ্রান্তি আছে? তাঁহার মতে 'রৈবতকের' যে দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস এবং অর্জ্জুনের যে চিত্র আছে তাহার তুলনা জগতের সাহিত্যে নাই; কিন্তু রমণীচিত্র সম্বলিত অবশিষ্ট দশম সর্গ তাঁহার মতে "অবকাশরঞ্জিনীর" কবির বিলাসী তুলিতে চিত্রিত। তাহা একেবারে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। দেখিলাম তিনি চৈতন্যদেবের মত 'প্রকৃতির' উপর বড়ই নারাজ। হরি! হরি! সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা, রুক্মিণী বিলাসী তুলির চিত্র! তবে একটী গল্প বলিব।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি আমার পিতার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। শুধু চট্টগ্রামের নহে, সমস্ত বঙ্গদেশের তিনি একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে কেন তাঁহার নাম কর্কশ 'খাস্তগির' করিয়াছিলেন জানি না। চট্টগ্রামে ইহাঁরা কাস্তগিরি বলিয়া পরিচিত। আমি সেই নামই ব্যবহার করিলাম। চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বঙ্গদেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কিঞ্চিৎ অস্থির-হৃদয় লোক ছিলেন। কখনও আমাকে খুব ভাল বলিতেন, কখন আবার আমার উপর ভয়ানক চটিতেন। তাঁহার 'আয়ুর্বর্দ্ধন' বহিখানি আমাকে আশীর্ব্বাদ উপহার দিয়া আমার দুই শত

বৎসর জীবন কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তারপর আবার কি জন্য শুনিয়াছিলাম বড়ই চটিয়াছিলেন। এ সময়ে কলিকাতার রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হইল। আমি কি জন্য ফেণী হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। পর দিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইবা মাত্র তিনি 'রৈবতকের' কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে 'রৈবতক' পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা 'রৈবতক' স্থানে স্থানে মুখস্থ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার মুখে তিনি 'রৈবতক' শ্রবণ করেন। তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন। তিনি ও আমার আর একটি বন্ধুর কন্যা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা 'রৈবতকের' অনেক স্থান পড়িলেন, এবং কোনও কোনও স্থানে কণ্ঠস্থ আবৃত্তি করিলেন। 'রৈবতকের' প্রশংসা পিতা ও দুহিতার মুখে ধরে না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক তর্ক করিলেন। শেষে বলিলেন তিনি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে বড় ঘৃণা করিতেন, কিন্তু 'রৈবতক' পড়িয়া অবধি তিনি এক জন কৃষ্ণ উপাসক হইয়াছেন। দেখিলাম তাঁহার কন্যা সুভদ্রা চরিত্রে মুগ্ধা। তিনি বলিলেন—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার সুভদ্রার মত হইতে পারি।" যতই আমি তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলাম, ততই আমার হৃদয় বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিল। ডাক্তার কান্তগিরি বড় সহজ লোক নহেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বিধবা বিমাতাকে পর্য্যন্ত বিবাহ দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার তিনি একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বি, এ পাশ করিয়াছেন। কুচবেহারি কাণ্ডে

কেশবচন্দ্র সেনের পতনের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ইনি এক জন মহারথী। 'রৈবতক' পাঠে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং এ মত-বিপ্লব!—ইহা অপেক্ষা 'রৈবতকের' সফলতার প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সে অবধি তাঁহার বিদুষী কন্যা পত্র লিখিয়া 'কুরুক্ষেত্র' লিখিতেছি কিনা, উহা কবে শেষ হইবে, বরাবর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহার বহু বৎসর পরে 'কুরুক্ষেত্র' বাহির হইবার পর, এক দিন ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কলিকাতার 'ইউনি-ভার্সিটি হলে' সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম 'রৈবতকের' নারী-চরিত্রাবলী সম্বন্ধে তখন তাঁহারও মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারের একটা 'হুজুগ' উঠিয়াছিল। আমি যখন নোয়াখালিতে তখন চূড়ামণি মহাশয় ধূমকেতুর মত বঙ্গের হিন্দু ধর্ম্মের আকাশে কলিকাতায় উদিত হন। শুনিয়াছিলাম যে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মের বর্ত্তমান জড়ত্ব, যাহাতে হিন্দু জাতির এই অননুভবনীয় অধঃপতন ঘটাইয়াছে, ঘুচাইয়া তাঁহাতে নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্য তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। আমরা যে কথা বলি এই জড়ত্ব-ব্যবসায়ীরা তাহা ইংরাজি "শিক্ষার বিমল জলে ধৌত" অশাস্ত্রীয় বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু পণ্ডিতকুলের একজন চূড়ামণি সেই কথা বলিলে আর শাস্ত্রের দোহাই দিবার পথ থাকে না। অতএব চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দু ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় দেশে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। হিন্দু ধর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের যে অজ্ঞানীর জন্য জড় (exoteric) এবং জ্ঞানীর জন্য আধ্যাত্মিক (esoteric) অর্থ আছে, তাহা আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছিলাম। এক জন পণ্ডিত এখন এই শেষ অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন। প্রতিমা পূজার —পৌত্তলিকতা শব্দ আমাদের কোনও গ্রন্থে কি অভিধানে নাই, উহা খৃষ্টান মিশনারীর কল্পনামাত্র—চূড়ামণি মহাশয় যেরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন তাহাতে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবে যে হিন্দু ধর্ম্ম সাত শত বৎসর মাটি চাপা পড়িয়াছে, তাহার পুনরোদ্ধারের আশা সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই মঙ্গলশূন্য নহে। হিন্দু ধর্ম্মের অধঃপতনে হিন্দু সমাজের অধঃপতন সংঘটিত হয়। হিন্দু সমাজের অধঃপতনে ভারতে প্রথম মুসলমান রাজ্য, তারপর ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হয়। ইস্‌লাম ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, সর্ব্বশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষা, হিন্দু

সমাজের মৃতদেহে যখন তাড়িত ক্ষেপ করিয়া উহার জড়ত্ব ঘুচাইতে আরম্ভ করে, এবং প্রবল বেগে উহাকে আপনাদের শক্তিস্রোতে ভাসাইয়া লইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মৈনাকের মত সেই স্রোতগর্ভ হইতে শির উত্তোলন করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করে, এবং তাহার পর 'থিওসফি' আসিয়া সদ্য চেতনা প্রাপ্ত হিন্দু সমাজের চক্ষুরুন্মীলন করে। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প করিব।

আমার বন্ধু ও সহোদরোপম নবীনচন্দ্র দত্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া অযোধ্যা অঞ্চলে সীতাপুরে ছিলেন। তিনি বড় সুন্দর একটি টাট্টু ঘোড়া কিনিয়াছিলেন, কিন্তু টাট্টুটি এমনি স্বাধীনচেতা যে তাহার পৃষ্টারোহণ করিলে সে একটি ফরাসি বিপ্লব উপস্থিত করিত। তিনি হতাশ হইয়া এক দিন ঘোড়াটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছেন যে নিকটস্থ সৈনা ছাউনি 'রাণিক্ষেতে' তাহাকে যথামূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটি বাবাজী কোথা হইতে ঘোড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে উহাকে 'রাণিক্ষেতে' পাঠাইতে হইবে না, উহা বেশ ঘোড়া হইবে। তিনি ঘোটকের অঙ্গে হাত বুলাইয়া সহিসকে উহাতে আরোহণ করিতে বলিলেন। নবীন বিস্মিত হইলেন। লোকটি দেখিতে একটা খেলো বাবাজীর মত, কিন্তু তিনি যে ঘোড়া 'রানিক্ষেতে' পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন সে তাঁহার মনের কথা কিরূপে জানিল। তাহা ছাড়া অন্য কেহ ঘোড়ার গায়ে হাত দিলে উহা লাফাইয়া উঠিয়া একটা লঙ্কাকাণ্ড করিত, কিন্তু বাবাজী হাত দেওয়া মাত্র চুপ করিয়া রহিল। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন— "বাবাজি! তুমি কি ঘোড়া ভাল করিতে জান।" তিনি বলিলেন তিনি জানুন, না জানুন, ঘোড়া ভাল হইলেই ত হইল। তাঁহার কথামতে নবীন সহিসকে ঘোড়ায় চড়িতে আদেশ করিলেন।

অন্য দিন ঘোড়ার পিঠে জিন পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই। কিন্তু আজ জিন দিতেও ঘোড়া চুপ করিয়া রহিল। সাইসটি যেন ফাঁসি কাষ্ঠে উঠিতেছে এরূপ ভাবে ঘোড়ার পিঠে উঠিল। ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। উহা অদৃশ্য হইলে নবীন ফিরিয়া দেখিলেন যে বাবাজীটি নাই। ইহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি হইল। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। ইহার কিছু দিন পরে নবীন মফঃস্বল হইতে একটি পার্ব্বত্য পথে সেই অশ্ব পৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। পূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে ঘোড়াটি আশ্চর্য্যরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। এক স্থানে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। পথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বত। অশ্বারোহী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই এক পাও অগ্রসর হইতেছে না। সহিস পশ্চাতে পড়িয়াছে। তিনি বড় সঙ্কটে পড়িলেন। পাহাড়ে কিছু দেখিয়া ঘোড়া ভয় পাইয়াছে মনে করিয়া তিনি পর্ব্বত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন এক পার্শ্বের পর্ব্বতের সানুদেশে দাঁড়াইয়া—সেই বাবাজী! তিনি কর প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বলিলেন যে তিনি ঘোড়া থামাইয়াছেন। নবীনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কথা আছে। এইবার নবীনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার ঈঙ্গিত মতে নবীন ঘোড়া ফিরাইয়া পর্ব্বতের পাদমূলে একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বাবাজী সন্ন্যাসী-শিষ্যে বেষ্টিত হইয়া সেখানে আছেন। নবীন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঘোড়া কাহার কাছে রাখিবেন ভাবিতেছিলেন, সহিস পৌঁছে নাই। বাবাজী বলিলেন—"ভয় নাই। তুমি অশ্বের বল্গা তাহার পৃষ্ঠোপরে ফেলিয়া রাখ; ঘোড়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।" তিনি এই বলিয়া অশ্বের গ্রীবায় আদরে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"খাড়া রহো বেটা!" অশ্ব মূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তিনি নিজে বসিয়া ও নবীনকে

মৃগাসনে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন যে নবীনকে বহু দিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে নবীন যখন যমুনার সেতুর উপর দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন, বাবাজী বলিলেন যে তিনি ঠিক সে সময়ে তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মনের অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। নবীন এইবার একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি এক সময়ে বড় উশৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন, এবং ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ানদিগকে লইয়া বড় হুটাহুটি করিতেছিলেন। একদিন কোনও স্থানে পঞ্চমকারে অর্দ্ধ নিশি অতিবাহিত করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, যমুনার সেতুর উপর উপস্থিত হইলে ফুল্লকৌমুদী-উদ্ভাসিতা সেতু-কণ্ঠিনী নীলমণিময়ী যমুনার সেই শোভা দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে ধারণা হইল,—তিনি কি করিতেছেন? এই জীবনের সার্থকতা কি? পুলের রেলিঙ্গে বক্ষ রাখিয়া পবিত্রা যমুনার সেই শান্তিময়ী নৈশ শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ে কি এক অচিন্ত্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি বহুক্ষণ আত্মহারাবৎ দাঁড়াইয়া শেষে আপনার হেট কোট যমুনায় বিসর্জ্জন করিয়া সেই অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার বেহারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে মনে করিল সুরাসুন্দরীর অতিরিক্ত কৃপায় প্রভু হেট কোট হারাইয়া এই হাস্যকর পরিচ্ছদে গৃহে ফিরিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য। বাবাজী বলিতেছেন যে সেই রাত্রিতে তিনি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার হৃদয়ের এ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। ভক্তিতে নবীনের হৃদয় পূর্ণ হইল। নবীন বুঝিলেন যে কোনও মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। তাহার পর সন্ন্যাসী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশের গল্প করিতে লাগিলেন। নবীন দেখিলেন যে তিনি সকল দেশের ভাষায় পারদর্শী।

সর্ব্বশেষ বলিলেন—"মহাত্মাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও। তাঁহারা অহরহ মানব-হিত-চিন্তায় নিরত, এবং মানবের মঙ্গলার্থ তাহাদের অদৃষ্ট-চক্র অচিন্ত্যভাবে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। পশুবলে মানবের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে কি না একবার তাঁহারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ফল ফরাসীবিপ্লব। তুমি তৎসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে সে সময়ে কখন কখন ফ্রান্সের পথে ঘাটে ভারতীয় সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখা যাইত। তাহা ভ্রান্তি নহে। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাহাতে আর বেশী কিছু হইবার নহে, আর নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করা নিষ্ফল, তখন একটী মাত্র লোক সেই বিপ্লব ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন, আর তাহার তর্জ্জনী সঙ্কেতে ফরাসীবিপ্লব নিবিয়া গেল। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন ভারতের এই অধঃপতনের সময়ে বিদেশীয়ের মুখে না শুনিলে তোমরা কোনও কথা বিশ্বাস কর না। অতএব শীঘ্র রাশিয়া হইতে একটি নারীরত্ন ও আমেরিকা হইতে একটী পুরুষ-পুঙ্গব ভারতে উপস্থিত হইয়া একটা ধর্ম্মান্দোলন সৃষ্টি করিবেন, এবং তাহাতে ভারতীয় ধর্ম্মে নব জীবন সঞ্চারিত হইবে।" তাহার কিছু দিন পরে মেডাম ব্লেভেটস্কি ও কর্ণেল অলকট আসিয়া 'থিওসফির' বা ব্রহ্ম-বিদ্যার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। এই আলাপের সময়ে তাঁহাদের নাম মাত্রও কেহ ভারতে শুনে নাই। যোগিশ্রেষ্ঠ এই অদ্ভুত কথোপকথন শেষ করিয়া বলিলেন—"তুমি শীঘ্র লক্ষ্ণৌ আবার বদলি হইয়া যাইবে।" নবীন এ বদলির পূর্ব্বাভাষ মাত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা অন্য কেহ জানিত না। লক্ষ্ণৌ গিয়া কি করিতে হইবে তাহা উপদেশ দিয়া এই মহাপুরুষ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বলা বাহুল্য সেই দিন হইতে নবীনের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে নবীন Supernumerary (অতিরিক্ত চিকিৎসক) হইয়া

মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণস্থ এক গৃহে বাস করিতেছেন। হঠাৎ একদিন একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইল। পাহারা অতিক্রম করিয়া, কোনও সংবাদ না দিয়া, তিনি কিরূপে আসিলেন? নবীন বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে কণ্ঠ শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহার গুরুদেব। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে বাবাজী বেশে ত প্রহরী তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। অতএব তিনি এই বেশ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রহরী মনে করিয়াছে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র। পরে তিনি বলিলেন যে তিনি দাক্ষিণাত্যে যাইতেছেন। সেখানে তাঁহার বহুকর্ম্ম আছে, অতএব বহু বৎসর নবীনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। নবীন শীঘ্র বদলি হইয়া দ্বারভাঙ্গা যাইবেন এবং সেখানে কোনও বিশেষ স্থানে তাঁহার এক শিষ্য আছেন, তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে বলিলেন। নবীনের দ্বারভাঙ্গা বদলির কোনও কথাই তখনও হয় নাই। এ কথা তিনি কিরূপে পূর্ব্বে জানিলেন, নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বাবু! ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তুমি ঐ যে বহিখানি পড়িতেছ তোমার ঐ অশিক্ষিত ভৃত্যের পক্ষে উহা এক অদ্ভূত ব্যাপার। কতকগুলিন কালীর দাগ দ্বারা কেমন করিয়া মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত হয় সে তাহা বুঝিতে পারে না। অথচ যে লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহার পক্ষে উহা অতি সহজ ব্যাপার। এও তাই। আমিও একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, যাহা তুমি কর নাই। কাযেই আমার কার্য্য ও কথা তোমার কাছে বড় বিস্ময়কর বোধ হইতেছে। উহা শিক্ষা করিলে তুমিও বুঝিতে পারিতে যে আমি যাহা বলিতেছি ও করিতেছি উহাও অতি সহজসাধ্য। ইহার পর নবীন সত্য সত্যই দ্বারভাঙ্গা বদলি হইলেন এবং সত্য সত্যই সেরূপ স্থানে সেরূপ একটি লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে

তিনি নোয়াখালিতে সিবিল মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিলেন। তাঁহার চরিত্রের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, এই অদ্ভুত উপাখ্যান তিনি আমাকে বলিলেন। তিনি সত্য-বাদী, এবং এখন একজন পরম সাধু। এরূপ একটি উপাখ্যান কাল্পনিক হইতে পারে না। আমার মত বন্ধুকে তাঁহার প্রবঞ্চনা করিবারও কিছু প্রয়োজন ছিল না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে মেডাম ব্লেভেটস্কি রুশিয়া হইতে ও কর্ণেল অলকট আমেরিকা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি তাঁহারা উভয়ে 'কুথুমিলাল' নামক এক মহাত্মার শিষ্য। শুনিয়াছি অলকট খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া বড় অশান্তিতে পতিত হইয়া একদিন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আমেরিকাতে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে তিনি ভারতবর্ষে গেলে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইবে। তিনি তদনুসারে ভারতে আসেন। মেডাম ব্লেভেটস্কিও বহুবৎসর হিমালয়ে মহাত্মাদের শিষ্যত্ব করিয়া সে সময়ে ভারতে উপস্থিত হন। উভয়ের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ভারত ও জগত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। আমি ফেণী থাকিবার সময়ে কর্ণেল অলকট 'থিওসফি' প্রচার উপলক্ষে নোয়াখালি আসেন, এবং আধ্যাত্ম জীবন (Spiritual life) সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় সে বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্বে বরিত হই। বক্তৃতান্তে উহা কেমন হইয়াছিল তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম যে আমি উহা উচ্চতর ভাবের হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন তাহা হইলে শ্রোতাদের মধ্যে কত জন তাহা বুঝিতে পারিত। সে জন্য তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্নতম ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি

বলিলাম এজন্যে হিন্দু ধর্ম্মে কস্মিন্ কালেও প্রচারক ছিল না, এবং এরূপ ভাবে ইহার প্রচার কার্য্যও হয় নাই। কারণ হিন্দু ধর্ম্মের অধিকারী ভেদে সোপান আছে। এরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতা করিতে গেলে যাহারা উচ্চতর অধিকারী তাহাদের তৃপ্তি হয় না। অন্য দিকে উহা উচ্চতর অধিকারীদের উপযোগী করিতে গেলে নিম্ন অধিকারীদের উপযোগী হয় না। এজন্য গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহাদের গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি নাই, তাহাদের কাছে যেন তাহা বলিয়া তাহাদের বিচলিত করা না হয়। বুদ্ধদেবও একদিন তাহাই বলিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তিন বার জিজ্ঞাসা করিল—আত্মার মৃত্যু আছে কি না? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। সে তাঁহাকে মুর্খ ভণ্ড মনে করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাঁহার নিরুত্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে আত্মা অমর কি মর তাহা প্রমাণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যদি এ ব্যক্তির বিশ্বাস থাকে যে আত্মা অমর এবং তিনি উহা সমর ব্যাখ্যা করেন, তাহার ফল এই হইবে যে তিনি যাহা বলিবেন সে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না। অথচ তাহার যাহা বিশ্বাস আছে তাহা বিচলিত হইবে। তদ্রূপ তাহার বিশ্বাস যদি থাকে যে আত্মার মৃত্যু আছে, আর তিনি বলেন আত্মার মৃত্যু নাই, তাহার ফলও ঐরূপ হইবে। অতএব এরূপ অবস্থায় নিরুত্তর থাকাই উচিত। কর্ণেল অলকট আমার কথার অনুমোদন করিলেন। তাহার পর হইতে এরূপ বক্তৃতার দ্বারা 'থিওসফি' প্রচারের স্রোত মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। নোয়াখালির সকলে জবাব দিলেন আমি 'থিওসফি' গ্রহণ না করিলে তাঁহারা কেহ করিবেন না, বিশেষতঃ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়। অল্কট আমাকে সে জন্য পাকড়াও করিয়া বসিলেন। আমি বলিলাম 'থিওসফির' মূল

ত্রিনীতি—সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা, আধ্যাত্মিক বিদ্যার অনুশীলন, এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব—আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহার জন্য শত-শত-সম্প্রদায়-বিভক্ত ভারতে আর একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়োজন কি তাহা আমি বুঝি না। তিনি শেষে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন যে আমি 'থিওসফি' গ্রহণ না করিলে তাঁহার নোয়াখালি আসা বিফল হয়, কারণ তাহা হইলে আর কেহ গ্রহণ করিবে না। তখন অগত্যা আমি এগার টাকা দক্ষিণা দিয়া 'থিওসফি' গ্রহণ করি। অনুমান ২০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি না সংস্কৃত শিক্ষার, না আধ্যাত্মিক বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারিয়াছি। এরূপ একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টির তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারি নাই। তবে 'থিওসফির' দ্বারা ভারতের ও জগতের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা অন্ধও দেখিতে পারে। যে সকল আবর্জ্জনা হিন্দু ধর্ম্মের এ জড়ত্ব যুগে হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, 'থিওসফি' আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে তাহা হিন্দু ধর্ম্ম নহে। সেই ভস্মের অভ্যন্তরে যে বহ্নি আছে উহাই হিন্দু ধর্ম্ম। তবে ব্লেভেটস্কি ও অলকট বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকে বেশী গড়াইতেছিলেন। বাগ্‌দেবী-স্বরূপিণী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা 'এনি বিশান্ত' (Annie Besant) 'থিওসফির' সেই গতি পরিবর্ত্তন করিয়া ও সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের গঙ্গা সাগরমুখী করিয়া, আমাদের পূজনীয়া হইয়াছেন। মহাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না কর, 'থিওসফি' প্রচারে এই নাস্তিক চূড়ামণি-স্বরূপিণী 'বিশান্তের' মত শক্তি ও প্রতিভাশালিনীর হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ যে দৈবকার্য্য (miracle) তাহা সকলকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা হউক তখন যেমন বিদেশীয়ের মুখে না শুনিলে আমরা কোনও কথা বিশ্বাস করিতাম না, এখন আবার হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা-ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায় উঠিয়াছে যে তাহারা বিদেশীয়ের মুখের

শত যুক্তিপূর্ণ কথা বাঙ্গালীর উপযোগী রসিকতায় বা ইতরতায় উড়াইয়া দিবে, এবং অনুষ্টুপ ছন্দে নিতান্ত গর্দ্দভোপযোগী কোনও কথা কোথায় প্রক্ষিপ্ত থাকিলে তাহার দোহাই দিয়া কর্ণ বধির করিবে। ইহারা যে এ ছাই ভস্ম করে তাহা নহে। তবে মুদি দোকানদার প্রভৃতিরা উহা বিশ্বাস করে,—এমন অদ্ভুত কথা কিছুই নাই যাহা তাহারা শাস্ত্রের নামে বিশ্বাস করিবে না, এবং ও সকল অন্ধ জড়ত্বের দোহাই দিলে অর্থোপার্জ্জন চলে, এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের তৃপ্তি সাধিত হয়। এ জন্য 'থিওসফি' বিদেশীয় মুখে যাহা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ী কেহ বলিলে, ইহাদের মুখ বন্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া, বোধ হয়, পূজনীয় বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সেই অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতচূড়ামণিকে এই ব্রতে ব্রতী করিলেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে যখন প্রথমতঃ হিন্দু ধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, তখন দেশে একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি পাঠ্য অবস্থায় ব্রাহ্ম সমাজ—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নহে—ছাড়িয়া আমাদের দেব দেবীর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়া 'আবাহন' ও 'শব সাধন' প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছিলাম। এখন একজন পণ্ডিতের মুখে এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার এত আনন্দ হইল যে আমি তখন কলিকাতায় থাকিলে ইঁহার কাছে দীক্ষিত হইতাম। বলা বাহুল্য এরূপ ব্যাখ্যার পথ পূজ্যপাদ ও অদ্ভুত-কর্ম্মা ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তৎশিষ্য ৺কেশব চন্দ্র সেন পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। শুনিলাম যে 'নবজীবন' মাসিক পত্রে 'হিন্দু ধর্ম্মের' এ আধ্যাত্মিকতা ইংরাজি শিক্ষার পথে বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎশিষ্যগণ এবং হিন্দু শাস্ত্রের পথে এই শক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিবেন স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দু ধর্ম্মের আবর্জ্জনা ব্যবসায়ীর দল দেখিল যে তাহাদের ব্যবসা মারা যায়। তখন তাহারা এই চূড়ামণিকে হস্তগত করিয়া, তাহাদের দলভুক্ত

করিল, আর তিনিও দেশপূজ্য স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'বেদব্যাস' পত্রিকার বেদব্যাস হইলেন, ও সেই সঙ্গে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সম্প্রদায়িকতা এ দেশের শত শত বৎসর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ভগবান জানেন আরও কত শত বৎসর করিবে। এই নির্ব্বাণ লাভের পর ইনি জল পথে, এবং তাঁহার একজন সহযোগী স্থল পথে 'পেশাদারি' হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারার্থ আহূত হইয়া একবার চট্টগ্রামে আসিলেন। সহযোগী স্থল পথে যাইবার সময়ে ফেণীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তখন মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র পড়িতেছিলাম। পঞ্চ মকার সম্বলিত দুইটি লাইন এক স্থানে তাঁহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম উপরের ও নীচের সঙ্গে তাহার কি সংস্রব। 'মহানির্ব্বাণ' পাঠক জানেন যে উহাতে মদ্য পানের ঘোরতর নিন্দা আছে। পঞ্চ তত্ত্বেরও স্বতন্ত্র অর্থ আছে। কেবল দুই এক স্থানে এরূপ পঞ্চমকার যুক্ত দুটি লাইন প্রক্ষিপ্ত হইয়া, শেষ ভাগে ভৈরবী চক্রের এক অধ্যায় আছে। শাস্ত্রান্তবাগীশ মহাশয় একটুক বিজ্ঞতার ঈষদ্ হাসি হাসিয়া বলিলেন যে বঙ্কিম বাবুর ও আমার বিশ্বাস শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে,—আমার চণ্ডীর অনুবাদ ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা শাস্ত্রকে সনাতন বলিয়া মানেন। তবে পঞ্চমকারের প্রচলিত অর্থ যাহা, উহাদের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তিনি তখন প্রত্যেক শব্দের ধাত্বর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। আমি বলিলাম তবে মদ মেয়ে মানুষ তাহার অর্থ নহে? তিনি বলিলেন—"এক শ বার না"! তখন আমি বলিলাম—"আপনারা চট্টগ্রামে যাইতেছেন। চট্টগ্রাম সুরাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার একজন উগ্র তান্ত্রিক। "পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা যাবৎ পততি ভূতলে" না হইলে

মুন্‌সেফ কোর্টের একটি 'এপ্রেন্‌টিসি' জোটে না। আপনারা তন্ত্রের পঞ্চমকারের এ প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন কি?" তিনি বলিলেন যদি তাহাই না করিবেন, তবে কেন আর দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। দ্বিতীয় কথা বলিলাম—"এক অশেষগুণ মোহন্তের দ্বারা চট্টগ্রামের বিখ্যাত সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথ তীর্থটি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। আমি ১০।১২ বার যাবৎ চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই করিতে না পারিয়া ইদানীং তাহাকে মোকদ্দমা করিয়া পদচ্যুত করিয়া তীর্থটি রক্ষা করিবার চাঁদা তুলিতেছি। আপনারা দেশের তীর্থগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন না কেন?" তিনি বলিলেন তিনি শুনিয়াছেন যে চন্দ্রনাথের মোহন্ত একজন নিতান্ত পাপিষ্ঠ। চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া তাঁহারা তীর্থরক্ষা ব্রতে হস্তক্ষেপ করিবেন, ও চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। তথন চন্দ্রনাথের দুরবস্থা সম্বন্ধেও একটী বক্তৃতা চট্টগ্রামে দিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইঁহাদের চট্টগ্রামে ধর্ম্ম প্রচারের ব্যয়ার্থ চাঁদা দিতে আমি পূর্ব্বে অস্বীকার করিয়াছিলাম, কারণ ইঁহাদের উপর আমি বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার মুখে এ সকল কথা শুনিয়া আমি ২৫৲ টাকার মনিঅর্ডার পাঠাইয়া এই ব্যাপারের সম্পাদক মহাশয়ের কাছে লিখিলাম যে শাস্ত্রান্ত-বাগীশ মহাশয় তন্ত্র ও তীর্থ সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বলিয়া আমি এ চাঁদা দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ফেণীর উকীল মোক্তারগণ আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে প্রচারক মহাশয়ের স্কুল গৃহে বক্তৃতার জন্য আমার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি দিলাম, কিন্তু বলিলাম যে তিনি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কি ব্যক্তি-বিশেষের নিন্দা করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে প্রচারক মহাশয় বলেন যে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান

বেটারা এত দিন হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাদের গালি না দিলে বক্তৃতার জোর হয় না। আমি জানিতাম নির্ব্বাণের পর হইতে পর-ধর্ম্ম নিন্দাই ইহাদের ব্যবসা হইয়াছিল। আমি বলিলাম তিনি বড় বড় সহরে বড় বড় লোকের সমক্ষে জোরের বক্তৃতা করিতে পারিবেন। ফেনী ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র কৃষকের স্থান। এখানে বক্তৃতার জোর কিছু কম হইলে হিন্দু ধর্ম্মের অচিন্তনীয় সর্ব্বনাশ হইবে না। বিশেষতঃ স্কুল উভয় হিন্দু ও মুসলমানের অর্থে নির্ম্মিত। সেখানে কবির লড়াই বা ধর্ম্মের লড়াই গীত হইতে পারে না। সন্ধ্যার সময়ে স্কুল গৃহে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই বলিলেন যে সংসারটা মায়া ও মিথ্যা। পুত্র পিতার মুখানল করে তাহার অর্থ এই যে, পুত্র বলে—"তুমি এই মুখে সংসার সংসার করিয়াছিলে, অতএব তোমার পোড়া মুখে নুড়োর আগুন দিতেছি।" এই পিতৃভক্তি ও পবিত্র মুখানলের ব্যাখ্যায় আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বলিলাম—"হিন্দু ধর্ম্মের এরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে আমার শক্তি নাই। অতএব আমি চলিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন যে বক্তৃতার চোটে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, আর বলিবেন না। তখন কিছুক্ষণ বসিয়া দেখিলাম যে লোকটির না আছে বক্তৃতাশক্তি, না আছে সামান্য চিন্তা শক্তি। বলিতেছেও ঐরূপ ছাই ভস্ম। আর উহা গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া সেই সন্ধ্যার বাসন্ত উৎসবের ও পাগলা মিয়ার দরগায় মৌলাদ সরিফ পাঠের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে বলিয়া, আমি চলিয়া আসিলাম। ইনি ইহার পর সীতাকুণ্ডে গিয়া মোহন্তের কাছে যুগল রজত মুদ্রা পাইয়া বক্তৃতা দিলেন যে এমন বিশুদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মোহন্ত তিনি আর দেখেন নাই। তাহার পর চট্টগ্রামে গিয়া তন্ত্রের কি তীর্থের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ

করিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে সেরেস্তাদার মহাশয়ের অধিনায়কত্বে তাঁহাদের বক্তৃতার জন্য ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তাঁহার যেরূপ প্রভুত্ব সেখানে পঞ্চ মকারের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গেলে, তাঁহাদেরই বা "পতন্তি ভূতলে" ঘটে। তাঁহার জুড়ি প্রচারকপুঙ্গব "শিব চতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথ দর্শন জন্য মাতা ও পত্নীকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে ৫০টী অখণ্ড মণ্ডলাকার রজতের জন্য, চন্দ্রনাথ মাথায় থাকুন, তিনি সেই দিন বক্তৃতা দিতে চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন! ইঁহারা প্রচারক না প্রবঞ্চক? কিছু দিন পরে চট্টগ্রামে গিয়া দেখি যে টিকির ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এত অল্প সময়ে টিকির এরূপ দীর্ঘতা হইতে পারে না। আমার বোধ হইল কলিকাতার বিখ্যাত "টিকির ডিপো" (depot) হইতে উহার বহু পরিমাণ আমদানী হইয়াছে। যে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমি ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলাম, পুরুষানুক্রমে প্রাতঃকালে তাহার নাম কেহ গ্রহণ করে না। বলা বাহুল্য তাঁহার টিকির দৈর্ঘ্য মর্কটলাঙ্গুল পরিমাণ গজাইয়াছে। তাঁহার কাছে শুনিলাম যে হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় দেশ তোলপাড় হইয়াছে। প্রচারকচূড়ামণি মানুষের আত্মার আকৃতি, ও প্রবৃত্তির সের মাপা ওজন পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিন্দু ধর্ম্মের অর্থ কি বুঝাইয়াছেন?" উত্তর—"কই তাহাত কিছু বলেন নাই?" প্রশ্ন—"ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কি বুঝিয়াছ?" উত্তর—"কই তাহাও ত কিছু বলেন নাই।" প্রশ্ন—"হিন্দু ধর্ম্ম কি?" উত্তর—"তাহাও কিছু বলেন নাই।" তবে আর হিন্দু ধর্ম্ম বুঝিবার বাকী কি? দিন কতক এরূপ প্রচারে ও প্রচারকে দেশের লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। আমার অমৃত ভায়ার "হলহলানন্দ স্বামীতে" দেশ ছাইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের চীৎকারে গগণ বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রবঞ্চনা চিরস্থায়ী হয় না। মানুষ একবার

মাত্র বিজ্ঞাপন কি বক্তৃতার চোটে প্রবঞ্চিত হইতে পারে। আজ সেই প্রচার ও প্রচারক উভয় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ডারওইনি টিকি সমূহও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না হইলে, দৈর্ঘ্যে অনেক হ্রস্ব হইয়াছে। পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া ডারওইনি অভিব্যক্তি-বাদমতে মনুষ্যত্ব লাভের আর বড় বাকী নাই। শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কয়েক জন প্রকৃত মহাত্মার উল্লেখ করিয়া, এই হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়দের কীর্ত্তি কাহিনীতে এই অধ্যায়টি শেষ করিতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অতএব ফেণীর রাম ঠাকুরের কথা বলিয়া ইহার উপসংহার করিব। রাম ঠাকুরের বাড়ী বিক্রমপুর, বয়স ২৬।২৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার গুরুদেব একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। রাম ঠাকুরের যখন ৮ বৎসর বয়স তিনি মৃত্যুমুখে তাঁহাকে বলিয়া যান যে রাম ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার আবার সাক্ষাৎ হইবে। কথাটি শুনিয়া বালকের মনে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে—ইহার অর্থ কি? বালক ইহার কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার প্রাণে কি এক উদ্যম সঞ্চারিত হইল। তাহার পড়া শুনাতে মন লাগিত না। অবশেষে সে ১২ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে নানা সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এক দিন কামরূপের কামাখ্যা দেবীকে প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইবে এমন সময়ে এক পার্শ্ব হইতে কে বলিল "তুই আমার গাঁজা সাজাইয়া দিয়া যা।" সে ফিরিয়া দেখিল একজন সন্ন্যাসী। চোকে চোকে দেখা হইলে তিনি বলিলেন—"তুই আমাকে চিনিতে পারিতেছিস্ না?" রামঠাকুরের বোধ হইল এ কণ্ঠস্বর তাহার গুরুদেবের। পরে তাঁহার সঙ্গে বহুবর্ষ হিমালয় ভ্রমণ করে এবং মহাত্মাদের কলেবর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বহু অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করে। তাহার মাতা জীবিতা। এজন্য

তাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত না করিয়া তাহার গুরুদেব তাহাকে তাহার মাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে ফিরাইয়া পাঠান। রাম ঠাকুর তাহার গ্রামস্থ একজন ওভারসিয়ারের পাচক হইয়া নোয়াখালি আসে। গল্প উঠিল যে এক দিন সে আহ্নিকে বসিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আহা! অমুকের শিশুপুত্রটি মারা গেল।" বাস্তবিক নোয়াখালি সহরের অন্য স্থানে ঠিক সে সময়ে সেই শিশুটির দৈব ঘটনাতে মৃত্যু হইল। তাহার পর ফেনীতে যে নূতন 'জেলখানা' প্রস্তুত হইতেছিল, রাম ঠাকুর তাহার সরকার হইয়া আসিল। লোকে বলিতে লাগিল যে কখনও তাহাকে গৃহে আহ্নিকে দেখিয়াছে, এবং পরের মূহূর্ত্তে রাম ঠাকুর অদৃশ্য হইয়াছে। কেহ তাহাকে রাত্রিশেষে রক্তচন্দনচর্চ্চিত অবস্থায় কোনও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে। সর্প দংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে, আর রাম ঠাকুর হাত তুলিয়া বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে। নিজে কিছুই আহার করে না। কদাচিত দুগ্ধ বা ফল আহার করে। অথচ তাহার সবল সুস্থ শরীর। পর-সেবায় তাহার পরমানন্দ। জেলখানার ইট খোলার গৃহে পবলিক ওয়ার্ক প্রভুদের বারাঙ্গনাগণ কখন পালে পালে উপস্থিত হয়। কিন্তু রাম ঠাকুর তাহাদের ঘৃণা করা দূরে থাকুক, ববং সন্তোষের সহিত নিজে রাঁধিয়া তাহাদের অতিযত্নে আহার করায়, এবং মাতাল হইয়া পড়িলে তাহাদের আপন মাতা কি ভগিনীর মত সুশ্রূষা করে। সে সময়ে নোয়াখালি হইতে বহুদুর ভবানীগঞ্জে গিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হইত। রাম ঠাকুর একদিন একটি আত্মীয়কে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া ফিরিতে রাত্রি হইলে একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গভীর রাত্রিতে রাম ঠাকুর দেখিল মসজিদ আলোকিত হইয়াছে, এবং তাহার গুরুদেব আর দুই জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি

বলিলেন যে তাঁহারা কৌষিকী পর্ব্বত হইতে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। নির্জ্জন স্থানে, একাকী, গভীর রাত্রি ; রাম ঠাকুর ভীত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন।

আর একটি গল্প বহু লোকের মুখে, সর্ব্বশেষ রামঠাকুরের নিজমুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাহার গুরুদেব প্রতিশ্রুত ছিলেন। রাম ঠাকুর ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া ওভারসিয়ার ছুটী দিলেন না। রাম ঠাকুর শিবচতুর্দ্দশীর প্রাতে বড় মন দুঃখে বসিয়া গুরুদেব তাহাকে কেন এ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন ভাবিতেছে। এমন সময়ে টেলিগ্রাম আসিল যে সাহেব আসিলেন না। তাহার ছুটী মঞ্জুর হইল। রাম ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে ছুটিল, কিন্তু অকস্মাৎ উত্তেজনায় ভ্রান্ত হইয়া দক্ষিণ মুখে না গিয়া উত্তর মুখে চলিল। কিছু দূর গেলে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল যে রাম ঠাকুর চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে যাইতেছে। তখন ভ্রম বুঝিয়া এক বৃক্ষতলায় বড় সন্তপ্ত হৃদয়ে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাম ঠাকুর কি চন্দ্রনাথ যাইবে জিজ্ঞাসা করিল। রাম ঠাকুর বলিল যে ভ্রমবশতঃ বিপরীত দিকে আসিয়াছে। অতএব সে দিন আর চন্দ্রনাথে পৌছিবার সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন, এবং পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া পার্ব্বত্য পথে তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত করিলেন! সে স্থান হইতে চন্দ্রনাথ চল্লিশ এবং ফেণী হইতে ত্রিশ মাইলের পথ। চতুর্দ্দশী রাত্রি সীতাকুণ্ডে অতিবাহিত করিবার পর দিন আবার সেরূপ অজ্ঞাত পথে অজ্ঞাতভাবে তাহাকে আনিয়া ফেণীর উত্তর দিকে একটি স্থানে রাখিয়া গেলেন। এখানে প্রত্যূষে

একজন পেয়াদার সঙ্গে রামঠাকুরের সাক্ষাৎ হইলে সে জঙ্গলে লুকাইতেছিল। পেয়াদা তাহাকে পাকড়াও করিল, এবং তাহার দ্বারা মহম্মদের এক রাত্রিতে বিশ্বভ্রমণের মত এই অদ্ভুত তীর্থ দর্শন-কাহিনী প্রথম প্রচারিত হইল। রামঠাকুর দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর, শান্তমূর্ত্তি। নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না, কোনও কথা কহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, এমন কি প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত, সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম, এবং পতি পত্নী মুগ্ধ চিত্তে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা সকল শুনিতাম। বলা বাহুল্য সে পেশাদারি হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে। এক দিন রাণাঘাটে উষাক্ষণে জাগিয়া স্ত্রী বলিলেন যে তিনি সেবার কালী দর্শন করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন রাম ঠাকুর কালীঘাটে আসিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে কেন দেখা করিল না—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম কেমন করিয়া বলিব। মুখ প্রক্ষালন করিয়া আমি আফিস কক্ষে 'সোফার' উপর বসিয়া যেই বাহির দিকে দেখিতেছি, দেখি আমার সম্মুখে বারণ্ডায় অধোমুখে স্থিরভাবে রামকুমার দাঁড়াইয়া আছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমার বোধ হইল যেন রাম ঠাকুর আকাশ হইতে সে স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যথা আমি তাহাকে আসিতে দেখিতে পাইতাম। তাহার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিয়াছি রামঠাকুর এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

কথায় কথায় এ সময়ের আর একটি অদ্ভুত ঘটনা স্মরণ হইল। রামঠাকুরের কর্ত্তা ওভারসিয়ার মহাশয়ও এক জন ঘোরতর তান্ত্রিক।

তাঁহার সঙ্গে ডিষ্ট্রীক্ট এন্‌জিনিয়ার মহাশয়ের বিশেষ মনোবাদ উপস্থিত হইল। সে অবধি এন্‌জিনিয়ার বাবুর একটি দশমবর্ষীয়া ভগিনীর উপর এক অচিন্তনীয় উপদ্রব উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহার কাপড়ে, গৃহের চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের বিশেষতঃ বালিকার আহার্য্যবস্তুতে ও অঙ্গে অকস্মাৎ ময়লা পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হইল। নিজ গৃহ ছাড়িয়া তাঁহারা ভুলুয়ার রাজার পাকা কাছারি গৃহে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাহাতেও উপদ্রব থামিল না। ইনস্‌পেক্টর অব লোকল ওয়ার্কস্‌ (Inspector of local works) বাবু সাধন চন্দ্র রায় একদিন এন্‌জিনিয়ার বাবুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের আচার দিতে ভৃত্য বোতল আনিয়াছে, বোতলের কাকের উপর ময়লা। শেষে এন্‌জিনিয়ার বাবু তাঁহার ভগিনীকে কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহাদের পাড়াতে একজন সন্ন্যাসী আসিলে তাঁহাকে তাঁহারা এ ঘটনার কথা বলেন। তিনি কি এক ক্রিয়া করিলে তাঁহাদের প্রাঙ্গণ হইতে একটি বাষ্পস্তম্ভ উৰ্দ্ধদিকে চলিয়া যায়। সে অবধি তাঁহার ভগিনী সে উপদ্রব হইতে উদ্ধার লাভ করে। এ অদ্ভুত উপাখ্যান আমি স্বয়ং এন্‌জিনিয়ার বাবুর মুখে শুনিয়াছি। এই বিপদে পড়িয়া তাঁহার শারীরিক অবস্থা দারুণ চিন্তায় এরূপ হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিলে দুঃখ হইত। তাঁহার বিশ্বাস যে উক্ত ওভারসিয়ারের এক জন তান্ত্রিক গুরু আছেন। এই উপদ্রব তাঁহারই কার্য্য। ঠিক হইল কিছু দিন পূর্ব্বে এরূপ উপদ্রব ফেনীর নিকটস্থ একটি যুগী বিধবার উপর হইয়াছিল। কেহ তাহাকে দেখিতে গিয়া সেই অদৃশ্য উপদ্রবকারীকে গালি দিলে কেহ যেন অদৃশ্যভাবে তাহার ঘাড়ে ধরিয়া অমানুষিক বলে তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিত। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এন্‌জিনিয়ার

বাবুর মত লোকের কথা অবিশ্বাস করিব কিরূপে? সেক্ষপিয়ার কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"আছে স্বর্গে মর্ত্তে বহু বিষয় এমন,
দর্শন দেখিনি যাহা স্বপ্নেও কখন।"

---

(১) গীতার অনুবাদ।

ঘোরতর নিরুৎসাহে 'রৈবতক' রচনা শেষ করিয়া ও প্রেসে পাঠাইয়া বেদব্যাসকে এখানে বিশ্রাম দিব, কি 'কুরুক্ষেত্রে' হাত দিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। শেষে স্থির করিলাম কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া রৈবতকের ভাগ্য পরীক্ষা করিব। আমি এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়ি নাই। ভাগবতের ও মহাভারতের উপাখ্যানভাগের বঙ্গানুবাদ পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল তাহাই 'রৈবতকে' বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এখন পূজনীয় পণ্ডিত অভয়ানন্দ তর্করত্নের সাহায্যে মূল সংস্কৃত গীতা ক্রেণীতে পাঠ করিলাম। দেখিলাম শাঙ্কর ভাষ্যে ও অন্যান্য টীকায় প্রবেশ করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়, এবং মূল পড়িয়া যাহা বুঝি তাহাও হারাইয়া ফেলি। অতএব টীকাকে প্রণাম করিয়া আমি মূলই পড়িতে লাগিলাম, এবং তাহা যেন ভাল বুঝিতেছিলাম। অনেক সময় মূলের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে একটুক তর্ক করিতাম। তিনি একদিন বলিলেন যে এক নিমন্ত্রণে তাঁহাকে একজন পণ্ডিত তাঁহার কাছে আমি গীতা পড়িতেছি কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে আমি তাঁহার কাছে গীতা পড়িতেছি কি তিনি আমার কাছে পড়িতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে, কারণ আমি গীতা যেরূপ বুঝি, এবং তাহার যেরূপ সরল ব্যাখ্যা করি, কোনও পণ্ডিতের তাহা বুঝিবার কি করিবার সাধ্য নাই। পণ্ডিত মহাশয় শিষ্য-বাৎসল্যবশতঃই অবশ্য এরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আমরা ইংরাজী দর্শনের ছাত্রগণ যেরূপ সহজে গীতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, বর্ত্তমান গ্রন্থমুখস্থকারী পণ্ডিতেরা তাহা পারেন না।

তাঁহাদের বিশ্বাস ও শিক্ষা এরূপ লোহ নিগড়বদ্ধ যে তাঁহাদের বিবেকশক্তি পূর্ণ মাত্রায় উন্মেষিত হইতে পারে না এবং তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারেন না। যাহা হউক গীতা যতই পড়িতে লাগিলাম, আমি ততই যেন কি এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, এবং কৃষ্ণভক্তিতে আমার হৃদয় ততই পূর্ণ হইতে লাগিল। গীতা শেষ করিয়া আমি বহুদিন পর্যান্ত আত্মহারাবৎ ছিলাম। হায়! এই অমূল্য গ্রন্থ ফেলিয়া আমরা ইউরোপীয় দর্শন ঘাটিয়া জীবন কাটাইয়াছি। খৃষ্টের মত সকল মনুষ্যই বুঝি জীবনের এক অংশ ঘোরতর অরণ্যে কাটাইয়া থাকে। আমার বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আমার জীবনও আমি ইউরোপীয় দর্শনের অরণ্যে অপচয় করিয়াছি। গীতা পাঠ করিয়া আমি যেন এক নূতন জীবন লাভ করিলাম, এবং আমার স্ত্রীকে পড়াইবার জন্য উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। শুনিয়াছি এক জন বিখ্যাত অঙ্কবিৎ সমগ্র সেকস্‌পিয়ার পড়িয়া বলিয়াছিলেন—what does it prove? ইহার দ্বারা কি প্রমান হয়? আমার স্ত্রীও গীতার অনুবাদ বহুকষ্টে পড়িয়া বলিলেন—"মানুষ কি এমন ধর্ম্ম মতে চলিতে পারে?" তাঁহার হৃদয় একটি ক্রোধাভিমানের বেঙ্গল-বেঙ্ক। গীতা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা দিতেছে। স্ত্রীলোক অভিমান ত্যাগ করিবে,—তাহাও কি হয়? অভিমানহীনা আমার এক বন্ধুপত্নীকে তিনি "কলাগাছ" আখ্যা দিয়াছিলেন। 'রৈবতকের' কৃষ্ণ অন্যের কাছে ভাল লাগে নাই। গীতার অনুবাদ পড়িয়া কৃষ্ণের ধর্ম্মটাও আমার আপনার স্ত্রীর কাছে ভাল লাগিল না।

হাই কোর্টের একজন উকিল গীতা পড়িতেই পারিতেন না। তিনি বলিতেন—"তোমরা কি গীতা গীতা কর, ও কৃষ্ণকে এত ভক্তি কর? অর্জ্জুন যুদ্ধ কর্‌বে না, কৃষ্ণ তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যুদ্ধ করালে,

ও ভারতটা নিক্ষত্রিয় কর্‌লে! কৃষ্ণ অপেক্ষা অর্জ্জুন কত মহৎ ছিল!" কোনও গ্রামে রামায়ণ গান হইতেছিল। একটি গঞ্জিকাসেবকের স্ত্রী তাহাকে উহা শুনিতে যাইতে জিদ করিতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। আর একদিন তাহার স্ত্রী দুটি টাকা তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া নিতান্ত জিদ্ করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল। পালা মারীচবধ। রামচন্দ্রের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সীতা লক্ষণকে যাইতে জিদ করিতেছেন। গাঁজাখোর স্বগত বলিল—"লখা! তুই যাস্ না!" সীতা যতবার লক্ষণকে যাইতে বলিলেন, সে ততবার বলিল—"লখা! তুই যাস না!" শেষে সীতা গালি দিলে লক্ষণ চলিয়া গেলেন। যখন রাবণ আসিয়া সীতার হাত ধরিল তখন—"কোথায় প্রাণের দেবর লক্ষণ!" বলিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন; তখন গাঁজাখোর লাফাইয়া উঠিয়া কোমরে গামোছা জড়াইয়া বলিল—"নে যা হারামজাদি বেটিরে! লখা যাবে না, তারে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাঠায়ে দিলে। আর এখন বলে—কোথায় প্রাণের দেবর লক্ষণ! মোকদ্দমা হয়, তার খরচ এ দুই টাকা দিলাম। পরে যা লাগে আমি সব দেব।" উকিল মহাশয়ের সাক্ষাতে 'গীতা' অভিনীত হইলে তিনিও হয় ত বলিতেন—"দে খুনী বেটাকে ফাঁসি। হাইকোর্টে আপিল করে, মোকদ্দমা আমি চালাব।"

যাহা হউক যদি অনুবাদটি অন্য কাহারও উপকারে আসে, এই বিশ্বাসে উহা ছাপিলাম। উহাতে আমার নিজের বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই নাই। মূল সংস্কৃতের যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছি মাত্র। তথাপি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পর্য্যন্ত এই অনুবাদের এবং তাহার আরম্ভে গীতার যে সারাংশ অধ্যায়ে অধ্যায়ে বুঝাইয়া দিয়াছি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

"Babu Nobin Chandra Sen, the well-known author

of the "Battle of Plassey" and other poems, has, we are glad to note, utilized his powers in the direction of religio-philosophical subjects. The present book contains a translation of the *Gita*, and is a master-piece, showing, as it does, the depth of his learning and the extent of his ingenuity in translating that abstruse poem, without affecting the letter or spirit of it. The poet gives in the preface a clear *resume* of the *Gita*, and thus helps the reader in mastering its contents. Babu Nobin Chandra Sen's rendering of the *Gita* is admirable, and a splendid acquisition to the poetical literature of the day"—*The Indian Mirror*.

দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিলেন—"তোমার গীতা তোমার বউ ঠাকুরাণীর কাছে তোমাপেক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের বাঙ্গলা ভাগ অনেক স্থানই মুখস্থ। শিবপূজার পর এক বা দুই অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুর ঘরে পাঠ করেন। গীতার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে; তুমি অর্দ্ধ মূল্য করিয়া দিলে, তোমার গীতারই ভূয়ো প্রচার হয়।" তদনুসারে আমি এক টাকা হইতে উহার মূল্য আট আনা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তখন 'গীতাহুজুগ' কলিকাতায় বঙ্কিম বাবুর প্রতিভায় আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের ঢক্কানাদে কাণ ফাটিতেছে। অর্দ্ধ মূল্যেই বা আমার অনুবাদের খবর কে লয়? সর্ব্বাপেক্ষা গীতানুবাদের শ্রমের সফলতা আমার সেই অন্ধ পিতৃব্য হইতে পাইয়াছিলাম। তিনি বৃদ্ধ, অন্ধ, এবং বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী হইলেও তাঁহার শিক্ষা সেকালের পাঠশালার উপরে যায় নাই। আমি গীতার অনুবাদ করিয়াছি শুনিয়া তিনি এক খণ্ড চাহিয়া পাঠান, এবং তাঁহার

পুত্রের মুখে উহা শুনিয়া তাহার দ্বারা আমাকে লিখিয়া পাঠান যে তাঁহার বৃদ্ধ বয়স। এ যাবৎ তাঁহার বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদিতে বৎসর তিন চারি বার গীতা পাঠ হইয়াছে, এবং গীতা পাঠের দক্ষিণা দিয়াছেন। কিন্তু গীতা কি তিনি এত দিন জানিতেন না। আমার অনুবাদের দ্বারা প্রথম জানিলেন। অতএব তিনি আমার মস্তকে পিতৃব্যের মত সস্নেহ সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষন করিয়াছেন। বহুদিন পরে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শিশিরকুমার ঘোষ লেখেন—"তোমার গীতা পড়িলাম। তুমি অনুবাদে অতিশয় শক্তি দেখাইয়াছ। এমন কঠিন বিষয় এরূপ সহজ ভাষায় ও সহজরূপে প্রকাশ যে সম্ভব তাহা আমার পূর্ব্বে বোধ ছিল না। তুমি বলেছিলে গীতা জগতের ধর্ম্ম, গীতা কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ একত্রিত হইতে পারে। তাই বটে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম অল্প কয়েক জনের জন্য।" মাননীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন —"আপনার গীতা আমার সহধর্ম্মিণীকে দিয়াছি ও পাঠ করিতে বলিয়াছি। 'গীতা' যে বাঙ্গলা পদ্যে এত সংক্ষেপে অথচ এত সুন্দর ও বিশদরূপে অনুবাদিত হইতে পারে ইহা আপনার অনুবাদ না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। এই সানুবাদ গীতাখানি বাঙ্গালি মাত্রেরই গৃহে থাকা বাঞ্ছনীয়।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উত্তর ও পশ্চিম-ভারত বেড়াইতে গিয়া কানপুর ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছি। একটি ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালি আমার ট্রেন কক্ষের পার্শ্বে আসিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কি বাবু নবীনচন্দ্র সেন ?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম— হাঁ। তখন তিনি বলিলেন তাঁহার নাম মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। এলাহাবাদের কোনও বন্ধুর পত্রে আমি এই ট্রেনে কানপুরে আসিব শুনিয়া তিনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন। আমি কাহারও ঘাড়ে পড়িয়া

অতিথি হইতে ভালবাসি না। বিশেষতঃ তাহাতে স্থান-দর্শনেরও অসুবিধা হয়। অতএব এলাহাবাদের অনেক বন্ধু কানপুরে তাঁহাদের বন্ধুদের কাছে পত্র লিখিতে চাহিলেও আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। তথাপি ইঁহার একজন বিশেষ বন্ধু আমার অজ্ঞাতে ইঁহাকে খবর দিয়াছেন। ইনি কানপুরের স্বনামধন্য ডাক্তার। তিনি আমাকে সভৃত্য তাঁহার প্রকাণ্ড 'ওয়েগনেটে' লইয়া তুলিলেন। আমি তথাপি তাঁহাকে বলিলাম যে আমাকে একটি ভাল হোটেলে লইয়া গেলে আমি তাঁহার কাছে অনুগৃহীত হইব। তিনি বলিলেন যে তিনি আমাকে একটি হোটেলেই লইয়া যাইতেছেন। একস্থানে গাড়ী থামাইয়া বলিলেন—"ঐ ডান দিকে কানপুরের প্রধান ইংরাজী-হোটেল, এবং ঐ বাম দিকে গরিব আমার 'ডিস্‌পেন্সারি' এবং গৃহ। আপনি ক্ষেপিয়াছেন যে আপনি হোটেলে যাইবেন। দেখিবেন আপনাকে দেখিবার জন্য প্রায় দুই শত ভদ্রলোক আমার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছে।"

তাঁহার 'ডিস্‌পেন্সারির' মত এমন সুসজ্জিত ডিস্‌পেন্সারি আমি দেখি নাই। উহা যেন একটি Drawing room, বিলাতি সাজে সজ্জিত বৈঠকখানা। উহা দেখাইয়া তাঁহার দ্বিতলস্থ প্রশস্ত বৈঠকখানায় আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম মাথায় মাথা লাগিয়া ভদ্রমণ্ডলি বসিয়া আছেন। আমাকে বড়ই অভ্যর্থনা করিলেন, এবং একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আমার গীতার অনুবাদের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া আমার গীতার অনুবাদ তিনি কিরূপে দেখিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। কারণ গীতা তখনই মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে গীতা কয়েকখানি ইতিমধ্যেই কানপুরে আসিয়াছে, এবং তিনি বাঙ্গালা জানেন। তখন তিনি গীতা সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ

করিলেন। সমবেত ভদ্রলোকগণ এরূপ আত্মহারা হইয়া শুনিতেছিলেন যে যখন মাথার উপর ঘড়ীতে দশটা বাজিল, তখন সকলের চেতনা হইল; ছয়টা হইতে চারি ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে, কাহারও জ্ঞান নাই। আমার তখনও পর্য্যটনের পরিচ্ছদ—সেই অর্দ্ধ ফিরিঙ্গি হেট কোট। আর এ পরিচ্ছদে গীতার ব্যাখ্যা! আমি যে এলাহাবাদ হইতে একটান কানপুর আসিয়াছি, এবং জলবিন্দুও গ্রহণ করি নাই, এ কথা মহেন্দ্র বাবু পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আমার জন্য কত রকমেরই জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতক্ষণ আমাকে মুখ প্রক্ষালন করিতে পর্য্যন্ত দেন নাই বলিয়া তাঁহার স্বামীকে ভৎর্সনা করিলে তিনি বলিলেন—"এ দোষ আমার না তাঁহার। কেবল আমি ত নহে, দু শ ভদ্রলোক এরূপ কাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। এমন আলাপের শক্তি আমি আর কাহারও দেখি নাই। চারটি ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে, আমরা এতগুলি লোক কিছুই জানিতে পারি নাই।" পর দিন প্রাতে তিনি তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আমাকে কানপুর দেখাইতে যাইতেছিলেন। পশ্চিমের শীতকালের প্রাতঃকাল। উপরে অভঙ্গ নীলাকাশ; প্রভাতানিল শরীরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। প্রাণের আনন্দে আমি একটুক হাল্‌কা কথা বলিলাম। মহেন্দ্র বাবু বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে কি মহাশয়! কাল সেই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত গীতা, এবং উচ্চ অঙ্গের দর্শন, আর এখন এ কথা!" দেখিলাম ইনিও 'ভারতী' ঠাকুরাণীর মত সত্যভামার শয্যা-কক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতা শুনিতে চাহেন। আমি বলিলাম—"মহেন্দ্র বাবু! আপনি নিজে ডাক্তার। আপনার কিরূপে এমন ভুল হইতেছে! মানুষের তিনটা জিনিস আছে—দেহ, মন, আত্মা। এই তিনটারই, চরিতার্থতা

চাহি। গীতায় কিম্বা দর্শনে মানুষের ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না।” সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণ, যে পর্য্যন্ত Memorial well, যাহাতে বিদ্রোহী সিপাহিরা ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সমক্ষে না গিয়াছিলাম, নানাবিধ খোস গল্পে কাটাইলাম। সে দিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার বৈঠকখানায় দর্শকের ভিড় আরও বেশী হইল। আবার গীতার কথা, উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মের ও দর্শনের কথা উঠিল। আবার রাত্রি দশটা হইল। তখন মহেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—“আপনারা তাঁহার এক মূর্ত্তি মাত্র দেখিলেন। তাঁহার আর এক মূর্ত্তি আছে। তিনি আজ সমস্ত প্রাতঃকাল ছয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত আমাকে হাসাইয়াছেন।” তখন যুবক সম্প্রদায় বলিলেন—“তবে এখন গীতা ও দর্শন থাকুক। আমরা সেই মূর্ত্তিটি কিছুক্ষণ দেখি।” কিন্তু এরূপ গভীর দার্শনিক আলাপের পর লঘু আলাপ মুখে আসিবে না, এবং রাত্রিও অনেক হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের কাছে ক্ষমা চাহিলাম। এই দূর দেশে গীতার অনুবাদের জন্য এই অভ্যর্থনা পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল।

(২) 'পলাশির যুদ্ধের' ইংরাজি অনুবাদ।

আমি ফেণী আসিবার কিছু দিন পরে কুমিল্লার একজন ইংরাজ কার্য্যোপলক্ষে ফেণী আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি 'পলাশির যুদ্ধের' প্রণেতা নবীন বাবু?" আমি বলিলাম—"লোকে তাহা বলে। আপনি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" তিনি বলিলেন—"কুমিল্লার সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ফ্রেঞ্চ মলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি একজন আপনার একান্ত কবিতানুরাগী (great admirer)। তিনি আপনার "পলাশির যুদ্ধ" লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তিনি আমার সহবাসী। আমরা কুমিল্লায় এক গৃহে বাস করি। তিনি দিন রাত্রি যেরূপভাবে আপনার "পলাশির যুদ্ধ" পড়িতে পড়িতে পাগলের মত গৃহ পরিক্রমণ করেন, আপনার একবার দেখা উচিত। তিনি আপনার বহি ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ করিতেছেন, এবং সময়ে সময়ে উহা আমাকে ও কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট স্ক্রীণ সাহেবকে—তিনিও একজন সাহিত্যানুরাগী—পড়িয়া শুনান। 'পলাশির যুদ্ধ' প্রণেতা আপনিই নবীন বাবু শুনিলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন এবং আপনার কাছে পত্র লিখিবেন।" তিনি তাহার পর সত্য সত্যই পত্র লিখিলেন। ডাক্তার ফ্রেঞ্চ মলেনের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার। মেডিকেল কলেজের 'প্রফেসার' ছিলেন। রোগীর পথ্যের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য লেঃ গবর্ণর এসলি ইডেনের ঘোরতর প্রতিবাদ করাতে, প্রতিহিংসা-পরায়ন ইডেন তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ হইতে বদলি করিয়া মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরাইতেছেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট" ডাক্তার মলেনের পক্ষাবলম্বী

ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ইডেন ইহার বেশী তাঁহার ক্ষতি করেন নাই! অতএব জানিতাম তিনি একজন কেবল বিচক্ষণ ডাক্তার নহেন, একজন অতিশয় যোগ্য লোক, সাহসী, সুলেখক, এবং সহৃদয়। দেশীয় রোগীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, এবং তাঁহাদেরই জন্য তিনি এত দূর আত্ম-বলিদান স্বীকার করিয়াছিলেন। এ আত্ম-বলিদানও নিষ্ফল হয় নাই। ইডেন রোগীর পথ্য-ব্যয় বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম পত্রেই আমাকে লিখিলেন যে তিনি আমার একজন গুণানুরাগী (admirer)। তিনি 'পলাশির যুদ্ধের' অনুবাদ করিতেছেন, এবং উহা ছাপাইবার সময় ভূমিকায় তিনি দেখাইবেন যে গভর্ণমেণ্টের আমাকে বাঙ্গালার Poet Laureate (রাজকবি ?) করা উচিত। মন্দ কথা কি? 'বঙ্গদর্শন' আমাকে বাঙ্গালার 'বাইরন' আখ্যা দিয়াছিলেন, ইনি তাহার উপর 'পোয়েট লরিয়েট' করিতে চাহেন। গোদের উপর বিস্ফোটক। তিনি 'কাদম্বরীর' উপাখ্যান ইংরাজী কবিতায় রচনা করিয়া তাহার নাম 'চন্দ্রাপীড়' দিয়া ছাপিয়াছেন। তাহার এক কপি আমাকে উপহার পাঠাইলেন। দেখিলাম ইংরাজী ভাষা ও কবিতার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তাহার পর আমি শিবিরে এক দিন 'ম্যাপের' মত একটা গোলাকার পার্শেল পাইলাম। খুলিয়া দেখি তিনি রঙ্গমতীর 'চন্দ্রকলার গীতের' এক অদ্ভুত ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকে চন্দ্রকলার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার এক ছবি আঁকিয়াছেন। ছবির নিম্নে এক পার্শ্বে বাঙ্গালা শ্লোকটি অতি সুন্দর বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অপর পার্শ্বে তাহার ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। ছবি অবশ্য বাঙ্গালি রমণীর ছবির মত হয় নাই, ইয়োরোপীয় মহিলার মত হইয়াছে। যদিও তিনি তাহাকে সাড়ী পরাইয়াছেন, সাড়ীর ভঙ্গিও বিলাতি

রকমের হইয়াছে। ঠিক যেন কোন ইউরোপীয় রমণী বাঙ্গালির সাড়ী পরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপে ১২ মাসের ১২ শ্লোকের ১২টি স্বতন্ত্র ভাবের ছবি ১২ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন।

এই উপহার পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলাম যে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ বাঙ্গালি উভয় জাতির যে এক স্থানে বাস করিয়াও একাধারে তেল জলের মত স্বতন্ত্র ও সম্পর্কহীন, তাঁহার ছবিগুলিই তাহার একটা শোচনীয় প্রমাণ। তিনি বাঙ্গালি ভদ্র মহিলা কখনও দেখেন নাই। কেমন করিয়া তাহাদের ছবি আঁকিবেন। অতএব ছবিগুলি বিচিত্র ভঙ্গিতে সাড়ী পরিহিতা ইউরোপীয় মহিলার ছবি হইয়াছে। ডাক্তার ফ্রেঞ্চ মলেন, কেবল 'আইরিশমেন' নহেন, কিরূপ 'আইরিশমেন' তাঁহার নিম্ন উদ্ধৃত পত্রখানিতে পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমার উক্ত পত্রের উত্তরে তিনি এই পত্র খানি লিখিয়াছিলেন।

I am glad you liked my illustrations; but you did not say you liked the translation. I did not quite understand the original and this together with the exegencies of verse prevented a literal translation. I do not think I have the book in which the other verses you refer me to occur. My servants are, I am afraid, given to relieving me of many of my volumes. I want very much to see your work on Krishna. I wrote a sonnet on his death (taken from the Mahavarat) which I will send you—a mere translation. It would take a great deal of money to print the illustrations I sent you as they are so large. I can draw small illustrations for you, whenever you require them.

When you are bringing out some new edition of some of your works, I could make some drawings for them—they might add to the interest of the work, the more so for being done by a European. But I should have originals to copy from. I could at the same time give an English translation of the lines referring to the picture. I am always scribbling—whatever weighs on my mind I put into a sonnet or verses of some kind. Some of the grievances of the Indian people have been running through my head lately, and in my note book I find them more or less crystalized in the following sonnets.

REDUCTIONS.

Each high official, in his office chair, must needs
Some large economies suggest—since gold is
Scarce in the Imperial chest, and starving
Peasants no new tax can bear : no chicken-
Heart hath he the weak to spare.

I find this sonnet has not been completed. My reason for giving the sonnet is to illustrate my expression of astonishment that no Bengali poet has ever, as far as I know, put forth the real grievances of the people in verse. My daughter in her last letter wrote the following ludicrous couplet—

I wish the English Government
Could be kicked out of Parliament.

Here is the last speech of my son (aged 5 years and 2 months)—

Ladies & Gentlemen,—I am going to see how O'Brien is getting on. I shall knock Balfour into a cocked hat; I shall get Reggy Dillon to squash him.

Balfour shall be put in jail; and if he goes to England I will kick him out. If he remains in Dublin I will thrash him; and if he is in the train I will thrash him still. The Lord Mayor will be out in a few days. I will speak to the Government; I will say :—"Good morning! now I have come to talk to you about the Lord Mayor; I will smash you if you don't take the Lord Mayor out of prison; and if you don't do it I will throw hot and cold water on you. I will die for my country like O'Brien. Marrie my queen will help me to drive the Saxons into the sea.

Ladies and gentlemen, I must think I have finished my speech. I will not allow the priests to be put in jail. I will go over to them and say :—"You need not be afraid, Priests! Parliament is going to be opened and I will get up and make a speech. I am king of Ireland, I am not afraid of the Government.

I do not blame the police; the government tell them to fire on the people, and it is not their fault.

I am going to make a meeting here in Dublin; now I shall be in it myself. I will go to the Town Hall and speak— I don't care what they say,—if they say a word I will thrash them.

I shall be a soldier and die in the battlefield, I will thrash Balfour here in Dublin; I will get my hounds

to tear him in pieces. Now ladies and gentlemen, I have finished. God save Ireland."

এই পত্র পাইয়া তাঁহার কাছে আমার বহি এক সেট উপহার পাঠাই। তখনও 'রৈবতক' প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এই উপহার পাইয়া যে পত্রখানি লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

I must apologise for leaving your last letter so long unanswered, and for not thanking you sooner for your handsome present of your own works ; but the fact is, I was waiting till the "Battle of Plassey" should be copied, that I might send it to you. It has been copied, but as a number of corrections are required I will not send it just now. Mr. Skrine, our Magistrate, is looking through it now and will assist me in revising it. He says,—"It is well worth publishing." It speaks well of the original when this can be said of the translation. I wish to translate some other pieces of yours, as English readers would like to see several subjects treated. Perhaps the piece on the Prince of Wales. I give you outside a hurried translation I made of one of your pieces the other day. If there is any particular piece, you would like translated, you might let me know.

আর্য্যদর্শন

From the *Bengali of* Nabin Chandra Sen.

O cruel soul which thus hast deeply sinned
In trailing through the dirt a glorious name,
Since we the sons of this degenerate Ind

For such proud title are too meanly tame !
As well in some parched desert waste exclaim,
'Spring waters' in the thirsty traveller's ear
For in that glorious word lies buried fame
Whose trumpet sounded once sublime and clear
Through this most ancient land where now we
crouch in fear.
Thou sure hast heard the sound in some deep dream
Thy mind o'erstrain'd with passion for our cause,
And newly landed from that treacherous stream
Where crocodiles await with open jaws.
The pilot careless of stern reason's laws.
But on that stream only the echo floats,
The sound itself has sunk into the maws
Of adverse ages, and what History quotes
Are but the echoes of sublime and godly notes.
Yet even from much erring History's pages
We get a glimpse of that eventful time
Beyond the limit of succeeding ages
When this most ancient land was in its prime—
Before the swell of sycophancy's shine
Filled all the plain from Indus to the sea,
Or night became the cloak of hideous crime,
And every year brought widening poverty
For this is now the Ind which all around we see.
Oft times, indeed, I doubt if this can be
The land where Kurukshetra's fight was fought
By those great heroes whose decendants we
Assert ourselves. The fateful theme is fraught

With pit-falls such as if some sage had sought
To prove mere fire-fly phantoms of the night
Direct descendants of those orbs which taught
The fields to flower, the Sea to show its might
When first Creation made the black of chaos bright
Sound not the name of Aryan in our ears
For those were warriors of the shaft and bow
Who loved that title in those far off years
When joy was visible in Ganges' flow,
And in the flowers that every where did grow;
While we who tread the India of to-day
Ply the slave's pen, oppressed by hungry woe;
And India's Soil is turned to barren clay
Where Disease stalks around and kills her helpless prey.

Great Lord of all the Worlds including this!
Men say that thou art strong and just and good,
Yet hast thou made this holy land of bliss
The home of millions calling loud for food;
And that proud name which like Himala stood
A monument of power and peace and fame,
Has long been swept away before the flood
Of alien conquerors, till now the name
Stands like a phantom sphinx, a monument of shame.
So let the name of Aryan slumber deep,
Ne'er wake it by the merest whisper—yet!
Be calm and silent tho' thou still must weep
Since India's Sun of glory long hath set:
It is not needful that thou shouldst forget,

But utter not that grief inspiring sound,—
Ganges some future day will cease to fret
When Freedom's sun shall take an upward bound
And spread its hallow'd light o'er India's holy
ground.

ক্রমে 'পলাশির যুদ্ধের, সর্গের পর সর্গ ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ আসিতে লাগিল। তিনি Alexandrine ছন্দে উহার অনুবাদ করিয়াছেন, এবং তাহাতে এরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়াছেন যে অনুবাদ মূল অপেক্ষা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর বোধ হইতেছিল। কিন্তু একেত 'পলাশির যুদ্ধের' জন্য আমি গবর্ণমেণ্টর কাছে 'চিহ্নিত লোক', তাহাতে তিনি কেবল দূর (free) অনুবাদ করিতেছেন এমন নহে, তাহার উপর আগুন ঢালিতেছেন। আমি দেখিলাম এই অনুবাদ প্রকাশিত হইলে আমার ফাঁসির ব্যবস্থা হইবে। তিনি লিখিলেন যে ভূমিকায় উহা 'পলাশির যুদ্ধের' দূর অনুবাদ বলিয়া লিখিবেন। তৎ-সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিলেন—

"—mind you, I can translate your stanzas literally one by one with no great difficulty, so that if you prefer me to do so I will. But I have never seen such a literal translation of any poem which was worth reading save for the story."

তাহা ঠিক। কোনও কবিতার ঠিক অক্ষরে অক্ষরে কবিতায় ভাষান্তর করা অসম্ভব। তাঁহার আর একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

MEDICAL COLLEGE, CALCUTTA.
Decr. 14, 1885.

I send you a translation of the fourteen stanzas that refer to the interview between Clive and Britannia. Eight of them you have not previously seen and the others I have altered. Of course I do not consider it a trouble, but on the contrary a great pleasure to translate your poem; and now that I see I was so much mistaken in not translating the 8 verses referred to above. In the first instance, I am still more anxious to translate all the other verses that up to this I have left untranslated. I see from your notes to my manuscript that in many places I failed to grasp the real meaning of the original, not to speak of the mistakes on every page made by the copier. But the plant on which the tender flower of poetry blooms requires a lot of nursing particularly where the work to be done is that of translating another's work, so that I fear if left to myself I shall not succeed in making a presentable translation of the Battle of Plassey. You say I have not dealt fully with Meermadan or Mohanlal's (I forget which for the moment and cannot find your letter) soliloquy; also that I did not explain fully Mirjaffar's treachery during the battle. Could you not give me a literal translation of the parts alluded to? I desire to have every verse readable, and this I think I can do by re-writing those that are weakly rendered. Above all, I think it necessary to translate every verse in the original. I

thought the description of Britannia could not be rendered into the flat-sounding English tongue without a number of repetitions, but I am well satisfied with the manner I have done it ; and having studied the original I agree with those who think it about the best part of the book. Please send me a literal translation of the General's soliloquy. My translation of your prize poem was the better for your help, for you suggested phrases I other-wise should not have thought of, besides making the meaning of the original clear. My brother at Ulwar was delighted with my rendering of your prize poem. It would be a most pleasing thing for me if I could do your epic, the Battle of Plassey, even moderate justice, whereas should I present the public with a worthless rendering of a high class poem I should get censured deservedly. I think it a pity you sent back the manuscript, if you intend helping me to revise the poem, as you will not remember the parts needing revision most. I fear, as you say, the latter stanzas are too free, but I was in a hurry to complete my pleasant task. The songs for the most part will have to be rewritten. I could not be very literal in describing the "Battle" as I wished to keep the same metre, it being well adapted for the description of such scenes ; but where I failed to retain important parts of the story I should like to make up the difficiency.

Please make all necessary corrections in the verses I send you.

ইহার পর তাঁহার অনুবাদ সংশোধিত করিয়া ছাপিবার জন্য ছুটী লইয়া তিনি বিলাত যান। সেখান হইতে আমাকে লেখেন যে তিনি Alexandrine ছন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'পলাশির যুদ্ধের' উপযুক্ত অনুবাদ করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি Browning র দেড়গজি ছন্দে তাহার নূতন করিয়া অনুবাদ করিবেন। আমি শুনিয়া অবাক হইলাম! কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়! একবার একখানি বহি ছন্দে অনুবাদ করিয়া, আবার নূতন একছন্দে তাহার দ্বিতীয়বার অনুবাদ করিতে যাওয়া কি অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কথা! আমি তাঁহাকে লিখিলাম এরূপ পরিশ্রম গ্রহণ করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তিনি যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহার যেরূপ সংশোধন উপরোক্ত পত্রে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু ইওরোপীয় জাতির শ্রমপ্রিয়তা আমরা আলস্যপরায়ন জাতি বুঝি না। তিনি আমার পত্র পাইয়া বিরক্ত হইলেন। তাহার পর তাঁহার অনুবাদের কথা আর কিছু শুনি নাই। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন যে আমি তাঁহাকে নিরুৎসাহ করাতে ও সাহায্য না করাতে তিনি দ্বিতীয় অনুবাদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব অনুবাদও প্রকাশিত করেন নাই। তিনি এমন সুন্দর অনুবাদটি প্রকাশ করিলেন না, আর আমরা বাঙ্গালি এক লাইন অপাঠ্য কবিতা লিখিলে তাহা কেমন করিয়া একটা সভা ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইব এবং তাহা ছাপাইব, তজ্জন্য আহার নিদ্রা বঞ্চিত হই।

'রৈবতক' প্রকাশিত হইলে উহা উপহার পাইয়া তিনি আর একখানি ছবি আঁকিয়া 'রৈবতকের' কয়েক ছত্র অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 'বৈরতকের' দ্বিতীয় সর্গে যেখানে আলুলায়িত-কুন্তলা সুভদ্রা ঘোরতর ঝটিকায় শৃঙ্গপ্রান্তে উপলখণ্ডে বসিয়া স্থির নয়নে ঝটিকাচ্ছন্ন সান্ধ্য

আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, তিনি সুভদ্রার এই ছবি আঁকিয়াছেন, এবং ছবির নিম্নে আমারই কবিতা কয় ছত্রের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

একবার আমি তাঁহার একখানি 'ফটো' চাহিলে, তিনি তাঁহার পত্রের শেষভাগে তাঁহার, পত্নীর ও পুত্র কন্যাদের এক চিত্র আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের কাছে কি আমরা মানুষ? ইনি একাধারে ডাক্তার, কবি ও চিত্রকর।

——:০:——

আবার চট্টগ্রামে।

ইংরাজী ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে এক দিন প্রাতঃকালে ডাকে চট্টগ্রামের কমিশনার লায়েল সাহেবের একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে—"তোমার দেশস্থ কার্য্যাধ্যক্ষের জড়বুদ্ধিবশতঃ (through the stupidity of your managers at home) চট্টগ্রাম সহরস্থ তোমার সুন্দর দ্বিতল গৃহখানি কল্য রাত্রিতে ধরাশায়ী হইয়াছে। আমি অদ্য প্রাতে ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার ও এঃ ইঞ্জিনিয়ারকে লইয়া পরীক্ষা করাইলাম। তাঁহারা বলিলেন উহা ভিত্তি পর্য্যন্ত ভগ্ন করিয়া আবার নূতন প্রস্তুত না করিলে সংস্কার অসম্ভব। তোমার বড় গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তুমি নিজে এখানে না আসিলে ইহার পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য হইতে পারে না। এজন্য আমার পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট পদে তোমাকে অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিতে আমি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলাম।" অকস্মাৎ মস্তকে বজ্রপাত হইলে আমরা পতি পত্নী অধিক বিস্মিত কি ব্যথিত হইতাম না। স্ত্রী শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাড়িতাহতবৎ পত্র হস্তে দীর্ঘিকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বাড়ীখানি বিস্তৃত হাতাযুক্ত, বড় সুন্দর, ও ইংরাজ অঞ্চলে স্থিত। তাহার ক্রয়ে ও সংস্কারে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। দশ হাজার টাকায়ও সেরূপ একখানি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন আমি প্রথমবার পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট হইয়া আমার যৌবনের প্রথম ভাগের তিন বৎসর এই গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। ইহার তলায় তলায়, কক্ষে কক্ষে, এমন কি ইষ্টকে ইষ্টকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আমাদের দাম্পত্যজীবনের প্রথম স্মৃতি অঙ্কিত ছিল। আমার চট্টগ্রামে

অবস্থিতি কালে এই গৃহ প্রায় প্রত্যহ আনন্দ ধ্বনিতে ও সঙ্গীতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নাট্যশালার মত মুখরিত থাকিত। প্রায় প্রত্যেক শনিবারে ও আফিস বন্ধের দিনে নিমন্ত্রিত বহু বন্ধুর আনন্দ উৎসবে পূর্ণিত থাকিত। যখন বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে ঘোরতর বিপদস্থ হইয়া ১৮৭৭ সনের জুন মাসে এই গৃহ জীবনের মত ত্যাগ করিয়া মৃতকল্প অবস্থায় কলিকাতায় চলিয়া যাই, তখন এই গৃহতল আমার পতিপ্রাণা অভিমানিনী পত্নীর কত অশ্রুতে সিক্ত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখস্থ হৃদয়াকার উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত সুবৃহৎ গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পরাজি দেখিয়া তিনি সুখের সময়ে কত হাসিয়াছিলেন, এই বিপদের সময় কত কাঁদিয়াছিলেন। পরদিন খুড়তত ভ্রাতা রমেশের পত্র আসিল— "আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ দ্বিতল গৃহখানি পড়িয়া গিয়াছে।" আমার যাবৎ জীবন তিনিই আমার দেশস্থ কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি ভিন্ন আমার দুই সহোদর মাত্র জীবিত—প্রাণকুমার ও অতুল। ইহারা দুইটিই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ও সংসার-জ্ঞান-বর্জ্জিত। খুড়তত ভাইও প্রায় তাই। তবে তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস যে তিনি একজন খুব বুদ্ধিজীবী লোক। তাঁহার এ আত্মাভিমান আমার ও তাঁহার এক প্রকার সর্ব্বনাশের কারণ। লায়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে তাঁহারই জড় নির্বুদ্ধিতায় গৃহখানি ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু তিনি সে কথা কখনও স্বীকার করিবার লোক নহেন। অতএব তিনি সকল বিষয়ে যেমন করিয়া থাকেন, এই দুর্ঘটনাও "দুরদৃষ্টের" ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। দুরদৃষ্টটা এরূপ—বৎসর বৎসর তিনি অট্টালিকার ছাদ মেরামত করান, কিন্তু কার্য্যটী এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় যে প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময়ে গৃহে জল পড়ে, এবং ভাড়াটিয়া ভদ্রলোক আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আমি জ্বালাতন হইয়া অগত্যা ছাদের উপর টিনের বা খড়ের ছাউনি দিয়া এ অসাধ্য সাধন

করিতে বলি আমার বংশীয় এক খুড়া ডিঃ ইঞ্জিনিয়ারকে। তিনি এবার 'এষ্টিমেট' করিয়া দিয়া আমাকে লিখিলেন যে এরূপ ভাবে মেরামত হইলে যদি জল পড়ে তবে তিনি দায়ী হইবেন। সমস্ত বৎসর গৃহখানির মেরামত হইতে দেওয়া হয়। শ্রাবণ মাস; চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য বর্ষা; একুশ দিন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। এ সময়ে ছাদ খুঁড়িয়া জল নির্গমের পয়ঃপ্রণালীগুলি বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ দারুণ বর্ষায় কিরূপে জল সরিতেছে, গৃহটীর কি অবস্থা হইতেছে, একবার দেখিতেও একটি প্রাণী যায় নাই। আমার বন্ধু সব-রেজিষ্টার আফিস হইতে আপন বাসায় ফিরিবার সময় দেখিতেছেন যে জল ছাদ হইতে নির্গত হইতে না পারিয়া উপরের তলার বারণ্ডার বৃহৎ পিলারের গায়ে ঝরণার মত শত সহস্র ধারায় ছুটিয়া পড়িতেছে। তিনি ডাকিলেন। গৃহ হইতে কাহারও সাড়া পাইলেন না। বলিলেন—"এ গরীবের কি দেশে কেহ নাই? এ সুন্দর মূল্যবান বাড়ীটি যে এখনই পড়িয়া যাইবে।" সে রাত্রিতেই বারণ্ডার পিলারগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া উপরের ছাদে, পরে নীচের ছাদে পড়িয়া যায়, এবং সমস্ত গৃহের দেয়াল সেই পতনে খণ্ড খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যায়। ইহাই ভ্রাতার মতে দুরদৃষ্টের "জড় নির্ব্বুদ্ধিতার" ফল। প্রথম সংবাদটিও তিনি দেন নাই, দিয়াছেন লায়েল সাহেব। হায়? এ সকল উদার হৃদয় ইংরাজ কোথায় গেল? এখন কোনও কমিশনার কি কালা ডেপুটীর প্রতি—এরূপ সদাশয়তা প্রকাশ করিবেন? তাঁহার প্রস্তাব মতে চটগ্রামে এই দ্বিতীয়বার পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট হইয়া গিয়া গৃহখানির এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পতি পত্নী বড় কাঁদিলাম। প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। এরূপে দশটি হাজার টাকার একটি সম্পত্তি এক রাত্রিতে ধ্বংস হইয়াছিল। লোকে অর্থব্যয় করিয়া গৃহ নির্ম্মান করে। আমার এমন ভাগ্য যে অর্থব্যয় করিয়া আমাকে সেই

ভগ্ন দেয়াল সকল ভাঙ্গিতে হইল। আবার যে সেরূপ একটা দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব, আমার সাধ্য ছিল না। একটা একতলা গৃহমাত্র সেই ভিত্তির উপর নির্ম্মান করিলাম। উহার সম্মুখের বারণ্ডার গোল আকার, এবং পার্শ্বের উভয় কক্ষের বিচিত্র আকার দেখিয়া ইংরাজ কালেক্টর স্ম্যাক সাহেব উহা আমার একটি কবিতা (poem of a house) আখ্যা দিয়াছিলেন।

লায়েল সাহেব তখন ছুটী লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে ওল্ডহেম (Mr. Oldham) কমিশনার হইয়া আসিয়াছেন। কি বিচিত্র নাম! বৃদ্ধ বরাহ! তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রেই বুঝিতে পারিলাম যে তিনি দন্তের দ্বারা বেদ উদ্ধার না করিয়া থাকিলেও পৃথিবীটা যে উদ্ধার করিতে পারেন, এ দম্ভ তাঁহার আছে। বৃহৎ দীর্ঘ মূর্ত্তি, জাতিতে আইরিশ, ইংরাজের দ্বারা পুরুষানুক্রমিক পদদলিত হইলেও তিনি অভিমানে ইংরাজের ইংরাজ। প্রথম আলাপ—

তিনি। আপনি পূর্ব্বেও এ আফিসে পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন?

উ। হাঁ।

তিনি। সে সময়ে কার্য্যপ্রণালী কিরূপ ছিল? সালতামামি ইত্যাদি কে মুসাবিদা করিত?

উ। কমিশনার তখন জজও ছিলেন। তাঁহার অবসর বড় কম ছিল। আমি করিতাম।

তিনি। আমি সেরূপ কোনও সাহায্য, এমন কি আপনার কাছে 'নোট' পর্য্যন্ত, চাহি না। যদি কোনও বিষয়ে আপনার মত আমি চাহি,—তবে আমি জিজ্ঞাসা করিব।

উ। তবে আপনার আর পার্শনেল এসিষ্টাণ্টের প্রয়োজন কি?

তিনি। তিনি কেবল আফিস সুশৃঙ্খলা মতে রাখিবেন।

উ। তাহা ত সেরেস্তাদার ও হেডক্লার্কও পারে।

তারপর অন্যান্য বিষয় আলাপের পর আমি উঠিয়া আসিবার সময়ে তিনি বলিলেন—"যদি সালতামামি মুসাবিদা করিতে চাহেন, তবে আবকারির সালতামামির জন্য তাগিদ আসিয়াছে। আপনি এটি মুসাবিদা করিলে আমি বাধিত হইব। অন্যান্য সালতামামি আমি নিজেই মুসাবিদা করিব।"

আমার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বের কল্পনা এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমি প্রাচীন আদালত চট্টগ্রাম সহরের উত্তরস্থ এক উচ্চ পর্ব্বত হইতে আনিয়া কমিশনার ও জজের এমটি সম্মিলিত 'কোর্ট' অট্টালিকা মঞ্জুর করাইবার সময়ে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলাম যে ইহাতেও সুবিধা হইবে না। বিশেষতঃ উপস্থিত অট্টালিকাতে কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের সমাবেশ হইতেছে না। অতএব অতঃপর "ফেয়ারী হিলের" (পরী পর্ব্বতর) উপর সমস্ত আফিসের জন্য একটী সম্মিলিত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। সেই 'ফেয়ারী হিলের' উপর ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া কলিকাতার 'সেক্রেটারিয়েটের' অনুকরণে এক বৃহৎ অট্টালিকা ইতিমধ্যে নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত আফিস তাহাতে স্থাপিত হইয়াছে। এই অট্টালিকাশীর্ষ পর্ব্বতের প্রায় পাদমূল দিয়া কর্ণফুলী প্রবাহিতা। অদূরে সমুদ্র, পশ্চাতে সৌধশীর্ষ-পর্ব্বত-সজ্জিত নগর ও দূরে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্য শোভা! অট্টালিকার পাদমূলে পর্ব্বতশিরে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। গিরিপার্শ্ব কাটিয়া এরূপ রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে যে অনায়াসে গাড়ী পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে পারে। অট্টালিকার যে স্থান হইতে দেখিবে, প্রাকৃতিক শোভায় তোমার নয়ন প্রাণ মুগ্ধ করিবে। কিন্তু পার্শনেল এ'সিসটাণ্টের কক্ষ হইতে এই শোভা কিছুই দেখা যায় না। তাহার উভয় পার্শ্বে কেরাণীদিগের কক্ষ। ঠিক যেন

বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত কৃষ্ণবলরামের মধ্যে সুভদ্রার স্থান। সর্ব্ব দক্ষিণ কক্ষ হইতে—মরি! মরি! বিশ্বশিল্পীর তুলিতে চিত্রিত চিত্রের মত কি মনোহর দৃশ্য! এইখানে বহুদূরাগতা প্রবলা পয়স্বিনী কর্ণফুলী নদীর সহিত সাগর সঙ্গম। সঙ্গমের উপরিভাগে শ্যাম মরকত খণ্ডের মত একটি দ্বীপ নদীগর্ভে ভাসমান এবং সঙ্গমের বামপার্শ্বে শ্যাম বৃক্ষ-গুল্ম-তৃণ-সমাচ্ছন্ন একটী পর্ব্বত। তাহার উপর আমি প্রথমবার পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট থাকিবার সময়ে যে 'স্বাস্থ্যনিবাস' (Sanitarium) মঞ্জুর করাইয়া গিয়াছিলাম, তাহা নির্ম্মিত হইয়া একটি শ্বেতবর্ণ রাজহংসের মত শোভা পাইতেছে। তাহার পশ্চাতে গগনপটে মেঘমালার মত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গিরিশ্রেণী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া যতদূর দেখা যায় গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ শোভা বিস্তার করিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বহুক্ষণ অতৃপ্ত নয়নে মাতৃভূমির এই অতুলনীয় দৃশ্যাবলী দেখিয়া আমার কক্ষে ফিরিয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া, তখনই আমার চক্ষের অবস্থা ভাল নহে, এবং এই কক্ষটিতে আলোকের অভাব বলিয়া, আমি সেই দক্ষিণের কক্ষটিতে আমার সিংহাসন সরাইবার অনুমতি চাহিয়া কমিশনরের কাছে এক 'নোট' পাঠাইলাম। তিনি তখনই অনুমতি দিলেন, এবং পরদিনই সেই কক্ষে গিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম রবিবার জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করিয়া সোমবার যাইব। সোমবার আফিস হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে অপরাহ্নে আমার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! আমি আপনার প্রিয় কক্ষটী দেখিতে আসিয়াছি। আহা! কি সুন্দর 'পিকনিকের' স্থান! সমস্ত অট্টালিকার মধ্যে এই কক্ষটি শ্রেষ্ঠ। আমি আপনার নির্ব্বাচনীশক্তির প্রশংসা করি।" তখন অপরাহ্ন রবিকরে সাগর-সঙ্গম তরল চঞ্চল সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছিল। নদীগর্ভস্থ দ্বীপে ও পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে তাহার আভা প্রতিফলিত হইয়া উহারাও

সুবর্ণমণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল। কমিশনার স্থির নেত্রে আমার কক্ষ-বারাণ্ডা হইতে সেই অবর্ণনীয় শোভা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কক্ষ-দ্বারের সম্মুখে কাঠের ফ্রেমে পর্দ্দা থাকাতে এই দৃশ্য কিছুই দেখা যায় না। আমি বলিলাম তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার এজলাস এই কক্ষে স্থানান্তরিত করি। তিনি বলিলেন—"না। আমি আপনাকে বেদখল করিতে চাহি না। তবে সময়ে সময়ে এই বারাণ্ডায় বসিয়া এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে আপনার অনুমতি চাহি।" তিনি হাসিতে হাসিতে বারাণ্ডার ইষ্টক নির্ম্মিত রেলিঙ্গের উপর বসিয়া সেই শোভা দেখিতে দেখিতে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পরও মধ্যে মধ্যে এরূপ করিতেন। আমার এ কক্ষ দেখিয়া জজ সাহেবও তাঁহার এজলাস, অট্টালিকার তাঁহার অংশের দক্ষিণ কক্ষে সরাইয়া লইয়াছিলেন।

আমি কার্য্যভার লইবার সময়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্বেতমূর্ত্তি আমার টেবিলের উপর ক্ষুদ্র গন্ধমাদন সদৃশ এক 'ফাইল' দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ আবকারির সালতামামি পড়িয়া আছে। সালতামামির মরসুম আসিয়াছে অবধি ভয়ে আমার জ্বর হইয়াছে।" আমি সেই দিনই উহা মুসাবিদা করিয়া দিলাম। কমিশনার পর দিবস উহা ফেরত দিবার সময়ে লিখিলেন—"উৎকৃষ্ট মুসাবিদা (a very good draft)। এখন কষ্টম সালতামামি আরম্ভ করুন।" উহা ফেরত দিবার সময়ও ঐরূপ প্রশংসা করিয়া লিখিলেন—"এখন পোর্ট সালতামামি আরম্ভ করুন।" সমস্ত সালতামামি তিনি নিজে লিখিবেন বলিয়া,এরূপে ক্রমে ক্রমে আমার দ্বারা সমস্তই লেখাইলেন। চট্টগ্রাম ডিভিসন হইতে কাগজ কলমের শ্রাদ্ধকারী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কাছে এই সময়ে চৌদ্দ পনরটি সালতামামি যায়। যাহা হউক আমি মনে করিলাম যে অন্ততঃ রাজস্ব বিবরণী

(Revenue Annual Report) এবং সাধারণ শাসন বিবরণী (General Administration Report) তিনি নিজে লিখিবেন। কারণ এ দুটি বড় গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু যেই কালেক্টরেরা রাজস্ব সালতামামি পাঠাইতে লাগিলেন, তিনি তাহার মুসাবিদার ভারও আমার উপর দিলেন। ইহার মুসাবিদা পাইয়া লিখিলেন "a most excellent draft (অতিশয় উৎকৃষ্ট মুসাবিদা)। এখন 'সাধারণ সালতামামি'ও লিখিতে আরম্ভ করুন।" এটিই বৎসরের শেষ রিপোর্ট। শুধু তাহা নহে, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে সাত দিনের মধ্যে ইহার মুসাবিদা দিতে হইবে। আমি বলিলাম যে পূর্ব্ব বৎসর লায়েল সাহের স্বয়ং মুসাবিদা করিতে পনর দিন লইয়াছিলেন। আমি বাঙ্গালি তাহা কেমন করিয়া সাত দিনে করিব। যাহা হউক আমি সাত দিনেই উহা শেষ করিয়া দিলে তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া এই মুসাবিদার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়া, আমার কাছে এ বৎসর এরূপ সাহায্য পাইলেন বলিয়া বড় ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে পরের বৎসর হইতে সমস্ত সালতামামি তিনি নিজে লিখিবেন।

চাঁদপুরের তখনকার সবডিভিসনাল অফিসার আমার পূর্ব্ব বারের পার্শনেল এসিস্‌টেণ্টের সময়ে আমার দ্বারাই ডেঃ মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। সিদ্ধবিদ্যা নামধারী এবং নিজেও খোসামুদিতে সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া আমি তাঁহার নাম 'সিদ্ধবিদ্যা' রাখিয়াছিলাম। এরূপ প্রসিদ্ধ তৈল-ব্যবসায়ী বলিয়া তিনি কোনও কুকার্য্য করিতেই সঙ্কোচ করিতেন না। চাঁদপুরে দুটি এমন কার্য্য করিয়াছেন যে তাহাতে তৈল ভাসিয়া গিয়াছে, এবং জজ কালেক্টর উভয়ে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে রিপোর্ট করিয়াছেন। কালেক্টর সালতামামিতে পর্য্যন্ত তাঁহার ঘোরতর বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন এবং কমিশনার উহাতে লাল চিহ্ন দিয়া উহা উদ্ধৃত

করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি সিদ্ধবিদ্যার কাঁদা কাটায় লাচার হইয়া তাহা করি নাই। কমিশনার আমার মুসাবিদার উক্তরূপ প্রশংসার পর আমাকে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চাঁদপুরের সব ডিঃ অফিসারকে আপনি চিনেন কি ?" উত্তর—"হাঁ"। প্রশ্ন—"তিনি আপনার বন্ধু ?" উত্তর—"হাঁ"। প্র—"আপনি সেজন্য আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাংশ উদ্ধৃত করেন নাই ?" উ—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে আমি ঐরূপ করি নাই। আমি যতদুর বুঝি, সালতামামি কেবল বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের দোষ গুণ উল্লেখের স্থান উহা নহে। বিশেষতঃ সব ডিঃ অফিসারের কাছে আপনি যে সকল কৈফিয়ত চাহিয়াছেন তাহা এখনও আসে নাই। তাহা আসিলে তাঁহার সম্বন্ধে আপনার মত পরিবর্ত্তনও হইতে পারে। না হয়, সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে স্বতন্ত্র রিপোর্ট করিতে হইবে। এই সালতামামির সঙ্গেও কর্ম্মচারীদের দোষগুণ সম্বলিত এক তালিকা যাইবে। তাহাতেও তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিতে হইবে। এ কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে কালেক্টরের মন্তব্য এস্থানে উদ্ধৃত করা আমি উচিত বিবেচনা করি নাই।" তিনি আর কিছু বলিলেন না। মুসাবিদা ফেরত আসিলে দেখিলাম যে তিনি লিখিয়াছেন—"এ স্থানে আমার আদেশ মত কালেক্টরের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। যাহা হউক, যখন উহা করা হয় নাই, তখন এভাবেই থাকুক।" কেবল 'সিদ্ধবিদ্যার' অনুকূল ব্যাখ্যা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তিনি কাটিয়া দিয়াছেন। তাহা তিনি কাটিবেন ও আমাকে তিরস্কার করিবেন আমি জানিতাম। ব্যাখ্যাটি তাঁহাকে 'সিদ্ধবিদ্যার' উদ্ধারার্থ জানান আবশ্যক ছিল। তিনি কোনও রূপ 'নোট' দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব এ স্থানে উহা না লিখিলে আর জানাইবার অবসর

আমি পাইতাম না। তিনি মন্তব্যটি কাটিলেন বটে, কিন্তু কথাগুলিন জানিলেন। 'সিদ্ধবিদ্যা' কিরূপ কৈফিয়ত দিবেন আমি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কৈফিয়ত আসিলে কমিশনার আমার মন্তব্য মতে মত প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধবিদ্যা প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া 'মনসার ভাসানের' কালীনাগের মত কিঞ্চিৎ লাঙ্গুল অর্থাৎ 'সামারি ক্ষমতা' ইত্যাদি হারাইয়া বদলি হইলেন। জানি না অন্য কোনও পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট এরূপ সাহস এরূপ কমিশনারের কাছে করিতেন কিনা।

সালতামামির সঙ্গীয় কর্ম্মচারীদের দোষ গুণের তালিকার উপর কমিশনার লিখিয়াছিলেন—"লইয়া আইস।" কাগজ পত্র সহ আমি কেরানিকে পাঠাইলাম। তিনি তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন যে তিনি আমাকে চান। আমি কেরানির কাছে এ সম্বন্ধীয় সার্কিউলার ইত্যাদি বুঝিয়া লইয়া তাঁহার কক্ষে গেলাম এবং বলিলাম যে কর্ম্মচারীদের নামের পার্শ্বে অঙ্ক দিয়া কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে, এবং মন্তব্যের ঘরে তাঁহার মন্তব্য লিখিতে হইবে। তিনি বলিলেন—"আমি আপনার (নোয়াখালীর) কালেক্টরকে প্রথম স্থান দিতে চাহি। আপনার মত কি?" আমি বলিলাম—"আমি অবশ্য আমার কালেক্টরের পক্ষপাতী।" তাহার পর—

প্র। আপনি ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীর মধ্যে 'সিনিয়ার' কে?

উ। আমি জানি না।

প্র। আশ্চর্য্য! আপনি কি কখনও 'সিভিল লিষ্ট' দেখেন নাই!

উ। না।

প্র। (আরও আশ্চর্য্য ভাবে) কেন?

উ। আমার তৎ সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার আছে। উহা যে দেখে তাহার সহজেই মনে হয় যে তাহার উপরে যে সকল কর্ম্মচারী আছে,

তাহাদের স্থান কখন শূন্য হইবে, এবং সে 'প্রোমোশন' পাইবে। আমার মতে মনের এ ভাবটি বড় সাধুভাব নহে। আমার প্রোমোশন যখন গবর্ণমেণ্ট দিবেন তখন পাইব। অতএব এই ভাগ্যগ্রন্থ (Book of fate) দেখিয়া কি ফল?

প্র। (একটুক হাসিয়া) আমি যেরূপ মনে করিয়াছিলাম আপনি তাহার অপেক্ষাও বড় দার্শনিক। আচ্ছা, আপনি কোন বৎসর এ চাকরিতে প্রবেশ করেন, অবশ্য তাহা জানেন?

উ। ১৮৬৮।

প্র। আমি জানি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৬৭র লোক। অতএব তাঁহাকে আপনার উপরে স্থান দিতে আপনার কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

হটকারিতা ও অবিবেচনা (impulsiveness and indiscretion) আমার দুটি চরিত্রগত মহৎ দোষ। উহা আমার জীবনের বহু সন্তাপের ও বিপদের কারণ। এতক্ষণ তিনি বেশ হাসিয়া হাসিয়া আমোদ করিয়া কথা বলিতেছিলেন। যেই এ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম যে এ বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীকে আমার উপরে স্থান দিলেও আমার আপত্তি নাই, তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর হইল। তিনি একটুক শ্লেষযুক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"দেখিতেছি আপনি আপনার 'সার্ভিসে' উন্নতি সম্বন্ধে বড়ই নির্লিপ্ত।" বুঝিলাম কথাটা ভাল বলি নাই। তিনি তাহাতে চটিয়াছেন। অতএব এই সুর বদলাইতে হইবে। আমি একটুক হাসিয়া বলিলাম—"কিয়ৎ পরিমাণে আমি যথার্থই নির্লিপ্ত বটে। কারণ আমার 'রায় বাহাদুর' 'খাঁ বাহাদুর' হইবার আকাঙ্ক্ষা নাই। আর উন্নতির আশাই বা কি? আমি ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আছি, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটই মরিব। আমার জীবনের একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহা বড়

ক্ষুদ্র। তাহাও আপনি জানিতে চাহিলে আমার বলিবার আপত্তি নাই।” তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি জানিতে পারি কি?” আমি হাসিয়া বলিলাম—“আপনার গবাক্ষপথে যে সকল পাহাড় দেখা যাইতেছে, আমার আকাঙ্ক্ষা, যে উহার একটিতে একখানি ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মান করি, এবং চাকরি শেষ হইলে গৈরিক ধারণ করিয়া উহাতে বাস করি। স্ত্রী আমার জন্য রন্ধন করিবেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সাহিত্য সেবা করিব।” তিনি একথা শুনিয়া আবার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—“বটে! ইহাই কি আপনার মোক্ষ (summum bonum)?” আমি বলিলাম উহার অধিক আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। প্রশ্ন—“কেন এই মোক্ষ লাভ করেন না? উহা ত অতিশয় সহজ সাধ্য!” উত্তর—“না। আমি সাত বৎসর যাবৎ একটি পাহাড়ের বন্দোবস্তি চাহিতেছি। কিন্তু পাইতেছি না।” তিনি এবার সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়া একটি পাহাড় নির্ব্বাচন করিতে আমাকে বলিলেন, এবং উহার বন্দোবস্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রস্থান করিলাম।

তিনি আফিস লইয়াও আমাকে বড় জ্বালাতন করিয়াছিলেন। জুন হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত সালতামামির সময় এবং চট্টগ্রামের জ্বরের সময়। আফিসও তখন বড় দুর্ব্বল। যোগ্য লোক বড় কম। তিনি কিছুতেই তাহাদের ছুটী দিবেন না, এবং সামান্য দোষের জন্য জরিমানা করিতে লাগিলেন ও পদচ্যুতির ধমক দিতে লাগিলেন। আমি ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমি কেরানিদের অযথা প্রশ্রয় দিতেছি। আমি বলিলাম, যে জ্বরে কাঁপিতেছে তাহাকে ছুটী না দিয়া আফিসের

টেবিলের উপর মাথা ফেলাইয়া অচেতন অবস্থায় রাখিয়া কি ফল। তিনি এরূপ অবস্থায়ও যদি তাহাদের বেতন দণ্ড করেন তবে অবশ্য সে বেতন আমি দণ্ড দিব। কারণ তাহারা আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং প্রায় সকলেই দরিদ্র। আমি চক্ষে দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাদের এরূপ দণ্ডভোগ করিতে দিব? তিনি তাহার পর তাহাদের কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট তলব করিতে লাগিলেন। আমি প্রতিবাদ করিলাম যে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে দুই টাকা করিয়া দুই তিনটি ভিজিট না দিলে তিনি তাহাদের সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া এঃ সার্জ্জনের কৈফিয়ত তলব করিলেন। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এক সার্কিউলার দেখাইলেন। তখন তিনি তাঁহার উপর ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিলেন যে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, এবং কেরানিদের বিনা ভিজিটে চিকিৎসা না করিলে তাঁহার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। এঃ সার্জ্জন কাঁদিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে রক্ষা করিলাম। এমন সময়ে এক দিন কমিশনার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তাঁহারও জ্বর হইয়াছে। অতএব কিছু দিন কমিশনারি আমাকে করিতে হইবে। তাঁহার কাছে এক খণ্ড কাগজও পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি কাঁপিতেছিলেন। "কাঁচা দুগ্ধ কাঁচা পাণি; জ্বরের ঔষধ জানি,"—মনসার পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের জ্বরের এ প্রেস্কৃপসন আছে। আমিও তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলাম যে চট্টগ্রামের জ্বর মারাত্মক নহে। তিনি দুই এক দিন কেবল সাগুমাত্র খাইয়া লঙ্ঘন দিলে এবং একটুক কুইনাইন খাইলে সারিয়া যাইবে। তিনি বলিলেন—"সুপও খাইব না? তবে যে মরিয়া যাইব।" যাহা হউক মরিলেন না। কিন্তু এখন হইতে কেরানিদের উপর চোট পাট কমিল। আমাকে

বড় অনুনয় করিয়া বলিলেন যে বোধ হইতেছে আফিসে কার্য্যের কোনও সুব্যবস্থা (system) নাই,—তাহা ঠিক—আমি যদি একটা ব্যবস্থা করি তিনি বড় বাধিত হইবেন। তখন আমি নূতন ব্যবস্থা করিয়া আফিস নানা বিভাগে বিভক্ত করিলাম এবং এক মাস এই ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খলামতে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, তিনি তাহা অনুমোদন করিয়া আমাকে খুব ধন্যবাদ দিলেন।

এরূপে চার মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে মিঃ ওল্ডহাম আমাকে রাখিতে চাহেন কিনা গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুকূল উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব আমিও এ পদে স্থায়ী হইব বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি। এক দিন জজ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। আমি এ কায পছন্দ করি কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে আমি পূর্ব্বেও একবার এই পদে ছিলাম। তখন পছন্দ করিয়াছিলাম, এখন করি না। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি আবার অবিবেচনাবশতঃ বলিলাম, যে তখন পার্সনেল এসিষ্টেণ্ট কমিশনারের একজন প্রকৃত পার্সনেল এসিষ্টেণ্ট (ব্যক্তিগত সহায়) ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা (confidential adviser) ছিল, এখন একজন কেরানি মাত্র। শুনিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। দেশে তখন ইংরাজ মহলে বাঙ্গালি-বিদ্বেষ-বাতাস 'ইলবার্ট বিলের' বিভ্রাট হইতে বেগে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"কমিশনারের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা! কি হাস্যকর কথা! হাঁ, তখন সত্যসত্যই পার্শনেল এসিষ্টাণ্টেরা কমিশনার এবং কমিশনারেরা পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। আমি আশা করি সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের কথামতে যে কমিশনার চলিবে সে তাহার পদের অযোগ্য হইবে, এবং তাহার পদ হইতে পদাঘাতে তাড়িত হইবার যোগ্য হইবে।"

তিনি কাঁপিতেছিলেন। আমার বোধ হয় তিনি কোনও পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের দ্বারা কিছু শিক্ষা পাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া স্বর বদলাইয়া বলিলাম—"সে কথা ঠিক। এখন কমিশনারেরা সকলেই যোগ্য লোক। মিঃ ওল্ডহ্যামের মত কমিশনার পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের কেন মত চাহিবেন?" তিনি একটু শ্লেষ ভাবে বলিলেন—"আমি ভরসা করি মিঃ ওল্ডহাম তাঁহার পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবেন না।" তিনি আমাকে ক্রোধের সহিত—"গুড্ বাই বাবু!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার বোধ হইল যে মিঃ ওল্ডহাম আমার মুখাপেক্ষী হইতেছেন বলিয়া ইংরাজ মহলে কাণাকাণি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব পালা প্রায় শেষ।

তাহার দুই এক দিন পরে কমিশনার চট্টগ্রামের 'নওয়াবাদ' সম্পর্কীয় একটি বিষয়ে আমার মত চাহিলেন। আমি বুঝিলাম আমার শেষ পরীক্ষা উপস্থিত। কেরানিরা সকলে আমাকে ধরিল যে আমি যেন কোনওমতে গবর্ণমেণ্টের "নওয়াবাদ নীতির" বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ না করি। তাহা যদি করি, আমাকে নিশ্চয় কমিশনার এ পদে রাখিবেন না। নওয়াবাদ জরিপ তখন চট্টগ্রামের সর্ব্বনাশ করিতেছিল। কেবল এ পদে থাকিবার অনুরোধে আমি এই মহাপাতক সম্বন্ধে অসরল মত প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলাম এবং তীব্র ভাষায় তাহার দোষ দেখাইয়া দিয়া 'নোট' লিখিলাম। কমিশনার তাহা পড়িয়া লিখিলেন—"এই বিচক্ষণ 'নোট' কেবল প্রজার পক্ষ দেখিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট পক্ষ মোটেও দেখে নাই। যাহা হউক উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে পিঃ এঃ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমি তাহা অনুমোদন করিলাম।" তাহার সপ্তাহ পরে কমিশনার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন আমার স্থানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, আমাকে ফেণী ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, যে আমি কেরানির কার্য্য অপেক্ষা শাসন কার্য্য ভালবাসি। তিনিও বলিলেন—"তাহা ঠিক! এ কেরানিগিরি আঁপনার মত প্রতিভাশালী লোকের (gifted man) কার্য্য নহে। আমি ফেণী পরিদর্শন কালে আপনার কার্য্যাবলী দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমি কোনও বাঙ্গালি ডেপুটী কালেক্টারকে এরূপ লোকহিতকর কার্য্যে সক্ষম দেখি নাই। আপনি এ কয়েক মাস মাত্র এখানে আছেন। ইহাতে আপনার কার্য্য সকলই নষ্ট হইতেছে। আপনি যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছেন তাহার ঘেরা স্থানে স্থানে পড়িয়া গিয়াছে। এমন কি আমার গাড়ীর গরু 'রিজার্ভ' দীঘির জলে নামিয়া ঘাস খাইতেছিল, অথচ আপনার স্থলাভিষিক্ত কিছু বলিতেছিলেন না।" আমি বলিলাম যে তিনি আমার 'সার্ভিসের' প্রতি অবিচার করিতেছেন। তাহাতে আমার অপেক্ষা যোগ্যতর কর্ম্মচারী আছেন। ঘেরা যে পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয় আমার স্থলাভিষিক্ত দেখেন নাই, এবং কমিশনারের গাড়ীর গরুকে তিনি বোধ হয় 'বিশিষ্ট জন্তু' (privileged animals) মনে করিয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তাহা নহে। আমার এই দীর্ঘ চাকরিতে বাঙ্গালির মধ্যে আমি আপনার মত এমন যোগ্য কর্ম্মচারী দেখি নাই।" আমি তাঁহাকে আবার ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিতে তিনি বলিলেন—"নবীন বাবু! আপনি অবশ্য যাইবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।"

আমার পরবর্ত্তী আসিলেন, এবং কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া বলিলেন, যে কমিশনার তাঁহার কাছে আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ইচ্ছা লোকে যেন জানে যে তাঁহার পার্শনেল এসিষ্টেণ্টের তাঁহার কাছে কোনওরূপ প্রতিপত্তি নাই। এ কথা

তাঁহাকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন এবং কোনও রূপ 'নোট' দিতে তাঁহাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন।

চার্জ দিয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে তিনি আমাকে আবার লিখিয়া পাঠাইলেন। আমি ঘোরতর বৃষ্টির মধ্যে তাঁহার শৈলস্থ ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি আজ আমার প্রতি বড় সসম্মান ব্যবহার করিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! আমি জানি, আমি আপনার মত কর্ম্মচারী আর পাইব না, এবং আপনার মত স্পষ্ট-বাদী দেশীয় লোকের সংস্রবেও আর আসিব না। আমি এত দিন ভারতবর্ষে কাটাইলাম, অথচ ভারতবর্ষের কিছুই জানি না বলিলে চলে। অতএব আপনার সঙ্গে আমি নানা বিষয়ে একটু দীর্ঘ আলাপ করিতে চাহি।" তখন তিনি পাটনার কালেক্টর মেটকাফ সাহেবের মত আমার সঙ্গে সামাজিক, ধার্ম্মিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি প্রথমতঃ এরূপ বিষয়ে আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ করা আমার নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া অসম্মত হইলাম। তিনি তাঁহার সম্মানের (honour) দোহাই দিয়া বলিলেন, তিনি বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আমার ঘোরতর মতভেদ হইলেও তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া, বরং আমাকে অধিক সম্মান করিবেন। তখন আমি তাঁহাকে মেটকাফ সাহেবের মত আমাদের স্ত্রী অবরোধ, ইংরাজ বাঙ্গালির মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ইত্যাদি বিষয়ে সরল অন্তঃকরণে বুঝাইলাম। তাঁহার তর্কের স্রোত ক্রমে মন্দ হইয়া আসিল। তিনি শেষে নীরবে গবাক্ষ পথে প্রাকৃতিক শোভার দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। তাহার পর আমি বিদায় চাহিলে আমাকে বড় সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া বলিলেন—"আমি জানিতাম যে এ সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আমি আপনার কাছে

জানিতে পারিব। আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম যে আপনার সঙ্গে এই আলাপ উপস্থিত হইয়াছিল। আমি আজ অনেক বুঝিলাম, অনেক শিখিলাম, এবং অনেক চিন্তা করিবার বিষয় অবগত হইলাম। এই আলাপ আমার চিরদিন মনে থাকিবে এবং চিরদিন তজ্জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।" এ আলাপের সারাংশ "ভানুমতীতে" দিয়াছি।

এরূপ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে এই চারি মাস কাটিয়া গেল। লায়েল সাহেব আমার ভগ্ন গৃহখানির পুনর্নির্ম্মানের জন্য আমাকে আনিয়া ছিলেন। তাহা করিব দূরে থাকুক, নিশ্বাস ফেলিবারও সময় পাই নাই। তথাপি কয়েকটি দেশহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব কমিশনারের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলাম। (১) ঝর্ণার জল পুষ্করিণীতে লইয়া স্থানে স্থানে সহরে রক্ষিত পুষ্করিণী (reserve tank) নির্দ্দেশ করিয়া জর নির্ব্বাণ করা। (২) চাকতাই খালের মুখে একটি নৌকার পুল (Pontoon jetty) নির্ম্মাণ করা (৩) নগরের বন পরিষ্কার করা। (৪) সীতাকুণ্ড তীর্থটি মোহন্তের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করা (৫) চন্দ্রনাথের বক্ষঃদেশ হইতে যে মন্দাকিনী নির্ঝরিণী প্রবাহিতা তাহার জল সীতাকুণ্ডে লইয়া যাত্রী ও সীতাকুণ্ডবাসীদের জন্য কয়েকটা 'রিজার্ভ পুষ্করিণী' করা (৬) তহশীলদারদের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া সীতা-কুণ্ড, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়াতে তিনটী সব-ডিভিসন খোলা ইত্যাদি। কিন্তু মিঃ ওল্ডহাম লালফিতার শ্রাদ্ধ এবং ত্রিপুরার কালেক্টর গ্রিয়ার সাহেবের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রায় প্রত্যহ ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পশ্চাতের কক্ষে বসিয়া দুই ঘণ্টা কাল তিনি গ্রিয়ার সাহেবের উপকারার্থ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া কাটাইতেন। মিঃ গ্রিয়ার সহ্য করিতে না পারিয়া একবার লিখিলেন যে তিনি তাঁহার

কার্য্যে এরূপ সর্ব্বদা দোষারোপ করিলে তাঁহার কার্য্য করা অসাধ্য। এবার ওল্ডহ্যাম আধ দিস্তা খানিক কাগজে দোষারোপ শব্দের অভিধানিক ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন যে তিনি দোষারোপ (Censure) করেন নাই। কেবল তাঁহার পরিদর্শন ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছেন মাত্র। আমার নোটের উপর লিখিলেন যে আমার জানা উচিত ছিল যে এ সকল কার্য্য ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারের। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার নহেন। তিনি ডিঃ অফিসারদের রাজা। যাহা হউক চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্লাইলের কাছে আমার নোট পাঠাইলেন, এবং তিনি একদিন আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পর আমার কোনও কোনও প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ঢাকা অঞ্চলের একজন দরিদ্র ভদ্রলোক চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে 'রবার' (rubber)ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যবান্ লোক। লুসাই যুদ্ধের সময়ে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। 'রবারের' বিস্তৃতি শক্তি আছ। মানুষের ভাগ্যেরও আছে। রবার বাবু এখন 'রায় বাহাদুর' বাবু। বঙ্গদেশে কেইবা 'রায় বাহাদুর' নহে। শব্দ দুটির অর্থ কি জানি না। কোনও অভিধানেও নাই। তবে অন্যান্য 'রায় বাহাদুরের' সহিত ইঁহার কিছু পার্থক্য আছে। ইনি তাদৃশ অদ্ভুত পদার্থ নহেন। ইনি অশিক্ষিত হইলেও বুদ্ধিমান, ততোধিক হৃদয়বান। তিনি একদিন আমার সঙ্গে আফিসে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি কথায় কথায় বলিলাম যে চট্টগ্রাম তাঁহার সৌভাগ্য ক্ষেত্র। অতএব এখানে তাঁহার কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া যাওয়া উচিত। নোয়াখালির মত ক্ষুদ্র নগরেও 'টাউন হল' আছে। চট্টগ্রামে নাই। 'রঙ্গমহল পাহাড়ে' তখনও 'হস্‌পিটল' হয় নাই। রঙ্গমহল পাহাড়টী ক্রয় করিয়া তাহাতে একটা 'টাউন হল' তাঁহার নামে প্রস্তুত করিতে আমি প্রস্তাব করি। তিনি

বলিলেন যে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লায়েল সাহেবের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা লায়েল সাহেবের নামে কিছু একটা কীর্ত্তিচিহ্ন স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের রেলওয়ে লায়েল সাহেবের কীর্ত্তি। তাঁহার মত কোনও কমিশনারের কাছে চট্টগ্রাম ঋণী নহে। যদিও তখন রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় নাই; লায়েল সাহেবের অমোঘ চেষ্টার ফলে তাহা তখন মঞ্জুর হইয়া কার্য্যারম্ভের আয়োজন হইতেছিল। অতএব আমি এ প্রস্তাব অন্তরের সহিত অনুমোদন করিলাম। স্থির হইল যে রঙ্গমহল পাহাড় ও তৎ শেখরস্থ অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, এবং তাহার হলের সহিত উত্তর দিকের কক্ষ যোগ করিয়া একটা বড় হল করা যাইবে এবং তাহার উত্তর দিকে বহির্ভাগে একটা 'রঙ্গমঞ্চ' (stage) যোগ করিয়া দেওয়া যাইবে। অট্টালিকার পূর্ব্ব পার্শ্বের কক্ষাবলী বাঙ্গালিদের জন্য 'ক্লাব ও লাইব্রেরী' হইবে। এবং 'রায় বাহাদুরের' ইচ্ছামতে পশ্চিম দিকের কক্ষ-সারি অতিথি থাকিবার স্থান হইবে। আমি এই কক্ষের নাম তাঁহার নামানুসারে 'মিত্রালয়' স্থির করি। উভয়ে অনুমান করিলাম যে ইহাতে ২০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু 'রঙ্গ মহলের' স্বত্বাধিকারী উহা বিক্রয় করিবার পাত্র নহেন। অতএব স্থির হইল যে কালেক্টরের কাছে আবেদন করিয়া উহা আইন মতে সাধারণের উপকারার্থ ক্রয় করা হইবে। তিনি সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়া ২০,০০০ টাকা আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। কবি 'বার্ণ' (Burn) বলিয়াছেন যে মানুষের ও ইন্দুরের প্রস্তাব সমান অকিঞ্চিৎকর। ইহার পর দিনেই ওল্ডহেম সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন আমাকে ফেনী ফিরিতে হইবে। আমার পরবর্ত্তী মহাশয় আসিলে আমি তাঁহাকে এ সমস্ত কথা বলিয়া এ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া যাই এবং দেশের আরও

দুই এক জন প্রধান ব্যক্তিকে বলিয়া যাই। কিন্তু হে তৈল! তোমার কি অপূর্ব্ব মহিমা! আজ বাঙ্গালি জাতির তুমিই একমাত্র ভরসা! তুমিই "স্বর্গাপবর্গদে দেবি"! তোমাকে নমস্কার! পরবর্ত্তী মহাশয় এই ২০,০০০ টাকার মধ্যে ২৫০০ টাকা মাত্র লইয়া এক "ওল্ডহেম ইনস্টিটিউট্"—দাঁত সাবধান!—মিঃ ওল্ডহেম গৃহের সম্মুখে নির্ম্মান করেন। তিন টকারান্ত সুমধুর 'ইনস্টিটিউট, শব্দের অর্থ 'ক্লাব'। ওল্ডহেম ইনস্টিটিউট্ বিকল্পে 'বাঙ্গালি ক্লাব'। তাহার সার্থকতা—কয়েকজন নগণ্য বা জঘন্য লোকের সায়হ্নিক তাম্রকূট সেবন এবং কদাচিৎ তাস পরিচালন। আমি ইহার নাম 'ওল্ড ডেমড্ ইনস্টি-টিউট' (Old d—d institute) রাখিয়াছি। উপযুক্ত লোকের উপ-যুক্ত কীর্ত্তি। ওল্ডহেমের কীর্ত্তির মধ্যে পার্ব্বত্য রাজা দুইটির এবং সরল পার্ব্বত্যবাসীদের গ্রীবাচ্ছেদন। তাহা হউক, কিন্তু এই কীর্ত্তির কল্যাণে আমার পরবর্ত্তী ওল্ডহেমের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। রঙ্গপুরের রঙ্গলাল।

ফেনী ফিরিয়া গেলে ওল্ডহেম আমাকে এই পত্র খানি লিখিলেন—

Chittagong 3rd Aug.
1891.

My dear Sir,

I thought your work with me very devoted—I need not say very intelligent—and I am under obligation to you for it. You have I think still to cultivate more soundness and to consider, in matters in which you are much interested the inpulsiveness of your expressions. Your being a local man was to me a distinct

embarrassment. Even were your advice such as I ought to follow in every instance, the position of a Commissioner so influenced is not a good one in the eyes of the ignorant. Like Mr. Lyall I hope often to seek your advice as I frequently have done while you were here, though the example of Mr. Louis's now historical conversion on the subject of Noabad is not an encouraging one. His new views, as you are aware, were not altogether accepted.

In the matter of the local settlement I should be glad for my views and attitude to be fully known. As an Irishman, and in India as a santal officer, I am most familiar with land agitation, and the measure which have met it with success, and with those which have failed. I am in favour of light assessments. I am an enemy to permament alienations by Government (apart from the exceptional cases provided for) and I am entirely opposed to Government giving up any title which belongs to it, that is, aggrandising a few at the expense of the people of India generally, and I am prepared to meet and deal with an agrarian meeting rather than abandon these principles.

Yours sincerely

Sd. W. Oldham.

বলা বাহুল্য আমার উল্লিখিত নওয়াবাদ 'নোট' উপলক্ষ্য করিয়াই এ মহামূল্য 'প্রিনসিপল' (নীতি সকল) বিবৃত হইয়াছিল। জজ সাহেবের ক্রোধের অর্থও পরিষ্কার!

অতএব আমার দেশ হিতৈষিতা, ও আমার নওয়াবাদ 'নোট' আমার ফেণী প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ। লাউইস্ সাহেবের মতের ন্যায় তাঁহার মতের "ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন" ঘটাইতে না পারিয়া থাকিলেও, তাঁহাকে এই নোটের দ্বারা লঘু রাজস্বের পক্ষপাতী করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার প্রকৃতির লোকের এ পরিবর্ত্তনও বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ইহাও তিনি কার্য্যে পরিণত করেন নাই। বরং গুরুতর করভারে পার্ব্বত্য রাজ্যগুলিন—যাহা কিছু দিন পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমি এ পত্রের উত্তরে দেশহিতৈষিতার অভিযোগ সম্বন্ধে দোষ স্বীকার (guilty plead) করিয়া সেক্ষপিয়ারের 'করাইওলেনাসের' উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, বঙ্কিম বাবুর 'পলাশির যুদ্ধের' সমালোচনার ভাষায় লিখিয়াছিলাম যে যখন "স্বদেশ প্রেমে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, আমি রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানি না।"

ইহার কিছু দিন পরে রেলওয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে তিনি ৮০০৲ টাকা বেতনে আমাকে রেলওয়ের জমী লওয়ার ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া লিখিলেন—"But by far the best selection for the post would be Babu Nabin Chandra Sen, the Sub-Divisional officer of Feni. His character and qualifications are well known to Mr. Lyall and the Chief Secretary. He is enthusiastic about the Railway, would like the work, and thoroughly knows the ground. The only necessity for keeping in a place like Feni where work is light, an officer of his calibre is that he knows well how to manage the complications which arise in Tippera Maharaja's estate, but if appointed

Land Acquisation Dy Collector, his advice will still be available in any emergency." বলা বাহুল্য আমিনের কার্য্যের জন্য ৮০০৲ টাকা বেতনযুক্ত একজন ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগের প্রস্তাবের "soundness" (বিজ্ঞতা) গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন না।

বহুকাল পরে তিনি আর এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে যদিও আমি একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোক (gifted man) আমার পরবর্ত্তীর মত কার্য্যক্ষমতা (aptitude for work) অর্থাৎ 'ওল্ডহেম 'ইনস্‌টিটিউট,' নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।" "Verily thou hast said" (চাচা! তুমি ঠিক বলিয়াছ)। উপরোক্ত প্রশংসা রাশির ইহা উপযুক্ত পরিশিষ্ট!! তাহার কারণ পরে বলিতেছি।

—:o:—

আবার ফেণী।

চার পেয়ালায় ঝড়।

ফেণী স্কুল কিরূপে আমি মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা মালিনী মাসীর 'বেসাতি' নীতি অবলম্বন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কার্য্যে ফেনীর উকিল, বিশেষতঃ মোক্তারগণ, আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা আমার কার্য্য প্রণালী সম্যক অবগত ছিলেন। এজন্য আমি চট্টগ্রামে আস্থায়ী ভাবে পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট হইয়া যাইবার সময়ে আমার স্থানাভিষিক্ত, সবডিভিসনাল অফিসারকে স্কুলের 'সেক্রেটারী' না করিয়া উক্ত কার্য্যের ভার আমার এক জন অনুগত উকিলের হস্তে রাখিয়া গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য যে তিনি স্কুলটি ঠিক আমার নিয়মমতে পরিচালিত করিবেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম স্কুলটির শোচনীয় অবস্থা। সে সময়ে ফেনীতে একটি মর্ক টাকৃতি মুন্‌সেফ ছিলেন। লোকটি একটি 'চিজ'। "শৃঙ্গিণাং দশ হস্তেন"—চাণক্য ঠাকুরের এই মহানীতি স্মরণ করিয়া আমি তাঁহাকে স্কুল হইতে দশ হস্ত ব্যবধানে রাখিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার নিজ প্রকৃতি সম্পন্ন একটি উকিলকে তাঁহার সহযোগী করিয়াছিলেন। আমি ইহাকে ফেণীর 'কুর্ম্মাবতার' বলিতাম। উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে। দুজনে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া ফেণীর সমস্ত উকিল, বিশেষতঃ সেক্রেটারী মহাশয়কে হাত করিয়াছেন। লোকটি কিছু সহজ প্রকৃতির লোক। শরীর ও উদর যেরূপ স্থূল, তাঁহার বুদ্ধিখানিও তাই। কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক রোগও আছে। ফলতঃ তিনি একজন "বুড়া বক্কেশ্বর" বিশেষ। উক্ত যুড়ি উকিলদের বুঝাইয়াছেন যে তাঁহাদের সাহায্যেই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। আমি মাত্র বি, এ,। সেক্রেটারী মহাশয় বি, এ, বি,এল।

অতএব স্কুলটিতে তাঁহারা আমাকে একাধিপত্য করিতে দিবেন কেন? অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা দ্বৈতবাদ সহজ। অতএব আমি ফিরিয়া আসিলেও যেন তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে এরূপ করিবার জন্য তাঁহাদের একটা দল কমিটির সভ্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য তাহাতে 'যুগলরূপ'ও আছেন। তারপর মুনসেফের পুত্রদের অবৈতনিক গৃহ-শিক্ষকতা করিবার জন্য ৪০ টাকা বেতনে কুর্ম্মাবতারের পুত্রকে সহকারী হেড মাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং অন্যরূপে আরও ব্যয়বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ দিকে স্কুলের সঙ্গে যে প্রাইমারী স্কুলগৃহ খানি ছিল, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে, এবং লাইব্রেরী হইতে বহু পুস্তক চুরি গিয়াছে। স্কুলের প্রধান দুই শিক্ষক ও আরও কোনও কোনও শিক্ষক এই দলভুক্ত হওয়াতে স্কুলে পড়া শুনা কিছুই হইতেছে না। আমার প্রচলিত নিয়ম সকল একরূপ রহিত হইয়াছে। মোট কথা "কালনিমে মামার" মত লঙ্কাভাগ করিয়া নহে, একাধিকার করিয়া মুন্‌সেফ মহাশয় স্কুলটির সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। আমি সব-ডিভি-সনাল অফিসারকে সভাপতি করিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবামাত্র সেক্রেটারীর পদ আমার পুনঃ গ্রহণ করিবার কথা স্থির ছিল, কারণ শিক্ষা-বিভাগের নিয়মাবলি মতে সভাপতির পদ নাই। কিন্তু কালনিমের ইঙ্গিতে সেক্রেটারী কিছুতেই পদ ত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন না। তাঁহার স্ফীতোদর মুন্‌সেফ এত অভিমানের বাষ্পে পূর্ণ করিয়াছেন যে তিনি তখন 'ইসফের' মণ্ডুকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার উপর, আমি যাহা আদেশ করিতেছিলাম তিনি উহা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। কমিটীতে কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উক্তরূপ দলবৃদ্ধির দরুণ তাহা অগ্রাহ্য হয়। কালনিমে সেখানে নেতা। তাঁহার হাস্যকর ব্যঙ্গপূর্ণ মুখভঙ্গিতে তিনি সকলই উড়াইয়া দেন। তাঁহার দল সমস্ত তাঁহার কোর্টের উকিল। তিনি যাহা বলেন তাহারা নত শিরে তাহাতে সায়

দেয়। দেওয়ানগঞ্জ মুনসেফি ধ্বংসের পালাও তাঁহারা এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। অন্য দিকে সবডিভিসনাল অফিসারের বিরুদ্ধে এরূপ দল হইয়াছে দেখিয়া চাঁদা দাতারা চাঁদা বন্ধ করিয়াছে। আমি পরিমিত-ব্যয়িতার দ্বারা যে টাকা এ তিন বৎসরে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইতেছে। যে সেক্রেটারী মহাশয় আমার নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বাসী ছিলেন, এবং প্রায় প্রত্যহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, এখন তাঁহাকে ডাকিলেও তিনি আসেন না। মুন্‌সেফের গৃহে মন্ত্রণার জন্য দিন রাত্রি অবিরাম যাতায়াত করিতেছেন। সেখানে একটা বিপ্লব কমিটী (Revolutionary Committee) বসিয়া কখনও বা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। সেক্রেটারী মহাশয় মুনসেফের প্রিয় পাত্র বলিয়া চারি দিকে ঘোষিত হওয়াতে তাঁহার পসার বৃদ্ধি হইতেছে। ফেনীর যাবতীয় উন্নতির কার্য্যে—আমার দুইটি প্রধান সহায় —উকিল বসন্ত কুমার দত্ত ও দুর্গাচরণ দত্ত। আমি দুজনকে সহোদরাধিক স্নেহ করিতাম। বসন্ত 'সেক্রেটারী' মহাশয়ের আত্মীয়। তাহারা দুজনে নিতান্ত কোনও দিন তাঁহাকে আমার কাছে মুনসেফ টের না পায় এরূপ ভাবে আনিলে, আমরা যাহা বলিতাম তিনি চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসি-যুক্ত অধোমুখে শুনিতেন। কখনও বা সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়া যাইতেন। তাহার পর মুনসেফের শিক্ষামতে বলিতেন উহা এরূপভাবে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে ঘোরতর অপমানের বিষয় হইবে। আমি চুপ করিয়া কমিটী পরিবর্ত্তনের সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন বৎসর অন্তর নূতন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের দরখাস্ত করিতে হয়। এ দরখাস্তের সময়ে আমি চুপে চুপে নূতন কমিটী নামাঙ্কিত করিয়া দরখাস্ত করিলাম, এবং ষড়যন্ত্রকারীরা আপত্তি করিলে সমস্ত কথা খুলিয়া ইন্‌স্পেক্টার দীননাথ সেন মহাশয়ের কাছে

লিখিলাম। এ কৌশল (coup) অবলম্বন করিয়া, আমি ডিরেক্টর কর্ত্তৃক কমিটীর মঞ্জুরির অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

এমন সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট নন্দকৃষ্ণ বসু ফেণীতে পরিদর্শনে আসিলেন। তিনি একজন 'অমৃত বাজার পত্রিকার' ক্ষণজন্মা শিশির-দাদার চেলা। কাযেই আমার সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃভাব। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহার কাছে, কমিশনারের কাছে ও এমন কি গবর্ণমেণ্টের কাছে পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত পাঠাইতেছিল। তাঁহার জিজ্ঞাসামতে আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। 'কালনিমে মামা' প্রমুখ ষড়যন্ত্র-কারীরাও তাঁহার কাছে গিয়া "পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে" ভাবে তাঁহাদের প্রতি আমার অবজ্ঞা ও অত্যাচারের কথা বলিল। সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতে বাহির হইলে নন্দকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে আমাকে সে সকল উপাখ্যান বলিয়া বলিলেন যে তিনি পর দিন আটটার সময়ে তাঁহাদের তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়াছেন, আমাকেও সেই সময়ে তিনি ডাকাইবেন। আমি হাসিয়া বলিলাম আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহারা কখনও আসিবে না। তাহারা বাঘের সম্মুখে যাইবে, তথাপি এ সকল মুনসেফের-সৃষ্টপ্রলাপ লইয়া কখনও আমার সম্মুখীন হইবে না। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা দেখা যাইবে।" তাঁহার বিশ্বাস তিনি জেলার কর্ত্তা। তাঁহার আদেশ তাহারা না মানিয়া পারিবে না। আমি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রকৃতি জানিতাম। সেজন্য এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাকে আমি বারম্বার নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। 'অফিসিয়েল' কার্য্য সম্বন্ধে তিনি একটুকু শির উচ্চ করিয়া আমার প্রতি অধীনস্থ কর্ম্মচারীভাবে ব্যবহার করিতেন।

পর দিন প্রভাত হইতে আমি চাপকান পাগড়ি আঁটিয়া তাঁহার

তলবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ৮টা, ৯টা, ১০টা, ১১টা বাজিল, কই দীঘির অপর পারের ডাক বাঙ্গালায় একটা মাছিও আসিল না। আমি বুঝিলাম আমার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে, পর্ব্বটা নিষ্ফল হইয়াছে। ১১টার সময়ে কালনিমে মামার তালপাতার সিপাহী সকল (men in buckram) পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া তাঁহার বাসা হইতে চলিয়া গেল। পতি পত্নী বড় হাসিলাম। সে দিন রবিবার, আহার করিয়া সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতে একটুক মধ্যাহ্ন তন্দ্রায় অভিভূত হইয়াছি, এমন সময়ে আরদালি আসিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বড় জরুরি কি কাগজ পাঠাইয়াছেন বলিয়া আমাকে জাগাইয়া উহা আমার হাতে দিল।

আমি অর্দ্ধভুক্ত-তন্দ্রালস-চক্ষে উহা পড়িতে লাগিলাম। নন্দকৃষ্ণ "ষ্টেটুয়ারী সিবিলিয়ান", শোভাবাজার রাজন্যবর্গের আত্মীয় হইলেও শোভাবাজারের "রাধাকৃষ্ণ" সম্প্রদায়ের লোক নহেন। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোক। যত বঙ্গচন্দ্র ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন—নোয়াখালি তাঁহাদের একটা খাস স্থান—কেহই নন্দকৃষ্ণের ছায়া স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে এক নন্দকৃষ্ণই কার্য্যক্ষম ছিলেন এবং আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানিতেন। কিন্তু এ হেন নন্দকৃষ্ণের পর্য্যন্ত মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তিনি মনে করিয়াছেন যে 'মর্কটের' সেনা তাঁহাকে অবমাননা করিয়া আসে নাই, তাহা নহে। তাহারা আমার সঙ্গে সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া ভয়ে আসে নাই। কালনিমের চক্রে পড়িয়া তাহারা তাঁহার দলে তিনি মুনসেফ বলিয়া গিয়া থাকিলেও তাহারা আমাকে ভক্তি করে এবং জানে যে সবডিভিসনাল অফিসারের তুলনায় মুন্‌সেফেরা না মৎস্য, না পাখী। দেখিলাম নন্দকৃষ্ণ অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত এই আদেশ পত্রে আমি কিরূপে ফেণীস্কুল স্থাপন করিয়াছি তাহার ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার

পর আমার অনুপস্থিতি সময়ে কিরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এবং তাহার ফলে স্কুলের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ কমিটীকে ও হেড মাষ্টারকে পদচ্যুত করিয়া স্কুলের ভার সবডিভিসনাল অফিসার স্বরূপ তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি জানিতাম এরূপ স্কুল সম্বন্ধে এরূপ আদেশ প্রচার করিতে ডিষ্ট্রিক্ট-মাজিষ্ট্রেটের কোনও ক্ষমতা নাই। সমস্ত আদেশ অবৈধ হইয়াছে। কিন্তু তিনি যেরূপ ক্ষেপিয়াছেন তাঁহাকে সেই কথা বলিলে তিনি আরও চটিবেন। আমি সে জন্য তাঁহার আদেশের বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়া লিখিলাম যে কাক মারিবার জন্য কামান দাগিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ একটি সামান্য কার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। আমি নিজে ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। তথাপি তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে তৎক্ষণাৎ স্কুলের ভার আমার গ্রহণ করা আবশ্যক তাহা আমি অন্যরূপে করিব। যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তিনি এ মৃদু প্রতিবাদটুকু পর্য্যন্ত শুনিলেন না। আমাকে লিখিলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বুঝিলাম যে আমি আর একটি সঙ্কটে পড়িতেছি। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম মুনসেফ তাঁহার কাছে সদলে দেখা করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তিনি তাহার উত্তরেও কমিটীকে পদচ্যুত করিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। এ সংবাদ ফেণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কালনিমে সর্পধৃত মণ্ডূকের ন্যায় চীৎকার করিতেছে এবং তাহার গৃহের দিকে আহূত হইয়া সেক্রেটারীর বৃহৎ মূর্ত্তি ও ষড়যন্ত্রকারীর দল বিষণ্ণ মুখে ছুটিয়াছে। তখন দেখিলাম যে আর আদেশ চাপিয়া রাখা যাইতে পারে না। রাখিলে নন্দকৃষ্ণের অবমাননা হয়।

অতএব স্কুলগৃহে কমিটীর পদচ্যুতির এক নোটিশ দিলাম, এবং স্কুলগৃহ-খানি পোড়াইবার আশঙ্কা হওয়াতে তাহা রক্ষার জন্য একজন কনষ্টেবল মোতায়ন করিলাম। ফেণী উলট-পালট হইল। নন্দকৃষ্ণ সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বেড়াইতে যাইবার সময়ে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়াছি কিনা নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও অবমানিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অনুকূল উত্তর পাইয়া আর এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না। হেড মাষ্টারকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলে স্কুলের পড়া বন্ধ হইবে। আমি সে জন্য তাহাকে সেই অপরাহ্নে পদচ্যুত করি নাই। কিন্তু নন্দকৃষ্ণ এরূপ ক্ষেপিয়াছেন যে তিনি পর দিন স্বয়ং স্কুলে গিয়া হেড মাষ্টারকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, এবং তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাঁহার আদেশ পালন না করার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। ভদ্রলোক ভয়ে স্কুল হইতে সটান্ দৌড় দিয়াছে দেখিয়া লোকেরা হাসিতেছে। ফেণীব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি ও উপহাসের তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

কালনিমের যে আহার নিদ্রা নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি দেওয়ানি আইন, ও হাইকোর্টের নজির হইতে ত্রিকোনমিতি পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতেছেন, কিন্তু ডেপুটি ও ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট বধের অস্ত্র পাইতেছেন না। অবশেষে 'ইংলিশমেন' 'পাইওনিয়ার' প্রভৃতি ভারত-প্রেমিক পত্রিকায় এ দুজনের কুকার্য্য সম্বন্ধে দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। 'নেটিভ মাজিষ্ট্রেট'—তখন আর কথা কি। এই মহামূল্য তাড়িত বার্ত্তাসকল উভয় পত্রিকা আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিলেন। নন্দকৃষ্ণ আন্দোলনের দৌড় এতদূর দেখিয়া ভয় পাইলেন। আমাকে লিখিলেন শ্রাদ্ধ গড়াইতেছে (the fun is getting fast and furious)। কিন্তু কই ফেণীর এই মহা

বিপ্লবে বঙ্গেশ্বরের সিংহাসন টলিল না। তখন শাণিত অভিযোগ-পূর্ণ এবং ঘোরতর অত্যাচারের ব্যাখ্যাব্যঞ্জক এক দীর্ঘ আবেদন কমিশনার ওল্ডহেমের কাছে প্রেরিত হইল। নেটিভ মাজিষ্ট্রেট —তিনি তৎক্ষণাৎ কৈফিয়ত চাহিলেন, এবং মাজিষ্ট্রেটকে সতর্ক করিয়া লিখিলেন যে ব্যাপার বড় গুরুতর। নন্দকৃষ্ণ আরও ভীত হইলেন, এবং নিজে কথাটি না কহিয়া কমিশনারের আদেশ আমার কাছে কৈফিয়তের জন্য পাঠাইলেন। কার্য্য তাঁহার, কৈফিয়ত দিব আমি। ব্যবস্থা মন্দ নহে। আমার আশঙ্কা সত্য হইল। ব্যাপার বাস্তবিক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নেটিভ মাজিষ্ট্রেট বা কালা সিবিলিয়ানদের উপর ইংরাজ সিবিলিয়ান কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুনজর নাই। তাঁহাদের কিছু একটা দোষ পাইলেই তিলকে তাল করিয়া "সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বধ" কাব্য অভিনীত হইবার সম্ভাবনা। নন্দকৃষ্ণ ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট। তাঁহার বিপদ হইলে দেশের একটি উন্নতির পথে ঘোরতর অন্তরায় উপস্থিত হইবে। অমনি গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ইংরাজী কাগজ-ওয়ালারা ধূয়া ধরিবে নেটিভকে মাজিষ্ট্রেট করিলে গোটা ভারত খানি যে ভারত সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে নোয়াখালির নন্দকৃষ্ণের অবৈধ কার্য্য তাহার জলন্ত প্রমাণ! আমি গরিব ডেপুটি। এরূপ ছারপোকা দুটা পাঁচটা মারা গেলেও দেশের কিছু আসে যায় না। নন্দকৃষ্ণের আদেশ ও কার্য্য এরূপ অবৈধ যে উহা সমর্থন করাও অসাধ্য। অতএব স্থির করিলাম যে নন্দকৃষ্ণকে বাঁচাইয়া এ আগুনে আমি ঝাঁপ দিব। "যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী!" অনেকবার পরের জন্য বিপদস্থ হইয়াছি। বারবার আমার যে স্বর্গস্থ পিতৃদেব ও পিতার পিতা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এই নিস্বার্থ আত্ম-বলিদানেও

করিবেন। আমি স্কুলের স্থাপন হইতে আমূল বৃত্তান্ত সরলভাবে লিখিয়া উপসংহারে লিখিলাম যে আমি নন্দকৃষ্ণের আদেশমতে কোনও কার্য্য করি নাই। আমি স্কুলের স্বত্বাধিকারী। উপস্থিত কমিটীর স্থিতিকাল তিন বৎসর শেষ হওয়াতে আমি নূতন কমিটী গঠিত করিয়া স্কুলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। এ কার্য্যের জন্য আমি, একা আমিই, দায়ী। এজন্য স্কুলে যে 'নোটিশ' দিয়াছিলাম আমি তাহাতে ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশের উল্লেখ মাত্র করি নাই। নন্দকৃষ্ণ এই 'রিপোর্ট' পাইয়া আমাকে শত ধন্যবাদ দিয়া এক 'ডেমি' পত্র লিখিলেন এবং আর একটি কথাও না লিখিয়া আমার রিপোর্ট কমিশনারের কাছে পাঠাইলেন। কেবল লিখিলেন যে সব ডিভিসনাল অফিসারের রিপোর্টের পর তাঁহার আর কিছুই বলিবার নাই।

ওল্ডহেম ইতিমধ্যে শুনিয়াছিলেন যে আমি তাঁহার চট্টগ্রামস্থ কীর্ত্তি ধ্বজার নাম old damned institute রাখিয়াছি। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের নীতি গর্ভ নিয়মাবলির এক বিজ্ঞ (sound) ব্যাখ্যা লিখিয়া এবং ফেণীর স্কুল কমিটীর রহস্য উদ্ঘাটন জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাসের দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্টের (Long Parliament) গবেষণা-পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া, এক দিস্তা কাগজব্যাপী এক দীর্ঘ ও মহামূল্য প্রবন্ধ আমার মস্তকে চট্টগ্রামের 'ফেয়ারি হিল' হইতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে আমার উপকারার্থ বহুতর আদেশ ও উপদেশও ছিল। নন্দকৃষ্ণ উহা আমার কাছে আসল প্রেরণ করিয়া এক 'ডেমি' পত্রে লিখিলেন—"এই বিজ্ঞ প্রবন্ধের (learned essay) কি করিবে লিখিও। উহা পড়িয়া হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্ব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।" আমি লিখিলাম যে এই মহামূল্য প্রবন্ধটিকে আমার ছেঁড়া কাগজের অন্তিম স্থান প্রদান করিলাম।

ওল্ডহেম কেবল এই অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদব্যাসকে বিশ্রাম দিলেন না। তিনি আমার জন্য নন্দকৃষ্ণকে অপদস্থ করিতে না পারিয়া তাঁহার সমস্ত ক্রোধ আমার উপর নানা পথে ঝাড়িতে লাগিলেন। আমার কাছে এক 'ডেমি' ও লিখিলেন যে তিনি বড় দুঃখিত হইয়াছেন যে আমি নন্দকৃষ্ণকে "নাকে দড়ী দিয়া চালাইতেছি" (leading him by the nose)। আমি লিখিলাম যে নন্দকৃষ্ণ এরূপ দক্ষ লোক যে তাঁহার নাকে কি কাণে দড়ী দিয়া চালান আমার সাধ্য নাই। তাহার পর আবার এক 'ডেমিতে' আমার 'অনৈতিক' (unconstitutional) কার্য্যের 'নৈতিক' ব্যাখ্যা করিয়া আর এক অস্ত্র ঝাড়িলেন—"I am both disappointed and disgusted to find that you would not show the wisdom required to maintain the school, and I attribute to your unconstitutional efforts to arrogate to yourself alone its entire control, the recent disturbances, just as I give you the credit for establishing it. If this was your aim, you should have had nothing to do with the grant-in-aid which is given only for a settled constitution with a prospect for stability and continuity and not to one depending on a single individual. Having got the constitution, you should have accomodated yourself to it, and resisted any clique in it in a proper way, instead of attempting to dominate it as you have done, so that it in turn took steps to dominate or dust you. What

I am most dissatisfied with is your having misled the Magistrate as you have done, (চিরদিনই পরকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে এরূপে মরিয়াছি) and I have now, till peace is restored, severed your official connection with the school. I see you claim absolute right as its founder, while you have omitted to discriminate between the popular and the legal sense of that term. Lady Dufferin as Foundress of the Dufferin Fund, and the Maharaja of Burdwan as sole founder and proprietor of the Burdwan College, are in very different legal positions"—বাপ! ফেণী স্কুলটি—যার হেড মাষ্টারের বেতন মবলগ ৪০ মুদ্রা মাত্র—কি এক বৃহৎ 'নৈতিক' (constitutional) ব্যাপার! যাহা হউক এ চার পেয়ালার ঝড় আমি চার পেয়ালাতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে দিলাম। আমি এই পত্রেরও কোন উত্তর দিলাম না।

ঐ দিকে কালনিমে মামার দলে দুর্গোৎসব উপস্থিত হইয়াছে। মামা দীঘির পাড়ে নৃত্য করিতেছে, এবং বক্কেশ্বর সেক্রেটারীর গম্ভীর মুখে মধুর হাসি আরও মধুর হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, ওল্ডহেম আমাকে ধমক দিয়াছেন যে আমি ফেণী স্কুলের সহিত আমার সংস্রব রহিত না করিলে তিনি আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে লিখিবেন। এইবার নবীন বাবুর আর রক্ষা নাই! সমস্ত সবডিভিসনের লোক এ সংবাদে ভীত হইয়াছে। কিন্তু কই, ফেনী স্কুলের সহিত আমি সংস্রব ত তথাপি রহিত করিলাম না। তাঁহারা স্কুলের ত্রিসীমার মধ্যেও পদার্পন করিতে পারিতেছেন না। কালনিমে বলিলেন—"আবার লাগাও।" কমিশনারের কাছে আবেদন গেল আমি তাঁহার আজ্ঞার অবমাননা

করিয়াছি। সেক্রেটারীও নাকি একবার সশরীরে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে "ত্রাহি মে মধুসূদন" বলিয়া স্তব করিয়া আসিলেন। হেড মাষ্টারের পদচ্যুতির জন্যও তাঁহার কাছে আপিল দাখিল হইল। তিনি এবারও কৈফিয়ত চাহিলেন, এবং নন্দকৃষ্ণ এবারও কৈফিয়তের জন্য আমার কাছে পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম যে এ পালা আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। অতএব এবার আমি আমার হাত দেখাইয়া লিখিলাম যে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী মতে কমিশনারের এ সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও সংস্রব আছে আমি দেখিতেছি না। হেড মাষ্টারকে আমি সবডিভিসনাল অফিসার রূপে পদচ্যুতি করি নাই। স্কুলের সত্বাধিকারী রূপে করিয়াছি। হেড মাষ্টারের আপিল স্কুলের নিয়মাবলি মতে ইন্স্পেক্টারের কাছে হইতে পারে। কমিশনারের কাছে হইতে পারে না। নন্দকৃষ্ণ এ উত্তর পাইয়া এবং এবারও ওল্ডহেমকে তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে দিই নাই দেখিয়া, উচ্চ হাসি হাসিয়া লিখিলেন—"হরি! হরি! ওল্ডহেম সাহেবের এত পাণ্ডিত্য, এত ইংলণ্ডের constitution ব্যাখ্যা, তুমি এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিলে।" তাঁহার আশঙ্কা হইল যে হেম বাবুর বৃত্রাসুরের মত এবার ওল্ডহেম ক্রোধে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাবলি উৎপাটন করিয়া আমার মাথার উপরে ফেলিবে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। শুনিয়াছি কোনও এক মহারাজার কাছে একজন ব্রাহ্মণ তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কিছু ভিক্ষা চাহিলে, তিনি এরূপ অপব্যয় করেন না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সে কিছু দিন পরে মহারাজার জন্য একটি নিরুপমা ষোড়শী শিকার সংগ্রহের জন্য ২০০৲ টাকা চাহিলে, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ দিলেন, এবং শিকার শীঘ্র আনিতে আদেশ করিলেন। সায়াহ্নে 'বায়ু ভক্ষণে' বাহির হইলে তাঁহার মোসাহেব

সেই বামনটাকে দেখাইয়া বলিল—"দেখুন মহারাজ! ঐ বামনটা তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের হাট করিতেছে।" মহারাজ তখন ম্লান মুখে বলিলেন—"আমি তাহাকে টাকাটা সৎকর্ম্মের জন্যই ত দিয়াছিলাম। সে এরূপ অপব্যয় করিলে আমি কি করিব।" ওল্ডহেম সাহেবও তাহাই করিলেন। তিনি এবার লিখিলেন যে যখন আমি সবডিভিসনাল অফিসাররূপে হেড মাষ্টারকে বরখাস্ত করি নাই বলিতেছি, এবং তাঁহার ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছি, তখন তিনি আর কি করিবেন। চারি দিকে আমার সাহসের, প্রশংসার ও একটা বিদ্রূপের ঢেউ ছুটিল। কালনিমে মামা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর তাঁহারা পদচ্যুত কমিটীর পক্ষে ও হেড মাষ্টারের পক্ষে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের কাছে আপিল উপস্থিত করিলেন। তিনি বোধ হয় ওল্ডহেমের মত Long Parliamentর ও Constitution Lawতে তেমন পণ্ডিত নহেন। তিনি লিখিলেন যে এরূপ সাহায্যকৃত স্কুলের স্থায়িত্ব সবডিভিসনাল অফিসারদের চেষ্টার উপর সম্যক্ নির্ভর করে। অতএব সবডিভিসনাল অফিসারের কার্য্যের উপর শিক্ষা বিভাগের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এ বলিয়া তিনি নূতন কমিটীর আবেদন মতে নূতন সাহায্য মঞ্জুর করিয়া দিলেন। এই "অজা যুদ্ধ, ঋষি শ্রাদ্ধ", এবং ওল্ডহেমের প্রভাতিক "মেঘ ডম্বরু" এরূপে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াতে" শেষ হইল।

শুনিয়াছিলাম ইহার পর আমাকে "talented but eccentric" (প্রতিভাসম্পন্ন কিন্তু মতিচ্ছন্ন) বলিয়া তিনি সেই বৎসরের সালতামামিতে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তার পর আমি রাণাঘাটে বদলি হইয়া গেলে প্রেসিডেন্সি কমিশনারকে আমার প্রতি বিষাক্ত করিবার জন্য ফেণীর পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আমি শোচনীয় অবস্থা করিয়া রাখিয়া

গিয়াছি বলিয়া আমার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। আমি তাহার এরূপ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলাম যে প্রেসিডেন্সি কমিশনারের আফিসে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি এই মাত্র লিখিয়াছিলেন, আমি যে কয়েক মাস তাঁহার পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট ছিলাম এ কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহাকে এরূপ অপ্রস্তুত করা আমার উচিত ছিল না। নন্দকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি তাঁহার এরূপ বিরাগভাজন না হইলে তাঁহার কৃপায় আমিও ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট হইবার আশা করিতে পারিতাম। আজ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্যের শনি ও বঙ্গের বোর্ডের বৃহস্পতি সেই ওল্ডহেম 'আয়ারলণ্ডের' এক অজ্ঞাত ও অগম্য কোণায় আলুর চাষ করিতেছেন। সে দিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে এ মর্ম্মে তিনি তাঁহার এক খোসামুদে খা বাহাদুরকে পত্র লিখিয়াছেন। হা! ভারতের অদৃষ্ট! কালনিমে মামাও আমার পরবর্ত্তীর হাতে ঘোরতর অপমানিত হইয়া লোকের কাছে প্রকাশ্য ভাবে বলিতেন—"দাঁত থাকিতে দাঁতের মায়া বুঝা যায় না। আমি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে নবীন বাবুর মত noble man (মহৎ লোক) ভারতবর্ষে নাই!"

রাণাঘাট।

ওল্ডহেম আমাকে ভুলিলেন না। তাহার উপর 'সিদ্ধবিদ্যা' তাঁহার ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিতেছিলেন। সিদ্ধবিদ্যা এ সময়ে চট্টগ্রামে ডেপুটি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নোয়াখালি। কিরূপে প্রথম নোয়াখালি-দর্শন সময়ে তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া, তিনি কোন এক অপরাধে দণ্ডিত হইতেছিলেন, তাঁহার সে কলঙ্ক ক্ষালনার্থ এক 'অনার সার্টিফিকেট' দিয়া, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ডেপুটি কলেক্টর করিয়াছিলাম, সে দিনও কিরূপে তাঁহার চাঁদপুরের কীর্ত্তি কলাপের জন্য ঘোরতর বিপদস্থ হইলে এই ওল্ডহেমের ক্রোধ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি এখন সেই সকল উপকারের প্রতিদান দিতে লাগিলেন। আমি উপকার করিয়া এক জীবন প্রায় এরূপ প্রতিদানই পাইয়াছি। বঙ্কিম বাবু বলেন পরের জন্য কাট কাটিও না; কিন্তু পরের জন্য কাট কাটা যাহার প্রকৃতি সে না কাটিয়া পারে না। খোসামুদিতে সিদ্ধহস্ত বলিয়া ইঁহার নাম আমি সিদ্ধবিদ্যা রাখিয়াছিলাম। লেঃ গবর্ণর চট্টগ্রাম আসিলে তিনি ওল্ডহেমকে হাত করিলেন। ওল্ডহেম চিফ সেক্রেটারী কটন সাহেবকে ধরিয়া আমাকে বদলি করাইয়া সিদ্ধ-বিদ্যাকে ফেণীতে দিলেন। কটন আমাকে জানিতেন বলিয়া ওল্ডহেম আর বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। কটন আমাকে লিখিলেন তিনি শীঘ্র আমাকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বদলি করিবেন। পরের গেজেটে আমি রাণাঘাট সবডিভিসনের ভার পাইলাম। আমি ফেণী হইতে বদলি হইবার জন্য দুইবার ছুটী লইয়া বাধ্য হইয়া ফেণী

ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। একবার স্বয়ং ওল্ডহেমই বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে আমার মত কেহ ফেণী এমন সুন্দরভাবে শাসন করিতে পারিবে না। আর বদলি হইলাম কোথায় ?—রাণাঘাট! একদিন ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট জেফ্রি যে রাণাঘাটকে "বাঙ্গালির স্বর্গ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই রাণাঘাট। আমি যতবার ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে যাতায়াত করিয়াছি ততবার রাণাঘাট ষ্টেশন দেখিয়া মনে মনে ভাবিতাম আমি কি কখনও এই সবডিভিসনের ভার পাইব ? প্রায় গবর্ণমেণ্টের প্রিয় পাত্রগণ ইহার ভার পাইয়া থাকেন ; অতএব আমি ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা মনে করিতাম। শ্রীভগবানের কি কৃপা! আমি আমার আকাঙ্ক্ষা মতে বেহার, ফেণী, রাণাঘাট তিনটি সবডিভিসন পাইলাম।

বদলির সংবাদে ফেণীতে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। স্বয়ং কালনিমে ও তাঁহার দল পর্য্যন্ত স্থানীয় উচ্ছ্বাসে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। আমি যে কঠোর মূর্ত্তিতে মাদারিপুর শাসন করিয়াছি, যে ললিত-ভৈরব মূর্ত্তিতে বেহার শাসন করিয়াছি, সে মূর্ত্তিতে ফেণী শাসন করি নাই। আমি স্থানোপযোগী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকি। রাজকার্য্যক্ষেত্র আমি একটি রঙ্গমঞ্চের মত মনে করি, এবং যেখানে যেরূপ ভাব আবশ্যক বুঝি সেখানে সেরূপভাবে অভিনয় করি। ফেণী দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকের দেশ। এখানে আমি রুদ্ররূপ মোটেও ধারণ করি নাই। ফেণী যেন আমার একটি জমীদারি, আমি উহাকে এ ভাবে শাসন করিয়াছি। স্ত্রীর কাছে প্রায় সমস্ত স্কুলের ছাত্র যাইত। তিনি তাহাদের মাতার মত স্নেহ করিতেন। আমার বাসাও যেন ফেণীর নিকটবর্ত্তী লোকের জমীদার বাড়ী। সকলে স্ত্রীর দরবারে উপস্থিত হইত। তিনি বাড়ী যাইতে সঙ্গে একজন চাকর না দিলেও চলিত। গাড়োয়ানেরা

তাহাদের জমীদার পত্নীর মত বা মাতার মত 'মাঠাকরাণীকে' লইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত। ফেণী বিভাগের সমস্ত লোক আমাকে একটা কৃষ্ণ বিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। গাছের প্রথম ফল, গাভীর প্রথম দুগ্ধ, নূতন পুষ্করণীর প্রথম মৎস্য, আমার জন্য 'মানস' করিয়া রাখিত। একজন ব্রাহ্মণ পিত্তশূল রোগে মরণাপন্ন হইয়া আসিয়া আমাকে বলিল যে সে তারকেশ্বরে গিয়া আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে যে আমার প্রসাদ খাইলে সে রোগমুক্ত হইবে। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া পায়ে পড়িতে লাগিল। তখন সামান্য জল-খাবার সামগ্রী আনাইয়া আমি কিঞ্চিৎ খাইয়া তাহাকে খাইতে দিলাম। সে তাহা খাইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে সে আসিয়া বলিল যে গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাহার দুই তিন দিন যাবৎ খুব বমি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সে নিরোগ হইয়াছে। দেখিলাম তখন তাহার সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ। এরূপে ফেণীর লোকেরা আমাকে এক প্রকার দেবত্ব প্রদান করিয়াছিল। কাযেই আমার বদলিতে দেশব্যাপী একটা হাহাকার উঠিল। কত লোক আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ এক চোটে ২৫০০৲ টাকায় আমার প্রায় সমস্ত জিনিস পত্র কিনিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট ভ্রাতারা বিক্রয় করিতে দিলেন না, বাড়ী লইয়া গেলেন। আমার নিজ কল্পনা-প্রসূত 'টেবিল' ও 'রাইটিং সোফা' লইয়া এখানেও টানাটানি পড়িল। শেষে একজন এঞ্জিনিয়ার কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন আমি যত মূল্য চাহি তিনি দিবেন। এই টেবিলে আমি আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, গীতা, চণ্ডী, খৃষ্ট লিখিয়াছিলাম। তিনি নিজেও একজন সাহিত্য-প্রিয় লোক ছিলেন।

তিনি বলিলেন বাঙ্গালা কবির এই নিদর্শন তিনি তাঁহার ইংলণ্ডস্থ গৃহে লইয়া সভক্তি রক্ষা করিবেন। আমরা কি সাধে ইঁহাদের গোলাম? অতএব বড় অনিচ্ছায় এ দুটি জিনিস ছাড়িলাম। আমার বাসা বাড়ী কিনিয়া স্থানান্তরিত করিতে বহুব্যক্তি উমেদার হইলেন, কারণ গৃহ দীঘির পাড়ে। দীঘি গবর্ণমেণ্টের। সিদ্ধবিদ্যা লিখিলেন যে ইঁহাদের স্বীকৃত মূল্যে তিনি উহা ক্রয় করিবেন। কিন্তু তিনি এখানেও আমাকে প্রতিদান না দিয়া ছাড়িলেন না। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি উক্ত মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক দিবেন না। কেবল গৃহের বেড়ায় মাত্র তত টাকার কাপড়ের পর্দ্দা আছে বলিলে, তিনি বলিলেন তিনি আমার মত সৌখিন নহেন। পর্দ্দার কিছুই প্রয়োজন তাঁহার হইবে না। কি করিব? সে রাত্রি প্রভাতে আমরা চলিয়া যাইব। তিনি কার্য্যভার লইয়াছেন। তাঁহার ভয়ে আর কেহ তখন ঘর কিনিতে সাহস করিবে কেন? স্ত্রী চটিয়া সমস্ত কাপড়ের পর্দ্দা ও ছাদ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভৃত্যদের বক্‌সিস করিলেন। ইংরাজি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফেণী আসিয়াছিলাম। নয় বৎসর পরে ইংরাজি ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে ফেণী ছাড়িলাম। কেবল সাহিত্য সেবার অবসর জন্য আমি এই অজ্ঞাত বাসে আসিয়াছিলাম, এবং এত দীর্ঘ কাল এই নিভৃত স্থানে ছিলাম। প্রাতে যাত্রা করিলে একটা রোদনের রোল উঠিল। অনুমান পাঁচ শত লোক সমবেত। কেহ পায়ে পড়িয়া, কেহ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে কিছুতে এক পা অগ্রসর হইতে দিতেছে না। প্রায় দুই মাইল যাবৎ আমি এরূপ অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে তাঁহাদের ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলাম। দশ মাইল ব্যবধান এক ডাক বাঙ্গলায় পৌঁছিলে একজন স্থানীয় জমীদার ধরিয়া পড়িলেন যে আমি এখন আর ফেণীর সব ডিঃ অফিসার নহি,

অতএব এক বেলা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। দেখিলাম তিনি প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আহারের পর রওনা হইব এমন সময়ে আমার ফেণীর নাজির ঊর্দ্ধশ্বাসে এ দশ মাইল পথ ছুটিয়া আসিয়া আমার ও স্ত্রীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অথচ ফেণীর আমলাদের মধ্যে তাহাকেই আমি বেশী শাসন করিত্যম। তাহার এ ভক্তিতে আমি বিস্মিত হইলাম। সে ঠিক পাগলের মত হইয়াছে। তাহাকে বহু কষ্টে ছাড়াইয়া রওনা হইলাম। নোয়াখালি হইতে দুই তিন মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে ষ্টীমারে উঠিলে সেখানে গাড়োয়ানগণ আর এক দৃশ্য অভিনয় করিয়া ষ্টীমারের খালাসিদের পর্য্যন্ত কাঁদাইল। ষ্টীমার খুলিল, তাহারা তীরে দাঁড়াইয়া মাতৃপিতৃহীন শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল। বলা বাহুল্য লোকের এই সকরুণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা পতি পত্নী ও শিশু পুত্রটি সমস্ত পথ কাঁদিয়াছিলাম। এখনও রেলপথে ফেণী হইয়া বাড়ী যাইতে পূর্ব্বে টের পাইলে ষ্টেশন লোকারণ্য হইয়া যায়। মানুষ এত সহজে যখন লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে, তখন কেন অভিশাপভাজন হয়, আমি বুঝিতে পারি না।

আসিবার সময়ে নন্দকৃষ্ণের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। তিনি বিবাহ করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীবিয়োগের পর তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে অস্বীকার করিয়া কয়েক বৎসর বিপত্নীক ভাবে অতিবাহিত করেন। শেষে তাঁহার পিতা উপস্থিত বিবাহ স্থির করিয়া তাঁহাকে ও আমাকে পত্র লেখেন। তাঁহাকে আমরা পতি পত্নী দুইজনে অনেক করিয়া বুঝাইয়া সম্মত করি। তিনি ২০০৲ টাকার নোট স্ত্রী হইতে লইয়া পাঠাইয়া বিবাহে সম্মত হইয়া ফেণী হইতে টেলিগ্রাফ করেন। বিবাহের পর নোওয়াখালি ফিরিয়া আমাকে পত্র লেখেন।

হতভাগিনী বঙ্গভূমি অদৃষ্ট আকাশ হইতে এ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রটি অকালে খসিয়া পড়িয়াছে। নন্দকৃষ্ণ আজ স্বর্গে। অতএব অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার বন্ধুভাব নিদর্শন স্বরূপ শেষ পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Noakhali
The 2nd March, 93.

My Dear Nobin Chandra

I and Sailo returned to Noakhali yesterday; and was very sorry to find that you had already left. I have very few friends in this world. I was so wrapped up with my deceased wife that I did not care to make many friends. After the loss I sustained, your loving tenderness, your consoling words, were like the balm of Gilead to my broken heart. You have been to me a brother. Let me hope you will show me the same tenderness as you have all along shown to me.

I had a talk with Mr Cotton about you. Your transfer and Bogola Babu's deputation were all due to Mr Oldham. I congratulate you that you have at last been able to shake off the yoke of that man.

The marriage went off without any hitch. It was a very quiet affair. I am glad to be able to say that she is all that I ever expected to be and wished for. I shall send you her photo bye and bye. you have the first claim to it, as but for you, I would not have got her.

It is indeed painful to me to bid you farewell. I shall always cherish you and Nirmal in my heart of hearts, and I hope you will reciprocate the feeling

Yours affectionately
Nandakrishna.

আমার পুত্র-প্রতিম খুড়া অখিল বাবু বরিশালে ওভারসিয়ার ছিলেন। এক দিন সেখানে একটা দুর্গোৎসবের আনন্দে কাটাইয়া বহু নদ নদীর ও তৎতীরস্থ বঙ্গ পল্লীগ্রামের বাসন্তী শোভা দেখিতে দেখিতে খুলনা হইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম। রবিবার প্রাতে অবসর জানিয়া কটন সাহেবকে 'সেলাম' দিতে গেলাম। প্রায় রবিবারে তাঁহার কয়েকজন প্রিয় বাঙ্গালি ঘুঘুর মত তাঁহাকে চারি দিকে ঘেরিয়া বসিয়া থাকিত। বহু বৎসরের পর কটনের সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। তিনি এবার আমাকে বলিলেন—"নবীন! বলিতে পার কি তোমার এত কম বয়স দেখা যাইবার রহস্য কি?" আমি বলিলাম যদি কোনও রহস্য থাকে তিনি ত জানেন, কারণ তিনিও বৃদ্ধ হন নাই। তিনি বলিলেন তাঁহাকে পূরা পঞ্চাশের মত দেখায়। আমি বলিলাম তাহা হইলে আমাকে পূরা ষাট দেখায়। তিনি বড় হাসিলেন। শেষে তাঁহার ঘুঘুদের বলিলেন—"চিন কি? ইনি তোমাদের বিখ্যাত কবি বাবু নবীনচন্দ্র সেন।" তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা আমাকে নামে চিনেন, কিন্তু আমার যে এত বয়স অল্প তাঁহাদের এ ধারণা ছিল না। তাঁহারা সকলে উঠিয়া খুব একটা হস্ত পীড়ন করিলেন। তখন কটন আবার বলিলেন—মূর্ত্তি-খানি এই ত দেখিতেছেন। কিন্তু উহাতে এত আগুন আছে যে এই কলিকাতা সহরটা পোড়াইতে পারে। ভাল, মিঃ ওল্ডহেমের সঙ্গে তোমার ব্যাপারখানি কি হইয়াছিল?" আমি বিবৃত করিতে লাগিলাম, আর তাঁহারা হাসিয়া আকুল হইলেন। কটন বলিলেন—"যাহা হউক সাবধান! রাণাঘাটে আগুন জ্বালাইও না। রাণাঘাটে বহুতর খ্যাতনামা লোক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমি এজন্য তোমার হস্তে উহার ভার দিয়াছি। রাণাঘাট কলিকাতার কাণের কাছে। উহা একটা খ্যাতনামা সবডিভিসন। উহাতে বহু শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী লোকের বাস।

অতএব বড় সাবধানে কার্য্য করিও, এবং কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

কলিকাতা হইতে রাত্রি ১২টার সময়ে রাণাঘাটে পৌঁছিলাম। আমার কত সাধের রাণাঘাট! একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। সবডিভিসন গৃহের একটি কক্ষে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি খাটিয়া মাত্র আমার অভ্যর্থনার জন্য রাখিয়াছিলেন। ঘরে একটা সামান্য মাটির প্রদীপ পর্য্যন্ত নাই। তিনি নিশ্চিন্তভাবে অন্য কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অথচ তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, আমি পত্নী পুত্র লইয়া আসিতেছি। একখানি খাটিয়ায় তিন জন শুইব কিরূপে? পুত্রকে লইয়া স্ত্রী নীচে বিছানা করিয়া শুইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিলাম বিস্তীর্ণ কেন্দ্রস্থলে সবডিভিসন গৃহ। তাহার এক পার্শ্বে লোকাল বোর্ডের আফিস, এবং তাহার সম্মুখে ফৌজদারী ও মুন্‌সেফি আফিস। গৃহ তিনটির কোন শৃঙ্খলা কি সৌন্দর্য্য নাই। পূর্ত্তবিভাগে তাহা থাকিবার কথাও নহে। হাতায়ও দেখিবার কিছু নাই। বসতি-গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় রৌদ্র নিবারণের জন্য একটি জাফরির একচালা কিয়দংশে আছে এবং তাহার উপর দুই একটি লতা উঠিয়াছে। তাহার সম্মুখে একটি আমড়া বৃক্ষ। কেবল হাতার 'গেট' হইতে যে রাস্তাটি মিউনিসিপাল বোর্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ ঝাউ-শ্রেণীই দেখিবার যোগ্য। বোধ হয় কোনও ইংরাজ সবডিভিসনাল অফিসারের দ্বারা রোপিত। তাঁহার হস্ত-চিহ্নস্বরূপ দুই একটা ক্রোটনও এখন গৃহসম্মুখস্থ শূন্য উদ্যানে আছে। গৃহখানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানে স্থানে আস্তর খসিয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে তৈলের ও নিষ্ঠীবনের চিত্র, মেজের স্থানে স্থানে মনুষ্য ও মূষিক কৃত বিবর, এবং স্থানে স্থানে কপাট শার্সি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কলির

আরম্ভ হইতে বোধ হইল গৃহের সঙ্গে চূণের সাক্ষাৎ হয় নাই। উহার পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলেন সাত বৎসর যাবৎ গৃহের সংস্কার হয় নাই, এবং সবডিভিসনাল অফিসারেরা সে জন্য দ্বিরুক্তিও করেন নাই। শ্রীবিষ্ণু!—তিনি একবার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ণপাত করেন নাই। অথচ রাণাঘাট বঙ্গের খ্যাতনামা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (prize) সবডিভিসন! প্রাণ জুড়াইল!

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আমি গৃহের একটি তীব্র শ্লেষাত্মক বর্ণনা পূর্ত্ত-বিভাগকে উপহার দিলাম। একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার শ্লেষ-বিষে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। লিখিলেন, গৃহের এরূপ শোচনীয় অবস্থা কখনও হইতে পারে না। আমি তাঁহাকে সশরীর উপস্থিত হইতে 'চেলেঞ্জ' (challenge) করিলাম; তিনি আসিলেন। দেখিলাম লোকটি মন্দ নহে। তিনি গৃহের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, দোষ তাঁহার নহে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের। ঘরের যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নিজে বড় লজ্জিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহা নহে, আমি যাহা চাহি, এমন কি যাহা এ সকল গৃহে কখনও হয় না, দেয়ালে আমার পসন্দমতে রং দিতে পর্য্যন্ত আদেশ দিলেন। আমি পরের রবিবার জিনিস পত্র কিনিতে সস্ত্রীক কলিকাতায় চলিলাম। ট্রেনে উঠিয়াছি, এমন সময়ে আমার গাড়ীর গবাক্ষের সম্মুখে তিন বিরাট মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইলেন। বাঙ্গালিতে এতাদৃশ বীর অবয়ব আমি দেখি নাই। তিন জনেরই হাসিভরা প্রসন্ন মুখ। মধ্যস্থ বলিলেন— "আমার নাম যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। আমি "ধাতুশিক্ষার" গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার, এবং ইনি দ্বিতীয় পুত্র গিরিজা। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু ষ্টেশনে

শুনিলাম আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন। আর এক দিন আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।” তখন কুমার আমার হস্তে একখানি চিত্র, এবং গিরিজা একটি মুদ্রিত অভিনন্দন-কবিতা দিলেন। আর অমনি গাড়ী খুলিল; আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার অবসরও পাইলাম না। যতদুর দেখা গেল তিনটি সৌম্যমূর্ত্তির দিকে আমি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলাম। যদুবাবু একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তাঁহার ‘ধাতৃশিক্ষা’ ‘বঙ্গদর্শনের’ ভবিষ্যৎ বাণীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া প্রত্যেক গৃহে গৃহে পঞ্জিকার মত সত্যসত্যই বিরাজ করিতেছে। আমি তাঁহাকে যদিও ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তথাপি বড় ভক্তি করিতাম। তাঁহার ‘ধাতৃশিক্ষার’ কৃপায় আমার দুই সন্তান বিদেশে ধাতৃহীন স্থানে নির্ব্বিঘ্নে প্রসূত হইয়াছিল। আমার স্ত্রীকে উহা পড়াইয়াছিলাম। শাশুড়ী উহার প্রসব-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি নিজে উহার একটা সারাংশ লিখিয়া রাখিয়াছি। উহা এখনও আমার কাছে আছে। কারণ প্রসব সময়ে গল্প হইতে আসল কথা বাহির করিতে সময় পাওয়া যায় না। যদুবাবুর সুযোগ্য পুত্রেরা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটা সারাংশ লিখিয়া দিলে, সাধারণের বড় উপকার হইবে। ট্রেণের বহু লোকেরা তাঁহাদের চিনিত। তাঁহারা আমার হস্তে কি দিলেন তাহা দেখিবার জন্য পরের ষ্টেশনে একটি লোক আসিয়া উভয় উপহারই লইয়া গেল। কুমার আমার কাব্যাবলি হইতে কতকগুলি “দৃশ্য” এমন অপূর্ব্ব কৌশলে আঁকিয়াছিলেন যে আমি তাঁহার শিল্প-চাতুর্য্যে ও কাব্যরস-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। গিরিজার কবিতাটিও অতিশয় সুন্দর হইয়াছিল। উভয় উপহার হাতে হাতে সমস্ত ট্রেণে বেড়াইয়া, ও বহু-লোকের প্রশংসা লাভ করিয়া শেষে শিয়ালদহে ট্রেণ পঁহুছিলে আমার হাতে ফিরিয়া আসিল। চিত্র ও কবিতা উভয়ই তাঁহারা ফ্রেম ও

আয়ানা দিয়া দিয়াছিলেন। দুটিই আমি বড় আদরে রাখিয়াছি। সর্ব্বদা আমার গৃহের প্রাচীরে উহারা শোভা পায়। আমি এ জীবনে বহু অভিনন্দন পাইয়াছি। এই দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কবিতা অনেক পাইয়াছি। কিন্তু চিত্র আর কখনও পাই নাই। চিত্রটি এত সুন্দর যে উহা 'এনগ্রেভ' করিয়া রাখিব আমার ইচ্ছা। ইহার পর ইঁহাদের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যদুবাবু বঙ্গদেশকে একটি অতুলনীয় রত্নহীন করিয়া আমি রাণাঘাটে থাকিতেই স্বর্গারোহণ করেন। কুমার এবং গিরিজাকে আমি আমার পরমবন্ধু ও সহোদরের মত স্নেহ করি। তাহারা এখন ঠিক যেন আমার আপনার পরিবারস্থ লোক। কুমারের বেশ অভিনয় শক্তি আছে। সে 'পলাশির যুদ্ধের' মোহনলালের অভিনয় করিয়াছে। বঙ্গদেশে বোধ হয় মোহনলাল সাজিবার এমন বীরদেহ আর কাহারও নাই। তাহার আবৃত্তি শক্তিও অসামান্য। গিরিজা এখন বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাভাজন কবি। আমার রাণাঘাট ও কলিকাতার জীবন তাহাদের ও বন্ধুবর রাজচন্দ্র বসুর পরিবারবর্গের স্নেহে স্মৃতিতে জড়িত। রাজচন্দ্র বাবু মাদারিপুরে আমার সময়ে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। রাণাঘাটে আসিয়া দেখিলাম তিনি পেনসন লইয়া বাড়ীতে আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হতভাগ্য সুশীল রাণাঘাটে একটি বিদ্যালয়ে ও লাইব্রেরীতে তাহার কীর্ত্তি রাখিয়া ও তাহার দেব-চরিত্রে সমস্ত রাণাঘাট কাঁদাইয়া আমি রাণাঘাটে থাকিতেই চলিয়া যায়। পুত্র-শোক সহিতে না পারিয়া তাহার পিতাও অল্পকাল মধ্যে তাহার অনুসরণ করেন। দেবশিশুর মত তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রগণ—সরল, সুকুমার, সুধীর, সন্তোষ, সুস্থির—আমার এখনও পুত্রস্থানীয়।

কলিকাতা হইতে জিনিস পত্র ও ফুলের ও ক্রোটেনের টব আনিয়া নব সংস্কৃত সবডিভিসনাল গৃহখানি সাজাইলাম। সম্মুখের জাফরিতে

আরও কয়েকটি সুন্দর লতা, এবং উদ্যানে পুষ্প ও ক্রোটন, এবং 'লোকাল বোর্ডের' পার্শ্বের গর্ত্তটিকে একটা গোলাকার সরোবরে রূপান্তরিত করিয়া তাহার চারিদিকে নারিকেলের সারি রোপণ করিলাম। মাজিষ্ট্রেট বারনার্ড (Bernard) আসিয়া বলিলেন—"আপনি কয়েক দিনের মধ্যে স্থানটির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।" সিবিল সার্জন বলিলেন—"আপনি দেখিতে দেখিতে এই জঘন্য স্থানটিকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গে পরিণত করিবেন দেখিতেছি।" অশিষ্টাচারের ও অসন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি কমিশনার ওয়েষ্টমেকটও এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি তাঁহার নিজের উদ্যান হইতে আমাকে গোলাপের কলম পাঠাইবেন বলিলেন, এবং ইন্‌স্পেকসন বহিতে পর্য্যন্ত আমার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে গৃহ ও স্থান সজ্জার প্রশংসা লিখিয়া গেলেন। বন্ধুবর সুরেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী বলিলেন—"গৃহ-সজ্জায় মূল্যবান কিছুই নাই। অথচ এমনি আপনার পসন্দ (taste) যে দেখিতে দেখিতে আপনি এ গৃহ ও স্থানটির কি সুন্দর রূপান্তর ঘটাইলেন! এই গৃহের ও এই স্থানের এই শোভা রাণাঘাটে কেহ কখনও দেখে নাই।" তখন রাণাঘাট সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী এবং সুরেন্দ্র নাথ পালচৌধুরীই রাণাঘাট। যে কৃষ্ণ পান্তিকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন—

"পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামে মা ডিক্রিজারি!
আর পান বেচ্‌তো যে কৃষ্ণ পান্‌তি তারে দিলি জমীদারি!"

প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণ পান্‌তির উপাখ্যান বঙ্গের কে না শুনিয়াছেন। তিনিই রাণাঘাটের খ্যাতনামা পালচৌধুরী ঘরের সৃষ্টিকর্ত্তা। এ অঞ্চলে সমস্ত তাঁহারই জমীদারি ছিল। শুনিলাম পাল চৌধুরীদের এক ছাগলের বিবাদের মোকদ্দমার নথিতে তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের এক কক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে এই বিপুল গৃহের দুই শাখা ধ্বংস

হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর শাখাও ছায়াবশিষ্ট হইয়া আছে। কোনও মতে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে তিনি এ গৃহের সম্মান রক্ষা করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র বাবুর দীর্ঘাবয়ব, উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণ, সদাশয়, সুন্দর মূর্ত্তি। অবস্থার তাড়নায় তিনি মধ্যে ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছিলেন। কিন্তু বালক ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটদের হাতে সম্মান রক্ষা করা কঠিন দেখিয়া তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন চতুর বুদ্ধিমান সদালাপী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যা তিনি আমার সঙ্গে সবডিভিসন গৃহে কাটাইতেন। এখনও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের ধ্বংসশেষ অট্টালিকা আধা রাণাঘাট যুড়িয়া আছে। অন্য শাখার দ্বারকানাথ পাল চৌধুরী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি আমাকে এক দিন লিখিলেন যে তাঁহার চলৎশক্তি নাই। অথচ তিনি আমার কাব্যাবলি পড়িয়াছেন, অভিনয় করিয়াছেন, এবং এখন লোকমুখে আমার কার্য্যের ও চরিত্রের অত্যন্ত প্রশংসা শুনিয়া আমাকে দেখিবার জন্য বড় লালায়িত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। কি প্রকাণ্ড ও সুন্দর রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়ী। তিনি কি সুদীর্ঘ, সুন্দর, সুপুরুষ ও সদালাপী লোক! দেখিলাম তিনি তখন বাতব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহার বৃহৎ স্তম্ভসারি-শোভিত উচ্চ বৈঠকখানা দেখাইয়া বলিলেন—"এই বৈঠকখানায় আপনার "পলাশির যুদ্ধ" অভিনীত হইয়াছে। আমি তাহাতে কখন ক্লাইব, কখন মোহনলাল সাজিতাম। আজ আপনি রাণাঘাটে আসিয়াছেন। আর আমার এ অবস্থা! আপনি কেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন না? আমি আপনার অভ্যর্থনায় রাণাঘাট কম্পিত করিতাম। আজ রাণাঘাটে আপনাকে কে চিনিবে, আপনার মূল্য কে বুঝিবে? যে রাণাঘাটের নাম

শুনিয়াছেন, সে রাণাঘাট আজ কোথায় ? এই যে চূর্ণী নদী দেখিতেছেন, ইহাতে বিশ পঁচিশ খানি 'ভাওলিয়া' সজ্জিত থাকিত ; এবং তাহাতে কত আমোদ হইত !" আমিও সে সকল উপাখ্যান শুনিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিলাম—"আজ সে রাণাঘাট কোথায় ?" রাণাঘাটে এখনও পাল চৌধুরীদের বাড়ী ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য এখন মহামহিম মহাপ্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত 'মেলেরিয়া' চন্দ্র অধিকার করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে আমরা পিতাপুত্র দুজনেই মেলেরিয়ার জরগ্রস্ত হইলাম। আমি কোনও রূপে সামালাইলাম। কিন্তু পুত্রের অবস্থা বড় শোচনীয় হইল। এক দিন কাছারিতে হস্‌পিটাল এসিস্‌টেণ্ট তিন টার সময়ে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন—"নির্ম্মলের জ্বর বড় বেশী হইয়াছে। ডাক্তার যদু বাবুকে আনিতে এখনই লোক পাঠান।" রাত্রি ১০টার সময়ে ট্রেন। তখন গরিবপুর পদব্রজে লোক পাঠাইলেও ট্রেনের পূর্ব্বে পৌছিবার সম্ভাবনা নাই। কাছারি ফেলিয়া গৃহে গিয়া দেখিলাম ১৪ বৎসরের শিশু ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে ছট্ ফট্ করিতেছে। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। মাথার চুল ফেলিয়া দিয়া ডাক্তার বরফের পটি দিয়াছেন। তাহার চেহারার এ কয় ঘণ্টায় এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তাহাকে চেনা যাইতেছে না। রাণাঘাটে আরও বড় বড় ডাক্তার আছেন। তাঁহাদের ডাকাইলাম। তাঁহারা অবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ ও গম্ভীর ভাবে রোগীর শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমরা পাগলের মত হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কলিকাতা হইতে প্রত্যেক টেশে টেলিগ্রাফ করিয়া বরফ আনান যাইতেছে। উহাই এক মাত্র চিকিৎসা। দেখিতে দেখিতে জ্বর ১০৭ ডিগ্রি হইল। ফেনাসিটিং দিলে এক ডিগ্রি নামে। আবার কয়েক মিনিট পরে ১০৭ ডিগ্রিতে

উঠে। জ্বর নামিলেই কুনাইন দেওয়া ডাক্তার যত্ন বাবুর মত। কিন্তু অন্যান্য ডাক্তারদের মত জ্বর একেবারে বারণ না হইলে কুনাইন দেওয়া উচিত নহে। ইহা লইয়া ঘোরতর মতভেদ চলিতেছে। যত্ন বাবু একা তাঁহার মত সমর্থন করিতেছেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে একবার ফেনাসিটিনে জ্বর নামিয়া আধ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইল। আমি যত্ন বাবুর মতের পক্ষাপাতী। তিনি বলিতেন যদি জ্বরের পূর্ণ 'রেমিসন' না হইয়া রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে কুনাইন দেওয়া যাইবে কখন? অথচ কুনাইন ভিন্ন জ্বরের ঔষধ নাই। তিনি এ সম্বন্ধে এক খানি বহিও লিখিয়াছিলেন। অগত্যা সম্পূর্ণ জবাবদিহি আমি নিজে লইলে ডাক্তারেরা ১০ গ্রেণ কুনাইন দিলেন। তাহাতে জ্বর আর এক ডিগ্রি নামিল। যত্ন বাবুর ব্যবস্থা মতে আবার ১০ গ্রেণ দিলাম। এরূপে প্রত্যেক ১০গ্রেণে জ্বর এক ডিগ্রি নামিতে নামিতে প্রভাত সময়ে ৯৯ ডিগ্রিতে নামিল। রাত্রি ৪টার ট্রেণে যত্ন বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি বলিলেন তাঁহার দেখিবার পূর্ব্বে আরও ২০ গ্রেণ কুইনাইন দিতে হইবে। তখন ডাক্তারেরা চলিয়া গিয়াছেন। গিরিজা গিয়া তখনই আবার ২০ গ্রেণ খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর তিনি দেখিয়া বলিলেন—"ডাক্তারেরা ছেলেকে মারিয়া ফেলিত। তুমি জিদ করিয়া কুনাইন দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ।" সে দিন শিশু ৯০ গ্রেণ কুনাইন খাইয়াছিল! তার পর দিন একটুক জ্বর, হইয়া আর জ্বর হইল না। কিন্তু তাহার দক্ষিণ কুক্ষিতে যে ফোড়া হইয়াছিল তাহা কোনও মতে সারিল না। প্রায় ৫ মাস যন্ত্রণা ভোগ ও বহু অর্থ ব্যয়ে উহা সারিল না। আবার যত্ন বাবু আসিয়া ঘায়েও কুনাইন দিয়া সারাইলেন। কুনাইন তাঁহার মতে সর্ব্ব রোগের একমাত্র ঔষধ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

আমার হাতার পশ্চাৎ ভাগ দিয়া চূর্ণী প্রবাহিতা। গঙ্গা পূর্ব্বে এ পথে প্রবাহিতা ছিলেন। প্রবাদ 'রাণা' নামক ব্যক্তির এখানে এক 'ঘাট' ছিল বলিয়া স্থানটির নাম 'রাণাঘাট'। গঙ্গা যে সরিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বর্ষার সময়ে বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সরিয়া তাঁহার এই চূর্ণী বা রেখা মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় এই ক্ষুদ্র নদীর নাম 'চূর্ণী'। তাহাতে বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে সামান্য একটুক জল থাকে। রাণাঘাটের লোক এ জল পান করে, এবং উহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। আমি বঙ্গদেশের High Lander (পর্ব্বতবাসী) কখনও নদীর জল খাই নাই। এ জলই কি আমাদের জ্বরের ও অসুস্থতার কারণ? আমার সন্দেহ হইল। আমরা জেলের 'ইনারার' জল খাইতে লাগিলাম, আর এই হইতে জ্বর হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার লাভ করিলাম। তথাপি কুনাইন সর্ব্বদা আমার পকেটে থাকিত। ঘোড়ায় কোথায়ও যাইতেছি। কুনাইন পকেটে আছে। যদি একটুক শরীর কেমন কেমন বোধ হইল, অমনি ঘোড়া থামাইয়া বড়ী একটা গিলিয়া ফেলিলাম। এরূপে হাতে-কুনাইনে রাণাঘাটে দুই বৎসর কাটাইয়াছিলাম।

অতলে।

"Ingratitude thou marble hearted fiend!"

Shakespeare.

পূর্ব্বে আমার বিবাহ উপাখ্যানে বলিয়াছি যে পিতা যদিও এরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন যে আমার কলিকাতার পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি যখন দীনহীনা শাশুড়ী তাঁহার এক হস্তে আমার ভার্য্যাকে ও অন্য হস্তে তাঁহার কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় শিশুপুত্র রজনীকে তুলিয়া দিলেন, পিতা অম্লানমুখে বলিলেন—"আজ হইতে এই মেয়ে ও ছেলে দুটিই আমার হইল," এবং দুটিকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সে ও তাহার মাতা সেই অবধি পিতার দ্বারা, এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে আমার দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তাহার বিবাহ চিন্তায় আমার শাশুড়ী কিরূপে অসাবধানে আমার জ্যেষ্ঠ শিশুটিকে মাদারিপুরে পদ্মার গর্ভে ভাসাইয়া দেন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যখন বেহারে, রজনী তখন কলিকাতায় বি, এ, পড়িতেছিল এবং তাহার চরিত্রদোষে আমার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। রজনীর চরিত্র আমার স্ত্রীর বিপরীত। সে শান্ত, স্থির, বিনয়ী, ও মধুরভাষী। এ সকল যে কেবল ছলনার ও চতুরতার আবরণ মাত্র তাহা তখন জানিতাম না। সে একবার বেহারে আসিয়া বলিল যে কলিকাতার একজন ধনীলোক এ নিয়মে বালকদের বিলাত পাঠাইতেছেন যে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার টাকা পরিশোধ করিবে। আমি বলিলাম যে সে শৈশবে যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল যে আমি তাহাকে 'সিবিল সার্ভিসের' জন্য বিলাত পাঠাইব কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার 'এণ্ট্রেন্স' ও এফ, এ, পরীক্ষার ফলে নিরাশ হইয়া আমি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি।

তবে সে অন্যের সাহায্যে যদি যাইতে পারে আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তাহার পরের বার বেহারে সে আসিলে যখন এ কথা উথাপিত করিলাম, সে বলিল যে ঐরূপ সাহায্যের কথা যাহা শুনিয়াছিল তাহা প্রকৃত নহে, অতএব সে বিলাত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে তাহার মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাড়ী হইতে পত্র লিখিলেন যে দেশের প্রধান জমীদারের কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে; এ পরিবারটির প্রতি আমার পুরুষানুক্রমিক অশ্রদ্ধা। তাহার কারণ তাহাদের অসামাজিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতা। আমি তাহাতে অসম্মত হইলাম। তাহার মাতা ও ভগিনী চটিয়া লাল হইলেন। মাতা লিখিলেন যে এখানে বিবাহ না হইলে তিনি কাশীবাসিনী হইবেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহার উপর বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন যে এত বড় জমীদারের কন্যার সঙ্গে তাঁহারা বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে আমি অসম্মত হইলাম। আমি যেন মণি মাণিক্য লইয়া তাহাকে বিবাহ দিয়া আসি। আমি তাহাতেও টলিলাম না। কারণ ইতিপূর্ব্বে একবার ষ্টীমারে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাইবার সময়ে আমার স্ত্রীর ও শাশুড়ীর তাড়নায় আমি কন্যার পিতা ও মাতার কাছে—ইহাঁরা আমার আত্মীয়—এ বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাঁহারা তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"যাহার বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত নাই, তাহাকে তাঁহারা কিরূপে মেয়ে দিবেন।" শেষে রজনী নিজেও স্ত্রীর কাছে এ বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিল, এবং আমার মনসা আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। রজনী এ পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করে নাই। সে আমার বড় অনুগত ছিল। অতএব তাহার এ আগ্রহে আমি বিস্মিত হইলাম। আমি তখন বলিলাম—এ বিবাহে যে শুভ হইবে আমার বিশ্বাস নাই। আমার হৃদয়ে কিরূপ

করাল ছায়া পড়িতেছে। তথাপি যখন রজনীর পর্য্যন্ত আগ্রহ আমি আর ইহার প্রতিবন্ধক হইব না।" কিন্তু জমীদার মহাশয় সহজ প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি আমার কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন—"আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে আপনি রজনীর জীবিকার উপায় করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিবেন, ও তাহার স্ত্রীকে কখনও বিদেশে লইবেন না, তবে আমি তাহাকে আমার কন্যা বিবাহ দিতে পারি।" এ স্বার্থপরতা ও নীচতায় আমি মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি ধনী, আমি দরিদ্র। তিনি জমীদার, আমি চাকরিদার। আমি তাঁহার জামাতার জীবিকার উপায় করিয়া দিবার ভার লইব, কিন্তু খবরদার তাহার স্ত্রীকে কখনও আমার কাছে বিদেশে আনিতে পারিব না! যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সামাজিকতা, শিষ্টাচার ও মনুষ্যত্ব আছে সে কি কখনও এরূপ প্রস্তাব করিতে পারে? কিন্তু স্ত্রী কুপিতা ফণিনীর মত ফণা তুলিয়া আছেন। কি করিব, আমি এই দাসখৎও স্বীকার করিলাম। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহের "দশ রাত্রির" মধ্যেই আমার ভবিষ্যৎবাণী ফলিল। জমীদার মহাশয়ের আদর্শ পরিচারক ও পরিচারিকার শিক্ষা মতে নববধূ পাগলিনী সাজিয়া শাশুড়ীকে এক প্রস্থ প্রহার করিয়া তাঁহার কাশী যাত্রার সাধ মিটাইলেন। তাহার পর জামাতা শ্বশুর মহোদয়ের কাছে পত্র লিখিল যে সে আমার অনভিমতে বিবাহ করিয়াছে। সে কিরূপে এখন তাঁহার জামাতা হইয়া তাহার কলিকাতার অধ্যয়নের ব্যয় আমার কাছে চাহিবে। তিনি নির্লজ্জের মত আমাকে দাসখৎ স্মরণ করাইয়া দিয়া লিখিলেন যে "রজনী তাঁহার জামাতা হইলেও আমি তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিব, কারণ আমি মহৎ ব্যক্তি।" আমি লিখিলাম "জীবিকা নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিবার" অর্থ আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে তাহার শিক্ষা তিনি শেষ করাইয়া দিলে, তাহার কোনওরূপ চাকরির সাহায্য করিব। সোজাসুজি

তাঁহার জামাতার শিক্ষার ব্যয় আমাকে বহন করিতে হইবে, এ কথা কেমন করিয়া লিখিবেন, তাই তিনি এরূপ কূটভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন উর্ণনাভ আপনার জালে আপনি পড়িলেন। আর আমার মহত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিলাম যে তাঁহার মত ধনীর জামাতার পড়ার খরচ দিয়া মহত্ত্ব দেখাইবার ক্ষমতা আমার মত দরিদ্রের নাই। তখন তিনি বড় সঙ্কটে পড়িলেন। আমি রজনীকে মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা করিয়া দিতেছিলাম। তিনি অনেক লেখালেখির পর জামাতার পত্রে ক্ষত-বিক্ষত-হৃদয় হইয়া অবশেষে মাসিক পনর মুদ্রা সাহায্য মাত্র বহুকষ্টে স্বীকার করিলেন! হায়! রূপচাঁদ তোমার কি মাহাত্ম্য! রজনী এই বদান্যতার উত্তরে লিখিল যে কলিকাতায় দানা খাইয়া থাকিলেও পনর টাকায় তাহার কুলাইবে না। সে আমাকে লিখিল যে সেই কারণে এরূপ কৃপা-পাত্রের পনর মুদ্রা সাহায্য সে অস্বীকার করিয়াছে। অতএব আমি পূর্ব্ববৎ টাকা যোগাইতে লাগিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে বেহারে বৌদ্ধদিগের 'নালন্দ' (বর্ত্তমান 'বড়গাঁও') গ্রামে শিবিরে আছি। সন্ধ্যার পর ডাক আসিল। কলিকাতা হইতে আমার পিসতুত ভাই নগেন্দ্র লিখিয়াছে যে রজনী সেই সপ্তাহের ষ্টীমারে বিলাত পলায়ন করিয়াছে। আমার স্ত্রীর সে সময়ে কৃষ্ণপক্ষ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত তাঁহার জীবনেও শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ আছে। ভাল মানুষের মত কথা কহিতেছেন, ইহার মধ্যে একটুক কথার ব্যতিক্রম হইলে, কি পাণ হইতে চূণ খসিলে, অমনি তাঁহার ক্রোধের ও মানের কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইল, এবং তিনি শয্যা লইলেন। মুসলমানেরা একরাত্রিতে দুইবার খাইয়া ত্রিশ রোজা করে, তিনি একবারও না খাইয়া তাহা পারেন। একবার বারদিন এরূপ নির্জ্জলা একাদশী করিয়াছিলেন। আমি নগেন্দ্রর পত্র পড়িয়া তাঁহাকে

বলিলাম—"এবার মানের পালাটা এখানে শেষ কর। এ দিকে সংবাদ গুরুতর। তোমার ভ্রাতা বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।" মান শোকে পরিণত হইল। তিনি শয্যা হইতে চীৎকার করিয়া তীরবৎ উঠিয়া শিবিরের গালিচায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া ভ্রাতার উদ্দেশে বহু ছন্দে বন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে এ সচীৎকার রোদনে বি, আই, ষ্টীমার থামিবে কি না আমার বড় গুরুতর সন্দেহ আছে। উহা ত্যাগ করিয়া এখন একটা কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। দুজনে প্রথমে ভাবিতে লাগিলাম রজনী টাকা কোথায় পাইল। পরে শুনিলাম তাহার যে খানিকটা জায়গা ছিল তাহা তাহার মাতুলের কাছে বন্ধক দিয়া কিছু টাকা লইয়াছিল। আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কলিকাতার ব্যয় লইয়া তাহার শ্বশুর হইতেও মাসে সেই পনর মুদ্রা উশুল করিয়া উহা জমা করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে আমার স্ত্রীর অলঙ্কারের জন্য এক জাল চিঠি আমার পুস্তক বিক্রেতাকে দেখাইয়া দুইশত টাকা লইয়াছিল। এ সকল টাকার দ্বারা তিনি বিলাতের পাড়ী যোগাইয়াছেন। এ সকল কথা তখন জানিতাম না। অতএব দুজনে ভাবিলাম বুঝি তাহার শ্বশুর টাকা দিয়াছেন ও বিলাতের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, আমার তাহা বড় বিশ্বাস হইল না। এমন সময়ে তাহার শ্বশুরের এক টেলিগ্রাফ আসিল—"নগেন্দ্র (ইনিও তাঁহার জামাতা) টেলিগ্রাফ করিয়াছে যে রজনী বিলাত যাত্রা করিয়াছে। আমি তাহার খরচ দিব না। আপনি তাহাকে দয়া করিয়া ফিরাইয়া আনুন। আপনার ক্ষমতা আছে।" সকল সন্দেহ ঘুচিল। বুঝিলাম শ্বশুরের ভরসায় তিনি যান নাই। আশঙ্কা হইল বুঝি এ বোঝা আমার স্কন্ধে পড়িবে। দেখিলাম তাহার শ্বশুরের বিশ্বাস আমি পরামর্শ দিয়া তাহাকে পাঠাইয়াছি। আমি

এমন দীর্ঘবাহু নহি যে বেহারের বড়গাঁও গ্রামে বসিয়া ষ্টীমারখানি সমুদ্রগর্ভ হইতে ধরিয়া আনিতে পারি। আমি তাঁহাকে টেলিগ্রাফে উত্তর দিলাম যে আমি তাহার বিলাত-যাত্রার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না এবং তাহাকে সমুদ্র হইতে ফিরাইয়া আনাও আমার অসাধ্য। তাহার পরদিন আমার ভায়েরাভাইয়ের এক টেলিগ্রাফ আসিল—"তুমি রজনীকে বিলাত পাঠাইয়া বড় অন্যায় করিয়াছ। তাহাকে ফিরাইয়া আন। আমি তাহার খরচ দিব না।" আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ইনি তাঁহার জীবনে কখনও সিকি পয়সা দিয়া রজনীর সাহায্য করেন নাই। অথচ তিনি আমাকে এ ধমক দিয়া কর্কশ টেলিগ্রাফ করিয়াছেন! আমি তাঁহাকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক এক পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন যে তিনি ঐ টেলিগ্রামের কোনও খবরই রাখেন না!

আমার কোনও বন্ধুর শিশুকে তাহার মাতা ভর্ৎসনা করিলে সে বলিত—"বা বুদ্ধিমান!" শুনিলাম জামাতার বিলাত প্রয়াণ সংবাদ প্রাপ্তির ও আমার কাছে টেলিগ্রাফ নিষ্ফল হইবার পর গভীরা রজনীতে জমীদার শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় চট্টগ্রামের "বা! বুদ্ধিমানদের" এক সভা বসিয়া গিয়াছিল। যাঁহার বুদ্ধির লাঙ্গুল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তিনি একজন তান্ত্রিক। তিনি যথাতন্ত্র স্থির করিলেন যে জামাতার নামে শ্বশুর মহাশয় একটা মিথ্যা চুরির মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া জামাতাকে ওয়ারেন্টের দ্বারা সমুদ্রগর্ভ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনুন। অন্যান্য "বা বুদ্ধিমানগণ" সাধু, সাধু বলিয়া এই বিজ্ঞ প্রস্তাবে সায় দিলেন। উকিল চক্কাদাস বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন শেষে মিথ্যা ফৌজদারী অভিযোগের জন্য শ্বশুর মহাশয় জেলে যাইতে প্রস্তুত আছেন? তাও ত বটে! তখন লাঙ্গুলধারী নং ২, যাঁহার "মহাফেজি" স্ফীতোদর তাঁহার

বেতনের ক্ষুদ্রত্বের ক্ষতিপূরণ করিয়া রাখিয়াছে, প্রস্তাব করিলেন কোনও বিধবার ঘড়ী চুরি করিয়া জামাতা বিলাত পলায়ন করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিলে, ফৌজদারির আইন বিধবার প্রতি খাটিবে না। আবার সাধুবাদের ধ্বনি উঠিল। এক বিধবার কাছে তৎক্ষণাৎ দূত গেল, কিন্তু বিধবা এ প্রস্তাবের মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া বলিল যে সে একটি ভদ্রলোকের ছেলের নামে এরূপ একটা মিথ্যা মোকদ্দমা করিতে যাইবে কেন? তাই ত—সে যাইবে কেন? সে ত তাহার ধনপতি শ্বশুর, কি তস্য বুদ্ধিমান মন্ত্রী নহে! উকিল ঢক্কাদাস আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন শেষ পরামর্শ স্থির হইল যে যখন শ্বশুর মহাশয় তস্য জামাতার জন্য পনর টাকার বেশী পড়ার খরচ "হা হতোঽস্মি!" "হা দগ্ধোঽস্মি!" করিয়াও দিতে পারেন নাই, তখন আমি দরিদ্র যে তাহাকে মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা দিয়াছি তাহা তাঁহাদের দীর্ঘ ও সুক্ষ্মবুদ্ধি-সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয় আমার ভায়েরাভাই ইহার অংশ দিয়াছেন, এবং জামাতার বিলাতের খরচেরও অংশ দিবেন। এই সিদ্ধান্ত-বলে তাঁহার নামে আমার কাছে ঐ জাল টেলিগ্রাম তন্ত্রশাস্ত্রমতে প্রেরিত হইয়াছিল। এ সকল পরামর্শ না করিয়া যদি শ্বশুর মহাশয় তিমিঙ্গিল-রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বিলাতের জাহাজখানি সেই 'প্রলয় পয়োধি জলে' ধরিয়া রাখিতেন, তবে বরং কায হইত। তিনি না পারেন, নিশ্চয় তান্ত্রিক চূড়ামণি পারিতেন, কারণ তিনি প্রত্যহ 'ত্বরিতানন্দের' কৃপায় 'কারণ সমুদ্রে *' ভাসিয়া শর্ব্বরী অতিবাহিত করিতেন। এ সকল পরামর্শ যে তান্ত্রিকের চক্রের মত বড় গোপনে হইয়াছিল তাহা

* তান্ত্রিকেরা গাঁজাকে 'ত্বরিতানন্দ' এবং মদকে 'কারণ' বলে।

বলা বাহুল্য। কিন্তু ঢক্কাদাস রাস্তায় বহির্গত হইয়া পথের লোককে ও তাহার উভয় পার্শ্বের গৃহবাসীদিগকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া এ গুপ্ত সমাচার বিতরণ করিতে করিতে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। কাহারও কোনও কথা চট্টগ্রামে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইলে উহা গোপনীয় কথা বলিয়া তাঁহাকে বলিলেই হইল। যথা সময়ে ডাকে এ সকল গুপ্ত-তত্ত্ব আমার কাছে উপস্থিত হইল। আমি তখনই টেলিগ্রাফ আফিসে পত্র লিখিয়া জাল টেলিগ্রামটি আবদ্ধ করাইলাম। সংবাদ শুনিয়া চট্টগ্রামের "বা! বুদ্ধিমান" দল ফৌজদারি মোকদ্দমার আশঙ্কায় হতভম্ব হইলেন।

এ দিকে বি, আই, ষ্টীমার মান্দ্রাজ পৌঁছিল। সেখান হইতে রজনী কান্ত লিখিলেন যে তাঁহার শ্বশুর ধনী লোক, তাঁহার বিলাতের খরচ দিবেন, এই আশায়ই তিনি আমার অমতে তাঁহার শ্বশুরের কন্যার শুভ পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। (এতদিনে তাঁহার বিবাহের রহস্য বুঝিলাম।) কিন্তু মান্দ্রাজে তিনি তাঁহার শ্বশুর হইতে যে টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার শ্বশুর তাঁহার সাহায্য করিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিয়াছেন। তিনি জানেন যে তাঁহার বিলাতের ব্যয়ভার গ্রহণ করি এমন অবস্থা আমার নহে। তথাপি টেনিসন 'কোট' করিয়া লিখিয়াছেন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুন্দুভি তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে। তিনি ফিরিবেন না, বরং ইংলণ্ডে তুষারাবৃত সমাধিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিবেন। মাসেক পরে ষ্টীমার ইংলণ্ডে পৌঁছিল। তিনি যথা সময়ে সেই সংবাদ তাঁহার শ্বশুরকে ও আমাকে লিখিলেন। শ্বশুর আমাকে এবারও লিখিলেন যে এখনও ভাল, আমি রজনীর কাছে পত্র লিখিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনি। তিনি তাহার বিলাতের খরচ দিবেন না। আমি লিখিলাম যে আমি লিখিলেই যে রজনী ফিরিয়া আসিবে সে

বিশ্বাস আমার নাই। আর ফিরিয়া আসিলেই বা কি হইবে? জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না। তিনি তখন 'রক্তবিস্ফুটিতেক্ষণ' করিয়া আমাকে লিখিলেন যে আমি ও তিনি তাহার আত্মীয় থাকিতে চট্টগ্রামে তাহার জাতি মারিবে সাধ্য কার! এ সকল কথা লিখিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য এক পত্র আমি রজনীকে লিখিয়া শ্বশুর মহাশয়ের কাছে পাঠাইলাম। অন্যথা তাঁহার বিশ্বাস হয় না। তিনি তাহা পাঠাইলেন। কিন্তু জামাতা "শ্বশুরমন্দিরং" অপেক্ষা তুষার-সমাধি সঙ্কল্প করিয়া তাহার তীব্র উত্তর দিলেন। এরূপে কয়েক মাস পত্র লেখালিখিতে গেল। শ্বশুর মহাশয়ের পুত্র তখন মহা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপে ইংলণ্ডে আছেন গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ইহাঁকে তখন বড় ভাল মানুষ বলিয়া জানিতাম। আমি তাঁহাকে লিখিলাম ইংলণ্ডে উপবাসে মরিবে বলিয়া আমি তাহাকে এ পর্য্যন্ত মাসে মাসে এক শত টাকা পাঠাইয়াছি। ইহা যে একটা চতুরতা আমি তাহা জানিতাম না। শ্বশুর মহাশয় যেই এই সংবাদ শুনিলেন, অমনি 'মা ভৈ' বলিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন আর ভয় নাই। আমি তাঁহার জামাতাকে মরিতে দিব না; তাহার বিলাত-খরচরূপ হিমালয় ভার বহন করিয়া তাহার জীবনোপায় করিয়া দিব। পরের খরচে 'বেরিষ্টার' জামাই হইবে, ইহার অপেক্ষা সুবিধার কথা আর কি হইতে পারে। অতএব তিনি এবার তাহাকে দৃঢ়ভাবে লিখিলেন—"আমি তোমার বিলাতের খরচ দিব না। আমি আজ হইতে মনে করিব আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে।" একেবারে প্রবাদের শ্রীহট্টবাসীর প্রতিজ্ঞা—

"মৃত্যু চিরা খাইমু,
তবু সিলহট্টর পানি ন যাইমু।"

আমি তাই বলিয়া থাকি যাহার টাকা নাই সে দরিদ্র, যাহার টাকা আছে সে মহাপাপিষ্ঠ। আমি রজনীকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়াছি। কেমন করিয়া তাহাকে বিলাতে মরিতে দিব ? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিবে ?" আমি মৃণালিনীর মত উত্তর দিলাম—"ডুবিয়া মরিব।" আমার তখন চারি শত টাকা মাত্র বেতন। স্কন্ধে দুই সহোদর ভ্রাতা ও এক খুড়তত ভ্রাতা ও তাহাদের পরিবার, তদ্ভিন্ন ভগিনী মাসী পিসী ইত্যাদি লইয়া একটা বৃহৎ সংসার। তথাপি শ্রীভগবানের ও স্বর্গীয় পিতার দিকে চাহিয়া এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। মাসিক এক শত পঞ্চাশ টাকা যেন উপবাস করিয়াও পাঠাইলাম, কিন্তু বেরিষ্টারের 'ইনে' ভর্ত্তির ফিস এক শত পঞ্চাশ পাউণ্ড, তখন ১৮০০ টাকা ! এ টাকা কোথায় পাইব ? শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সে সময়ে বেহার হইতে বদলি হইলাম। সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, এ টাকাও পাঠাইলাম। ভাগলপুরে একখানি তক্তাপোষ মাত্র আমাদের চারি মাস সম্বল ছিল।

আমি জলের তলে আমার আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই দেখিয়াছিলাম না। আমার স্ত্রী মৃণালিনীর মত রত্ন দেখিতেছিলেন রাশি রাশি—তাঁহার নিজের সোনার নাক, রূপার চোক, হীরার কাণ, বাপের শূন্য ভিটায় অট্টালিকা, তথায় দোল দুর্গোৎসব, ও তাঁহার বাহু নাড়া, আরও কত কি ? এ আকাশ দুর্গের আমি একখানি ইট খসাইতে চাহিলেও তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আমার প্রতি এ আত্মবিসর্জ্জনের জন্য কৃতজ্ঞতা নহে, অগ্নি বর্ষণ করিতেন। এ দিকে তাঁহার ভ্রাতা বিলাতে আমার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া 'নেটিভ প্রিন্স' সাজিয়া লীলা করিতে লাগিলেন। দুইবার দুই পরীক্ষা পাস করিয়াছেন বলিয়া লিখিলেন। স্ত্রী হুলুধ্বনি দিলেন, কাংস্য ঘণ্টা বাজাইলেন। তাহার পর সংবাদ আসিল যে তিনি নহে, তাঁহার নামধেয় অন্য একজন পাস হওয়াতে

তিনি ভুলক্রমে এরূপ সংবাদ দিয়াছিলেন! তখন বিলাতি 'বারের' পরীক্ষা নাম মাত্র ছিল। কেবল বার 'টার্ম্' ডিনার খাইলেই হইল। তাঁহার দুই বৎসর দশ মাসে ফিরিবার কথা। ছয় বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইল। শেষে এখানের পত্নীকে শ্বশুর মহাশয় বিধবা করাতে, সেখানে দ্বিতীয়া এক সধবা পত্নীর যোগাড় করিয়া পত্র পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। আমিও টাকা বন্ধ করিলাম। স্ত্রীর অশ্রু ধারায় বহিতে লাগিল। তাহার পর মিস্ মেনিং ও এক জন মিশনারির দ্বারা পরিচিত মিসেস্ হেমিন্টন নামিকা একটি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রাণা রমণীর কৃপায় তাঁহার উদ্দেশ পাইলাম। ছয় বৎসরে সেই নাম মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বার' প্রবেশ করিতে ও ফিরিয়া আসিতে ২০০০৲ টাকা তলব করিলেন। এদিকে অর্থাভাবে অচিকিৎসায় আমার বাম কর্ণ ও বাম পদ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এবং চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। চিকিৎসা দূরে থাকুক, তাঁহার টাকা যোগাইতে পারিব না বলিয়া ছুটী পর্য্যন্ত লইতে পারি নাই। রুগ্ন কর্ণ, চরণ ও দেহ লইয়া সবডিভিসনের খাটুনি খাটিতেছি। যাহা হউক এরূপে মরিয়া, না খাইয়া, কোনও রূপে তাঁহার মাসিক খরচ বেতন হইতে যোগাইতেছিলাম। কিন্তু এখন ২,০০০৲ দুই সহস্র টাকা এক সঙ্গে কোথায় পাইব? অগত্যা তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের কাছে আবার দরখাস্ত উপস্থিত করিলাম। লিখিলাম তাঁহার জামাতা পাস হইয়াও দেশে ফিরিতে পারিতেছেন না। আমি ১২০০০৲ বার হাজার টাকা দিয়াছি। আমার হাতে আর এক পয়সাও নাই। এমন কি অর্থাভাবে চির রোগগ্রস্ত হইয়াছি। আরম্ভে বিলাতের খরচ তাঁহার কাছে চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কত? অনুমান ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা, শুনিয়া তিনি মধ্যম নারায়ণ তৈল মাথায় দিয়াছিলেন। দশ হাজার টাকা! তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"তো—বা ! আমি ১০,০০০ টাকা দিতে পারিব না। আমার মেয়ে বিধবা হইয়াছে, মনে করিব।" এবার জামাতা পাস হইয়াছে, বারিষ্টার হইয়া বাড়ী আসিতেছে, অতএব কিছু শিষ্টাচার দেখান উচিত মনে করিয়া, কত টাকা আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। যেই শুনিলেন যে ২০০০ টাকা, তিনি আবার কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন—"তোবা ! এত টাকা দিতে পারিব না। তার পর এক দিকে কুটুম্বিতা রক্ষার জন্য অন্য দিকে আমাকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য লিখিলেন—তিনি তাঁহার জামাতাকে সাহায্য করিয়া ধর্ম্মনষ্ট করিবেন না। যদি আমার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া আমি নিজে কর্জ্জ চাহি, তবে তিনি দিতে পারেন। মন্দ কি ? আগতপ্রায়-জামাতারও মন রক্ষা করা হইল, টাকাটাও নিরাপদ হইল, তাহার উপর সুদও পাওয়া যাইবে ! মানুষ যে এতদূর মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে আমি বিশ্বাস করিতাম না। আমি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সম্মত হইলাম। কিন্তু তিনি সত্য সত্যই আমার বাড়ী ভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক লইয়া, ২০০০ টাকা আমাকে কর্জ্জ দিলেন ! তাঁহার জামাতা আমার এই অপমান পূর্ণ ঋণের দ্বারা ফিরিয়া আসিলেন। আর কলিকাতা পৌঁছিবা মাত্র সর্ব্বাগ্রে সহৃদয় শ্বশুর মহাশয় আনন্দে অভ্যর্থনা করিয়া টেলিগ্রাফ করিলেন—"তুমি অন্য কোথায়ও না গিয়া ঘরের ছেলে একবার আমার ঘরে আইস, এবং আমার ঘরে থাকিয়া চট্টগ্রামে ব্যবসা কর।" পরের টাকাতে জামাতা বেরিষ্টার হইয়া যখন দেশে ফিরিয়া অসিয়াছে, এবং আর টাকা দিতে হইবে না, তখন আর "ধর্ম্ম নষ্টের" ভয় নাই। কাযেই যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ও আধমরা হইয়া জামাতাকে বেরিষ্টার করিয়া আনিয়াছে, সে পাপিষ্ঠের কাছে না গিয়া—কি জানি সে যদি টাকা চায়—সোণার চাঁদ আমার, তুমি একবারে "অসার খলু সংসারে সার শ্বশুর মন্দিরে" আইস ! কিন্তু জামাতা তাহা পারিলেন না।

তাঁহার বিলাতি লীলার ফলে এক উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া এক মাস কলিকাতায় জনৈক বন্ধুর গৃহে পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ছয় বৎসর আমার হৃদয়-শোণিত শোষণের পর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ফেণী আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে বক্ষে লইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার পতিও আসিলেন। ছয় বৎসরের অবর্ণনীয় দুর্গতি ভুলিয়া দুটী দিন আনন্দে কাটাইলাম।

আমি তাঁহার কাছে যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম ও শ্বশুরের ২০০০৲ টাকা কর্জ্জ তাহা ধরিয়া তাঁহার বিলাত খরচ শোধ ১৭০০০৲ টাকা হইল। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা 'বিধবা' পত্নীর কাছে পত্রে লিখিলেন যে তিনি আমার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই টাকা যোগাইতে গিয়া অর্থাভাবে অচিকিৎসায় আমার স্বাস্থ্য গিয়াছে, আমি একপ্রকার দুই অঙ্গহীন হইয়াছি। আমার চট্টগ্রামের অট্টালিকা সংস্কারাভাবে ধরাশায়ী হইয়াছে। অর্থাভাবে উহা পুনঃ প্রস্তুত করিতে পারি নাই। অতএব তাঁহার কুবের তুল্য ধনবান পিতার দ্বারা পত্নী তাঁহাকে এই ঋণ হইতে মুক্ত করুন এবং তিনি ফেণী চলিয়া আসুন। তিনি পত্নীসহ রেঙ্গুনে গিয়া ব্যবসা করিবেন। পতিপ্রাণা 'বিধবা' পত্নীর কঠোর সংসার-জ্ঞান পূর্ণ এক উত্তর আসিল। বলা বাহুল্য যে এই প্রণয় লিপির মুসাবিধা তাঁহার পিতার। তাহাতে লেখা আছে যে উক্ত পিতৃদেবের বৈষয়িক অবস্থা তখন বড় শোচনীয়। তিনি এ ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। আর আমি যেরূপ মহৎ লোক, যে টাকা তাঁহার জামাতাকে দান করিয়াছি, তাহার আর প্রতিদান চাহিব না। নিতান্ত চাহি, তবে উক্ত বিধবা পত্নীর পতি চট্টগ্রামে ব্যবসা করিয়া তাহা শোধ করিলেই হইবে। পত্নীর শুভাগমন; কি বিরহ-বিধুর স্বামীর সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে কোনও কথাই পত্রে লেখা নাই। অতএব স্বামী তিন মাস এরূপ

প্রণয় লিপিতে কাটাইয়া, এবং আমার কাছে কিঞ্চিৎ আইন শিক্ষা করিয়া—কারণ বিলাতে কিছুই শিক্ষা করেন নাই—সর্ব্বশেষ ফেণীতে ও কলিকাতায় আরও কিছু লীলা করিয়া বিরহ-কাতর হৃদয়ে রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। কয়েক মাস স্বনাম খ্যাত এক বারিষ্টার বন্ধুর আশ্রয়ে ও সাহায্যে ব্যবসা করিয়া পূজার বন্ধে আমার নয়াপাড়া গ্রামস্থ বাড়ীতে আসিলেন। অমনি শ্বশুর মহাশয়ের দৌলতখানায় আবার 'বা! বুদ্ধি-মানদের' সভা বসিল। এবার আমার দুই আত্মীয় এবং আশৈশব বন্ধু চন্দ্রকুমার ও অখিল বাবুও শ্বশুর মহাশয়ের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাদের এত ভক্তি করিতাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহাদের হৃদয়ের কোণায় কোথায় আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। তাহা সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি এরূপ একটি আত্ম-বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, তাহাতে আবার রজনীকান্ত তাহার পত্নীকে তাহার পিতার আকাঙ্ক্ষা মতে বিধবা না করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। তাহার উপর আবার শ্বশুর হইতে ১৭,০০০৲ টাকাটা আদায় করিয়া আমাকে দিবে,—তাঁহা-দের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা শ্বশুর মহোদয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিলেন যে আমার প্রতিকূলে একটা সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করি-বেন, এবং কপর্দ্দকও আমাকে না দিয়া দাঁতে তৃণ লইয়া রজনীকান্তের বিধবা পত্নীকে আনিয়া সধবা করিতে আমাকে বাধ্য করিবেন। আমি রজনীকে লইয়া দাদা অখিল বাবুর সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কিছু-দিন পূর্ব্বে তাঁহার দেব সদৃশ কনিষ্ট ভ্রাতা কৈলাস বাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। আমি তাহার শিশু পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিতেছিলাম। আর সে সময়ে দাদা বলিলেন তাঁহার টেবেলের উপর এক খানি পত্র পাইয়াছেন। পত্র রজনীর শাশুড়ীর। তাহাতে লেখা আছে তাঁহার কন্যাকে পাঠা-

ইলে "যদি ভোগ করিয়া দখল না করে" তবে কি হইবে? অর্থাৎ ভোগ করিয়া জাতি মারিয়া রজনী যদি পত্নীকে সধবা না করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয় ইহাই 'বা বুদ্ধিমানদের' আশঙ্কা। আমরা উভয়ে 'ভোগের' কথায় লজ্জায় মাথা হেট করিলাম। আমি পরে বলিলাম যদি এরূপ পত্র তাঁহার কাছে আসিয়া থাকে, ভালই হইয়াছে। আমি টাকা চাহি না। তিনি মধ্যস্থ হইয়া রজনীর স্ত্রীকে আনাইয়া দেন। সে তাহাকে লইয়া রেঙ্গুন চলিয়া যাউক। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে কেমন করিয়া পত্র খানি তাঁহার টেবলের উপর আসিল তিনি জানেন না। তিনি এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাহা হউক তিনি চেষ্টা করিয়াও নয়াপাড়ায় সামাজিক গোলযোগ করিতে পারিলেন না। বংশীয়েরা দলাদলি না করিয়া বরং রজনীকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এমন কি প্রাচীন পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র মহাশয় পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীর নবমীর নিমন্ত্রণে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন। আমি গোলযোগের আশঙ্কায় তাহাতে অসম্মত হইলে তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধে নবমীর নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর তৃপ্তি হইল না। তিনি সর্ব্বদা নাসিকা বাহির করিয়া তাঁহার পুত্রের সঙ্গে কে তামাক খাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের এক চোটে সমাজে উঠিবার এমন একটা সুযোগ আমি নষ্ট করিলাম, তিনি চটিয়া লাল হইলেন; এবং আমি ফেণী ফিরিয়া গেলে, তিনি আমার পত্নী ও রজনীকান্তকে তৎক্ষণাৎ স্বগ্রামে লইয়া এক 'শনির সির্ন্নি' দিলেন। দাদা অখিল বাবু সেই শনির স্থান গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাতাকে সেই গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া একটা 'সির্ন্নির দল' সৃষ্টি করিলেন। এই 'সির্ন্নির' দ্বারা বিরহ-যন্ত্রণা নিবারিত করিয়া ভ্রাতা আবার রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে রজনী ও বেরিষ্টার বন্ধুর পত্নী কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বেরিষ্টার বন্ধু চট্টগ্রামের লোকের নাম শুনিতে পারেন না, দেশে আসেন না। তাঁহারা উভয়ে আমাকে বলিলেন যে তিনি আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। আমি লিখিলে তিনি চট্টগ্রামে আসিবেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম—"শুনিয়াছি তুমি একতারা লইয়া সন্ধ্যার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা কর। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র জন্মক্ষেত্রই কর্ম্মক্ষেত্র। যেখানে তৃণটিও জন্মিয়াছে, সেখানে তাহার কর্ম্ম আছে। তবে তোমার সম্বন্ধেই কি কেবল ঈশ্বর ভ্রান্ত? তোমার জন্মক্ষেত্রে কি তোমার কোনও কর্ম্ম নাই? তুমি কি তোমার সন্তানদের ইউরেসিয়েন-নরকে নিপাতিত করিতে চাহ?" তাঁহার বাঙ্গালি বিদ্বেষ এত দূর যে তাহার পুত্র কন্যারা বাঙ্গালা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না। তিনি উত্তরে লিখিলেন আমার পত্রখানি পাইয়া তিনি অনেক চিন্তা করিতেছেন। তাহার কিছু দিন পরে তিনি রজনীকে লইয়া সপরিবারে চট্টগ্রাম আসিলেন। আমি তাঁহাকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া ফেণী ফিরিলাম। আবার সীতাকুণ্ডে গিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র হইলাম। তিনি বলিলেন যে আমার পত্র সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, অনেক বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁহার পরামর্শ করিবার আছে। তিনি তীর্থে তীর্থে, এমন কি হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়া মহাত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার এ সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য ছুটী লইয়া আসিয়াছেন। আমি মূর্খ কিরূপে এরূপ গুরুতর সন্দেহসকল দূর করিব? তথাপি তিনি ছাড়িলেন না। একটা সমস্ত রাত্রি স্ত্রীদের মাথাকুটা সত্ত্বেও তিনি নিদ্রা গেলেন না। আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। প্রভাত সময়ে দৃঢ়রূপে আমার কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার সকল সমস্যার সুন্দর নিষ্পত্তি পাইয়াছেন। ইতিমধ্যে

শ্বশুর মহোদয় সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা তাঁহার পুত্রের নাই। সিন্নির দলও আমাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই। বিধাতার এমনি ন্যায়-বিচার উহা তাঁহারই ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে! তাহার উপর উক্ত বেরিষ্টার বন্ধু বিলাতি বুটের পদাঘাতে তাঁহার গৃহতল কম্পিত করিয়া বলিলেন যে এত সাধ্য সাধনার পর তিনি রজনীকে ছাড়িয়া যখন দিলেন না, তিনি কেমন লোক তাহা বুটধারী বেরিষ্টার মহাশয় দেখিবেন! ভয়ানক কথা! তখন তিনি আমার ২০০০ টাকার তমস্থক খানি ফেরত দিয়া এবং ভগিনীর রেঙ্গুনে যাত্রার জন্য ২০০০৲ টাকা দিয়া ভগিনীকে ছাড়িয়া দিলেন, আর কৃতজ্ঞ ও সহৃদয় ভগিনীপতি বিরহ-বিধুরা 'বিধবা' পত্নীকে লইয়া সোজা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আমার ভার্য্যা কাঁদিয়া 'কল্পতরুর' নগেনের পিসীর মত ফেণী ভাসাইয়া পত্র লিখিলেন—"ওরে আমার তপস্যার ধন! তুই বউ লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলি। অভাগিনী আমাকে তাহার ও তোর চন্দ্র মুখখানিও একবার দেখাইয়া গেলি না?" এ দিকে "চন্দ্রমুখী বউ" এমনি ভাগ্যবতী যে তাঁহার স্বামী ষ্টীমার হইতে যে বিষম মস্তিষ্কের জ্বর (brain fever) লইয়া কলিকাতায় নামিলেন, আর সেই জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

রোগের কারণ তাঁহার ব্যভিচার। স্কুলে ও কলেজে থাকিতেই, পরে শুনিলাম, তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিলে দেখিলাম সেই ব্যভিচার-স্রোত সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। তিনি আমার ও তাঁহার উভয়কে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তখন প্রধান দুই মকারের ক্রীতদাস। রেঙ্গুন গিয়া পানদোষ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে পূজার সময়ে বাড়ীতে আসিয়া ২৪ ঘণ্টা মদের উপর ছিলেন। আমি অনেক বুঝাইলাম। স্ত্রী অনেক কাঁদিলেন, অবশেষে আমার শিশু

পুত্রের মাথায় হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এবার চট্টগ্রামে তিন দিন পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ ছিলেন, এবং অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ষ্টীমারে উঠিয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার ফল এই বিষম জ্বর। কিছু দিন কলিকাতায় চিকিৎসা করাইয়া বৈদ্যনাথ গিয়া কিঞ্চিৎ সারিলে, ভগিনীকে যুগল 'চন্দ্রমুখ' দেখাইবার জন্য ফেণী আসিলেন, এবং ঠিক সেই সময়ে আমি অস্থায়ী পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট নিযুক্ত হওয়াতে আমার সঙ্গে চট্টগ্রামে গেলেন। ডাক্তার কবিরাজ সকলে বলিতে লাগিলেন যে এ অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীকে কাছে রাখা ভাল নহে। আমি তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। আমার শাশুড়ী ও পত্নী চটিয়া লাল হইলেন। গোপনে আমার ভায়েরা-ভাইয়ের লোক একজন পাঠাইয়া তাহাকে আনাইয়া লইলেন এবং রাত্রি ৮টা না হইতে 'বংশ-রক্ষার' জন্য তাহাকে তাহার স্বামীর কক্ষে পাঠাইয়া কপাট বন্ধ করিতে লাগিলেন। আমি তাহার জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ফেণী ফিরিলাম; এ দিকে রাসের সময়ে আমার পত্নী ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে আমার বাড়ীতে লইয়া বংশীয়দের সঙ্গে আহার করাইয়া ভ্রাতাকে সমাজে তুলিলেন। ভ্রাত নাচিলেন, গাইলেন এবং আরোগ্য দৃঢ় হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য সুরাপান করিলেন। ইহার ফল—বিলাতের অত্যাচারে যে যক্ষ্মার বীজোদ্গম হইয়াছিল তাহা ফুটিয়া উঠিল। এ সকল কথা লিখিতে দারুণ মনোবেদনায় আমার হৃদয়ের শুষ্ক ক্ষতস্থান উত্তেজিত হইয়া শোণিত ছুটিয়া পড়িতেছে। অতএব সংক্ষেপে—তিনি আবার কলিকাতা, আবার বৈদ্যনাথে গিয়া কিঞ্চিৎ সারিলে, মাঘ মাসের কলিকাতার শীতে 'ফেন্‌সি ফেয়ারে' (Fancy fair) ইয়ার্কি দিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে সঙ্গিনীর সঙ্গে পদব্রজে গৃহে ফিরিলেন। এবার যে পড়িলেন আর উঠিলেন না। আমি রাণাঘাট

আসিয়া দেখিলাম তাঁহার শেষ অবস্থা। ডাক্তারের উপদেশ মতে সমুদ্রানিল সেবনের জন্য চট্টগ্রামের 'মহেশখালি ও কুতুবদিয়া' নামক দ্বীপে গেলেন, এবং সেখানে মৃতপ্রায় হইয়া চট্টগ্রাম সহরে আসিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন। "আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে"—শ্বশুর মহাশয়ের শ্রীমুখের সাধু ইচ্ছা বুঝি বিধাতা শুনিয়াছিলেন, এবং অদৃষ্ট পটে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের পুত্র হইতে পত্নীসহ যে ২০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ে যে ১০০০৲ টাকা জমাইয়াছিলেন, তাহা ব্যাঙ্কে ছিল। তাঁহার মাতার ভয় হইল যে পুত্রের মৃত্যুর পর এই টাকা আমার ১৭০০০৲ টাকার জন্য আমি গ্রাস করিব। অতএব তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার সঙ্গে যোগ দিয়া মৃত্যু শয্যায় পুত্রের দ্বারা এক 'উইল' করাইলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার মৃত্যুর পর তস্য পুত্রবধূ পুত্রের সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন! আর ট্রষ্টি হইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা! কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হতভাগ্যের মৃত্যু হইল, ট্রষ্টি মহাশয় জাতি ভয়ে তাহাকে মৃত কুকুরের মত ফেলিয়া সরিয়া পড়িলেন। বিপত্তিকালে মধুসূদন। তাহাকে পোড়াইল আমার ভ্রাতারা! এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, ট্রষ্টি মহাশয় আমাকে উইলের মর্ম্ম অবগত করাইলেন এবং পাছে আমি লইয়া যাই এই ভয়ে আমার হৃদয়ের রক্তে হতভাগা যে ৩০০০৲ টাকার পোষাক ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া বিলাতে 'নেটিভ প্রিন্‌স' লীলা করিয়াছিল, তাহা ৩০০৲ টাকাতে বিক্রয় করিলেন! রেঙ্গুণ যাইবার সময়ে অর্থাভাবে আমার নিজের ঘড়ী চেন তাহাকে দিয়াছিলাম, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাহাও এ সঙ্গে 'বিক্রমপুরে' পাঠাইলেন। একটা হীরার আঙ্গটি সে রেঙ্গুন হইতে আনিয়া আমার আঙ্গুলে পূজার সময়ে পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিজের অঙ্গুরীয় ছিল না বলিয়া উহা তাহাকে আমি সম্প্রতি ব্যবহার করিতে

দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম তাহার নিজের ঐরূপ অঙ্গুরীয় একটি হইলে উহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। শুনিলাম ভায়েরাভাই অঙ্গুরীয়টি বিক্রয় করেন নাই। হাতে রাখিয়াছেন। যখন আমার পত্নী উহা আদর্শ ভ্রাতার নিদর্শন স্বরূপ চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন ভায়েরাভাই মহাশয় উহা ভ্রাতার বধূর কাছে পাঠাইয়াছেন বলিয়া লিখিলেন! বধূ "মালিনীর বাড়ীর" সেই রাসোৎসবের পর আর স্বামীর মুখ দর্শন করেন নাই। মৃত্যুশয্যায় স্বামী 'চন্দ্রমুখ' দেখিতে চাহিয়াছিলেন। যেমন পিতা তেমন কন্যা। জাতিনাশের ভয়ে তিনি আসেন নাই। এক ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীর মুসলমান প্রণয়ী না বলিয়াছিল—"ঠাকুরাণীর সে দিকে নিষ্ঠা আছে। তিনি মুসলমানকে জাতিনষ্ট হইবে বলিয়া মুখ চুম্বন করিতে দেন না!" তাহার পর জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রের জন্য তাহার মাতুলের কিছু নিদর্শন পাঠান উচিত বলিলে, তাঁহার মাতা একখানি পুরাতন ধুতি আমার পুত্রের জন্য রাখিতে দয়া করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহা যথেষ্ট মনে না করিয়া এক সুট পোষাক রাখিয়াছিলেন। শ্বাশুড়ী স্বয়ং কাশী যাইবার সময়ে উহা রাণাঘাটে আনিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে উহারও কাশী-ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। উক্ত ট্রষ্টের টাকা ট্রষ্টী মহাশয় প্রায় ভাঙ্গিয়াছিলেন। যাহা ৪০০৲ মাত্র অবশিষ্ট বেঙ্কে ছিল তাহা শাশুড়ী জিদ করাতে, তিনি উঠাইয়া আনিয়া স্ত্রী হইতে হেণ্ডনোট লইয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এরূপে আবদ্ধ না হইলে উহাও বিক্রমপুরে যাইত। শাশুড়ীর কাশী প্রাপ্তির সময়ে তিনি স্ত্রীকে এই ৪০০৲ শত মুদ্রা দান করিয়া যান। কিন্তু এ টাকাও তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া শুনিয়াছি। সেই দ্বিতীয়বার বিধবা কুবের-কন্যা তাহার ২০০৲ টাকা উদ্ধার করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ২০০৲ টাকার জন্য নানা ছলনাপূর্ণ পত্র সময়ে সময়ে লিখিয়া থাকেন।

এই সাংঘাতিক অঙ্ক, এরূপে রজনীকান্তের লীলা ও আমার জীবনের শেষ হইল। তিনি আমার হৃদয়ের রক্তে সাহেবী করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ত মরেন নাই, মরিয়াছি আমি। একজন গরিব ডেপুটির ১৫০০০৲ টাকা এট্‌লেণ্টিকের তলায় গেলে কি থাকে? তাহার উপর দশ বৎসর ব্যাপী আমারও ঘোরতর হৃদয় শুষ্ককারী অপমান ও যন্ত্রণা! বহুবিপদে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু এবার ডুবিলাম—অতলে! এই ১৫০০০৲ টাকার মধ্যে তিনি ১০০০৲ টাকার একখানি নোট না কি স্ত্রীকে দিয়াছিলেন। এমনি বিধাতার নির্ব্বন্ধ তাহাও স্ত্রী হারাইয়াছিলেন? তাঁহার চিহ্নের মধ্যে একখানি বিলাতী রগ (rug) আমার কাছে ছিল। এক দিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে সান্ধ্য-সম্মিলনীতে আমি উহা গায়ে দিয়া গিয়াছিলাম। আমি এ সম্মিলনীর উপযোগী বহুমূল্য শাল কোথায় পাইব? মহারাজ-কুমার প্রদ্যোৎকুমার কাপড় খানি ধরিয়া দেখিলে বলিলাম—উহার মুল্য ১৫০০০৲ টাকা! উপাখ্যান শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

বন্ধু সমাগম।

রাণাঘাট হইতে কলিকাতা রেলে ১॥ ঘণ্টার পথ। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্য ও অসাহিত্য-সেবী অনুগ্রহ করিয়া রাণাঘাটে বেড়াইতে, ও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এমন কি প্রত্যেক রবিবার পূর্ব্বাহ্নের, এবং প্রত্যহ অপরাহ্নের বাষ্পীয় যানের জিমূত গর্জ্জন শুনিলে আমি অতিথি প্রত্যাশায় ঝাউ সজ্জিত রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশ আমার সহোদর স্থানীয়; এবার কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি এক দিন লিখিয়া পাঠাইলেন যে সেই রবিবার তিনি বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। হীরেন্দ্র বাবু "সাহিত্যে" কয়েক প্রবন্ধে 'রৈবতকের' যে দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছিলেন পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। সুরেশ লিখিয়াছিলেন যে তিনি কলিকাতার একজন ধনীর সন্তান; তাঁহার ভ্রাতা "রেলি ব্রাদারের" মুচ্ছুদ্দি; তিনি নিজে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী এবং পরম পণ্ডিত। এখন তিনি একজন খ্যাতনামা এটর্ণি এবং বাঙ্গলার একজন প্রধান লেখক ও সমালোচক। বলা বাহুল্য তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে আমারও বড় আগ্রহ ছিল। অতএব রবিবার প্রাতে ১০টার ট্রেন হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া আমরা পতি পত্নী তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। গাড়ী ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম যে একজন সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দীর্ঘ স্থূল কলেবর, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, মস্তকে

খর্ব্ব কেশ, ললাট ও চক্ষু জ্ঞান-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। বয়স প্রথম যৌবন। সুগোল বদন মণ্ডলে সুন্দর ওষ্ঠের উপর ঈষদ গুম্ফ রেখা, এবং অধরে সুপ্রসন্ন ঈষদ্ হাসি। চোকে সোনার সমুজ্জ্বল চশ্‌মা। পরিধানে সুকুঞ্চিত ধুতি ও পিরাণ। দক্ষিণ স্কন্ধোপরে সুকুঞ্চিত চাদর। শান্ত-সমুদ্রবৎ-গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ মূর্ত্তি খানি দেখিয়াই তাঁহাকে পরম পণ্ডিত ও দেব-চরিত্র-সম্পন্ন একজন মহাপুরুষ বলিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ও সম্মানের সঞ্চার হইল। সঙ্গে কৈ সুরেশ ত নাই! তিনি একা আসিয়াছেন। তাঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিব, আমি সে জন্য কিছু চিন্তিত হইলাম। যাহা হউক বুঝিলাম তিনিই হীরেন্দ্র বাবু। আমি তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গাড়ী হইতে গৃহে লইয়া গেলাম। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন যে শেয়ালদহে সুরেশের সঙ্গে তাঁহার একত্র হইয়া আসিবার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেণের সময় পর্য্যন্ত সুরেশ আসেন নাই। অতএব তিনি একা আসিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের জন্য স্ত্রী যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছিলেন ও নিজে রন্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই পবিত্র শান্ত স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে কেমন নিরামিষ আহারী বলিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার আহার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ নিয়ম আছে কি?" ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"আমি মাছ মাংস খাই না।" আমি বলিলাম—"তবে ত আপনি আমার মুণ্ডটি খাইয়াছেন! আমার ত মাছ মাংস ভিন্ন অন্য কোনও আয়োজনই নাই।" তিনি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমাকে সামান্য দুটি ডাল ভাত দিলেই হইবে।" আমি ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীকে খবর দিলে—তিনি তখনও রন্ধন করিতেছিলেন—তিনি মাথায়

হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"এত গুলি খাবার নষ্ট হইল! আর এত বেলায় তাঁহার জন্য কি নিরামিষ আহারেরই বা আয়োজন করিব?" যাহা হউক সমস্ত দিন তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপে বড় আনন্দে কাটাইলাম। তাঁহার বৃত্তান্ত 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের ইতিহাস লিখিতে পরে বলিব। তাঁহার আহার অতি সামান্য। একটি পাখীর আহার বলিলেও চলে। তিনি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করেন, ততোধিক এত গুলি কঠোর পরীক্ষা এরূপ কৃতিত্বের সহিত দিয়াছেন, আমার কাছে ইহা একটা অলৌকিক ব্যাপার (miracle) বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার শান্ত আকৃতি, শান্ত প্রকৃতি, দেবচরিত্র, ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কেবল প্রাচীন ভারতের জগৎপূজ্য ঋষিদের সহিত তুলনীয়। আমাদের পতি পত্নীর হৃদয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ করিয়া এ যুবক-ঋষি ৪টার ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। কি শুভক্ষণে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আজ তিনি আমার একটি দেব-ভ্রাতা ও পরম শ্রদ্ধাস্পদবন্ধু।

কি উপলক্ষে, স্মরণ হয় না, এ সময়ে পত্রের দ্বারা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হই। স্মরণ হয় ১৮৭৬খৃষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটীতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্ব্বে আমার "পলাশির যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্য পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায়

যেন একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—"ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাসিমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটী গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন-কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি 'নেশনাল মেলায়' গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একদিন একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন—"কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুর বাড়ীর কাঁচা মিঠা আঁব।" তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছে—আজ "কাচামিঠা আঁব" পরিপক্ব "ফজলী"। তাঁহার গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত! রবি বাবু আজ বাঙ্গলার 'শেলি' 'কিট্‌স্' 'এডগার পো'—কত কিছু বলিয়া পরিচিত। নব্য বঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সখের অনুকরণে উন্মত্ত।

এ সময়ে রাণাঘাটে রবি বাবুর যে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম তাহা আমাদের বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম—

"হিন্দু মেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র—তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে

আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র—কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্র বালকের সহিত ক্ষণ কালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর আজ প্রায় মাস খানেক হইল রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম যে আপনি আমার গাড়ীতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্য পরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সে দিন আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য পরিষদ্ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে দিনও আপনার দর্শন লাভ হইল না। সহৃদয়তা গুণে আজ আপনি নিজ হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপন পত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।”

স্মরণ হয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম আমার নিম্নে তাঁহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গ সাহিত্য উভয়ে নিরাশ হইব। আমার আশা তাঁহার স্থান আমি অযোগ্যের বহু ঊর্দ্ধে হইবে। মাইকেল ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যের, হেম বাবু ‘বৃত্র সংহারের’ এবং আমি ‘পলাশির

যুদ্ধের' কবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু রবি বাবু কোনও এক কাব্য বিশেষের কবি বলিয়া কেহ তাঁহার নাম করে না। অথচ তিনি রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান গীতি কবি। শুনিয়াছি তাঁহার বিশ্বাস বঙ্গভাষায় গীতি কাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জমীদারি কার্য্যে কুষ্টিয়া যাইবার পথে এক দিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌর বর্ণ; ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকা শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষ যুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরাণ ও রেশমী চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহ্যতা-ব্যঞ্জক। গাড়ী হইতে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল——

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।"

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক আমার পুত্র নির্ম্মল তাহা হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে গাইল। তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে। রবি বাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, এবং আরও দুই একটি গান গাইতে বলিলেন। সে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান গাইল। তিনি এ হইতে নির্ম্মলকে বড় ভাল বাসিতে লাগিলেন। নির্ম্মল তাঁহার গানে নূতন নূতন সুর দিয়া গাইয়াছিল বলিয়া না কি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বন্ধুদের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হারমোণি ফ্লুট তাঁহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না, কারণ যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দ্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া, সুরটিমাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে এক খানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া উহা গাইতে লাগিলেন। আমি এমন সুন্দর গান অতি অল্পই শুনিয়াছি।

গীত।

১

এস এস ফিরে এস!
বঁধু হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে! ফিরে এস!

২

আমার নিষ্ঠুর ফিরে এস হে!
আমার করুণ কোমল এস!

আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্তি
সুন্দর ফিরে এস !
আমার নিতি সুখ ফিরে এস !
আমার চির দুঃখ ফিরে এস !
আমার সব সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন !
অন্তরে ফিরে এস !

৩

আমার চির বাঞ্ছিত এস হে !
আমার চিত শঙ্কিত এস !
ওহে চঞ্চল হে চিরন্তন,
ভুজ বন্ধনে ফিরে এস !
আমার চক্ষে ফিরিয়ে এস !
আমার বক্ষে ফিরিয়ে এস !
আমার শয়নে, স্বপনে, বসনে, ভূষণে,
নিখিল ভুবনে এস !

৪

আমার মুখের হাসিতে এস হে !
আমার চোকের সলিলে এস !
আমার আদরে, আমার দুলাল,
আমার অভিমানে ফিরে এস !
আমার সকল স্মরণে এস !
আমার সকল ভরমে এস !
আমার ধরমে, করমে, সোহাগে, সরমে,
জনমে, মরণে এস !

একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস। তাহাতে রবি বাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ! আমার বোধ হইতে লাগিল কণ্ঠ একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শ মাত্র অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গি! গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে! আমি তখন "রৈবতক"-"কুরুক্ষেত্রের" কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল; আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল। আমি পৌত্তলিকের এ ভাব দেখিয়া রবি বাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া, আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তার পর নিজের রচিত আরও দুই একটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিম বাবুর "বন্দে মাতরম্" গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাইলেন। বলিলেন গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই। তিনি বাঙ্গালি অন্য কাহারও গান যে জানেন, কি বাঙ্গালি অন্য কাহারও কাব্য যে পড়িয়াছেন, তাঁহার কথায় বোধ হইল না। শুনিয়াছি বঙ্কিম বাবুও শেষ জীবনে অন্য কাহারও বহি পড়িতেন না। আমি কিন্তু ভাল বহি বাহির হইলেই পড়ি। তবে নির্ম্মলের মুখে অন্যের রচিত কোনও কোনও গান শুনিয়া তিনি প্রশংসা করিলেন। কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা গান গিরীশ ঘোষের রচিত বলিলে, বলিলেন—"শুনিয়াছি তিনি গান রচনা করিতে পারেন।" এই পর্য্যন্ত। রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বলিত রবি বাবুর অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। বিশেষতঃ উপরের কীর্ত্তনটি

লক্ষ্য করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি অনেক সময়ে ভাবি আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবত খানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।" আমি বলিলাম—"উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কাল পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু সজল হইল। দেখিলাম আমার প্রাণের এ উচ্ছ্বাস তাঁহার প্রাণও স্পর্শ করিল। তাঁহার চক্ষুও ছল ছল হইয়া উঠিল। গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবি বাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা। তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই। তাহার পর তাঁহার গান ও কবিতার কথা হইল। নিধু বাবুর গানগুলি ৪।৬ লাইন একটি সম্পূর্ণ ভাবের ফোয়ারা, এবং তাঁহার গান গুলি বড় দীর্ঘ, এক একটি কবিতা বিশেষ, বলিলে তিনি বলিলেন তাঁহার ছোট ছোট গানও আছে। তাঁহার 'সোণারতরী' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী দৃশ্যের একটি ফটো। কিন্তু উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বড় বুঝিলাম না।

দুজনে বহুক্ষণ গল্প করিতে করিতে আহার করিলাম, এবং আহার করিতে করিতে সাহিত্য ও বহু বিষয় আলাপ করিলাম। অপরাহ্নে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে রাণাঘাট দেখাইতে ও বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'ভারতীতে' 'রৈবতকের' সেই অপূর্ব্ব সমালোচনার উল্লেখ করিয়া রবিবাবু বলিলেন—"আমি ও দিদি এ সমালোচনার কিছুই জানি-

তাম না। উহা বোধ হয় আমাদের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করিবেন না। আপনি উহার লেখিকা বলিয়া যাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছেন, তিনিও নির্দ্দোষী। উহার লেখিকা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কোনও কারণবশতঃ আমি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমি ও দিদি উহার জন্য বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" ইহার কিছুদিন পরে এক কবি-বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন যে আমি এ কারণে 'কুরুক্ষেত্র' "ভারতীকে" উপহার দেই নাই বলিয়া সরলা দেবী বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি তিনি বন্ধুর কাছ হইতে একখানি 'কুরুক্ষেত্র' চাহিয়া লইয়াছেন এবং উপরোক্ত সমালোচনা-লেখিকার নামও তাঁহাকে বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া আমার কাছে নাম প্রকাশ করিবেন। সুরেশের বিবাহ সভায় তিনি কাণে কাণে "সেই নামটি" বলিলেন। সেই 'মধুর নাম' 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবা-মাত্র' আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া কি বলিতেছিলাম। তিনি আমার মুখে হাত দিয়া বলিলেন—"সম্মুখে লেখিকার পুত্র বসিয়া আছেন।" তখন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং আমার কাণে কাণে বলিলেন—"তিনি বড় অনুনয় করিয়া আপনার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছেন।" আমি যাহাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম তিনি এক দিন আমার পরম আত্মীয়া ছিলেন, পরে এক পাপিষ্ঠ পৃষ্ঠদংশকের কৃপায় অনাত্মীয়া হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি স্ত্রী কবি নহি, আমার প্রতি তাঁহার এ নিষ্কাম বিদ্বেষ কেন—কিছুই বুঝিলাম না।

নগর ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু সুরেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ রবি বাবুর

ও নির্ম্মলের গান হইল। পরে 'টেবিলে' পানাহার বড় আনন্দের সহিত চলিতে লাগিল। রবি বাবুর মার্জ্জিত সোণার চশমা, মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত ইষদ্ হাসি। সমস্ত দিন ঠাকুর বাড়ীর ওজন মাপা চাপা কথা, চাপা হাসি, ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আমি আর পারিলাম না। স্বুরা দেবীও পরিমিত শিষ্টাচারের বন্ধন কিছু শিথিল করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"রবি বাবু! সমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় জ্বালাতন হয়েছি। আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখ্‌তে পাচ্ছি না। দোহাই আপনার! আপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা বলুন!" তিনি এবার খুব হাসিলেন। তিনি এ বেলা বড় খাইতেছিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। বধূঠাকুরানী সকালে একদিকে আমার প্রতি ৫৩ রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আলাপেও এরূপ একটা মোহিনী শক্তি (charm) আছে যে আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর বোঝাই লইতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম—"এ কেবল শিষ্টাচারের কথা। কলিকাতার "বৈঠকখানার বীরকে" (Hero of the Calcutta drawing room) আমি গরীব কি খাওয়াইতে পারি? আর আলাপ—আমি 'বাঙ্গালের' আলাপে রবি বাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই ত কথা!" তখন স্বুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবমতে আমরা খুব ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি ও স্বুরেন্দ্র বাবু উভয়ে রবি বাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া জীবনের একটি দিন বড় আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। রবি বাবু তাঁহার জমীদারী কাছারি হইতে লিখিলেন—"এমন কখনই মনে করিবেন না যে,

আপনার স্নেহ এবং আদর আমি বিস্মৃত হইয়াছি—বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষুদ্র-শক্তি স্বল্প-ক্ষুধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরিহাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার আয়োজনের মধ্যে ব্যঞ্জন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু স্নেহ অংশটুক সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম। এবং তাহাও ব্রাহ্মণ-সুলভ লোভ বশতঃ সঙ্গে বাঁধিয়া আনিয়াছি।" 'সখি! এরূপ না হইলে তোমার নাম প্রিয়ম্বদা হইবে কেন?' এরূপ না হইলে রবি বাবু সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন কেন?

ইহার কিছু দিন পরে অমৃত বাজারের শিশির দাদা কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; সেই ভারতখ্যাত রাজনীতিকুশল শিশির বাবুর আজ কি অপূর্ব্ব অবস্থা! তিনি তখন 'অমিয় নিমাই চরিত' লিখিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমতরঙ্গে তিনি আত্মহারা। অনিবার দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে। কথায় কথায় কাঁদিতেছেন। আমার রাণাঘাট বদলিতে তিনি বড় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা পড়িয়া এ অঞ্চল দেখিতে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তিনি আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"করিবেন না কেন? আমরা কি মরা দেবতার পূজা করিয়া থাকি?" তাহার পর এ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমি এ উপলক্ষে রবিবাবুর উপরোক্ত গানটির প্রশংসা করিয়া গানটি একবার রবিবাবুর মুখে তাঁহাদের শুনিতে বলিলাম। মতি দাদা বলিলেন—"হুঁ! রাশি রাশি পদাবলির গান ফেলিয়া রবিঠাকুরের গান শুনিতে যাই!" আমি বলিলাম তাহাতে ত পাপ নাই। রাশি রাশি পদাবলির গান আছে বলিয়া যে এখন আর ভাল গান

হইতে পারে না, এমন কথাও ত' নাই। তখন শিশির বাবু বলিলেন—"নবীন! তোমার মুখে মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, রবি সকলেরই প্রশংসা শুনি। অথচ তুমিও একজন তাহাদের সমকক্ষ কবি। তুমি কেমন করিয়া এরূপ বিনয় শিক্ষা করিলে, এবং হৃদয় এরূপ অভিমানহীন করিলে, তাহা বলিতে পার কি? তোমার পায়ের ধূলা লইতে ইচ্ছা করে।" আমি বলিলাম—"না দাদা! আমি তোমার একটি পায়ের ধূলার তুল্যও নহি। আমি বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। কিন্তু দাদা! একটী কথা বলিব—মানুষকে ভালবাসিয়া সুখ, না বিদ্বেষ করিয়া সুখ? মানুষকে মানুষ বিদ্বেষ করিয়া, হিংসা করিয়া, নিন্দা করিয়া কি সুখ পায় আমি বুঝি না। আমার সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। মানুষ অপূর্ণ, কেবল শ্রীভগবান্ মাত্র পূর্ণ! মানুষের দোষ দেখিলে ত ভালবাসা যায় না, গুণ দেখিলেই ভালবাসিতে পারি। আমার কত দোষ আছে। অতএব মানুষের দোষ না দেখিয়া গুণ দেখিতে আমার বড় আনন্দ বোধ হয়।" তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ সময়ে কলিকাতায় এক দিন অপরাহ্নে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একটু আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কথা আর কি বলিব! তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ হইল। সর্ব্বশেষ সাপ্তাহিক প্রভুদের অপূর্ব্ব সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম—"আপনি বঙ্গসাহিত্যের একমেটে সরস্বতীকে বটতলার ধূলা কাদা ও পুতিগন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া, এবং দোমেটে করিয়া, অমল শুভ্র বর্ণে ও বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়া শত-শোভাপূর্ণ-সহস্র দলে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার

প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন বঙ্গসাহিত্য আবার সেই 'কি মজার শনিবার' 'হদ্দ মজার রবিবার' সাহিত্যের দিকে গড়াইতেছে। আপনি কেমন করিরা চুপ করিয়া চাহিয়া আছেন ?" তিনি চিন্তাযুক্ত বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—"নাতি! 'গড়াইতেছে' কেন, গড়াইয়াছে বল। সত্যই আমরা যে বটতলা হইতে তুলিয়াছিলাম, বঙ্গসাহিত্য আবার সেই বটতলায় গিয়াছে। কিন্তু কি করিব?" আমি বলিলাম—"আপনি এখনও জীবিত, আপনার মানসিক শক্তি ও প্রতিভা এখনও পূর্ণ প্রতিভান্বিত, এবং বঙ্গসাহিত্যে আপনার একাধিপত্য এখনও অপ্রতিহত। আপনি আবার 'বঙ্গদর্শনের' পতাকা গ্রহণ করুন, আর আমরা আপনাকে বেষ্টন করিয়া সে পতাকার ছায়ায় দাঁড়াই। আপনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি আমরা সাহায্য করি আপনি একখানি ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস 'বঙ্গদর্শনের' মত খণ্ডশঃ মাসে মাসে লিখিবেন। আপনি নভেল ছাড়িয়া, এ গুরুতর কার্য্যটিতে ব্রতী হ'ন। আপনি ভিন্ন উহা আর কাহারও দ্বারা হইবে না।" তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তাহা পারি, যদি তোমারাও কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও। আমি এখন বুঝিতেছি যে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলাম। তুমি চেষ্টা করিয়া উহা পুনর্জীবিত করিয়াছিলে, কিন্তু যাঁহারা উহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা উহা রাখিতে পারিলেন না। তুমি আর একদিন আসিও। এ বিষয়ে ভাল করিয়া পরামর্শ করিয়া একটা কর্ত্তব্য স্থির করিব।" তাহার পর বলিলেন—"তুমি দেখিতেছি 'নভেলের' উপর বড় নারাজ।" আমি বলিলাম—"আমি ত বরাবর আপনাকে বলিয়াছি আপনার বিলাতি পীরিতের পিণ্ড পিণ্ডান্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরাজী 'নভেলের' পতি পত্নীর ও উপপত্নীর পীরিত! আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যে সকল প্রেম লইয়া

আমাদের জাতীয় জীবন, ও জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত,—পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষ ঈশ্বরপ্রেম,—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তাহা শুনিলেন না। ছাই ভস্ম নরনারী প্রেমের উগ্র ছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারী হত্যার—বিশেষতঃ নারী-দিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।” প্রাচীরে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অভাগিনী কনিষ্ঠা কন্যার ‘অইল পেণ্টিং’ ছিল। তাঁহার চক্ষু তাহার দিকে পড়িল, এবং সজল হইল। এই কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল। তিনি শূকরের গলায় মুক্তার মালা দিয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন—“সত্য, নবীন! আমি এখন ভাবিতেছি যে আমি ‘নভেল’ লিখিয়া দেশের হিত কি অহিত করিয়াছি। এজন্য তুমি দেখিয়াছ আমি আমার শেষ উপন্যাসগুলিতে ধর্ম্মের সুর ধরিয়াছি।” আমি বলিলাম—“ধরিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বের ‘নভেলে’ যে তীব্র বিষ ঢালিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার যে এরূপে হইবে, আমার বড় বিশ্বাস নাই। পাপের ছবিগুলি যেরূপ চিত্তাকর্ষক ও মাদকতাপূর্ণ, পুণ্যের ছবি কি সেরূপ হইয়াছে? আপনার উপন্যাসের উচ্চ শিল্প ও ধর্ম্মনীতি সাধারণে বিশেষতঃ রমণীদের মধ্যে কয়জন বুঝিতে পারে? আমি সেজন্য বলিতেছি আপনি উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসটিতে হাত দিউন।” তিনি নীরব রহিলেন। আমি বিদায় হইবার সময় আবার বলিলেন—“তুমি শীঘ্র আর একবার আসিও। তোমার ঐ জ্বলন্ত উৎসাহে আমার বুড়া হাড়েও বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। আর একবার সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।” বঙ্গ সাহিত্যের সেই সুদিন আর হইল না।

ইহার পর একদিন চাকদহ মিউনিসিপাল আফিসে বসিয়া আছি।

৪ টার পূর্ব্বে মিটীং শেষ না হওয়াতে, ৮টার ট্রেণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এমন সময় কলেজ-কারামুক্ত কয়েকজন চাকদহ-বাসী যুবক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি সময় কাটাইবার উপায় স্বরূপ তাঁহাদের পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। একজন কলেজি-শিক্ষা বা স্বাস্থ্য-তিতিক্ষা শেষ করিয়াছেন। তিনি একজন সাহিত্যপ্রিয় যোগ্য লোক। আমি বলিলাম—"আমি আপনাদের মিউনিসিপালিটী পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করা যাইবে। রথ দেখা হইবে, কলা বেচাও হইবে।" বেড়াইতে বেড়াইতে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের তিনি একজন গোঁড়া, এবং তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল আদর্শ-চরিত্র বলিয়া খুব প্রশংসা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন চরিত্রটিকে তিনি আদর্শ-চরিত্র বলেন। তিনি বলিলেন—কেন? সকল চরিত্রই আদর্শ। প্রশ্ন—পুরুষ চরিত্রের আদর্শ কে কে? তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন—পুরুষ চরিত্র না হয় বাদ দিলাম। বঙ্কিম বাবু পুরুষচরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে বড় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীচরিত্র সকল কি আদর্শ নহে?" প্রশ্ন—মাতৃচরিত্রের আদর্শ কে? তিনি আবার ভাবিয়া বলিলেন—তাহা কেহ নাই। প্রশ্ন—আচ্ছা ভগিনী-চরিত্রের আদর্শ? আবার ভাবিয়া উত্তর—তাহাও নাই। প্রশ্ন—কন্যা-চরিত্রের আদর্শ? উত্তর—তাহাও নাই। প্রশ্ন—তবে কোন্ চরিত্রের আদর্শ আছে? উত্তর তৎক্ষণাৎ—কেন, পত্নী-চরিত্রের? প্রশ্ন—কে? উত্তর আবার তৎক্ষণাৎ—কেন? সূর্য্যমুখী। প্রশ্ন—লোকে যেমন ইচ্ছা করে সীতা সাবিত্রীর মত স্ত্রী হউক; আপনি কি সেরূপ ইচ্ছা করেন যে সূর্য্যমুখীর মত রমনী আপনার স্ত্রী হউক? আপনি কি ইচ্ছা করেন, আপনার স্ত্রী অভিমান করিয়া দুপুর রাত্রিতে গৃহত্যাগ

করিয়া পলায়ন করেন? এবার তিনি বড় সঙ্কটে পড়িলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ভ্রমর।" আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"এবার আরও ভাল। আপনি কি ইচ্ছা করেন যে আপনার স্ত্রী আপনার একবার মাত্র পদস্খলিত হইলে—সময়ে সময়ে কাহার না হয়—আপনার ভিটাতে ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িবেন?" তিনি এবার আমার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ান্তে বলিলেন—"তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলিন কিছুই নহে?" উত্তর—"কই, আমি ত সে কথা বলি নাই। আপনি বঙ্কিম বাবুর গোঁড়া। আমি তাঁহার উপাসক। আপনার মত আমিও বঙ্কিম বাবুর গদ্য পড়িয়া গদ্য লিখিতে শিখিয়াছি। তিনি আমার গুরুস্থানীয়। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম বাবু অমর। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে। কিন্তু আদর্শ চরিত্র নাই। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ-পিতা, আদর্শ-পুত্র, আদর্শ-ভ্রাতা, আদর্শ-ভগিনী, আদর্শ-মাতা, আদর্শ-কন্যা, এমন কি আদর্শ-ভৃত্য পর্য্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিম বাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন—গড়িতে পারেন নাই। এ কথা কেবল আপনাকে নহে, তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাস উপহার পাইয়া আমি বারম্বার তাঁহাকে লিখিয়াছি। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলিন ইওরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।" তিনি তাহা স্বীকার করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিম বাবু লিখিলেন যে তিনি শান্তিপুরের রাস কখনও দেখেন নাই। অতএব রাস দেখিতে আসিবেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি কিছুদিন রাণাঘাটে আমার সঙ্গে থাকিবেন, এবং যে সকল বিষয়ের প্রস্তাব উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল, তাহাও স্থির করিবেন। আমাদের

পতি পত্নীর আনন্দের সীমা রহিল না। রাসের সময় তাঁহার জন্য সমস্ত স্থির করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি, পত্র পাইলাম তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে, অতএব তিনি আসিতে পারিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে রাণাঘাটে আসিয়া আমার সঙ্গে কিছু বেশী দিন থাকিবেন, কারণ কলিকাতার হট্টগোলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না। তাঁহার বিশ্বাস, যে রাণাঘাটের জল বাতাস ভাল না হইলেও, তাঁহার নাতী নাতিনীর স্নেহে ও শুশ্রূষায় সে অভাব পূরিত হইবে। হা! ভগবান! আমাদের এ আশাও পূর্ণ করিলে না! ইহার পরে একদিন আমার প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা লিখিলেন যে সেই দিনই বঙ্কিম বাবুর অস্ত্র চিকিৎসা (operation) হইবে। অবস্থা ভাল নহে। সকলেই বড় চিন্তিত হইয়াছেন। তাহার দুই দিন পরে সংবাদ পত্রে মর্ম্মাহত হইয়া দেখিলাম যে এই শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন। তিনি একবার "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছিলেন যে যে দেশে এক শতাব্দী-তেও একজন বড়লোক জন্ম গ্রহণ করে, সে দেশ ভাগ্যবান। এ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের উর্ব্বর ও ভাগিরথী-বিধৌত পবিত্র ক্ষেত্রে বহু বড়লোক—ধর্ম্মজগতে রামমোহন ও রামকৃষ্ণ, এবং সাহিত্য জগতে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাল বড় বিষম পরীক্ষক। তথাপি পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংস, দয়ার সাগর বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা বিদ্যাসাগর, ক্ষণজন্মা হতভাগ্য মধুসূদন, এবং প্রতিভার বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অমরত্ব বোধ হয় মহা কালের অগ্নি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইবে। পরমহংসদেব এখনই অবতার ভাবে এক সম্প্রদায় দ্বারা গৃহীত ও পূজিত হইতেছেন। বঙ্গমাতা এই অধোগতির সময়েও রত্নপ্রসবিনী।

"কুরুক্ষেত্র কাব্য"।

স্মরণ হয় এলাহাবাদের 'কন্‌গ্রেস্' দেখিয়া ফেণী ফিরিয়া আসিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ "রৈবতক" রচনা শেষ করিবার ৫ বৎসর পরে "কুরুক্ষেত্র" রচনা আরম্ভ করি। "রৈবতক" লিখিতে আমার ৩ বৎসর লাগিয়াছিল। তাহার কারণ প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে আমি গুরুতর কিছুই লিখিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু পর্য্যন্ত এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি দুই দিকে দুই সামাদান জ্বালাইয়া অনেক রাত্রি—সময় সময় রাত্রি ২ টা পর্য্যন্ত—জাগিয়া তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কাযে কাযে প্রাতে ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। আমার কি রকম কু-অভ্যাস, রাত্রি জাগা দূরে থাকুক, আমি অপরাহ্ণেও কোন লেখা পড়ার কার্য্য করিতে পারি না। এমন কি ছাত্র জীবনেও আমি বড় বেশীক্ষণ প্রদীপের আলোকে অধ্যয়ন করিতে পারিতাম না। বলিয়াছি চট্টগ্রাম স্কুলে পড়িবার সময়েও আমি অপরাহ্ণে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘণ্টা খানেক এবং প্রাতঃকালে ঘণ্টা খানেক মাত্র পড়িতাম, এবং সমস্ত সন্ধ্যা পিতার বৈঠকখানার প্রান্তে বসিয়া গান ও খোস গল্প শুনিতাম, এবং আমোদ দেখিতাম। এ অভ্যাস আমার চিরদিনই রহিয়া গিয়াছে। চিরদিন, এমন কি বড় বড় সবডিভিসনে কার্য্য করিবার সময়েও আমি ১২ টার পূর্ব্বে প্রায় আফিসে যাই নাই এবং ৩।৪ টার পর আফিসে থাকি নাই। তাহার পর গৃহে আসিয়া জলযোগ করিয়া সংবাদ পত্রাদি পড়িতাম, এবং সূর্য্যাস্তের সময় হইলেই অশ্বপৃষ্ঠে, গাড়ীতে কি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইতাম। সূর্য্যাস্তের পর গৃহে আসিয়া শীত কাল ভিন্ন অন্য সময়ে গৃহের প্রাঙ্গণে কিম্বা খোলা বারান্দায় অন্ধকারে

বসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতাম। কিম্বা গৃহে মৃদু আলোকে বসিয়া সঙ্গীত শুনিতাম। অতএব প্রাতঃকাল মাত্র আমার লেখার সময়। এ জন্য আমি উষা সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ প্রক্ষালনের পর প্রাঙ্গণে উষার শোভা দেখিয়া কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে বেড়াইতাম। তাহার পর প্রভাত হইলে চা কি কোকো, কি শুধু দুধ রুটি খাইয়া ৯টা পর্য্যন্ত নিবিষ্ট মনে আপন কার্য্য করিতাম। এ তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমাকে প্রত্যহ বহু পত্র লিখিতে হইত, এবং সব-ডিভিসনের ডাক খুলিয়া 'অফিসিয়াল' চিঠি পত্র ও রিপোর্টাদি ও লিখিতে হইত। অবশিষ্ট সময়টুকু মাত্র আমি আমার কবিগিরিতে নিয়োজিত করিতে পারিতাম। ইহার ফলে এই হইত যে কোনও দিন কিছুই সময় পাইতাম না। এমন কি মাসের পর মাস, কখনও বা (যেমন "রঙ্গমতী" লিখিবার সময়) বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিছুই লিখিবার সময় পাই নাই, কারণ প্রাতঃকাল ভিন্ন অপরাহ্ণে কি প্রদীপালোকে আমি একটী অক্ষরও লিখিতে পারি না। এমন ও হইয়াছে যে একটা লাইন অসম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বহুদিন পরে আবার যখন লিখিতে বসিয়াছি, পূর্ব্বে কি লিখিতে যাইতেছিলাম তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। সেই অসম্পূর্ণ লাইন পূর্ণ করিতে পারি নাই। কখনও বা পূর্ব্ব কল্পনা ভুলিয়া টানিয়া টুনিয়া উহা কোনও মতে শেষ করিয়াছি। তাহার উপর সমস্ত জীবন চাকরির ও সংসারের উৎপাতে সাংসারিক শান্তি কাহাকে বলে আমি বড় জানি নাই। তবে শ্রীভগবান্ চিত্তের যে একটুক স্বাভাবিক প্রসন্নতা আমাকে দয়া করিয়া দিয়াছেন, তাহা শত বিপদেও অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, এবং বন্ধুবর্গ সকলেই আমাকে পরম সুখী মনে করেন। তাহার কারণ আমি কোন দুঃখকে কখনও আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে দিই নাই।

বিপদ আসিল, দুঃখ আসিল, তাহার নিবারণের একটা যথাসাধ্য উপায় স্থির করিলাম। তাহার পর শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সেই কর্ত্তব্যের পথে চলিলাম। এ সকল কারণে আমার কোনও কাব্য আমি অল্প সময়ে লিখিতে পারি নাই। ছুটীতে আপন বাড়ীতে ছিলাম বলিয়া যৌবনের প্রথম উদ্যমে কেবল "পলাশির যুদ্ধ" খানি মাত্র তিন মাসে লিখিতে পারিয়াছিলাম। "রঙ্গমতী" লিখিতে পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। এক এক বৎসরের পর এক এক সর্গ লিখিবার সময়ও শান্তি পাইয়াছিলাম; তদ্রূপ "রৈবতক" লিখিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। এ সময়ে আমি ফেণী সবডিভিসনটি নূতন করিয়া সৃজন করিতেছিলাম, এবং দীর্ঘকাল পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। "কুরুক্ষেত্র" লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া উহা ১৮৯১ খৃঃ ২৮ শে জানুয়ারি ফেণীতে বঙ্গোপসাগর তীরে শিবিরে শেষ করি। তখন বন্ধুবর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রের দ্বারা বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছে। অতএব 'কুরুক্ষেত্রের' হস্তলিপি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাঠাইলাম। 'কুরুক্ষেত্রে' দুর্ব্বসাচরিত্র আরও ফুটাইবার জন্য তাঁহার একটি কৌতুক-মূর্ত্তি শিষ্য উপস্থিত করিয়াছিলাম। কাব্যখানি আগাগোড়া গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিলে এক ঘেয়ে হইবে আশঙ্কায় একটু হাস্যরসের সঞ্চার করিয়া আলোক ছায়ার ক্রীড়া দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরদাস বলিলেন যে এরূপ (sublime) উচ্চরস বা শান্তিরস-প্রধান কাব্যে হাস্যরস ভাল লাগিবে না। তিনি দোহাই দিয়া এই শিষ্যকে বাদ দিতে লিখিলেন। অতএব শিষ্যকে বিদায় দিলাম। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে জরৎকারুকে বড় কৃষ্ণের শারীরিক রূপের মোহে মুগ্ধা করিয়াছি। তাহার মোহে একটু intellectuality

and spirituality (জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা) মিশাইলে ভাল হইবে। আমি লিখিলাম কেহ কেহ শ্রীভগবানের রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকে। অশিক্ষিতা সরলা ব্রজগোপীরা তাঁহার রূপে মুগ্ধা। তাই বৈষ্ণবদের শ্রীভগবান্ মদনমোহন। আমি সে জন্য জরতকারুকে যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধা করিয়া থাকি—আর তাহাই করিয়াছি কি? জরতকারু চরিত্রে কি inteelectuality (মানসিকতা) নাই?—তবে এই প্রাচীন আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছি। তাহার চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা ঢালিতে গেলে সুভদ্রা ও শৈলজার সহিত তাহার চরিত্র অভিন্ন হইয়া পার্থক্যহীন হইবে। তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লিখিলেন—"আমি এতদিনে বুঝিলাম আমরা সমালোচকগণ কত মূর্থ। আমি এমন মোটা কথাটা বুঝিতে পারি নাই।" তাহার পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দ্বারা "কুরুক্ষেত্রের" হস্তলিপি হীরেন্দ্র বাবুর কাছে পাঠাই। তখনও উভয়ে আমার অপরিচিত। হীরেন্দ্র বাবু সাহিত্যে ইতিমধ্যে "রৈবতকের" সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মত জানিতে চাহি। তিনিও সেই শিষ্যকে বাদ দেওয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন, এবং আর এক খানি বহি ('প্রভাস') লিখিবার আমার সঙ্কল্প না জানিয়া অনেক বিষয়ের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতকের' সমান নহে, কারণ ইহাতে "গভীর দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিক গবেষণা সেই পরিমাণ নাই।" তাঁহার পত্রের আরম্ভটি হীরেন্দ্র বাবুর বিনয়েরই যোগ্য—"একটি প্রবাদ আছে যে ফরাশী দেশের শ্রেষ্ঠ কবি মলেয়ার নাটক লিখিয়া প্রথমে তাঁহার ধোবীকে শুনাইতেন। সেই তাঁহার দোষ গুণের বিচার করিত। নবীন বাবু কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিতে দিয়া অনেকটা ফরাশী কবির অনুকরণ করিয়াছেন।"

যাহা হউক 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিবার পূর্ব্বে তথাপি দুই জন কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তির একটু মত জানিতে পারিলাম। এ সৌভাগ্য আমার অন্য কোনও কাব্যের পক্ষে ঘটে নাই। সবডিভিসনে বা সদর ষ্টেসনে যেখানে গিয়াছি, এক যশোহর ভিন্ন আর সাহিত্যপ্রিয় লোকের সাক্ষাৎ আমার ভাগ্যে বড় ঘটে নাই। সর্ব্বত্র কেবল মামলা মোকদ্দমার কথা। সাহিত্যের স পর্য্যন্ত প্রায় কাহারও মুখে শুনি নাই। অতএব সর্ব্বত্র লেখক আমি এবং পাঠক ও সমালোচক আমার পত্নী। 'কুরুক্ষেত্র' পর্য্যন্ত যখন যে সর্গ লিখিয়াছি উহা শেষ করিয়া তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছি। তিনি পড়িতেন, সমালোচনা করিতেন। আমি নীরবে, এবং সেই সর্গের বিষয়ে নিমজ্জিত চিত্তে শুনিতাম। মোটের উপর ঠাকুরদাস ও হীরেন্দ্র বাবু 'কুরুক্ষেত্রের' অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতএব 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিতে আমার পুত্রপ্রতিম হতভাগ্য ভাগিনা কামিনীর কাছে পাঠাইলাম। কামিনী বি, এ, পড়িতেছে। সাহিত্যে তাহার বিশেষ অধিকার। কামিনী দেব-শিশু। এই দেবত্ব ব্রাহ্মসমাজের হাড়ি কাষ্ঠে বলিদান পড়িল। হিন্দুরা পৌত্তলিক, বলিদান দেয় ছাগশিশু। ব্রাহ্মরা অপৌত্তলিক, বলিদান দেন মানবশিশু! কামিনী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভক্ত ছিল। তাঁহার কি এক বক্তৃতা হইবে। সে দারুণ শীতকালের একটা সমস্ত রাত্রি মই ঘাড়ে করিয়া কলিকাতা হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত বক্তৃতার বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়াছে। তাহার অব্যবহিত ফলে তাহার সঙ্কটাপন্ন জ্বর হয় এবং সেই জ্বরে বহুদিন ভুগিয়া কামিনী আমার হৃদয়ের একটা স্নেহ-কক্ষ শূন্য করিয়া তাহাতে তাহার দেবত্বের স্মৃতিমাত্র রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। কামিনী 'কুরুক্ষেত্র' পড়িয়া আনন্দে অধীর হইয়া লিখিয়াছিল—"It will be the magnum opus of your

life. It has no equal in the Bengali or any Literature" "ইহা আপনার সর্ব্বপ্রধান কাব্য। ইহার তুলনা বাঙ্গলা কি কোনও সাহিত্যে নাই।" সে ধরিয়া বসিল যে সে তাহার বন্ধু সান্ন্যাল কোম্পানীর দ্বারা বিলাত হইতে অক্ষর এবং ফুল আনাইয়া এরূপ ভাবে 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিবে যে বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কনে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিবে। অতএব 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিতে বিলম্ব হইবে। আমি ইতিমধ্যেই গীতার মত অবসর সময়ে প্রথম 'চণ্ডীর' ও পরে মেথু লিখিত খৃষ্টলীলার শিক্ষাভাগের অনুবাদ করিলাম। উহারা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্নীকে পড়ানই এই দুই অনুবাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কোনও ধর্ম্মশিক্ষক এমন সরল সত্য এমন সরল ভাষায় শিক্ষা দেন নাই। 'খৃষ্ট' লিখিবার ইহা আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মনস্বী কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহার Liberal পত্রিকায় খৃষ্টের অনুবাদের ও তাহার মুখপত্র খানির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্য ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন হইতে বুঝাইতেছেন, কিন্তু হিন্দুর পক্ষ হইতে এমন দক্ষতার সহিত আর কেহ বুঝাইতে পারেন নাই। কামিনী ৬ মাস পর্য্যন্ত 'কুরুক্ষেত্র' ফেলিয়া রাখিল। শেষে সে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলে আর ফেলিয়া না রাখিয়া উহা আড়ম্বর-শূন্য ভাবে ছাপিতে আমি জিদ করিলাম। লিখিলাম সে বাঁচিয়া থাকুক, আমি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ তাহার ইচ্ছামত ছাপিব। এ অবস্থায় আমি ফেণী হইতে রাণাঘাট বদ্‌লি হইয়া আসিলাম। 'কুরুক্ষেত্রের' শেষ প্রুফ যে দিন রাণাঘাটে পাইলাম সেই দিনই কামিনীর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, এবং অশ্রুজলে শেষ প্রুফ শেষ করিয়া, 'কুরুক্ষেত্রের' আরম্ভে প্রকাশিত পত্রখানিতে তাহার স্মৃতি 'কুরুক্ষেত্রের' সঙ্গে জড়িত করিয়া দিলাম। হা ভগবন্! তুমি এরূপে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আমার এই

দেব শিশুটি তোমার দেবধামে লইয়া গেলে! তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইলে!

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হইল। সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটু sensation (আন্দোলন) হইল। সর্ব্বাগ্রে আমার দাদা লিখিলেন—"I have gone through the book twice in 3 days. I shall read it several times more and as often as I have time to spare. It is not for me to give an opinion as to its poetical beauties, but I shall say this only that it eminently sustains the reputation of the author of 'Plassey'. It shows the elevation of the author's moral and spiritual plane as its predecessors showed his intellectual capabilities. Whether the philosophy of the *Gita* will come to men's business and bosom—specially of the men who bask in the sunshine of Western Civilization and science—is not free from doubt, but to me who unfortunately have remained unaffected by western enlightenment, your poem is a treasure which can not be put by. Having passed the prime of life in the pursuit of vain phantoms and while approaching rapidly the goal of all humanity it is a solace to me to find that you have sent me a gospel of grace and good will which I desired in my heart of hearts should guide my conduct." এরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাস পূর্ণ বহু পরিচিত ও অপরিচিত নর নারীর পত্র আসিতে লাগিল, এবং সংবাদপত্রে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির

হইতে লাগিল। এমন সময়ে বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার এ প্রথম সাক্ষাতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র'লইয়া তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে অনেকের ধারণা যে আমি বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে আমার কৃষ্ণচরিত্র লইয়াছি। আমি বলিলাম বঙ্কিম বাবুর মত পূজনীয় ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমি শ্লাঘার কথা মনে করি। অনেক কবি সেক্ষপিয়ার পর্য্যন্ত, অন্য গ্রন্থ হইতে চরিত্র লইয়া তাঁহাদের জগতবিখ্যাত কাব্যাবলি রচনা করিয়াছিলেন। অতএব আমি বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্রের' কৃষ্ণ লইয়া কাব্য লিখিয়া থাকিলে তাহাতে আমার বিশেষ নিন্দার কথা হইতে পারে না। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে আমি যখন এরূপ ভাবে কৃষ্ণচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করি, তখন বঙ্কিম বাবু তাহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পত্রই তাহার প্রমাণ। তখন এই কাব্যের সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর সংস্রব বর্ণনা করিয়া আমি সকল কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বঙ্কিম বাবুর পত্রগুলি দেখিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি দেখাইলাম। তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন তাঁহার মত অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে। অতএব সাহিত্যিক সত্বের অনুরোধে এই পত্রগুলি ছাপাইয়া সাধারণের মন হইতে এই ভ্রান্তি দূর করা আবশ্যক। আমি বলিলাম বঙ্কিম বাবু ভয়ানক অভিমানী। তাঁহার জীবিত সময়ে এ সকল পত্র ছাপা হইলে তিনি আমার মুখ দর্শন করিবেন না। কিছুদিন পরে মাননীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যাপক Professor ছিলেন। সে অবধি আমি তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করি এবং তাঁহার সরল আড়ম্বরহীন দেবচরিত্রের জন্য আমি তাঁহাকে পূজা করি। তিনি আমার মুখে 'রৈবতক' শুনিতে

চাহিলেন। 'বাঙ্গালের' মুখে কবিতা শুনা! তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। 'রৈবতকের' স্থানে স্থানে তিনি নিজে নির্ব্বাচন করিয়া পড়িতে দিলেন। পড়িলাম। তিনি আমার বাঙ্গালা আবৃত্তির বড় প্রশংসা করিলেন! বলিলেন আমার আবৃত্তিতে একট বিশেষ আন্তরিকতা (feeling) আছে। 'রৈবতকের' চরিত্রাবলি, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। দেখিলাম তিনি 'রৈবতকের' বড়ই পক্ষপাতী! অতএব 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হওয়া মাত্র তাঁহার কাছে 'গীতা', 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' এক এক খণ্ড উপহার পাঠাইলাম। তিনি আমাকে তৎসম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে যে ৪ খানি পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একটু প্রয়োজন আছে।

(১)

শ্রীহরিঃ নারিকেলডাঙ্গা,
শরণম্। ৮ই সেপ্টম্বর ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

* * * * * *

"অপর দুইখানি গ্রন্থ (রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র) এখনও সমস্ত পাঠ করা হয় নাই ; কিয়দংশ মাত্র পড়িয়াছি। কিন্তু যতদুর পাঠ করিয়াছি তাহাতে দেখিলাম যে গীতার ভূমিকায় আপনি কথায় যাহা বলিয়াছেন, আপনার উক্ত কাব্যদ্বয়ে কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আপনি উক্ত ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কাব্যে এবং ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।" এবং আপনার কুরুক্ষেত্রে যে উজ্জ্বল ত্রিমূর্ত্তি অপূর্ব্বভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—

"————জ্ঞানবল, আত্মদান।
ভক্তির নিষ্কাম সূত্রে সম্মিলিত সমপ্রাণ"

তাহাও সেই শিক্ষা দিতেছে।

আশা করি ভগবৎকৃপায় আপনার 'মহাভারত' গানের সুগভীর ধ্বনি শুনিয়া সংসার কান্তারে পথশ্রান্ত ও বিষয়বাসনায় উদ্ভ্রান্ত পথিক অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে ও পরমানন্দ ধামে যাইবার পথের পথিক হইতে উৎসাহিত হইবে।

* * * * * *

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

শ্রীহরিঃ শরণম্

নারিকেলডাঙ্গা।
৬।১০।৯৪

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ সমাপ্ত করিয়া উহার উত্তর লিখিব। কিন্তু শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে অনেক বিঘ্ন সহজেই ঘটিয়া থাকে। এবং আমি কতকগুলি নিত্য (বা অনিত্যই বলুন) কর্ম্মের মধ্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কাম্য কর্ম্ম করিবার বিন্দুমাত্রও অবকাশ পাই নাই। আপনার পত্রের উত্তর দিতে আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্বেই এই পত্রখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আপনি যে এত ভক্তিপূর্ণ ও বিনীতভাবে আমাকে পত্র লিখিয়া-

ছেন, ইহা আমার গুণে নহে ইহা কেবল আপনার হৃদয়ের গুণে। যে হৃদয় সমস্ত জগৎ

'অনন্তে অন্তের ক্রীড়া চির সম্মিলন'

এই ভাবে দেখে এবং বিচিত্র কল্পনা কৌশলে অপরকে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারে, সে হৃদয় যে ভক্তি ও বিনয় পূর্ণ হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। আপনি আমার একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং আমি আপনাকে 'তুমি' না বলিয়া 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি? ইহাতে আপনি একটু ক্ষুন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন ক্ষোভের কারণ নাই। এরূপ সম্বোধন বর্ত্তমান স্থলে স্নেহের অভাবব্যঞ্জক নহে। আপনি এক সময়ে আমার একজন অতি সুশীল ছাত্র ছিলেন বলিয়া আপনার প্রতি যে স্নেহ ছিল তাহার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে আপনি একজন চিন্তাশীল পরমার্থপরায়ণ কবি বলিয়া আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহা সেই স্নেহের সহিত মিলিত হওয়ায় আপনার প্রতি এমন একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে যে অন্তরে সামান্য ছাত্রের স্থান অপেক্ষা বিশিষ্ট স্থানে আপনাকে রাখিতে ইচ্ছা হয়। এবং সেই জন্যই আপনাকে সামান্য ছাত্রের ন্যায় সম্বোধন করি নাই।

আপনি আমার এখানে সুযোগমত এক দিন আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আসেন তাহা হইলে পরম সুখী হইব। 'রৈবতক' এবং 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ করা সমাপ্ত হইলে সময় পাইলেই আপনাকে পুনরায় লিখিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা,
২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

কল্যাণবরেষু

আপনার পত্র ও আপনার প্রদত্ত আপনার কৃত বঙ্গানুবাদসহ মার্কাণ্ডেয় চণ্ডী পাইয়াছি। 'চণ্ডী'খানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

আপনার 'কুরুক্ষেত্র' নিশ্চিন্ত হইয়া পাঠ করিব এই ভাবিয়া কিছু দিন তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ এ সংসারে নিশ্চিন্ত কখনই হইতে পারে না এ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম! কথাটা মনে পড়িলে আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছি এবং একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে। পাঠ করিয়া যে কি আনন্দ লাভ করিতেছি তাহা এই দুর্ব্বল লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

'রৈবতক' পাঠ করা সমাপ্ত হইলে আপনাকে বলিয়াছিলাম, কবিতা শ্রেণীবিভক্ত করিতে হইলে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, বহির্জগৎ বিষয়ক ও অন্তর্জগৎ বিষয়ক, ও আপনার কবিতা এই দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত; আর সেইজন্যই আপনার কাব্যে দুই এক স্থানে কর্ণে যেটা ভাষার পারিপাট্যের অভাব বলিয়া বোধ হইতে পারে মনে সেটা বাস্তবিক অভাব বলিয়া বোধ হয় না। বহির্জগতের ভাব মনে প্রতিফলিত করিতে হইলে ভাষা যতটা অবলম্বনীয়, অন্তর্জগতের ভাব মনে উদ্ভাসিত করিবার জন্য ততটা নহে, বরং শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা সরল

স্বাভাবিকতা অধিক উপযোগী এবং আবশ্যক। আমার এই ধারণা 'কুরুক্ষেত্র' পাঠে আরও দৃঢ়তর হইতেছে। এবং এই কাব্যের ভাষার সরল সৌন্দর্য্যে মন অতিশয় আকৃষ্ট হইতেছে। রৈবতকের উদ্যানে কুমারীব্রত-নিরতা ভদ্রার যে প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ শিবিরে নিশাকালে অস্ত্রাহত বীরগণের শুশ্রূষণে ও মর্ম্মাহত কারুর সান্ত্বনায় নিযুক্তা সেই অনন্ত প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ দর্শনে এই অপূর্ব্ব ছবি যে কবির কল্পনাপ্রসূত তাঁহাকে ধন্য মনে করিতেছি ও সত্যই যে

'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক'

আপনার এই কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি।

অন্যান্য চরিত্র গুলির মধ্যে কৃষ্ণ চরিত্রের তো কথাই নাই। নবম সর্গে দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার যে ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহা চমৎকার হইয়াছে।

অভিমন্যুর চরিত্র আপনার কল্পনার আর একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রে সুভদ্রার অমানুষী কমনীয়তা ও অর্জ্জুনের অলৌকিক বীরত্ব একাধারে মিলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। দশম সর্গে কর্ণচরিত্রে আধিপত্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষার নিকট বীরের সদ্‌গুণের পরাজয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্রপটে একখানি বিচিত্র আধ্যাত্মিক যুদ্ধের চিত্র স্বরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

কাব্যের আখ্যায়িকা ভাগেও আশ্চর্য্য রচনাকৌশল দৃষ্ট হয়। মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি যে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সঙ্কল্পের ও অপরদিকে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্ব্বাসার কৃষ্ণানুগত ক্ষত্রিয়দিগের নিপাতের জন্য ষড়যন্ত্রের ফল এইটী দেখাইয়া আপনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করি না,

সুতরাং এ কথাটা কত দূর ঠিক তাহা বলিতে অক্ষম। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান আছে, সুতরাং একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এরূপ অসাধু মন্ত্রণা হইয়াছিল এ কথাটা ঠিক না হইলেই সুখী হইব।

'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে আপনি আমার মতামত উভয়ই জানিতে চাহিয়াছেন, অতএব অমতের দুইটী কথা এক্ষণে বলিতেছি। প্রথম কথাটা এই যে জারুর চরিত্রটী এতই সুন্দর হইয়াছে যে তাহাতে পতিব্রতা ধর্ম্মের অভাবের আশঙ্কা হইলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। জারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, বাসুকির সহিত তাঁহার যে অসাধু সন্ধি সংস্থাপিত হয় তাহার প্রতিভূ স্বরূপে জারু ঋষি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন, ও পরে পত্নীত্বে গৃহীত হইবেন অভিপ্রায় থাকে, এই কথা বা এই রূপ একটা কোন কথা বলা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই সুন্দর ছবিতে যে মলিনতা পড়িয়াছে তাহা ঘুচিয়া যায়। দ্বিতীয় অমতের কথাটা এই যে আপনি নবম সর্গে (১৩৯পৃঃ) শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে বলাইয়াছেন।

"অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন।"

এ কথাটী একটু প্রাণে লাগে। আমার মনে হয়, এবং বোধ হয় আপনারও এই মত যে

রোগ নাশ, রোগার্ত্তের অরোগ্য সাধন,
ভব ব্যাধি চিকিৎসার বিধি চিরন্তন।

যদি এই দুইটী কথার সামঞ্জস্য করিয়া দেন তবে বড় ভাল হয়। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে অনেক বুঝিবার, অনেক চিন্তা করিবার, অনেক শিক্ষা করিবার বিষয় আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় সুভদ্রার চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানপ্রদ।

"উপজিল সুধা যথা সমুদ্র মন্থন,
উপজিল গীতামৃত কুরুক্ষেত্র রণ,"

'কুরুক্ষেত্র' মহাকাব্যে, বঙ্গের 'নবীন' কবি,
মথিয়া কল্পনা সিন্ধু, প্রেমামৃত লভিলা তেমনি।
ক্ষীরাব্ধি মন্থনে সুধা, উঠে যবে পুরাকালে,
দেবে মাত্র দিলা হরি, ধরি রূপ বিশ্ববিমোহিনী।
এ যে প্রেমামৃত হেরি, আর্য্যানার্য্যে সমভাবে,
বিতরিছে কৃষ্ণানুজা, গুণে তিন ভুবনতোষিণী।
পাপ পরিতাপ-তপ্ত, দুঃখ শোক রোগাক্রান্ত,
এসো জীব লহ সুধা, পাবে শান্তি পিয়িলে অমনি।

আপনার কাব্যসুধাপানে 'চাপলায় প্রণোদিত:' হইয়া অনেক কথা লিখিলাম, ভরসা করি পাঠ করিয়া হাসিবেন না। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। "কুরুক্ষেত্র" পাঠ সমাপ্ত হইলে ইচ্ছা রহিল আর একবার লিখিব। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

শ্রীহরিঃ
শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা,
৯ই পৌষ ১৩০১।

কল্যাণবরেষু—

'কুরুক্ষেত্র' পাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আপনার পত্রের উত্তরে একখানি পত্র লিখিয়াছি, বোধ হয় তাহা পাইয়া থাকিবেন। এইক্ষণে কাব্যখানি সমস্ত পড়া শেষ হইয়াছে, এবং বলা বাহুল্য যে পাঠ করিয়া

অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। পূর্ব্ব পত্রে যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত আর আমার অধিক বলিবার কথা নাই। তবে শৈলজার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; এক্ষণে দেখিতেছি এই চিত্রটীও অতি অপূর্ব্ব চিত্র, এমন কি কোন কোন অংশে সুভদ্রার চিত্র অপেক্ষাও সুন্দর। সুভদ্রাকে পুত্র বিয়োগের পূর্ব্বে কখনও কোন দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই; শৈলজা বাল্যকাল হইতে দুঃখিনী ও অনাথিনী। অতএব যদিও উভয়েরই হৃদয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের আধার তথাপি শৈলজার চরিত্র অধিকতর সমুজ্জ্বল আদর্শ বলিতে হইবে। নায়ক নায়িকার প্রেমই অধিকাংশ কাব্যের মূল মন্ত্র, বিশ্বব্যাপী প্রেম আপনার এই কাব্যের মূল মন্ত্র। এই প্রেম একদা সংসারের বন্ধন ও জীবের মুক্তির হেতু। এবং যে কাব্যে এই মন্ত্র শিক্ষা দেয় তাহাই প্রকৃত মহাকাব্য।

আর একটী কথা বলিবার আছে। দুর্ব্বাসার সম্বন্ধে ২১৪ পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা একটু নরম করিয়া বলিলেই ভাল হইত। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনও হীরেন্দ্র বাবুর কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এই পবিত্র স্নেহাশীর্ব্বাদ পূর্ণ পত্র কয়খানি পাইয়া আমি যে কত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম, তাহা আর কি বলিব। পূজনীয় গুরুদাস বাবুর পত্র গুলিন এখানে উদ্ধৃত করিবার আমার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য—প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যয়নের সময় হইতে আমি তাঁহাকে এত ভক্তি করি, তাঁহার দেবচরিত্রের জন্য তাঁহাকে এরূপ পূজা করি, যে তাঁহার এই মঙ্গলাশীর্ব্বাদকে আমার

জীবনীতে দেবনির্ম্মাল্যবৎ স্থান দেওয়া আমি উচিত মনে করি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারকের গুরুতর কার্য্যভার বহন করিয়াও গুরুদাস বাবু কিরূপে বঙ্গসাহিত্যানুশীলন করেন এবং তাঁহার কিরূপ সর্ব্বতোমুখী শক্তি, তাহা সমস্ত দেশ, বিশেষতঃ বঙ্গভাষাবিদ্বেষী ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী মহাশয়েরা বুঝিবেন। গুরুদাস বাবু যে দুইটী 'অমত' প্রকাশ করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার একটী (কারুর পতিব্রতাধর্ম্মের অভাব) আমার কাব্যত্রয় সম্বন্ধে সাধারণ অভিযোগ। অতএব এখানে এই দুটী অমত সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব। এ সকল পত্র পাওয়ার পর আমি গুরুদাস বাবুকে তদুত্তরে এক পত্র লিখি। প্রথমতঃ একটু তামাসা করিয়া লিখি—কারণ গুরুদাস বাবুর মত এমন সুরসিক ও রসজ্ঞ বঙ্গদেশে অতি অল্প আছেন—তিনি হাইকোর্টের জজ, আমি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। হাইকোর্টের জজেরা আমাদের উপর 'রুল' জারি করিতে যেরূপ পটু, আমরা ডেপুটীরা কৈফিয়ত দিতেও সেরূপ পটু। অতএব তিনি যখন 'রুল' জারি করিয়াছেন, তখন আমাকে একটা কৈফিয়ত দিতে হইবে। কৈফিয়তটি সংক্ষেপে এই—জরৎকারুর দোষ সে দুর্ব্বাসার পত্নী হইয়াও কৃষ্ণ-প্রেমিকা। কিন্তু ব্রজগোপীদের কি স্বামী ছিল না, অথচ তাহারা কি কৃষ্ণ-প্রেমিকা ছিল না? তাহাদের কোন দোষ না হইলে গরিব জরৎকারুরই বা দোষ হয় কেন? আর দ্বিতীয় 'অমত' সম্বন্ধেও সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম যদি 'গীতার' 'বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্' কথা প্রাণে না লাগে, যাহার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবে 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস' কথাটাই বা প্রাণে লাগিবে কেন? ইহার উত্তরে গুরুদাস বাবু যে পত্রখানি লেখেন তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীহরিঃ
শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা
১৭ পৌষ, ১৩০১।

কল্যাণবরেষু

আপনার গত ২৮ এ ডিসেম্বরের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। আপনি কৈফিয়ত বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহা সে ভাবে লইতে পারি না, আমার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অনুগ্রহ লিপি বলিয়াই গ্রহণ করিলাম! আমি জানি কবিরা যে রাজ্যে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহারা যে পদে অধিষ্ঠিত তাহাতে তাঁহারা কাহারো নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নহেন। প্রকৃতই আপনি যেরূপ বলিয়াছেন

'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক'

আমিও আপনাকে যাহা লিখিয়াছি তাহা কৈফিয়ত তলবের জন্য নহে। আপনি পূর্ব্বপত্রে 'কুরুক্ষেত্র' আমার কাছে "কেমন লাগিল" জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য যেখানে যেমন লাগিয়াছে সরলভাবে লিখিয়াছি। আর এ সরলতায় যদি কোন গুণগরিমা থাকে সে আমার নহে, সে আপনার ও আপনার কাব্যের। একথা কেবল শিষ্টাচারের মিষ্ট কথা নহে, কথাটা প্রকৃত কথা। গুণ আপনার বলি কেন না যদিও আমার ন্যায় একজন লোকের মতামতে আপনার কাব্যের কিছুমাত্র আসে যায় না, তথাপি অসামান্য উদারতা ও বিনয়ের সহিত আপনি গৌরব করিয়া আমার মতামত জানিতে চাহেন, এবং সেই জন্য সাহসী হইয়া আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করি। এবং গুণ আপনার কাব্যের বলি কেন না, যদি এ কাব্য এরূপ গুণপূর্ণ ও দোষশূন্য না হইত এবং উহাতে যদি এমন কোন

গুরুতর দোষ থাকিত যাহা আপনাকে বলিতে গেলে আপনার মনে কষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্যবসায়ী সমালোচক ভিন্ন কোন সামান্য পাঠক পুস্তক সম্বন্ধে অমতের কথা আপনাকে বলিতে পারিত না, আমি যে টুকু অমতের কথা বলিয়াছি তাহা এত অল্প যে তদ্বিষয়ে কথাটা ভ্রম না হইয়া ঠিক হইলেও নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যথন দেখিতেছি যে আমার অমতের কথা ছুইটী ব্রজলীলা ও কৃষ্ণাবতারত্বের উপর অনাস্থাব্যঞ্জক বলিয়া আপনি ছুইটী গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তখন আমার সাফাই জন্য ছুই একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, ভরসা করি নিজগুণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাচালতা ক্ষমা করিবেন।

আমার প্রথম কথার সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন যে "ব্রজগোপীদিগের যদি পতিব্রতার অপলাপ না ঘটিয়া থাকে তবে কারুর ঘটিতে পারে না।" কথাটা অতি গুরুতর, এবং অতি সঙ্কুচিতভাবে আমি ইহার উপর কথা কহিতেছি। স্বয়ং শুকদেবের মুখে ভাগবত শুনিয়াও শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষিৎ যে ব্রজলীলার মর্ম্ম স্থানে স্থানে বুঝিতে পারেন নাই এবং সন্দিগ্ধচিত্তে মুনিবরকে প্রশ্ন করিয়াছেন (যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ১২ শ্লোকে ও ৩৩ অধ্যায় ২৭—২৯ শ্লোকে) এই ঘোর কলির কালধর্ম্মাক্রান্ত কলুষিতচিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য মনুষ্য আমি যে সেই ব্রজলীলার তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব এমত আশা করি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব, কিন্তু কাব্যের কথা যথাজ্ঞানে বিচার করিয়া

স্বীকার করিব। বিশেষ ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেম যেভাবে বর্ণিত আছে তাঁহারা যেরূপ তন্ময় ও "তদর্থবিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামাঃ" হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণকে দেখিতে যাইতে পান নাই তাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন কারুর কৃষ্ণপ্রেম সেভাবে বর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি "কুরুক্ষেত্রের" ৯৮ পৃষ্ঠা দেখিতে বলিয়াছেন। তথায় যাহা লিখিত আছে আমার পূর্ব্বপত্র লিখিবার সময় তাহা উত্তমরূপ স্মরণ ছিল, কিন্তু তাহাতে আমার অল্প বুদ্ধিতে দোষ খণ্ডায় না। পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ নরনারীর মধ্যে কোন একজন বিবাহ অস্বীকার করিলেই যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে এমত হইতে পারে না।

ফলকথা ব্রজলীলা শাস্ত্রোক্ত একটি অলৌকিক ব্যাপার, অলৌকিক শক্তির দ্বারা ইহার লৌকিক দোষ ভাগ অপসৃত হইত (যথা ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোকে), যুক্তি ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহার একমাত্র প্রমাণ। কারুর পতিসত্ত্বে পতিকে ঘৃণা করিয়া পতিভাবে কৃষ্ণ ভজনা ব্রজলীলার অংশও নহে, তাহার অনুরূপও নহে, ইহা লৌকিক কবিকল্পনামাত্র ও কামনাপূর্ণ নায়িকার প্রেমভাব ইহাতে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। আর পতিব্রতা ধর্ম্মও যে একটা উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতামাত্র ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আপনার চিত্রিত কারুর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেই যে ব্রজলীলার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এই গুরুতর অভিযোগটি যে কতদূর সঙ্গত ইহার বিচার আপনি শাস্ত্রত সুপণ্ডিত আপনিই করিবেন।

কারু আপনার মানস কন্যা। কারুকে কোন্‌রূপে সজ্জিত ও কোন্ গুণে ভূষিত করিলে ভাল দেখাইবে আপনা অপেক্ষা তাহা আর অন্য কে বুঝিবে? এবং আপনার কাব্য আমা অপেক্ষা শতগুণে অধিক গুণগ্রাহী

সহস্র সহস্র পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে। আমি কেবল আমার নিজের কথা বলিতে পারি। তাহা একবার বলাতেই বোধ হয় হেয় আত্মাভিমানের প্রচুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। তবে কারু দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক প্রতিভূস্বরূপে গৃহীত হইয়াছিল বলিলে পুরাণের সহিত অসঙ্গত হয় আপনি যে বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অন্য কোন পুরাণে কিরূপ আছে বলিতে পারি না, কিন্তু মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত আস্তীক পর্ব্বে (৩৮—৪৮ অধ্যায়) জরৎকারু উপাখ্যান যেরূপ কথিত হইয়াছে তাহার সহিত কুরুক্ষেত্রে বর্ণিত কারুর বৃত্তান্তের বিশেষ মিল আছে বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতের জরৎকারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, জরৎকারু মুনির পত্নী, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেন না বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান, (আস্তীক পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়), আস্তীক তখন গর্ভে, এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে আস্তীক বালক ছিলেন (আস্তীক পর্ব্ব ৫৬ অধ্যায়)। অতএব দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কারু কেবল প্রতিভূস্বরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন বলিলে মহাভারতের সহিত অধিকতর অসঙ্গত না হইয়া বরং মহাভারতের কোন স্পষ্ট উক্তির সহিত অসঙ্গত হইত না। এবং পুরাণের সহিত অনৈক্যদোষের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইত না। আমার দ্বিতীয় অমতের কথা অর্থাৎ

'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন'

এই কথার প্রতি কিঞ্চিৎ আপত্তি কৃষ্ণাবতারত্বের অস্বীকার ব্যঞ্জক বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। এবং অভিযোগ প্রমাণার্থে ভগবদ্‌বাক্য গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্

বিনাশায় চ দুস্কৃতাং' ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য হয় ইহা আমি অস্বীকার করি নাই এবং এ কথার প্রতি আমার আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস' বলিয়া তাহার উপর আপনি আরও বলিয়াছেন 'নহে সংশোধন'। এই শেষোক্ত কথাটির প্রতিই আমার আপত্তি এবং সেই জন্যই উপরের উদ্ধৃত কথার সহিত 'রোগনাশ রোগার্ত্তের আরোগ্য সাধন' এই কথার সামঞ্জস্য করিয়া দিলে ভাল হইত বলিয়াছি। বাস্তবিক 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন' আপনার এই কথায় সহজেই এই বুঝায় যে অধার্ম্মিকের গতি ধ্বংস ও পরিণামে তাহার আর সংশোধন বা মুক্তি নাই। একথা ভগবদ্বাক্যের বা শাস্ত্রের অনুমত বলিয়া বোধ হয় না। বরং যে সকল দুষ্টেরা ভগবান কর্ত্তৃক নিহত হয় তাহারা নিধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে মুক্তি বা সদ্গতি লাভ করে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে রহিয়াছে। আমার আপত্তি যে কেবল আমার কলুষিত বুদ্ধির ভ্রম ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। বিশুদ্ধচেতা কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব বিশারদ শ্রীধরস্বামী আপনার উদ্ধৃত গীতার শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "নচৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ লালনে তাড়নে মাতুর্না কারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি।" যদি ভগবান কর্ত্তৃক দুষ্টের নিগ্রহ, মাতা কর্ত্তৃক অর্ভকের তাড়নের সহিত তুলনীয় হয় তবে সেই নিগ্রহ বা বিনাশ কখনই সংশোধনের বিরোধী হইতে পারে না বরং সংশোধন নিমিত্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদিত, এবং তাহা না হইলে পাপীর গতি নাই। অধর্ম্মের ধ্বংস হইবে কিন্তু সংশোধন নাই এ কথা পাপ

পরিতাপ তপ্ত প্রাণে যে কতদূর কঠোর লাগে তাহা আপনার ভক্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় বোধ হয় বুঝিতে পারে না।

আপনি যদি

'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন'

এই স্থলে 'নহে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তাহে' বা 'ধ্বংসে' বা 'তবে' বা 'পরে' বা এরূপ অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে আর কোন আপত্তি থাকিত না।

আপনি বলিয়াছেন যে কৈফিয়ত দিতে আপনারা পটু। লোকে বলে একটু সুযোগ পাইলেই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে এবং একবার অভিযোগ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আর ছাড়িয়া না দিতে আপনারা অধিকতর পটু। যাহা হউক আপনার দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধে সাফাই স্বরূপে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। বিচারে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন।

আমার আর একটি বিনীত নিবেদন আছে। যাহা লিখিলাম ও পূর্ব্বপত্রে যাহা লিখিয়াছি আপনার কাব্যের সমালোচনা বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সমালোচকের উচ্চাসন গ্রহণাভিলাষী নহি। বঙ্গভাষায় ও অন্যান্য ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য অনেকগুলি আছে, তাহার দুই এক খানি পাঠ করিয়াছি। আপনার কাব্যও তাহার মধ্যে গণনীয়। ভাল কাব্য মাত্রই পাঠ করিলে আনন্দ হয়। কিন্তু যে কারণে 'কুরুক্ষেত্র' আমার এত ভাল লাগিয়াছে তাহা সঙ্ক্ষেপে এই যে বিশ্বব্যাপী প্রেম ও নিরভিমান আত্মবিসর্জ্জনের এমন সুন্দর ছবি অতি কম দেখিয়াছি, এবং জীবের তাপিত প্রাণে এমন শান্তিবারি সেচন করিতে পারে এরূপ কাব্য অতি কম পড়িয়াছি। যে দুইটী স্থানে আমার অল্পবুদ্ধিতে এই ভাবের একটু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহারই মাত্র উল্লেখ পূর্ব্ব

পত্রে করিয়াছি। এই পত্রখানি সমালোচনা বিষয়ক নহে, একপ্রকার কৃষ্ণকথা ও তত্ত্বকথা বিষয়ক বটে, এইজন্য ইহা নিরভিমান ভাবে লিখিব বলিয়া সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু এ সঙ্কল্প সিদ্ধির আশা অধিক নাই, তবে আপনার ন্যায় হরিপরায়ণ সাধু ব্যক্তির নিকট ক্ষমার আশা সম্পূর্ণ রাখি। কিমধিকমিতি।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহার উত্তরে আমি সংক্ষেপে লিখিলাম যে তাঁহার এই পাণ্ডিত্য পূর্ণ পত্রের উত্তর দিব, সেই বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলি কেন এরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা কেন এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন আমি সেরূপ লিখিয়াছি। কোনও সর্গ লিখিতে বসিলে ও যদি কেহ সেই সর্গে কি লিখিব জিজ্ঞাসা করিত, আমি তাহা বলিতে পারিতাম না।

এই উপলক্ষে এখানে এক দিনের ঘটনা বলিব। হীরেন্দ্র বাবু ইহার পরে যে কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে আমি কুরুক্ষেত্রের 'ব্যাধ' সর্গে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান কারণ কর্ণকে যেরূপে কুন্তী দুর্ব্বাসার কানীন পুত্র বলিয়া প্রমান করিয়াছি, উহা একটা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু এ সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিবার সময়েও আমি জানিতাম না যে আমি এ কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিব। তখনও এরূপ ধারণা আমার ছিল না। সর্গ শেষ হইল। স্ত্রীকে পড়িতে দিলাম। পড়া শেষ হইল। উভয় নীরবে ফেনী দীর্ঘিকার নীল নির্ম্মল সলিল হিল্লোলের

দিকে চাহিয়া রহিলাম। দীঘির উত্তর তীরে আমার গৃহের সম্মুখস্থ গোল বারাণ্ডাটি আমার লিখিবার স্থান। সম্মুখে বিস্তৃত দীর্ঘিকা ও তাহার চারি তীরস্থ মদ্‌রোপিত নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষশ্রেণীর শোভা। বহুক্ষণ দুজনে নীরবে স্তম্ভিত ভাবে রহিলাম। বহুক্ষণ পরে স্ত্রী বলিলেন —"করিলে কি? কর্ণ দুর্ব্বাসার পুত্র, এ কথা ত মহাভারতে নাই।" আমি বলিলাম—"এই সর্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমিও তাহা মনে করি নাই। কিন্তু এখন ভাবিতেছি কর্ণ দুর্ব্বাসার পুত্র বলিয়া মহাভারতে পরিষ্কার না থাকুক, দুর্ব্বাসার অভিচার-মন্ত্র-পুত্র বলিয়া ইঙ্গিত আছে। মন্ত্রবলে ভীষণ অগ্নিমণ্ডল সূর্য্য মানবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, এ আষাঢ়ে গল্প যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা কর্ণকে দুর্ব্বাসা-কুন্তীর কানীন পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আর তাহা হইলে কর্ণ, ভারতের অদ্বিতীয় বীর ও দাতা কর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও, কেন পাপিষ্ঠ কাপুরুষের মত দুর্য্যোধনের সকল পাপের প্রশ্রয় দিয়া কৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে মহাভারতের সমস্ত ঘটনাবলি আমরা এই নূতন আলোকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

সর্ব্বশেষ গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম যে কারু চরিত্র কুরুক্ষেত্রেও শেষ হয় নাই। আমার আর একখানি বহি লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। যদি শ্রীভগবান শক্তি, শান্তি, ও আয়ুঃ দেন, এবং তাঁহার কৃপায় 'প্রভাস' লিখিতে পারি, তবে এক দিন গুরু শিষ্যের মধ্যে এই বিষয়ের বিচার হইবে। সে পর্য্যন্ত তাঁহার Judgment suspend (বিচার স্থগিত) করিতে আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলাম। ইহার উত্তরে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত শেষ পত্র খানি পাইলাম।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা
৩ মাঘ ১৩০১।

কল্যাণবরেষু—

আপনার প্রীতি ও ভক্তি পূর্ণ পত্র খানি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলাম। এত প্রেম ও ভক্তি আপনার হৃদয়ে না থাকিলে কি আপনি 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রের' রচয়িতা হইতে পারিতেন? আপনি মহাভারতের ইতিহাস ভাগ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আপনার কাব্যপাঠে সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়, এবং এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও এক দিন আপনার সহিত কথা হইয়াছিল। অতএব ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার কাব্যে আপনি যে গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়াছেন তৎপ্রতি যে আমি একেবারে লক্ষ্য করি নাই এমত মনে করিবেন না। বোধ হয় আমার পূর্ব্ব পত্রেও এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছি। তবে এ সকল কথা যে বাহুল্যরূপে বলি নাই তাহার কারণ এই যে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা, মলিন হৃদয়কে বিমল করা, এবং তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সেচন করা কাব্যের যে প্রধান গুণ তাহা উক্ত দুই খানি কাব্যে এত অধিক পরিমাণে আছে যে তাহাতেই মন মোহিত হইয়া যায়, অন্য গুণের আলোচনা করিবার অবসর থাকে না। আপনি 'প্রভাস' নামক আর একখানি কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে তাহা পাঠ করিবার জন্য উৎসুক ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। আশীর্ব্বাদ করি যাঁহার লীলা বর্ণনা করিতেছেন তিনি আপনাকে কায়িক, মানসিক ও বৈষয়িক সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে রাখুন। ইতি।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানে গুরুদাস বাবুর 'ছুইটি কথা' উদ্ধৃত করিব। "প্রথম কথাটা এই যে কারুর চরিত্রটি এত সুন্দর হইয়াছে যে তাহাতে পতিব্রতা ধর্ম্মের অভাবের আশঙ্কা হইলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। কারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, বাসুকির সহিত তাঁহার যে অসাধু সন্ধি সংস্থাপিত হয় তাহার প্রতিভূস্বরূপে কারু ঋষি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন, ও পরে পত্নীত্বে গৃহীত হইবেন অভিপ্রায় থাকে, এই কথা বা এইরূপ একটা কোনও কথা বলা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে মলিনতা পড়িয়াছে তাহা ঘুচিয়া যায়।" আমার ব্রজ গোপীদের দৃষ্টান্তের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন —ব্রজ গোপীরা "যেরূপ তন্ময় ও 'তদর্থ বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামা' হইয়াছিলেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণকে দেখিতে পান নাই তাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন, কারুর কৃষ্ণপ্রেম সে ভাবে বর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না।" তাহা ত হইবারই কথা নহে। আমি ত আর ঠিক ব্রজ গোপীর চিত্র আঁকিতে যাই নাই। 'প্রভাস' পড়িয়া গুরুদাস বাবু বুঝিয়া থাকিবেন যে, গরিব কারুও "তদর্থ বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামা"। তবে এটি যখন কারু চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ অভিযোগ তখন আমাকে তৎসম্বন্ধে, ও গুরুদাস বাবুর প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুটি কথা এখানে বলিতে হইল। মহাভারতে ত কারু অবিবাহিতা নহে, তবে আমি তাহাকে অবিবাহিতা বলিয়া চিত্র করিলে কি মহাভারতের সঙ্গে মিল হইত? মহাভারতে কারু কেবল বিবাহিতা নহে, যে আস্তীক সর্প সত্র, বা পরীক্ষিতের দ্বারা অনার্য্য নাগ ধ্বংস, নিবারণ করে, কারু সে আস্তীকের মাতা। অতএব কারুর বিবাহও একটা ঐতিহাসিক সত্য, এবং মহাভারতের কেন্দ্রস্থ ঘটনা। তবে কারু প্রকৃত প্রস্তাবে যে দুর্ব্বাসার পত্নী নহে, বিবাহটি একটি ছলনা মাত্র, এবং কারু প্রকৃতই গুরুদাস বাবুর প্রস্তাবিত সন্ধির প্রতিভূ

মাত্র, তাহা আমি উভয় দুর্ব্বাসা ও জরৎকারুর মুখে প্রকাশ করিয়াছি।

"দুর্ব্বাসা আমার নহে পতি,
আমি পত্নী নহি দুর্ব্বাসার ;
উভয় উভয়ে মাত্র দেখি
উভয়ের সেতু আকাঙ্ক্ষার।"

অতএব ব্রজগোপীদের কৃষ্ণপ্রেম দোষনীয় না হইলে কারুর কৃষ্ণপ্রেম কোনও মতে দোষনীয় হইতে পারে না, কারণ ব্রজগোপীদের স্বামী (conventional) ছল-স্বামী নহে, তাহাদের প্রকৃত স্বামী ছিল, এবং ব্রজগোপীরা কৃষ্ণকে লইয়া যাহা করিয়াছিল, কারু ততদুর কিছুই করে নাই। অথচ এই হতভাগিণীর উপর যত চোট। কেবল একজন সবডেপুটী মাত্র এক দিন জরৎকারুর অনুকূলে দুটি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"জলপ্লাবনে প্রজাবর্গের কিরূপ ক্লেশ হইয়াছে তদন্ত জন্য একটুক দূরে যাইতে হইয়াছিল। 'কুরুক্ষেত্র' সঙ্গে লইয়াছিলাম। জানি না মাথা মুণ্ড কি কায করিয়া আসিলাম—কি দেখিলাম—তবে এই পর্য্যন্ত মনে হয় যে বাহিরে যেরূপ প্লাবন, ভিতরে তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক প্লাবন অনুভব করিয়াছি। আত্মহারা হইয়া অশ্রুস্রোতে বুক ভাসাইয়াছি। তোমার কারু, তোমার শৈলজা, তোমার উত্তরা ও অভিমন্যু, আর তোমার সুভদ্রা ও সুলোচনা কাব্য জগতে অতুলনীয়।" কারুর নামই সর্ব্বপ্রথম, অতএব কারুই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কাছে অধিক ভাল লাগিয়াছিল। গুরুদাস বাবুর দ্বিতীয় 'অমত'—

"অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন।"

আমি ইহা এই অর্থে লিখিয়াছিলাম যে অধর্ম্মের যখন শেষ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তাহার সংশোধন হইতে পারে না, তাহাকে ধ্বংস

করিতে হয়। এই মত আমার নহে গীতার। গীতাও বলেন অধর্ম্মের এই শেষ বা চরম অবস্থা হইলে

"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।"

কই গীতা দুষ্কৃতের সংশোধনের কথা বলেন নাই। তবে গুরুদাস বাবু ঠিক বলিয়াছেন যে এরূপ অধর্ম্মীদের ধ্বংসেই উদ্ধার। ধ্বংস না করিলে ইহাদের অধর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী পাপভারে পূর্ণ করিবে। এই পাপভার মোচনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতার। কুরুক্ষেত্রই এই পাপভার মোচনের ভীষণ দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ কত প্রকারে শান্তিপথে সংশোধনের চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হন। শেষে সংশোধন অসম্ভব হইলে কুরুক্ষেত্রে এ অধর্ম্ম ধ্বংসিত হয়।

এই সময়ে আমি রাণাঘাটে থাকিতেই 'নব্যভারতে' কুরুক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র সমালোচনা বাহির হইল। তাহার আরম্ভেই প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম বাবু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। * * * আমরা যখন কুরুক্ষেত্র প্রথম বার পড়িলাম তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম কি নবীনচন্দ্র পড়িলাম, তাহা ঠিক থাকিল না। আবার পড়িলাম, তখন দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, নবীনচন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্বে মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের স্বর্গভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীন বাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীন বাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী।"

তাহার পর প্রবন্ধ লেখক শ্রীকৃষ্ণকে এক চোট খুব গালি দিয়াছেন। আমি 'নব্যভারতের' সম্পাদক মহাশয়কে তখনও চিনিতাম না। অবশ্য জানিতাম তিনি একজন ব্রাহ্ম, এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন ব্রাহ্ম সমাজের ৩॥০ দলের বহির্ভাগে তাঁহার নিজের এক স্বতন্ত্র বেদি। তিনি একাই একদল। আমি তাঁহাকে লিখিলাম—

রাণাঘাট
১০।১০।৯৩

শ্রদ্ধাস্পদ—

'নব্যভারতে' আমার 'কুরুক্ষেত্রের' সমালোচনার জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

মহাভারত কি মহাভারতের অধিনায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আপানার ও আমার একমত হইবে আমি সে আশা করি না। অতএব সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কেবল একটা কথা অযাচিত বলিতে আসিলাম। ক্ষমা করিবেন।

বঙ্কিম বাবুর মত দেব-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের শ্লাঘার কথা। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে "রৈবতক" ও "কুরুক্ষেত্র" কল্পিত ও সূচিত হয় ১৮৮২ ইংরাজিতে, বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, আমার যতদূর স্মরণ হয়, ১৮৮৪ ইংরাজিতে। ১৮৮২ ইংরাজিতে 'রৈবতক' ও তৎপরবর্ত্তী আরও দুই খণ্ড কাব্যের plot বঙ্কিম বাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু ও প্রফুল্ল বাবু দেখিয়াছিলেন এবং বঙ্কিম বাবু "রৈবতকের" প্রথম কয়েক সর্গও দেখিয়া তাহাদের নীচে যে মন্তব্য এবং তিনখানি কাব্যের plot ও তৎসূচিত কৃষ্ণচরিত্র ও তাহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া যে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার কাছে

আছে। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে রৈবতক লিখিত হইবার প্রায় এক বৎসর পরে যখন উহার অর্দ্ধেক মুদ্রাঙ্কন হইয়া গিয়াছে, তখন বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' মাসে মাসে বাহির হইতেছিল, এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কৃষ্ণজীবনের উদ্দেশ্য তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছিল। অতএব স্বয়ং বঙ্কিম বাবু এবং কালীপ্রসন্ন বাবু, প্রফুল্লবাবু ও ঈশান বাবুই আমার সাক্ষী যে রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে ঋণী নহি। তবে তাঁহার কাছে আমি এ পরিমাণে ঋণী যে তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত না হইলে 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' শিক্ষিত সমাজে স্থান পাইতে পারিত কি না সন্দেহ।

আর একটি কথা। 'কৃষ্ণ চরিত্রের' কৃষ্ণ, এবং 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের' কৃষ্ণ কি এক? আপনার মত প্রেমিক ভক্ত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি এরূপ বলেন, তবে আর কাহাকে কি বলিব? বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণচরিত্রের' প্রথম সংস্করণে শ্রীমদ্ভাগবত একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে যদিও ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ব্রজলীলার ব্যাখ্যার সঙ্গে 'কুরুক্ষেত্রে' কৃষ্ণমুখে তাঁহার বাল্যজীবনের ব্যাখ্যা মাত্র একবার মিলাইয়া দেখিবেন কি?

ইচ্ছা আছে পূজার বন্ধে আপনার মত পবিত্র প্রেমিক ভক্তের দর্শন লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিব। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, প্রয়োজন হয়, সে সময়ে বলিব।

প্রীতিপ্রার্থী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

কিন্তু 'নব্যভারত' সম্পাদক ব্রাহ্ম, আমি কর্ম্মদোষে হিন্দু। তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী; আমি কৃষ্ণভক্ত। অতএব আমার কথা তাঁহার

বিশ্বাস হইল না। তিনি আমার কাছে বঙ্কিম বাবুর চিঠিগুলি চাহিয়া পাঠাইলেন। আমি লিখিলাম যে সেই সকল পত্র প্রকাশ করিতে হয় আমি নিজে যথা সময়ে প্রকাশ করিব, তাঁহার হস্তে দিব না। তখন হীরেন্দ্র বাবু আমার কাছে লিখিলেন যে যখন আমার উপর 'নব্যভারত' এরূপ প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে আমি আমার কৃষ্ণের জন্য বঙ্কিম বাবুর কাছে ঋণী, তখন আর আমার চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। এখন বঙ্কিম বাবু জীবিত, অতএব এখনই সাহিত্যিক সত্যের অনুরোধে তাঁহার পত্রগুলি ছাপাইয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা আমাদের মৃত্যুর পর এ বিষয় লইয়া একটা ঘোরতর গোলযোগ হইবে, এবং 'নব্যভারতের' অভিযোগই সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। তখন বঙ্কিম বাবুর মূল পত্রগুলি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি হীরেন্দ্র বাবুর কাছে পাঠাইলাম, এবং তিনি নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিলে যাহাতে বঙ্কিম বাবু কোনওরূপে বিরক্ত না হন, ঠিক আমার উপরের উদ্ধৃত পত্রের ভাবে 'নব্যভারতের' অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে পারেন এইরূপ লিখিলাম। তাহার পর 'কুরুক্ষেত্রের' পরিশিষ্টে মুদ্রিত "নব্যভারত ও কুরুক্ষেত্র" প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। কিন্তু তাহাতেও 'নব্যভারতের' বিশ্বাস হইল না। তিনি আর একপ্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন যে যতক্ষণ এই সকল পত্রের আসল তিনি না দেখিবেন, এবং বঙ্কিম বাবু উহাদের প্রকৃত বলিয়া স্বীকার না করিবেন, ততক্ষণ তিনি উহাদের প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। ' 'নব্যভারতী' বিশ্বাস এমনই চিজ্! এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তব্য কি তাহা প্রকাশ করিতে তিনি বঙ্কিম বাবুকে আহ্বান (challenge) করিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ব্রাহ্ম বিশ্বাসের দুর্ভাগ্যবশতঃ 'চিনাবাজারি' ভাষায়, একেবারে "speak টি not" হইয়া রহিলেন! একজন বন্ধু বলিলেন—"নিমে

দত্ত বলিয়াছিল যে বড় মানুষের ছেলেগুলি মদ ছাড়িবে, আর আমি আরন্ধ খাইয়া মরিব। সে জন্য 'সুরাপান নিবারনী' সভার উপর সে ভারি চটা ছিল। তুমি হিন্দুধর্ম্মের ও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে, আর ব্রাহ্মরাও আরন্ধ খাইয়া মরিবে। অতএব 'নব্যভারত' তোমাকে 'চোর', 'জালিয়াৎ' ও তোমার শ্রীকৃষ্ণকে 'বদমায়েস' বলিবে না কেন?" গোবিন্দ অধিকারী যাহা হউক ইহার পরে গাইয়াছেন—"কি কথা তা জানিনে বাপ! কি কথা।"

'নব্যভারত' স্মরণ হয়, ইতিপূর্ব্বে একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আমি রাণাঘাটে গিয়া সমালোচনার জন্য সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছি। বলা বাহুল্য এটি ঘোরতর মিথ্যাপবাদ। তবে তাঁহার দ্বারে কথনও যাই নাই, এ কথা ঠিক। সে দিন সুরেশ লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালির গালি বিষয়গত নহে, ব্যক্তিগত।

এখানে আর একটী কথা বলিব। বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম খণ্ড উপহার পাইয়া আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, যে তিনি ব্রজলীলা কেন অবিশ্বাস করিয়াছেন আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি এক মাত্র কারণ দিয়াছেন যে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন কিনা সে বিষয়ে যখন কৃষ্ণের অভিমত চাহিলেন তখন কৃষ্ণ জরাসন্ধের উপাখ্যান বিবৃত করিবার উপলক্ষে তাঁহার বাল্য জীবনের দুই একটি যাহা প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার বৃন্দাবন-বাসের ও ব্রজলীলার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এ বলিয়াই বঙ্কিম বাবু তাহা অনৈতিহাসিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি লিখিলাম যে বঙ্কিম বাবু নিজেই প্রমান করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বাক্ সিদ্ধি ছিল, অর্থাৎ তিনি নিস্প্রয়োজনীয় কোনও কথা কথনও বলিতেন না। তবে জরাসন্ধকে বধ না করিলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন না, এ কথা বুঝাইতে

গিয়া কৃষ্ণ কেন ব্রজলীলা বা বৃন্দাবনে বাল্যে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা আবৃত্তি করিবেন? আর বঙ্কিম বাবু মহাভারতের কৃষ্ণই ঐতিহাসিক কৃষ্ণ বলিতেছেন। কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণের কি ভারতের কোনও স্থানে পূজা হয়? সমস্ত ভারতেই ভাগবতের কৃষ্ণের পূজা। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে সমস্ত ভারতবর্ষ এরূপ সত্যের পূজা না করিয়া একটি অনৈতিহাসিক মিথ্যার এত কাল পূজা করিতেছে? বঙ্কিম বাবু আমার এ পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ "কৃষ্ণচরিত্রের" ভূমিকায় ব্রজলীলাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন স্বীকার করিয়া এই পূর্ণ সংস্করণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার দীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। আমি এবারও তাঁহাকে লিখিলাম—"যে এবারও আপনি ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে কৃষ্ণ বড় সুন্দর ছেলে ছিলেন বলিয়া ব্রজগোপীরা তাঁহাকে বড় স্নেহ করিত। এইমাত্র। কৃষ্ণপ্রেম ও গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেম কথাটি মাত্র আপনি ইংরাজি নবিসদের ভয়ে মুখে আনেন নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব যে কৃষ্ণপ্রেম, গোপ-গোপীপ্রেম, ও রাধা-প্রেম লইয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন, নাচিতেন ও মূর্চ্ছিত হইতেন, তাহা কি একটি মিথ্যা কথা লইয়া? আমার বোধ হয় আপনি এখনও ব্রজলীলা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ আপনি চৈতন্যদেবের বিদ্বেষী। আপনি বলিয়াছেন যে চৈতন্যদেব অর্দ্ধেক বৈষ্ণব ধর্ম্ম মাত্র বুঝিয়াছিলেন। বোধ হয় চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে কোনও বহি আপনি এই বিদ্বেষবশতঃ পড়েন নাই। ক্ষমা করিবেন, এই জন্য বোধ হয় ব্রজলীলাও আপনি বুঝিতে পারেন নাই।" তাঁহার প্রথম পূর্ণ সংস্করণ 'কৃষ্ণচরিত্র' বাঙ্গালি পাঠকদের অনুগ্রহে আমার হাতে নাই। প্রায় কোনও বহিই থাকে না। তাঁহার 'বসুমতী'র উপহার সংস্করণের

'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে' লিখিত আছে—"আমি বলিতে বাধ্য যে প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এ কথা আমার বক্তব্য। * * * বঙ্গ-দর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ।" কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর পরিবর্ত্তিত মত আমার রৈবতক রচনার, স্মরণ হয়, প্রকাশেরও পর বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক হীরেন্দ্র বাবুর সমালোচনার পর এ সম্বন্ধে আমার নিজের আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করি বঙ্কিম বাবুর এই পরিবর্ত্তিত মতের কৃষ্ণ, এবং আমার রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণও কি এক? বঙ্কিম বাবু ভাগবত উড়াইয়া দিয়াছেন। ভাগবতের ও মহাভারতের কৃষ্ণই কি 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্রের' কৃষ্ণ নহে? অন্যান্য বিষয়েও বঙ্কিমবাবু তাঁহার ইংরাজী পত্রের লিখিত মত বহু বৎসর পরে পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—"যিনি বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন—বেদে ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্ম লোকহিতে'—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

মোট কথা হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' সূচিত হইবার বহু পূর্ব্বে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, এবং তাহারও পূর্ব্বে রচিত, এবং বঙ্কিম বাবুর নামে উৎসর্গিত আমার 'রঙ্গমতীতে' কৃষ্ণলীলা নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম—

"অন্তর বিগ্রহে, বৎস! ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নিশিখা

জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নি শিখা
দেব-চক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্যগ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
নিবিল সে মহা বহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের এক ছত্র হইল স্থাপন।
এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব অভিনেতৃ সম্বরিল লীলা
সিন্ধু প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ী-করে।"

হীরেন্দ্রে বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমিও জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসের' মূলতত্ত্ব নহে? 'রঙ্গমতী' যখন রচিত হইতেছিল, তখন বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ সম্বন্ধে "অন্ধকার" পূর্ণ "বঙ্গদর্শনী" মত প্রচার করিতেছিলেন। একজন অপরিচিত পত্রলেখক লিখিয়াছিলেন—"স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দেখিয়াছি; কিন্তু অবস্থা বিশেষে মনুষ্য যে মহান্ অভাব হৃদয়ে অনুভব করে উক্ত গ্রন্থদ্বয় সে অভাব পূর্ণ করে না। উহা দার্শনিকের আদরের ধন; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ের মধুর ঝঙ্কার যেন উহাতে শুনিতে পাই নাই। আপনার 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' ভক্তের হৃদয়ের পুণ্য প্রস্রবন।" কবি অক্ষয় বড়াল লিখিয়াছিলেন—'নব্যভারতের' সমালোচক 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনে লিখিয়াছেন—"বুঝিলাম না নবীনচন্দ্র পড়িলাম কি বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম।" যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে আপনি বঙ্কিম বাবু অপেক্ষাও প্রতিভাশালী। বঙ্কিম বাবু

যাহা দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিকতায় শেষ করিয়াছেন—তাহাকে আপনি মূর্ত্তি দিয়াছেন—জীবন দিয়াছেন।” তবে আমি পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর কাছে এরূপে না হউক অন্য রূপে চিরঋনী। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যবলে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ না লিখিলে আমার এই তিন খানি কাব্য বঙ্গ সাহিত্যে দাঁড়াইতে পারিত কি না সন্দেহ। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রকাশ সত্ত্বেও হেম বাবুর মত লোক ‘রৈবতক’ পাঠ করিয়া এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পর বঙ্গ মাতার বরপুত্র, এবং বঙ্গ সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক, বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত কৃত ‘কুরুক্ষেত্রের’ সমালোচনা সাহিত্যে প্রকাশিত হইল। হীরেন্দ্র বাবুর কাছে ‘রৈবতক’ ও ‘কুরুক্ষেত্রের’ সমালোচনার জন্য আমি চির উপকৃত। দুঃখের বিষয় রাজ সেবায় আমার নানা স্থানে পরিবর্ত্তনে, ও বাঙ্গালির পাঠ করিতে লইয়া কোনও পুস্তক ফিরাইয়া না দেওয়ার অভ্যাসবশতঃ আমার কাছে তাঁহার সমালোচনা সম্পূর্ণ নাই। যদি কেহ সাহিত্যের এই সমালোচনার সংখ্যা গুলি আমাকে দিতে পারেন আমি বড়ই কৃতজ্ঞ হইব। ‘কলিকাতা রিভিউ’তেও, ‘কুরুক্ষেত্রের’ এক অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইল। তাহার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

“Babu Nabin Chandra Sen is undoubtedly the poet of the Hindu revival. * * *

He is now writing on Jesus Christ, now translating Gita, now making Bengali version of Markandya Chandi, and one absorbing purpose runs through all the works, namely that of reviving in the minds of his countrymen a respect for Hinduism. He interprets

the story of Mahabharat and that of the great war at Kurukshetra as signifying a successful attempt at fusing the contending nations in India into one great nationality on the basis of a Catholic religion and a liberal social—organisation * * * * * They (the characters in the poem) are all ideals. The ideality of Krishna, Vyasa and Arjuna has already been explained. But the most charming figures are Shubhadra and her son Abhimanya. * *

The *Battle of Plassey* is well known. His *Abakash Ranjinee* is also a good poem. It shows to full advantage the patriotism and courage with which our young men should be infused. His *Rangamati* is filled with vivid descriptions of nature, and for his power of delineating natural scenes he deserves to take prominent place among the poets of Bengal."

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে (History of Bengali Literature) লিখিয়াছেন—

"But perhaps Nabin Chandra Sen has struck a still deeper chord (than Babu Hem Chandra Banerji) in the hearts of his countrymen. His first great work, *Palashir Juddha*, came like a surprise and joy to his countrymen, and pleased the reading public by its freshness and vigour and its voluptous sweetness. His great epic on Krishna is still in progress, (since completed—*Raibatak, Kurukshetra,* and *Provash*) and his last work *Amitabha* on the life and teachings of Buddha, somewhat after the style of Arnold's Light of Asia, sustains and enhances the reputation of the great poet of the Hindu revival of the present day."

বঙ্গের একটি সমুজ্জল নক্ষত্র নন্দকৃষ্ণ বসু বহু দিন হইল বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যবশতঃ চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতে 'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাঁহার দ্বিতীয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"I have received a copy of your "Kurukshetra"—a work which is bound to immortalize you. The question whether Nabin or Hem Chandra is entitled to occupy the throne left vacant by Modhu Sudan, will, I think, now be settled once for all. You are aware, I am not a man much given to adulation. It is my honest opinion that by your present work, you have distanced all competitors.

I do not exaggerate when I say that I have nowhere seen in Bengali literature such noble thoughts clothed in such beautiful language. Your style has much improved and chastened and the characters you have delineated have very seldom been surpassed. What a beautiful and happy idea that is to make Subhadra a florence nightingale. As for Sulochana, it is a character which only a Hindu can conceive or delineate."

সর্ব্বাপেক্ষা কুরুক্ষেত্র এ সময়ে আর এক অচিন্তনীয় সম্মান লাভ করিল। স্বয়ং বৃটিশ সিংহের ইহার উপর কৃপা কটাক্ষ পড়িল। বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের এক পত্র পাইলাম। তাহার এক অংশও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The authorities of the British Museum have learnt from the Lieutenant Governor's address at the

Asiatic Society that your book entitled Kurukshetra is very valuable and are anxious to preserve a copy in the Museum."

অর্থ—"এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে লেঃ গবরনর যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার দ্বারা 'বৃটিশ মিউজিয়ামের' কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারিয়াছেন যে আপনার "কুরুক্ষেত্র" পুস্তক অত্যন্ত মূল্যবান, এবং এ কারণে তাহার এক খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষা করিতে তাঁহারা আগ্রহান্বিত।" জানি না বাঙ্গালা আর কোন কাব্যের পক্ষে এ সম্মান লাভ ঘটিয়াছে কিনা। 'বটতলা' হইতে উঠিয়া বাঙ্গালা ভাষা আমাদের জীবিত সময়ে 'বৃটিশ মিউজিয়ামে' স্থান পাইল, বাঙ্গালা ভাষার অভাবনীয় ও আশাতীত উন্নতির শ্রেষ্ঠতর প্রমান আর কি হইতে পারে?

'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে আমি এখনও কত ভক্তি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র পাইয়া থাকি। জনৈক অপরিচিত ব্রাহ্মণের এক খানি পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

১৩০৮।২৫ কার্ত্তিক আড় বালিয়া।

ওই সর্ব্ব শোক নিবারণ, দাঁড়াইয়া নারায়ণ,
শান্তি প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ।
গাব সুখে কৃষ্ণ নাম জুড়াব জীবন।

মহাশয় !

আপনার এ উপদেশেও সর্ব্বতোভাবে শান্তি পাইলাম না। না পাওয়ার কারণ, আমি ঘোর পাতকী। ফল যাহা কৎঞ্চিৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, তাহা আপনার রচিত কুরুক্ষেত্র কাব্যের বলে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভাষা জ্ঞান আমার নাই, যে ভাষা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আপনাকে জানাই। আমি ব্রাহ্মণ না হইয়া যদি অন্য জাতি হইতাম, তাহা হইলে মনের সাধে হরি হরি বলিয়া আপনার চরণতলে গড়াগড়ি দিতে পারিলে আমার হৃদয়ের জ্বালা অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইত। আমার এমন সঙ্গতি নাই যে চট্টগ্রামে গিয়া আপনাকে দর্শন করি। যদি মহাশয় কখনও কলিকাতায় আইসেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক খানি পত্র লিখিবেন। আমি কুরুক্ষেত্র কাব্য রচয়িতাকে দেখিয়া মনের জ্বালা নিবারণকরিব।

"মিল মহাশয়।"

"Frailty ! thy name is woman."

কোনও স্থানে জ্যোৎস্নার পিতার সঙ্গে কাজ করিতাম। জ্যোৎস্নার পিতার মত এমন সদাশয়, সৎসাহসী, ও তেজস্বী পুরুষ ও তাহার মাতার মত এমন শান্তি-প্রতিমা ও স্নেহময়ী রমণী আমি বড় দেখি নাই। পিতা দেব, মাতা দেবী। তাঁহাদের দেখিলে আমার স্বর্গীয় পিতা মাতাকে মনে পড়িত। তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণ নন্দনের পারিজাত। তাহারা বঙ্গদেশের মহামূল্য রত্ন। পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে এ পরিবারের গৃহ তাঁহার কাছে স্বর্গ বলিয়া বোধ হইত। একবার বাবু দীনবন্ধু মিত্র পোষ্ট আফিস পরিদর্শন উপলক্ষে আমার অতিথি হইলেন, এবং জ্যোৎস্নার পিতার গৃহে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইলেন। আহারের বিলম্ব দেখিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার নব প্রকাশিত 'লীলাবতী' নাটক পঠিত হউক।

তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কাজেই কিছু অতিরিক্ত রকমের প্রশংসা করিতেন। কিছুক্ষণ সঙ্গীত হইয়াছিল, আমি তাহাতে 'জর্ম্মান সিলভারের' একটি বড় ফ্লুট বাজাইয়াছিলাম। আমার তখন প্রথম যৌবন। রূপের, গুণের, ফুটোন্মুখ কবি-যশের, বিশেষতঃ চক্ষু ছুটির, প্রশংসায় আমি একরূপ উৎপীড়িত। সকলে বলিতেন যে এত বড় চোক কেহ কখন দেখেন নাই। গ্রীষ্মকাল, বড় সুন্দর জ্যোৎস্না, সুরায় সঙ্গীতে সমুজ্জ্বলতরা। এক বন্ধু গাইলেন—

"এমন কালরূপ নাই সংসারের মধ্যে অন্য।
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন।"

বন্ধুগণ আমার পিরাণ খুলিয়া, উড়ানিখানি ধড়ার মত পরাইয়া, হাতে ফ্লুট দিয়া জোর করিয়া ত্রিভঙ্গ করাইয়া দাঁড় করাইলেন। আজ দীনবন্ধু বাবুও বলিলেন আমি তাঁহার ললিতের আদর্শ। অতএব ললিতের পার্ট আমাকে দিলেন, এবং রসিক চূড়ামণি নিজে নদেরচাঁদের পার্ট গ্রহণ করিলেন। এ ভাবে পুস্তকের পাঠ আরম্ভ হইল। আমি তাঁহাদের পিতৃব্যের তুল্য সম্মান করিতাম, সলজ্জভাবে ললিতের পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। উহা আমার প্রায় মুখস্থ ছিল। আশৈশব আমার স্মরণ-শক্তি কিছু প্রখরা। কাজেই আমার আবৃত্তির খুব প্রশংসা হইতে লাগিল। পার্শ্বের কক্ষের একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি নব-যুবতীর উজ্জ্বল বর্ণাভা অস্ফুট দেখা যাইতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন তিনি এ নুতনভাবে 'লীলাবতী' পাঠ বড় আনন্দের সহিত শুনিতে-ছিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন তিনি গৃহস্বামীর কন্যা, জ্যোৎস্না। দীনবন্ধু বাবু যে যে অঙ্ক নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন তাহার আবৃত্তি এরূপে শেষ হইলে, জ্যোৎস্নার পিতা জ্যোৎস্নার রচিত কয়েকটি কবিতা আনিয়া দীনবন্ধু বাবুর হাতে দিলেন। তিনি উহা বড় করিয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। বালিকার প্রথম রচনা। তাহাতে দোষ ছিল। তিনি জ্যোৎস্নার লিখিত কবিতা আমার দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইতে তাহার পিতাকে অনুরোধ করিলেন, এবং আমাকেও উহার দোষ গুণ দেখাইয়া দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর আমরা আহার করিতে গেলাম। আমার জুতা জোড়াটা কিছু কসা ছিল। আহারের পর উহা পরিতে আমার একটু বিলম্ব হইতেছে, আর সকলে বহির্বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ একটি নবযুবতী এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গেল। তাহার উজ্জ্বল বর্ণ-জ্যোৎস্নায় আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিল।

"মাধব! অপরূপ পেখনু বামা।
কনকলতা জনু অবলম্বনে উরল
হরিণ পরিহীন হিম ধামা।"

আমারও সেরূপ দৃষ্টিভ্রম হইল। বুঝিলাম উহা জ্যোৎস্না। ইহার পর হইতে তাহার রচিত কবিতা সংশোধনের জন্য তাহার পিতা আমার কাছে পাঠাইতেন, এবং আমি উহা সংশোধন করিয়া তাঁহার কাছে ফেরত দিতাম। কোনটা বিশেষ ভাল হইলে পত্রিকা বিশেষে পাঠাইতাম, এবং উহা প্রকাশিত হইত। এরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। এক দিন জ্যোৎস্নার পিতার একজন ভৃত্য আমার জন্য কিছু খাবার লইয়া আসিল। সে বলিল—"দিদি ঠাকুরাণী শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠাইয়াছেন।" পরে জানিতে পারিয়াছিলাম খাবার জ্যোৎস্নার মাতা পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কথার ভাবে জ্যোৎস্না পাঠাইয়াছেন মনে করিয়া আমি যে তখন যে অপূর্ব্ব কাগজে একটি মোকদ্দমার মাথামুণ্ড রায় লিখিয়া সুবিচারের মুণ্ডপাৎ করিতেছিলাম, সে কাগজের এক টুক্‌রা ছিঁড়িয়া লইয়া পেন্‌সিলের দ্বারা জ্যোৎস্নাকে ধন্যবাদ দিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়া দিলাম। তিনি তাহার পর আপন বাড়ী চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কোনও কারণে তাঁহার পিতার সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। তাহার মাতা আমার সাক্ষাতে বাহির হইয়া, আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম। কিছুদিন পরে জ্যোৎস্না ফিরিয়া আসিলেন। পিতা মাতা তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। দেখিলাম জ্যোৎস্না সুতন্বী ও সুন্দরী। বর্ণ বৈশাখী জ্যোৎস্নার মত শান্ত শীতল সমুজ্জ্বল। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে ইউরোপীয়া বলিয়া ভ্রান্তি হইত। নব-যৌবন-সুলভ তেজ ও গর্ব্ব ফুটিয়া পড়িতেছে। তিনি আমার পত্নীর সমবয়স্কা, কিঞ্চিৎ

বয়োজ্যেষ্ঠা। কাজে কাজে তাঁহাদের মধ্যে, দুই পরিবারের মধ্যে, অত্যন্ত আত্মীয়তা হইল। পিতা জ্যোৎস্না ও তাঁহার স্বামীকে, আমাকে ও আমার পত্নীকে, জোর করিয়া পাশাপাশি বসাইয়া কত আমোদ করিতেন, কত হাসিতেন; মাতা কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। হায় দেব! এই হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ ধরাধামে তোমার সেই দেবত্বের ছায়াটিও যদি রাখিয়া যাইতে আজ তাহাতে বুক পাতিয়া প্রাণ জুড়াইতাম! ইহার দুই তিন মাস পরে আমি সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইলাম। পিতা মাতা, জ্যোৎস্না ও তাহার স্বামী, শিশু পুত্র কন্যাগণ পর্য্যন্ত বড়ই কাঁদিলেন। তাঁহাদের হৃদয় এত সরল যে তাঁহারা সকল কথা সহজে বিশ্বাস করেন। তাই পিতাকে লক্ষ্য করিয়া একটি কবিতায় লিখিয়াছিলাম—

সরল হৃদয় তব সহজ বিশ্বাস,
এক পূর্ণ শশধরে,
হৃদয়েতে রাজ্য করে,
উজ্জ্বলি বিমলালোকে হৃদয় আকাশ।
শুদ্ধ চিত্তপটে আহা!
যাহার যা ইচ্ছা তাহা,
সহজে লিখিতে পারে। কিন্তু সে লেখন
সলিলের লেখা যেন, থাকে না কখন।

মধ্যে একটা অমূলক কথা বিশ্বাস করিয়া দুই পরিবারের মধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটাইয়াছিলেন। দেব-হৃদয় পিতা তাই আজ বিদায়ের সময়ে জ্যোৎস্নাকে আমার ভগিনীটির মত আমার কাছে বসাইয়া দিলেন। সে আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, আমার স্ত্রীর গলা জড়াইয়া, ভগিনীটির মত বড় কাঁদিল। আমরা বিদায় হইলাম।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে দাসত্বের ঘূর্ণ চক্রে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কদাচিৎ জ্যোৎস্না আমাকে পত্র লিখিতেন। তাঁহার কোনও কবিতা পাঠাইতেন। কোনও ঘটনা উপলক্ষে তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং উক্ত ঘটনা উপলক্ষে তিনি একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার এক কপি আমার কাছে কিছু দিন পরে উপহার পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতায় সেই মহা সমারোহে তিনি আমাকে এ দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, না দেখিয়া বড় নিরাশ হইয়াছেন। পত্রখানি পড়িয়া তাঁহাদের একবার দেখিতে প্রাণ আকুল হইল। এ সময়ে আমার শরীরও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আমি সেই দিনই তিন মাস ছুটীর দরখাস্ত করিলাম, এবং তাহা মঞ্জুরী সাপেক্ষ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বেড়াইতে গেলাম। চারিদিক হইতে বন্ধুগণের নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলাম। বলা বাহুল্য জ্যোৎস্নার পিতা মাতারও নিমন্ত্রণ পাইলাম। বঙ্কিম বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের সেই তীর্থক্ষেত্রে কাঁটালপাড়ায় গিয়াছি। তিনি আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া ঠাট্টা তামাসা করিবার জন্য নাতি সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। বঙ্গের রসিক চূড়ামণি রসিকতার ও মাদকতার উচ্ছ্বাসে বলিলেন যে জ্যোৎস্নারা তখন যেখানে ছিলেন সেখানের কোনও বন্ধুর কাছে তিনি শুনিয়াছেন যে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে যাইতেছি, কিন্তু আমি যদি যাই তবে সেখানের "ছোক্‌রারা আমার ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিবে।" আমি বিস্মিত হইয়া আমার অপরাধ কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"জ্যোৎস্নাকে লইয়া সেই দেশটা ক্ষেপিয়াছে। ক্ষেপিবারই কথা, কারণ শুনিয়াছি তাহার মত রূপবতী ও গুণবতী রমণী বঙ্গদেশে আর নাই। তাহাকে দেখিয়া ছোক্‌রাদের মাথা বিগড়াইয়াছে। কেহ দেশত্যাগী হইতেছে,

কেহ সন্ন্যাসী হইতেছে, কেহ পাগল হইতেছে। তাহাকে একটু দেখিবার জন্য কত ছোক্‌রা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় ঘুরিতেছে, গেটের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কেহ তাহার ছায়ার কাছেও দখল পাইতেছে না। তাহাদের বিশ্বাস তাহার কারণ তুমি,—সে তোমাকে ভালবাসে। কাজেই তোমার উপর তাহাদের বড়ই আক্রোশ।" আমি আরও বিস্মিত হইলাম, এবং তাঁহাকে বলিলাম যে বহু বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার পারিবারিকভাবে দুই তিন মাসের মাত্র পরিচয়। অতএব আমি গরিব 'বাঙ্গালের' উপর তাহাদের এই আক্রোশের ত কোন কারণই নাই। তিনি বলিলেন—"তাহাই ত বরং তাহাদের বিশেষ ক্ষেপিবার কথা। একটা 'বাঙ্গাল' কোথায় দূর দেশে বসিয়া কাপ্তানি করিবে, আর তাহারা কাছে থাকিয়া তাহার ছায়াটুকুও দেখিতে পাইবে না, ইহা কি সহ্য হয়?" হাই কোর্টে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখিলাম উক্ত স্থানের কোনও বিশিষ্ট বেরিষ্টারও সেই ক্ষেপার দলে। তিনি আমার প্রতি শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনি দূরে থাকিলেই বা কি, আর দু দিনের পরিচয় হইলেই বা কি? সে আপনাকে ভালবাসে এবং অন্য কাহাকে (তাহার মধ্যে অবশ্য তিনিও আছেন) গ্রাহ্য করে না। মেডাম পেটি ডিউক আর্লদের পায়ে ঠেলিয়া এক জন দরিদ্র গায়ককে বিবাহ করিয়াছে।" আমি তাঁহাকে তখন কিঞ্চিৎ শিষ্টাচার শিক্ষা দিলে, তিনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতএব আমি সভয়ে জ্যোৎস্নাদের দেখিতে গেলাম। গাড়ী হাতায় প্রবেশ করিতেছে। জ্যোৎস্না একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আমি চিনিতে পারিলাম না; কোনও ইংরাজ মহিলা বলিয়া আমার ভ্রম হইল। গাড়োয়ান ভুলে কোনও ইংরাজের বাড়ী আমাকে আনিয়াছে

বলিয়া আমি গাড়ী থামাইলাম। সে বলিল সে বাড়ী চিনে। তথাপি আমি সভয়ে গাড়ী হইতে নামিলাম। জ্যোৎস্না ও তাহার মাতা আসিয়া বড় আদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। জ্যোৎস্না তখনই তাঁহার একটি রমনী বন্ধুকে সংবাদ দিয়া যে পত্র খানি লিখিলেন তাহা আমাকে দেখাইলেন। তাহা স্নেহোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। তাহার বন্ধুও তদ্রূপ উত্তর দিয়া, তৎক্ষণাৎ আমাকে দেখিতে আসিলেন। ইনি আজ পর্য্যন্ত আমাকে সহোদরের মত স্নেহ করেন।

তাঁহার কাছেও গল্পে গল্পে শুনিলাম, এবং নিজেও দেখিলাম সত্য সত্যই ছোক্‌রাগুলি ক্ষেপিয়াছে। হায়, বাঙ্গালির অবরোধ প্রণালী! কেহ কোনও ভদ্র মহিলাকে দেখিতে পায় না। যদি কেহ একটুক সেই প্রথা শিথিল করিয়া চলে, তবে দেশ তাহাকে লইয়া ক্ষেপিয়া উঠে, একটি ভদ্র মহিলার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা উত্তর ভারতবাসী জানে না। আমার স্ত্রীকে সময়ে সময়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। শশাঙ্ক কুমার পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত, এমন কি তাহার ভাগিনী আমার পুত্রবধূর সহিত, প্রথম সাক্ষাতে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও হাসি পায়। এই ক্ষেপাদলের এক জনের গল্প বলিব। আমি বেলা ১১ টার সময়ে জ্যোৎস্নাদের গৃহে পৌঁছিলাম। ইনি ৪টার সময়ে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার পরিবারদের সঙ্গে জ্যোৎস্নার পরিবারের খুব আত্মীয়তা। ইনি একজন আমার কবিতার পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে রাত্রিতে আরও দুই চারটি বন্ধুর সহিত আহার করিতে নমন্ত্রণ করিলেন। সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের আলাপে বড় আনন্দে

সন্ধ্যা কাটাইলাম। আমি দেখিতেছিলাম যে তিনি আমার প্রতি জ্যোৎস্নার ব্যবহার বরাবর লক্ষ্য করিতেছিলেন। আহারের পর বসিয়া আছি, হঠাৎ তাঁহার উদরে ব্যথা উপস্থিত হইল। তিনি শয্যা লইলেন। সমস্ত পরিবার অস্থির হইলেন। ডাক্তার ডাকিতে বলিলেও তিনি নিষেধ করিলেন। বলিলেন এরূপ তাঁহার সময়ে সময়ে হইয়া থাকে, কিছু কাল পরে সারিয়া যায়। তিনি বাড়ী যাইবার জন্য তাঁহাদের গাড়ী চাহিলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইতে তাঁহারা অসম্মত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, গৃহের এক প্রান্তভাগে, তাঁহার ও আমার স্বতন্ত্র পালঙ্গে শয্যা হইল। মহিলাগণ অপর প্রান্তের কক্ষে থাকেন। মধ্যের কক্ষে জ্যোৎস্নার ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য আত্মীয়গণ থাকেন। ভদ্র লোকটি পালঙ্গে পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া আহা! উহু! করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন তাঁহার বড় কষ্ট. বোধ হইতেছে। একবার বলিলেন—"জ্যোৎস্নারা বুঝি শুইতে গিয়াছেন। পরের জন্য পরে আর কত ক্লেশ স্বীকার করিবেন?" আমি বলিলাম—"অনেক রাত্রি হইয়াছে। তাঁহারা ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা এতক্ষণ আপনার সুশ্রুষা করিয়া, এবং আপনাকে নিদ্রিত মনে করিয়া, এই মাত্র শুইতে গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের ডাকিয়া দিব কি?" তিনি মানা করিলেন, এবং বলিলেন আর তাঁহাদের কষ্ট দিবেন না। বলিলেন—"ইঁহারা বড় ভাল লোক? তাঁহাদের সঙ্গে আপনার বহু দিনের পরিচয়। জ্যোৎস্নাকে আপনার কিরূপ বোধ হয়? জ্যোৎস্না এক জন অদ্বিতীয়া রমণী,—না?" আমি বলিলাম তাঁহাদের ও আমার পরিবারের মধ্যে বড় অল্প দিনের পরিচয়। আমি তাঁহাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানি না। তিনি তাহার পর "আহা! উহু! মলাম! গেলাম!" করিয়া, হাঁচিয়া, কাশিয়া ও মধ্যে মধ্যে

নিদ্রার ভাণ করিয়া সমস্ত রাত্রিটা নিদ্রা গেলেন না, এবং অনুগ্রহ করিয়া গরিব আমাকেও নিদ্রা-দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না। আমার সন্দেহ হইল তাঁহার পেটের ব্যথাটা ষড়যন্ত্র মাত্র; তিনি আমার পরীক্ষা করিবার জন্য এই প্রহসন অভিনয় করিতেছেন। চাপা হাসিতে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন। বলিলেন বাড়ী চলিয়া যাইবেন। আমি বলিলাম হিমে গেলে তাঁহার অসুখ বাড়িবে। একটুক অপেক্ষা করুন, তাঁহাদের জাগাইয়া দিই, তাঁহাদের গাড়ী করিয়া বাড়ী যান। তিনি বলিলেন যে তিনি ভাল হইয়াছেন, আর তাঁহাদের কষ্ট দিবেন না। তিনি গন্ধমাদনবৎ এক প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি তাঁহার চাদরের দ্বারা মস্তকে বাঁধিয়া অবলীলা-ক্রমে চলিয়া গেলেন। আমি চৌকাঠের উপর বসিয়া সেই মূর্ত্তিখানি দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম। তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন, এমন সময়ে জ্যোৎস্না ও তাঁহার জনৈক কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ইনি বি এ, পড়িতেছিলেন—উঠিয়া আসিয়া রোগী পলাতক দেখিয়া অবাক্ হইলেন। প্রশ্ন—তিনি কোথায়? উত্তর—পলাতক। প্রশ্ন—সে কি? তিনি কখন গেলেন? উত্তর—এইমাত্র। প্রশ্ন—কেমন করিয়া গেলেন? উত্তর—মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া। জ্যোৎস্না হাসিতে লাগিলেন। ভ্রাতা বলিলেন—"দিদি! তোমার ভারি অন্যায়। ভদ্র লোকটির অসুখ, শুদ্ধ আমাদের উপর চটিয়া চলিয়া গেল, আর তুমি হাসিতেছ।" আমাকে বলিলেন—"দাদা! তাঁহার সত্যসত্যই অসুখ হইয়াছিল,—না? আমাদের বড় অন্যায় হইয়াছে। আমাদের পালা করিয়া তাঁহার কাছে একজন থাকা উচিত ছিল। থাকি নাই, বলিয়া বোধ হয় তিনি চটিয়া এরূপে চলিয়া গিয়াছেন।" দেব-পিতার, দেবী-মাতার উপযুক্ত দেব-শিশু।

প্রাতে চা সেবন করিয়া ভ্রাতাভগিনীর অধ্যয়ন-কক্ষে গল্প করিতেছি ; কাহার কি এক খানি পত্রের কথা উঠিলে জ্যোৎস্না দেয়াল হইতে তাঁহার চিঠির ফাইলটি লইয়া সে চিঠিখানি আমাকে দেখাইলেন। তাঁহার সহিত কাহার কাহার চিঠি লেখালেখি আছে দেখিবার জন্য, তাঁহার সমস্ত পত্রগুলি উল্‌টাইয়া দেখিলাম, এবং তাঁহার রমণী-বন্ধুদের পত্রগুলি বিশেষ করিয়া পড়িলাম। ফাইল দেখা শেষ হইলে ভ্রাতাভগিনী হাসিয়া উঠিলেন, এবং ভ্রাতা বলিলেন—"দিদির ভারি অন্যায়। এত লোকের পত্র রাখিয়াছেন, কিন্তু আপনার একখানি পত্রও রাখেন নাই।" আমি বলিলাম আমি রাখিবার উপযুক্ত কোনও পত্র ত তাঁহাকে লিখি নাই। এমন সময়ে সেই ভদ্রলোকটি উপস্থিত। ভ্রাতা ভগিনী ও জননী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ভাল হইয়াছেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া স্থানটি দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া গাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। আমি ভাবিলাম তিনি আর একটা কি মতলব ঠাওরাইয়াছেন। দুজনে নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে সাহিত্য ও নানা বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনি আমার একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেন। দেখিলাম আমার 'অবকাশরঞ্জিনী' ও 'পলাশির যুদ্ধ' তাঁহার কণ্ঠস্থ। আমি মনে করিলাম আমি বুঝি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। তাঁহার হৃদয়ে যে বিদ্বেষ-মেঘ সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বুঝি সরিয়া গিয়াছে। তিনি এক জন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত ও আমার সমবয়স্ক যুবক। তাঁহার প্রতিও আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে করিলাম অগ্নি দেখিলে পতঙ্গ ক্ষেপিয়া উঠে। ইনিও সেরূপ ক্ষেপিয়াছেন।

ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন আহারের পর, হলে গিয়া দেখিলাম মেজে আমার জন্য বিছানা পাতা হইয়াছে। বুঝিলাম অন্য কক্ষে আমার

সঙ্গে একাকিনী বসিয়া আলাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া জ্যোৎস্না এখানে শয্যা করাইয়াছেন। আমি শয়ন করিলাম। আমার দিবা-নিদ্রা অভ্যাস আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলাম আমি দাসত্ব-জীবীর পক্ষে উহা অসম্ভব। তখন তিনি এক 'ফুটষ্টুল' লইয়া, এবং মা একখানি 'কুসনযুক্ত' চেয়ার লইয়া, আমার শয্যা-পার্শ্বে বসিলেন। আমাকে মেজে বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, স্নেহময়ী সরলা মা আমার গায়ে লাগিবে বলিয়া জ্যোৎস্নাকে ভর্ৎসনা করিলেন। আমার অসুস্থতার জন্য তাঁহারা বড় দুঃখ করিলেন। মা বলিলেন আমার চেহারা এরূপ মন্দ হইয়াছে, আমাকে তাঁহারা অন্য স্থানে দেখিলে চিনিতে পারিতেন না। এত কাল দেখেন নাই, আমি বড় দূরে থাকি, এজন্য তিনি পেড়াপিড়ি করিয়া জ্যোৎস্নার দ্বারা সময়ে সময়ে পত্র লেখাইয়া আমার খবর লইয়া থাকেন। নিকটে কোনও স্থানে বদলি হইয়া আসিতে তিনি মাতার মত বারম্বার অনুরোধ করিলেন। তিনি উঠিয়া গেলে, জ্যোৎস্না তাঁহার কয়েকটি নূতন রচনা পড়িয়া শুনাইলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ অমনস্কা। কি যেন কিছু বলিবেন, অথচ বলিতে পারিতেছেন না। শেষে কি ভাবিয়া একটুক হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা, সত্য সত্য বলুন দেখি, সকালে ফাইলে আপনার কোনও চিঠি নাই দেখিয়া আপনি কি একটুক দুঃখিত হন নাই? আমাকে বড় কৃতঘ্না মনে করেন নাই? আপনার পত্রগুলি আপনি দেখিতে চাহেন কি?" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া একটি কারুকার্য্যখচিত হাতির দাঁতের ক্ষুদ্র বাক্‌স আনিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে সাটিনের রুমালে বাঁধা একতাড়া চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন—"আপনার কোন্ চিঠি দেখিতে চাহেন বলুন। মা জলখাবার পাঠাইলে আপনি ভুলক্রমে আমাকে একটুক্‌রা সামান্য কাগজে পেন্-

সিলের লেখা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিবেন কি ? উহাই আমার কাছে আপনার প্রথম পত্র। পত্রখানি বহুদিন আমি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।" কি সুন্দর স্নেহপূর্ণ ঈষদ্ হাসি হাসিয়া পত্রখানি আমাকে দেখাইলেন, ও গদ গদ কণ্ঠে পড়িলেন! তাহার পর চিঠির পর চিঠি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি ছল ছল নেত্রে বলিলেন—"ফাইলে গাথিয়া রাখা দূরের কথা, দেখুন পত্রের খামগুলি পর্য্যন্ত আমি এমন সাবধানে খুলিয়াছি যে খামটি কি খামের উপরের অক্ষরটি পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই।" আমার চক্ষু হইতে কি একটা আবরণ পড়িয়া গেল। আমার সমস্ত দেহ ও হৃদয় অমৃতে সিক্ত হইল। আমি আত্মহারা হইলাম। নয়নে কি যেন এক স্বর্গ খুলিয়া গেল। আমি আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি শয্যায় বসিয়া তাঁহার দুই কর দুই করে লইয়া উর্দ্ধমুখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার অশ্রুপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম—"জ্যোৎস্না! তুমি দেবী। আমি এই দশ বৎসর অদৃশ্য থাকিয়া তোমাকে দেবীর মত পূজা করিয়াছি ও ধ্যান করিয়াছি। আমি জানিতাম তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু সে ভালবাসা যে আমার ভালবাসার মত গভীর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ তাহা জানিতাম না। আমি বড় ভাগ্যবান। কিন্তু আমি তোমার এ স্বর্গীয় ভালবাসার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি বড় অপাত্রে তোমার এ দুর্ল্লভ ভালবাসা অর্পণ করিয়াছ।" তাহার মুখ আমার মস্তকের উপর হেলিয়া পড়িল। জ্যোৎস্না উচ্ছ্বাসভাবে কেবল একটি কথা বলিলেন—"নবীন। তোমার এই সরলতাই আমি এত ভালবাসি।" দুই জনের অশ্রুধারা পড়িতেছিল, অশ্রুতে অশ্রু মিশিতেছিল। আজও সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে আমার বক্ষঃ সিক্ত হইতেছে। এই মরুময় জগতে রমণীহৃদয়ই স্বর্গ, রমণীর ভালবাসাই অমৃত। সেই দিন

সন্ধ্যায়ও তাঁহাদের উপরোক্ত বন্ধু, আরও কয়েক স্ত্রী ও পুরুষ-বন্ধু নিমন্ত্রিত ছিলেন। বড় আনন্দে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। উপরোক্ত কক্ষে আমি ও জ্যোৎস্নার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহোদর শয়ন করিলাম। ভ্রাতা ত নহে, একটি ত্রিদিবের রত্ন। ভাই ভগিনী দুজনের মধ্যে এমন বন্ধুতা ও প্রগাঢ় ভালবাসা বাঙ্গালির আর কোথায়ও দেখিয়াছি স্মরণ হয় না। তাহার দিদির জন্য অহঙ্কারে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমরা দুজনে নানা বিষয়ে গল্প করিয়া আরও কিছু রাত্রি কাটাইলাম। পর দিন আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। জ্যোৎস্নাদের বিশ্বাস আমি একজন 'ফুলবাবু'। তাঁহারা আমার ভৃত্য হইতে চাবি লইয়া জনে জনে আমার ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখিতেন। গরিব আমার শরীরের কাছেও বাবুয়ানার গন্ধ নাই। আমার বড় simple life, তথাপি লোকের সর্ব্বত্র এ বিশ্বাস কেন জানি না। তাঁহারা ট্রাঙ্ক খুঁজিয়া পাইলেন একখানি রকমোয়ারি 'রেপার'। চট্টগ্রামে তাহা কেহ কিনিয়াছিল না। আমি কিনিলে উহা সেখানেও ফেশন হইয়া গিয়াছিল। এই রেপারখানি তাঁহারা ভাইভগিনীরা কাড়াকাড়ি করিয়া গায়ে দিতেন। কলিকাতায় গিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখি স্ত্রীর জন্য একটা নূতন রকমের কাঁচলি ও একখানি সাটিনের রুমালে বাঁধা আমার ফটোর জন্য জ্যোৎস্নার এক পত্র ও বার টাকা। তিনি ফটোর জন্য আমাকে বড় জিদ করিয়াছিলেন। আমি নানা কারণ দেখাইয়া বিশেষতঃ অসুস্থ বলিয়া ফটো তুলিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। এ পত্রের দ্বারা বাধ্য হইয়া জীবনে প্রথম ফটো লইলাম। টাকা ফেরত পাঠাইলাম। এখন এ প্রৌঢ় বয়সে সেই ফটো দেখিয়া অনেকে বলেন যে রবি ঠাকুরের ফটো। রবি বাবুর পক্ষে উহা blasphemy (দেবনিন্দা)। ছুটী শেষ হইলে আমার কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহাদের উক্ত অকস্মাৎ ব্যথাগ্রস্ত বন্ধু হইতে আমি এক অপূর্ব্ব পত্র পাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বাইরণ ও মিলের প্রেমের মধ্যে আমি কাহার প্রেমের অধিকতর প্রশংসা করি। বাইরণ যাহাকে ভাল বাসিতেন, তাহার নামে কবিতা লিখিয়া সমস্ত পৃথিবীর লোককে তাহা জানাইতেন। আর মিল মিসেস্ টেইলারকে যে ভাল বাসিয়াছিলেন তাহার স্বামীর জীবিত সময়ে ৭ বৎসর তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন। আমি পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম, এবং তাহা জ্যোৎস্নার কাছে পাঠাইয়া দিয়া রোগী মহাশয়কে উত্তর লিখিলাম যে আমি বাইরণ কি মিল কাহারও প্রেমের খবর রাখি না, অতএব তাহাদের প্রেমের তুলনার সমালোচনা করিতেও অক্ষম। তিনি কেন আমার কাছে উহা চাহিয়াছেন তাহাও আমি বুঝিতে অক্ষম। আমি এই হইতে তাঁহার নাম "মিষ্টর মিল" রাখিয়াছিলাম, এবং জ্যোৎস্নার পরিবারের মধ্যেও তিনি এই নামে এই হইতে অভিহিত হইতেন। জ্যোৎস্না লিখিলেন—"লোকটির মাথা খারাপ হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহার পত্রখানি গ্রাহ্য করিবেন না। মিল মহাশয় আপনার উত্তর পাইয়া বড় লজ্জিত হইয়াছেন। উহা তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের মত পড়িয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে তিনি এখন আপনার কবিতার নামও শুনিতে পারেন না। তিনি অকস্মাৎ হেম বাবুর "বৃত্র সংহারের" বড় পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমি উহার নাম "বেত্র প্রহার" রাখিয়াছি বলিয়া আমার সঙ্গে 'মিল মহাশয়ের' সর্ব্বদাই সাহিত্যিক কলহ হয়।

ইহার কিছু দিন পরে আমি ঘোরতর বিপদস্থ ও মৃতপ্রায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আবার ছুটী লইয়া আসি। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে একবার এবং পুরী বদলি হইয়া যাইবার সময়ে আর একবার

নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যোৎস্নাদের দেখিতে যাই। উভয়বার এক এক দিন মাত্র তাঁহাদের গৃহে বড় আদরে ও আনন্দে কাটাইয়া আসি। পুরী বিদায় দিতে তাঁহারা বড় কাঁদিলেন। একটি শিশু ভ্রাতা স্কুল হইতে আসিয়া বারণ্ডার একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। জ্যোৎস্না আমাকে ডাকিয়া দেখাইলেন। তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদা! তুমি আজ চলিয়া যাইবে কেন?" শিশুর এ সরল স্নেহে কি স্বর্গ! আমি তাহাকে বুকে লইয়া বড় কাঁদিলাম। আমার পত্নীর তখন আসন্ন প্রথম প্রসবের সময়। তাহাকে তাঁহারা রাখিতে কত চেষ্টা করিলেন! সে সকল কথা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। উহা জন্মান্তরীণ স্বর্গের স্মৃতির ন্যায় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে, এবং রোগে, শোকে, তাপে হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করে।

পূরী আসিবার কিছু দিন পরে কোনও মাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় আমার ও হেম বাবুর কবিতার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে হেম বাবুকে স্বর্গে ও আমাকে এরূপ কদর্য্যভাবে গালি দিয়া নরকে প্রেরণ করা হয় যে স্বয়ং হেম বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার ভাই ঈশানকে বলেন—"ওহে! এ পাজিটা কে যে ভদ্র লোককে এরূপ গালি দিতেছে? তোমরা কেহ ইহার প্রতিবাদ কর না কেন? বোধ হয় লোকটার নবীনের প্রতি কোনও রূপ malice (বিদ্বেষ) আছে।" লোকটা কে, আমার আর বুঝিবার বাকী রহিল না। তাহার ত বিদ্বেষ আছেই, তাহা ছাড়া আমি ঐ সময়ে কোনও কারণে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের বিশেষ 'ভ্রাতৃ প্রেমের' পাত্র হইয়াছিলাম। তিনি তখন একজন নামজাদা ব্রাহ্ম। ঈশান আমার কাছে হেম বাবুর মুখের কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া এই গালাগালির প্রতিবাদ করিতে অনুমতি

চাহিলেন। দেখিলাম লোকটা কে, এবং এ গালাগালির কারণ কি, তাহা কলিকাতা অঞ্চলে সেই ঠেঙ্গ ভাঙ্গার দলের দ্বারা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশান সে জনরব সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে এই বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত, ঘৃণিত, ও ব্যক্তিগত গালির প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া লিখিলাম যে এইরূপ সমালোচনার এক মাত্র প্রতিবাদ আছে, তাহা কার্য্যগত, এবং উহা তাঁহার কি আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবান্ বুঝি তাহা শুনিয়াছিলেন। তিনি এই নরাধমের জন্য তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সকল প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার পত্রের সংখ্যা কমিতেছিল, ও স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়িতেছিল। আমার কাছে তিনি যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার একবার দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন যে তাঁহার ও আমার পত্রগুলি ছাপিলে একটি সুন্দর উপন্যাস হইবে। আমি মনে করিলাম তিনি বুঝি সেজন্য পত্রগুলি দেখিতে চাহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার ফটোগ্রাফ ফেরত চাহিলেন। তাহার পর আমার ফটোগ্রাফ ও আমার বহি, তাঁহাকে যাহা উপহার দিয়াছিলাম তাহা ফেরত আসিল। অথচ আমার হাতের উপহার-লেখা বহির যে পৃষ্ঠায় ছিল তাহা কাটিয়া রাখিয়াছেন, আমার পত্রগুলিও ফেরত আসিল না। তাহার পর তাঁহার পত্র বন্ধ হইল। এ কি বিচিত্র লীলা কিছুই বুঝিলাম না। তাহার পর ২৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমি তাঁহার আর পত্র পাই নাই। তাঁহারা সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

উক্ত প্রবন্ধাবলির পর 'ঠেঙ্গ ভাঙ্গার দল' হইতে আরও কত বিচিত্র উপন্যাস, অপন্যাস, ছাই পাঁশ বাহির হইয়াছিল। মিল মহাশয় এক দিকে আমার প্রতি শাণিত শরজাল সকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অন্য দিকে সরলা জ্যোৎস্নার ও তাঁহার সরল পরিবারবর্গের মন পৃষ্ঠ-

দংশনের দ্বারা আমার প্রতি বিষাক্ত করিতেছিলেন। উপরোক্ত লীলা তাঁহারই এ চুক্‌লির ফল। ছেলে বেলা শুনিতাম আমাদের বাজিকরগণ বাজির আরম্ভে গাইত—

"বাবু! আমরা ভোজের বাজি খেলিয়া ফিরি।
আত্মারাম সরকারের মুখে মারি খেঙ্গরার বাড়ি।"

শুধু তিনটি কদাকার পুতুল বাহির করিয়া চুক্‌লিখোর আত্মারাম সরকার ও তাহার হতভাগ্য মাতা পিতা বলিয়া বাজিকরেরা সকলকে দেখাইত। তাহাদের বিকৃত রূপ দেখিয়া সকলে হাসিত। তাহার পর উক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া বাজিকরেরা তিন জনের মস্তকে সম্মার্জ্জনি প্রহার করিয়া খেলা আরম্ভ করিত। আমি তখন ভাবিতাম যে এই হতভাগ্য আত্মারাম সরকারটি কে, এবং ইহাদের কাছে সে কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহার দেশব্যাপী এই ঘোরতর নিগ্রহ। পরে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" পড়িয়াছিলাম স্মরণ হয়; যে আত্মারাম সরকারও 'মিল মহাশয়ের' মত প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে ভোজের বাজিটা কিছুই নহে, কেবল হস্ত-কৌশল মাত্র, এবং বাজিকরেরা ঘোরতর প্রবঞ্চক। এই জন্য দেশব্যাপী বাজিকর তাহাকে 'চুক্‌লিখোর' উপাধি দিয়া তাহার এই পৃষ্ঠ দংশন অপরাধের এরূপ অকথ্য প্রতিশোধ লইয়া থাকে। শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে; তাঁহার ও তাঁহার পিতা মাতার সম্মার্জ্জনী-ভোগ সমান ভাবে চলিতেছে। মনে করিতাম বাজিকরেরা কি হিংস্রক! কিন্তু আমি এ জীবনে চুক্‌লিখোরদের কৃপায় এত দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়াছি, এত গভীর মনস্তাপ পাইয়াছি, এত সুখ শান্তি হারাইয়াছি, যে আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে যে বাজিকরেরা চুকলিখোর আত্মারাম সরকারের উপযুক্ত দণ্ডই বিধান করিয়া থাকে। ন্যায়বান শ্রীভগবান্ চুক্‌লিখোর

'মিল মহাশয়ের' তদপেক্ষাও গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়াছেন। আমি রাণাঘাট হইতে একবার সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়া কোনও এক বন্ধুর গৃহে ছিলাম। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন যে পার্শ্বের গৃহের একটি রমণী বরাবর আমাদের কথা বলিয়া থাকে, এবং আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দেখিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্ত্রী ছাদে উঠিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বিস্মিতা হইয়া আসিয়া বলিলেন যে সে আর কেহ নহে, এই মিল মহাশয়ের পত্নী! বন্ধু আমাকে গোপনে বলিলেন যে হতভাগিনী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া একজন ডাক্তারের 'রক্ষিতা' হইয়া আছে। তাহার স্বামী মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহের রোয়াকে বসিয়া, রোয়াকের ইষ্টক অশ্রুজলে ভাসাইয়া থাকে। আরও কিছু দিন পরে শুনিলাম রমণী প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন! হায় ভগবন্! মানুষ তোমার অলঙ্ঘনীয় সূক্ষ্ম দণ্ডনীতি কি বুঝিবে?

এরূপে একটি অমূলক ঈর্ষার ফলে আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ স্বপ্নটি ভগ্ন হইল। আমি জ্যোৎস্নার সমস্ত পত্র ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। কেবল পুরী যাইতে বিদায় হইয়া আসিয়া যে গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলাম, তাহা ভুলক্রমে আমার কাছে ছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জীবনসর্ব্বস্ব আমার!

আমার ক্ষমতা নাই, কি লিখিব? ক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির, অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইয়া নয়ন দৃষ্টিহীন হইয়াছে, হৃদয়-রক্ত নয়ন পথ দিয়া ঝরিতেছে। আমি মরিলাম না কেন? ইহার সানুকুল উত্তর কে দিতে পারে? বলিয়া দেও আমি সেই উপায় অবলম্বন করি। মানুষ সকল সহ্য করিতে পারে, আমি কিছুই পারি না। পাষাণ গলিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে। আমি পাষাণময়ী মূর্ত্তিবিশেষ ছিলাম—সেই পাষাণ দ্রব

হইয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, কি লিখিব? যেই তুমি লিখিয়াছিলে তোমার পুরী যাইবার আদেশ আসিয়াছে, সেই দিন হইতে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিয়াছি। তুমি আসিলে—চলিয়া গেলে,—আমার সকলই ফুরাইল। সন্ধ্যার সময়ে তুমি গাড়ী হইতে নামিলে—আমি তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া—আমার ইচ্ছা হইল আমি মরি। তুমি বিদায় লইতে আসিয়াছ।

আবার সেই রাত্রি! যখন তুমি ট্রেন miss হইবে বলিয়া চঞ্চল হইয়াছিলে তখনও মৃত্যুকে ডাকিলাম। অভাগিনীর আরাধনা ঈশ্বর শুনিলেন না। মৃত্যুও শুনিল না। তুমি গাড়ীতে উঠিলে, আমি আত্মহারা হইলাম, কম্পিত দেহভার বহন করিতে পারিতেছিলাম না। পা অচল হইল, শরীর অচল হইল, কাঁপিতেছিলাম, পড়িয়া যাইতে যাইতে টেবিল ধরিলাম। আলো আমার হাত হইতে পড়িয়া নিবিয়া গেল, আমিও আশ্রয় পাইয়া দাঁড়াইলাম। অন্ধকারে আর কেহ আমাকে দেখিল না। আমি ছুটিয়া অন্য বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলাম। ভ্রাতা চীৎকার করিয়া ডাকিল, আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। কণ্ঠ রোধ হইয়াছিল। আর এ সকল লিখিয়া কি ফল? পুনর্ব্বার গাড়ীর শব্দ শুনিলাম, আমার হৃদয়ের আঘাতের সঙ্গে তাহা মিশিয়া গেল, আমি চঞ্চল হইলাম। তোমার নিকট যাইতে পারিলাম না। আমার তখন ভ্রম হইতেছিল—ভয় শেষ মুহূর্ত্ত। তোমাকে দেখিলাম—কি দেখিলাম! তাহা বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষু কর্ণ দিয়া তড়িৎ প্রবাহ ছুটিতেছে, কি লিখিব? তোমার সিক্তমুখ আমার নয়নের নিকট ভাসিতেছে। আবার যখন দেখিব তখন সেই দৃশ্য ভুলিব। নতুবা সেই মুখ মনে করিয়া মরিব। যেরূপ অবস্থা মৃত্যু নিকট—মরিলে দুঃখ নাই। আর এই নিরাশময় জীবন ভার বহন করিতে পারিব না। আশা নিবিয়া গিয়াছে, উৎসাহ ভাসিয়া গিয়াছে, সমুদয় অন্ধকার।

অবস্থা শোচনীয়। সত্য সত্যই অশ্রুজলে চক্ষু ক্লান্ত হইয়াছে, তুমি এ মুহূর্ত্তে আমাকে দেখিলে জানিতে পারিতে এই কয় দিনে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে কি না। আমার কোন কথা মনে আসিল না। তরঙ্গে তরঙ্গে সকলই ডুবিয়া গেল। যখন কিছু বলিব ভাবিতাম তোমার মুখ দেখিলে সমুদয় ভুলিয়া যাইতাম। আজ তোমাকে লিখিতে লিখিতে সকলই ভুলিয়াছি। কেন অশ্রু তুমি লিখিতে দিতেছ না? আমি আর পারি না। কাগজ ভিজিয়া যাইবে। তুমি ব্যথিত হইবে। আমার অন্তঃকরণ ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আর লিখিতে পারিব না।

তুমি নিরাপদে সুস্থ শরীরে পুরী পৌঁছিয়াছ শুনিলে কিছু স্থির হইব। সেই আশার পথ চাহিয়া আছি। অদ্য পত্র না লিখিলে তুমি দুঃখিত হইবে। সেই জন্য বিদীর্ণ হৃদয়ে লিখিলাম। তোমাকে কবে দেখিব বলিয়া দেও, সেই আমার মোহমন্ত্র হইবে। তাহা মনে করিয়া যদি মন ভাসাইতে পারি ও বাঁচি।

তোমার মৃতপ্রায়——"

পত্রের স্থানে স্থানে শব্দ অশ্রুজলে ভাসিয়া গিয়াছে। হে কবিগুরু! তুমি যথার্থই বলিয়াছ—"দুর্ব্বলতা! তোমারই নাম রমণী।" পুত্রকে বলিয়া রাখিয়াছি এই পত্রখানি যেন আমার চিতানলে সমর্পিত হয়।

আমি এ জীবনে দুইটি রমণী রত্নের ভালবাসা পাইয়াছিলাম। এই ভালবাসার নাম আন্তরিক বন্ধুতা,—নিষ্কাম, অনাবিল, পূণ্যময়, প্রেমময়। একজন আজ স্বর্গে, আর একজন আজ স্বপ্নে! পাপিষ্ঠদের কল্যাণে আমি আজ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিতেছি না। কেন এমন হয়? এক দিন ইনি কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্ত্রীর প্রেম কি নিষ্কাম বলিব?" না, তাহাত নহেই। এই জন্যই ত ভাগবতকার

রাধাকৃষ্ণের আদর্শ আমাদের নয়নের সমক্ষে ধরিয়াছেন। এই আকুলতা, গভীরতা ও নিষ্কামতা পতি পত্নীর প্রেমে সম্ভবে না। অথচ পতি পত্নীর অধিক ভগবানকে প্রেম করিতে না পারিলে মানুষ তাঁহাকে পাইবে কেন? হায় ভগবন্! তবে নিষ্কাম বা আসক্তিহীন প্রেম কি, তাহা শিক্ষা দিবার, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই কি মানুষকে এরূপ আগুণে পোড়াইয়া থাক? হে মঙ্গলময়! তোমার দুর্জ্জেয় মঙ্গল-নীতি কে বুঝিবে? এরূপ অনলে দাহিত ও পবিত্রিত না হইলে আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস লিখিতে, এবং শৈলজা ও জরৎকারুর চিত্র আঁকিতে পারিতাম না!—

"এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান;
এই প্রেমে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান।
আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
নাহি যার প্রেমে; সেই উপাস্য আমার।"

কুরুক্ষেত্র।

রাণাঘাটের কার্য্যাবলি।

রাণাঘাটের ভার পাইবার সপ্তাহ মধ্যে চাকদহের এলেকায় এক শাস্ত্রসিদ্ধ নৈশ ডাকাতি হইয়া গেল। গভীর রাত্রিতে মশাল জ্বালাইয়া, গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া, এবং গৃহবাসীকে নিগ্রহ করিয়া, সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে। দেশ অস্ত্রহীন, বীর্য্যহীন, এমন কি মনুষ্যত্বহীন। প্রতিবাসীরা "জগদম্বা! আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম" নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহিণীর অঞ্চল ধারণ করিয়া "দুর্গা! দুর্গা!" করিয়া কোনও মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে—অাঁটা ঘরে সিঁদ মেরেছে, কোন ডাকাতের এ ডাকাতি?" কিন্তু "যৌবনের জেলখানাতে রাখ্‌ব তারে দিবারাতি" বলিয়া পূলিসের দারোগা সাহেব প্রেম বিতরণ করিতে গেলেও তাঁহারা ধরা দিবার পাত্র নহেন। এখনকার স্থানীয় পুলিস তদন্তের ফল যাহা হইয়া থাকে তাহা হইল, অর্থাৎ ডাকাতেরা অনুগ্রহ করিয়া ধরা দিল না। বলা বাহুল্য যাহার বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে তাহার ঘাড়ে পড়িয়া কয়েক বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা ব্যতীত তাঁহারা তাহাদের ধরিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। চোর ডাকাতি ধরিয়া তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন কেন? তাহারাত আর ঘুস দিতে পারে না। তাহার উপর আর এক লীলাময় আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছেন। এক নামজাদা ম্যাজিষ্ট্রেট মিশনারি হইয়া রাণাঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার লীলার কথা পরে বলিব। তিনি বলিলেন যে তিনি জানেন যে তিনি কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতে বনগাঁয়ে বদমায়েসের আড্ডা ছিল। অতএব তাহাদিগকে ধর, মার,

কাট! আমি বলিলাম এখন সে দিন নাই। এখন এ নীতি অবলম্বন করিলে ডাকাত ধরা ত পড়িবেই না, আমি মারা পড়িব। তিনি বলিলেন সেই দিন এখনও আছে। কেবল আমরা কাপুরুষ বলিয়া বীররসে ভাসিয়া সেই "মহাগীত" গাইতে পারি না। তাহার পর আরও একটি ডাকাতি, এবং মাজিষ্ট্রেট-মিশনারি সাহেবের হাতার কাছে এক সিঁদ চুরি হইল। তিনি সিঁদ দেখিয়া বিজ্ঞতার সহিত বলিলেন যে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে উহা বনগাঁয়ের বদমায়েসদের রচনা। আমি এখনও সেই অজ্ঞাত বদমায়েসদের বাল বাচ্চা সহিত জেলে ফেলি নাই বলিয়া তিনি আমার অকর্ম্মণ্যতার জন্য নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্ণার্ডের (Bernard) কাছে পুষ্প চন্দন প্রেরণ করিলেন। বার্ণার্ড পত্র পাইয়া আসিলেন, তাঁহার গৃহে একবেলা আহার করিয়া আমার কৈফিয়ৎ শুনিয়া চলিয়া গেলেন। বনগাঁয়ের বদমায়েসেরা খৃষ্টপ্রেমের উদারতা বুঝিল না।

যাহা হউক উপর্য্যুপরি চুরি ডাকাতিতে আমি বড় চিন্তিত হইলাম। আমি দেখিলাম যে মশালের কাপড় এবং সিঁদ কাটার লক্ষণ বাঙ্গালা দেশের নহে। শুনিলাম কাকিনারা প্রভৃতি স্থানে বহু সহস্র হিন্দুস্থানী কুলি কলকারখানার কাযে আছে। তাহাদের উপর কোনও রূপ তত্ত্বাবধারণ নাই। ঘটনাও যাহা হইয়াছে তাহা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট। আমার সন্দেহ হইল এই সকল কীর্ত্তি সেই হিন্দুস্থানি কুলিদের। আমি তখন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত দিয়া আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই কুলিদিগের গতি লক্ষ্য করিতে, পুলিস মোতায়ন করিতে, ও তাহাদের রাত্রিতে দুইবার খবর লইতে রিপোর্ট করিলাম। এ দিকে প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে গজেন্দ্রগামী শিকারলোলুপ 'রেলওয়ে পুলিস' কনেষ্টবল প্রভুদের আরামের ব্যাঘাত না করিয়া—

অনেক সময় চোর ডাকাতদের তাঁহাদের সঙ্গে সরিকি কারবার—আমাদের সাধারণ পুলিসের কনেষ্টবল অপুলিস পরিচ্ছদে রাত্রির প্রত্যেক ট্রেণ লক্ষ্য করিবার জন্য নিয়োজিত করিলাম। কুলি দুই এক দল রাত্রির ট্রেণে আসিয়া রেলওয়ে পুলিসের কি অন্য গোয়েন্দার কাছে খবর পাইয়া আমাকে নিতান্ত "কমবক্ত" স্থির করিয়া ফিরিয়া গেল। ইহার পর আমি যে দুই বৎসর রাণাঘাটে ছিলাম, আর বনগাঁয়ের বদমায়েসেরা আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট-মিশনারি সাহেবের বিরাগভাজন করে নাই।

রাণাঘাটের ফৌজদারি কার্য্য একে লঘু, তাহাতে আমার old parliamentary hand(পাকা পৌরাণিক হাত) কিঞ্চিৎ মাত্র দেখাইবা মাত্রই আরও কমিয়া গেল। এখানে আমার পঞ্চায়েতি-প্রথা পরিচালন করিতে গিয়া আবার বিপদে পড়িলাম। বেহারের সব-রেজিষ্ট্রার কাজি সাহেবের মুরুব্বি সেই ইন্সপেক্টার জেনারেল এখন নদীয়ার জজ। তিনি আমাকে ভুলেন নাই। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া যেই তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, তিনি আরক্ত চক্ষু ঘুর্ণিত করিয়া বলিলেন—"বাবু! আমি তোমাকে চিনি। তুমি গরীব কাজি—র সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে এবং আমার অবমাননা করিয়াছিলে। তুমি যদি ভাল চাহ, তবে যত শীঘ্র পার রাণাঘাট হইতে দৌড়িয়া পালাও।" আমার আর এক বন্ধু তাঁহার কোনও অবিচার সম্বন্ধে তাঁহার কাছে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন—Moulvi! it is not a question of Justice, but purely my khushi (মৌলবী! উহা বিচারের কথা নহে, আমার খুসি মাত্র)। এই দীর্ঘ দাসত্বে প্রতিযোগী পরীক্ষার কল্যাণে অনেক নিকৃষ্ট ইংরাজকে দেখিয়াছি, কিন্তু একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে তাহাকে মুখের উপর এরূপ অপমান করিতে পারে এমন পশু যে ইংরাজ জাতিতে আছে তাহা জানিতাম না। আমি বার্ণার্ড

সাহেবকে এ কথা বলিলে তিনি প্রথম বিশ্বাস করিলেন না। পরে বলিলেন যে আমি "খুসি বাহাদুরের" অধীনস্থ কর্ম্মচারী নহে, তিনি আমার কি করিতে পারেন। আমি এই অভয় বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। তখন "খুসিরাম" রাণাঘাটে ছুটিয়া আসিয়া আফিস পরিদর্শন করিলেন। পূর্ব্বে আমাদের পরিদর্শনের ক্ষমতা জজদের ছিল না। কিন্তু লাট ইলিয়ট—আমি ইহাকে 'ইডিয়ট' বলিতাম—দেখিলেন যখন রাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলেই ডেপুটিদের উপর কর্ত্তাগিরি করিতে পারে, তখন আর "খুসিরামেরা" বাদ যান কেন? খুসিরাম আর কিছু না পাইয়া আমার পাঞ্চাইৎ প্রণালীকে তীব্র আক্রমণ করিয়া আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন না কেন কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। প্রায় বার বৎসর যাবৎ মাদারিপুর হইতে আমি এই পাঞ্চাইৎ প্রণালীর জন্য প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়া আসিয়াছি। একটি স্ত্রীলোকের 'এস্তেহার' লওয়ার ছলনায় প্রথম কনেষ্টবল, তারপর জমাদার, তারপর দারোগা তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া সর্ব্বশেষ মাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করিলে তিনিও যখন 'এস্তেহার' লইতে চাহিলেন, তখন সে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমি তিনবার এস্তেহার দিয়াছি, আর পারি না।" আমি ভাবিতেছিলাম আমিও আর কৈফিয়ৎ দিতে পারি না বলিয়া জবাব দিব। ফেণীতে অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটের পর নন্দকৃষ্ণও কৈফিয়ৎ লইয়া এই প্রণালীর মোকদ্দমা আপোষ করিবার ও কমাইবার একটা অমোঘ উপায় দেখিয়া উহা নোয়াখালি সদরেও পরিচালিত করেন।

আমি যখন ছুটী লইয়া চট্টগ্রাম গিয়া ওল্ডহেমের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনিও ছুটীতে যাইতেছিলেন এবং বিধাতার এমন

সূক্ষ্মনীতি যে তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রিয়ার অস্থায়ীভাবে তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। ওল্ডহেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ সময়ে মিঃ গ্রিয়ার বোধ হইল ইচ্ছা করিয়া উপস্থিত ছিলেন, কারণ তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন যে আমাকে দেখিবার তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, কারণ আমার ফেণীর কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা তিনি কুমিল্লায় বসিয়া শুনিয়াছেন। তিনি এরূপ খবর লইতেন যে আমি আমার পেয়াদা ও চৌকিদারদের সুন্দর "ইউনিফরম পোষাক" দিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার কাছে পত্র লিখিয়া নমুনা লইয়া গিয়াছিলেন, এবং ত্রিপুরা জেলায় তাহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আমি কিরূপে মোকদ্দমার সংখ্যা এত কমাইয়াছি তিনি তাহার রহস্য (secret) কি বিশেষ আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম এমন বাঁধাবাঁধি রহস্য কিছু নাই, আমি স্থানোপযোগী নীতি অবলম্বন করিয়া থাকি। তবে পঞ্চায়েতের দ্বারা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার তদন্ত প্রণালী আমার একটি প্রধান রহস্য। তিনি উহা জানিতে চাহিলে আমি সমস্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি শুনিয়া বড় প্রীত হইলেন, এবং ওল্ডহেমের দিকে চাহিয়া বলিলেন যে তিনি উহা একটা উৎকৃষ্ট প্রণালী (an excellent plan) মনে করেন। দাম্ভিক-চূড়ামনি ওল্ডহেম একটুক ঈষদ্ বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মিঃ গ্রিয়ার! নবীন বাবু একজন বিখ্যাত কবি। তিনি সকল বিষয় কবির মত ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তুমি জান আমি একজন সারগ্রাহী লোক (matter of fact man)।" গ্রিয়ার আমার ফেনীর কার্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিয়া ও অনেক প্রশংসা করিয়া আমাকে বড় সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন, এবং বলিলেন আমি ফেণী ফিরিয়া গেলে তিনি একবার আমার সৃষ্ট ও লোক-প্রশংসিত ফেনী দেখিতে যাইবেন। তাহার পর কুমিল্লায় ফিরিয়া

তিনি সেখানে আমার পঞ্চাইত প্রণালী প্রচালিত করেন। নন্দকৃষ্ণ ও তিনি উভয়ে সেই বৎসরের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে (General Administrative Report) উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া লেখেন। ওল্ডহেম এই সকল প্রশংসোক্তি তাঁহার বিভাগীয় বিজ্ঞাপনীতে উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর এই বিজ্ঞ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে তিনি উহাতে "আন্তরিক গুণ কি বাহ্যিক মূল্য (Internal merit or External value) কিছুই দেখেন না।" বাঙ্গালার শাসন দণ্ড তখন অস্থায়ীভাবে বিচক্ষণ এঃ পিঃ মেকডনেলের (A. P. Macdonell) হস্তে ছিল। ইলিয়ট ৬ মাসের ছুটীতে তাঁহার ঐতিহাসিক "no conviction, no promotion" (না শাস্তি, না উন্নতি) নীতির জন্য হাইকোর্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বিলাত গিয়াছিলেন। চতুর মেকডনেল বিভাগীয় বিজ্ঞাপনী হইতে এ অংশ আমূল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন—"বা! এ কেমন কথা! দুইজন মাজিষ্ট্রেট পরীক্ষা করিয়া এ প্রণালীর উপকারিতার কথা লিখিতেছেন। আর কমিশনার কেবল বাহাদুরী করিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেছেন। লেঃ গবর্ণরও উহা সমস্ত বঙ্গরাজ্যে পরীক্ষাধীন প্রচলনের আদেশ দিতেছেন।" সেই সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইল, আর আমি বগল বাজাইয়া উহাই আমার কৈফিয়ত স্বরূপ 'খুসিরামের' বা 'ঘাসিরামের' মস্তকে সজোরে নিক্ষেপ করিলাম। তিনি পপাত হইলেন। ইহার পর তিনি আর আমাকে "দন্তরুচি কৌমুদী" প্রদর্শন করেন নাই। বার্ণার্ড সাহেব হাসিয়া আকুল। এই পঞ্চায়েতী তদন্তের প্রথার ও আমার অন্যান্য কৌশলের ফলে মোকদ্দমার সংখ্যা এত কমিল, এবং গুরুতর মোকদ্দমা এরূপ লুপ্ত হইল, যে কিছু দিন পরে আমি কলিকাতায় বেড়াইতে গেলে আমার বন্ধু শ্যামাধব রায়,

সেয়ালদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, আমাকে বলিলেন—"তোমার কি দৈবিক শক্তি আছে? শুনিলাম যে রাণাঘাট সবডিভিসনে রামশঙ্কর সেন ও রামচরণ বসুর মত দক্ষ কর্ম্মচারী সমস্ত দিন রাত্রি খাটিয়াছে, তুমি সেখানে ১২টার পূর্ব্বে কাছারি যাও না এবং ৩টার পরও থাক না? তুমি কায কেমন করিয়া সামলাইতেছ?" আমি বলিলাম—"আমার দৈবিক কি ভৌতিক কোনও শক্তি নাই, তবে তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা সত্য।" তিনি বলিলেন—"তবে বুঝি তুমি ফৌজদারী দরখাস্ত সকল পাওয়া মাত্রই ডিস্‌মিস্‌ কর?" আমি বলিলাম—"সকল দূরের কথা, আমি একখানিও ডিস্‌মিস্‌ করি না।" তিনি তাঁহার আয়ত চক্ষু আরও বিস্তৃত করিয়া আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, এবং বলিলেন—"তবে ব্যাপার খানি কি? আমি ত এখানে খাটিয়া খাটিয়া মলেম। আমাকে তোমার কার্য্য প্রণালী শিখিতে হইবে।"

রাণাঘাট সবডিভিসন প্রমিলার পুরী। ইহার, বিশেষতঃ শান্তি-পুরের মহিষমর্দ্দিনীরাই রাণাঘাট ফৌজদারী কোর্ট রক্ষা করিতেছেন। দুই একটি গল্প বলিব। শান্তিপুরের এক বিধবা ব্রাহ্মণীর দুই কন্যা। বিধবা পুত্রহীনা বিধায় কনিষ্ঠার স্বামীকে গৃহ-জামাতা করিয়া রাখিয়াছেন। বিধবার কিছু সম্পত্তি আছে। এ জামাতার সঙ্গে সম্প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ মনান্তর ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ জামাতা বুঝিয়াছেন যে এই তাঁহার কণ্টকোদ্ধার করিবার সুযোগ। তিনি আসিয়া সেই অনলে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষ পুলিসকে হাত করিয়া ব্রাহ্মণীর দ্বারা কনিষ্ঠ জামাতার বিরুদ্ধে এক গুরুতর চুরির অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে উকিল আনিয়াছেন। শাশুড়ী সাক্ষীর বাক্সে, নব যুবক কনিষ্ঠ জামাতা আসামীর বাক্সে, এবং জ্যেষ্ঠ

জামাতা তাঁহার বৃহন্নলা সারথী উকিল মহাশয়ের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। শান্তিপুর ভাঙ্গিয়া লোক তামাসা দেখিতে আসিয়াছে। এমন হুজুগে লোক বুঝি আর ভূভারতে কোথায়ও নাই। মোকদ্দমা ধরিয়াই অবস্থা কি আমি বুঝিলাম। মোকদ্দমা প্রমান হইলে কনিষ্ঠ জামাতার, অপ্রমাণ হইলে শাশুড়ীর শ্রীঘর-বাস নিশ্চয়। উভয় ফলে জ্যেষ্ঠ জামাতার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তাঁহার স্থূল দেহ, তিনি সম্ভ্রান্তভাবে উড়ানির দ্বারা অজানুকণ্ঠ আবৃত করিয়া গাম্ভির্য্যপূর্ণ মুখে শিকারার্থ অপেক্ষা করিতেছেন। আমি প্রথম তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। অবশেষে তাঁহার স্বার্থ-ছায়া যে এই মোকদ্দমার পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান, এবং তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তাহাও বুঝাইলাম। তিনি ও তাঁহার উকিল মহাশয় মধুর ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন— "তোবা! তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। তাঁহার শাশুড়ীর উপর ঘোরতর উৎপীড়ন হইয়াছে বলিয়া, এবং তাঁহার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া তিনি কেবল তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন মাত্র। এই মোকদ্দমায় তিনি নিতান্ত দুঃখিত, কারণ উভয় পক্ষ তাঁহার পরম আত্মীয়।" তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া ঠাকুরাণীটিকে ভজাইতে লাগিলাম। তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে আসামীকে এতদিন পুত্রবৎ পালন করিয়া এখন এরূপে জবাই করা মাতৃধর্ম্ম হইবে না। তিনি টিয়া পাখীর মত এক বুলি শিখিয়া আসিয়াছেন—"দোহাই আপনার! ও আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে। আমি বড় কষ্টে তোমার কাছে এসেছি।" বারম্বার এই কথা বলিতেছেন ও চক্ষু মুছিতেছেন। তখন আমি আসামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার পায়ে পড়িতে বলিলাম। সে ছুটিয়া আসিয়া সাক্ষীর বাক্সস্থিতা তাঁহার শ্রীচরণ দুখানির উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া

আছেন ; আর বলিতেছেন—"আমি আর ওর মুখ দেখ্‌বো না," এবং এক এক বার জ্যেষ্ঠ জামাতার দিকে কটাক্ষ করিতেছেন। তাহার অর্থ—কেমন অভিনয় ঠিক হইতেছে ত? আমি বলিলাম—"দোহাই ঠাকুরাণী! একবার হতভাগা সন্তানটির দিকে একটুক আড় চোকেও না হয় দেখ। তার পর মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা হয় চালাইও। তাহার গলা কাটিতে হয় কাটিও। তুমি ত দানবদলনী খড়্গ-পাণি হইয়াই দাঁড়াইয়াছ, এবং দানবও চরণে পড়িয়া আছে।" তিনি তখন একটুক আড় চোকে দেখিলেন। আমি বলিলাম—আর একটুক মুখ ফিরাইয়া দেখ! তখন মুখ আর একটুক ফিরাইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—"না, আমি ওর মুখ দেখবো না।" আমি আবার বলিলাম—"আমার বিশেষ অনুরোধ ঠাকুরাণি! একটিবার ভাল করে ওর দিকে দেখ। আমি হাকিম, আমার এ সামান্য কথাটি রাখ্‌বে না?" তখন তিনি পূর্ণমাত্রায় মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে দেখিলেন। কোর্ট শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। এবার তিনিও আর না হাসিয়া পারিলেন না। আমি তখন বলিলাম—"হরি! হরি! বল সবে. পালা হলো সায়।" তখন জ্যেষ্ঠ জামাতাকে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়া ধমকাইয়া উভয় পক্ষকে 'বোধিদ্রুম' মূলে প্রেরণ করিলাম। কিছুক্ষণ সেখানে কাঁদা কাটা হইল। কনিষ্ঠা কন্যাও গাড়ীতে বসিয়া ছিল। আমার উপদেশ মতে সেও মায়ের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর ব্রাহ্মণী হাসিতে হাসিতে দরখাস্ত-হস্তিনী হইয়া বলিলেন তিনি তাঁহার জামাতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবেন না, এবং উহা আমি তৎক্ষণাৎ ডিস্‌মিস্‌ করিলে তিনি আমাকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া কনিষ্ঠা কন্যা ও উভয় জামাতাকে এক গাড়ীতে লইয়া সকলে হাসিতে হাসিতে শ্রীপাট শান্তিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

কাছারিতে ও হাতায় একটা আনন্দের হাসি উঠিল। স্বয়ং বিবাদীর উকিল মহাশয় বলিলেন—"রাণাঘাটের কোর্টের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। আজ চক্ষে দেখিয়া গেলাম। এরূপ অফিসার পাওয়া রাণাঘাটের পরম সৌভাগ্যের কথা। এই মোকদ্দমা অন্য কোর্টে হইলে একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ হইত!"

আর এক মোকদ্দমা, সেও শান্তিপুরের। এক বিবাহে বরযাত্রী হইয়া কলিকাতা হইতে একজন খ্যাতনামা বিলাত ফেরত ডাক্তার আসিয়াছেন। একে বিবাহের বরযাত্রী, তাহাতে স্থান শান্তিপুর, কাল 'দুরন্ত বসন্ত', সময় জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী! মধুর দক্ষিনানিলে সাধের তরণী জ্যোৎস্না প্লাবিতা সুরধনীর সুনীল সলিল হিল্লোলে নাচিতেছে। অন্তরে সুরাধনীর হিল্লোলে বসন্তবাহার খুলিয়াছে, এবং বাহিরেও নানা যন্ত্রে ও কণ্ঠে বসন্তবাহার বাজিতেছে। সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনীর গৃহ জ্যোৎস্নালোকে হাসিপূর্ণ মুখে আহ্বান করিতেছে। ইনি এখন একটি স্থানীয় জমীদারের রক্ষিতা। ডাক্তার সাহেবের প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া কলিকাতা হইতে উড়িয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় মুনি ঋষিরাও মাথাটা স্থির রাখিতে পারিতেন না। বিলাত ফেরত ডাক্তারের মুণ্ডটা ঘুরিবে, আর আশ্চর্য্যের কথা কি? তিনি দলে বলে শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন। 'হৃদয়ের দ্বার' খুলিয়াছে, কিন্তু কাষ্ঠের কপাট প্রথম প্রেমালাপে, পরে সিংহনাদে খুলিল না। রসিকশেখর দীনবন্ধু মিত্র মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়াও সুহৃদশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম বাবুকে বলিয়াছিলেন—"ফোড়া পায় ধরিয়াছে, আর ভাবনা নাই।" এখানেও প্রেম পায়ে ধরিল। পদাঘাতে কপাট ভগ্ন হইল। শান্তিপুর স্থান, একটি টিকটিকি নড়িলেও সেখানে একটা তোলপাড় হয়। সমবেত তেঁতঁরের দল করতালি দিল। রস জমাট হইয়া উঠিল, আর এমন সময়ে বিরসের ধ্বনি উঠিল।

স্বলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে,
গজমুক্তা থাকে গুপ্ত স্বক্তির সদনে ;
হীরকের ছটাবদ্ধ খনির ভিতর ;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর ;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া ;
হায় ! বিধি এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ?

এত সাধেও কুবিধি বাদ সাধিলেন। প্রণয়িনীর গুপ্ত দূতীর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া—সর্ব্বনাশ ! পুলিস উপস্থিত ! so sweet was never so fatal ! হায় ! এমন মধু এমন বিষে পরিণত হইল !

"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।"

কোথায়—"বিকচ নলিনে, জাহ্নবী পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে।"

আর কোথায় পুলিসের মোকদ্দমা ! আমার আবাসগৃহ হইতে দেখিলাম কাছারির চারিদিকে একটা শান্তিপুরী রাসের সমারোহ ! ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম, এক দিকে শান্তিপুরের প্রধান 'ব্যবসায়িনী' ও অন্য দিকে কলিকাতার একজন প্রধান 'নিদান ব্যবসায়ী' ডাক্তার ও বিধান ব্যবসায়ী 'বেরিষ্টার' উপস্থিত। ব্যবসায়ের ত্র্যম্পর্শ ! আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া ব্যবসায়িনীকে সমোক্তার আমার গৃহের আফিস কক্ষে ডাকিলাম। তাঁহার রূপে কক্ষ আলোকিত হইল, বর্ণ জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাঁহার সুগঠিত, সুগোল, ঈষদ্‌স্থূল দেহ। যৌবনে ভাঁটা ধরিয়াছে, কিন্তু স্রোত ফিরে নাই। সুগোল বদন চন্দ্র-মণ্ডলের সঙ্গে তুলনীয়। চক্ষু আবেশময়। পরিচ্ছদ হাল ফেসনের চরম,—"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যং।" আমি শুনিয়াছিলাম

তিনি জনৈক খ্যাতনামা সুবর্ণ বনিক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা। হত-ভাগিনীর পিতা একদিন রাণাঘাটের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সাটিনের রুমালে গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলে, আমি তাঁহাকে একটি বেঞ্চে বসিতে বলিলাম। তিনি অধো-মুখে বসিলেন। আমি তাঁহাকে মধুর সস্নেহ কণ্ঠে বলিলাম যে তাঁহার পিতা একদিন এই কক্ষে তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া বসিয়াছিলেন এবং যে কোর্টে তিনি আজ এভাবে উপস্থিত হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার পিতা উহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে। এখন এই স্থানে এই কোর্টে তাঁহার কি এরূপভাবে উপস্থিত হওয়া উচিত? বিশেষতঃ এই ডাক্তারও একদিন তাঁহার প্রণয়ভাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার অন্ন বহুবর্ষ খাইয়াছেন। আমার করুণ সস্নেহ কণ্ঠে তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল, তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—তিনি কি করিবেন, তাঁহার রক্ষক এ মোকদ্দমা চালাইতেছেন। তিনি এরূপ স্নেহকরুণ কণ্ঠ কখনও শুনেন নাই। আমি যাহা বলিব তিনি তাহাই করিবেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষকের আদেশ ছাড়া মোকদ্দমা ছাড়িবার যে তাঁহার ক্ষমতা নাই, আমি তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। আমি উক্ত জমীদারকে চিনিতাম। আমি তাঁহার একটুক প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে তোমরা এখনই একখানি গাড়ী ছুটাইয়া তাঁহার কাছে বলিয়া পাঠাও যে আমি তাঁহার সম্মানের অনুরোধে এ মোকদ্দমা ছাড়িতে বলিতেছি। অন্যথা ইহাতে তাঁহাকে বিবাদীর পক্ষে নিশ্চয় সাক্ষী মানিবে, এবং জেরাতে তাঁহাকে ঘোরতর অপমানিত করিবে। এখন রমণী আর ডাক্তারের হাতে নহেন। অতএব তাঁহার ঈর্ষারও কোন কারণ নাই। রমণী এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উঠিয়া গেলেন। প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

কাছারিতে গিয়া দ্বিতীয় অঙ্ক খুলিলাম। ডাক্তার ও তস্য বেরিষ্টারকে বুঝাইলাম এরূপ একটা ঘৃণিত মোকদ্দমায় বেশ্যার প্রতিযোগী হইয়া ডাক্তার মহাশয়ের আসামীর বাক্সে দণ্ডায়মান হওয়া কি সম্মানের কথা হইবে? বাঙ্গালি বেরিষ্টার সাহেব সচস্মা তীরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া এবং বেরিষ্টারি-তন্ত্রমতে বুটাবদ্ধ চরণ একখানি চেয়ারের উপর তুলিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া বলিলেন—"ইওর ওয়ারসিপ! মোকদ্দমাটা কিছুই নহে। সম্পূর্ণ অমূলক। ৫ মিনিটের মধ্যে আমি উহা আপনাকে দেখাইতে পারিব।" আমি বলিলাম—"তাহা হউক, এ পাঁচ মিনিটও ত তাঁহাকে একটি বেশ্যার মোকদ্দমায় আসামীর বাক্স শোভিত করিতে হইবে?" কিন্তু বেরিষ্টার মহাশয়েরাও শিকারী বিশেষ। একবার শিকার তাঁহাদের জালে পড়িলে আর তাহাকে ছাড়িবেন না। তাঁহার বিশ্বাস যে এক গুলিতে তিনি এ মোকদ্দমা উড়াইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু আমি দেখিলাম হাইকোর্টের সমস্ত বেরিষ্টার বীরেরা একত্র হইয়া তোপ দাগিলেও ইহার কিছুই হইবে না। তখন ট্রেজারির কার্য্যের ভান করিয়া আমি ট্রেজারির কার্য্য-কক্ষে গিয়া বসিলাম। ক্রমে ৩টা বাজিল, ট্রেজারির কার্য্য আর শেষ হয় না। বেরিষ্টার মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন তিনি ৪টার ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিতে চাহেন। অতএব মোকদ্দমাটি সেই দিন হইবে কি না তিনি জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। ট্রেজারির কায শেষ করিয়া সময় পাইব কি না বলিতে পারি না। তিনি যাইতে পারেন, আমি মোকদ্দমা মুলতবি করিয়া পরে দিন স্থির করিয়া দিব। তিনি ধন্যবাদ দিয়া হেট মাথায় দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনই তৃতীয় অঙ্ক খুলিলাম। বাদিনীর মোক্তারকে ডাকাইলাম। সে বলিল যে রক্ষক বাবুর বাড়ী হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনি সম্যকভাব

আমার উপর দিয়াছেন। তাহার পর ডাক্তার মহাশয়কে ডাকিয়া আর একবার বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন বাদিনী মোকদ্দমার খরচ ১০০৲ টাকা চাহিতেছে। আমি বলিলাম তাঁহার অবস্থায় আমি পড়িলে উহা দিয়া এ আপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতাম। তাহার পর সস্মিত মুখে বাদিনী আসিয়া দরখাস্ত দিল যে বিবাদী তাহার পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া তাহার গৃহে গিয়াছিলেন। তাহার প্রহরীর ভুলে এ গোলযোগ হইয়াছে। বাদিনী এখন জানিতে পারিয়াছেন তিনি কোনও অপরাধের কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন না। অতএব ভুলবশতঃ নালিশ হইয়াছে। বাদিনী মোকদ্দমা চালাইবে না। পুলিস আমার ইঙ্গিতে কেবল ৪৪৮ ধারামতে চালান দিয়াছিল। মোকদ্দমা আপোষ হইয়া গেল। একটি ভদ্রলোকের এরূপে সম্মান রক্ষা হইল বলিয়া সমবেত জনতা আনন্দ প্রকাশ করিল। আর ভদ্রলোকটির কৃতজ্ঞতায় চক্ষু সজল হইল। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম এখন তিনি আর বিবাদী নহেন। অতএব তিনি আমার গৃহে গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আমি বড় সুখী হইব।

তাঁহাকে তখনই গৃহে লইয়া গিয়া 'জলযোগ' করাইলাম। দেখিলাম তিনি একজন সরল-হৃদয় সদাশয় হতভাগ্য লোক। প্রলোভনের পীঠভূমি ইংলণ্ডে তিনি ফাঁদে পড়িয়া এক ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইংরাজনীরা কৃষ্ণচর্ম্ম ভারতবাসীকে দেখিলেই 'নেটিভ প্রিন্স' (Native Prince) মনে করে, এবং পতঙ্গের মত অনলে ঝাপ দেয়, কারণ সেখানে বিবাহ একরূপ বিপত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পত্নী কলিকাতায় আসিয়া দেখিল তিনি ত নেটিভ প্রিন্স নহেন, 'ঘৃণিত নিগার' এবং গোলামের জাতি! তখন দাম্পত্য-প্রেম-বন্ধন প্রথম শিথিল হইল। তাহার পর হাইকোর্টের দ্বারা তাহা ছিন্ন করাইয়া, এবং মোটা মাসিক

বৃত্তি দণ্ড করাইয়া, বিলাতের পাখী বিলাতে উড়িয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার জীবন এরূপ নরকে পরিণত হইয়াছে। তিনি গলদশ্রুলোচনে বলিলেন যে তিনি সন্তান দুটিকে রাখিয়া যাইতে তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে পাছে তাহার বৃত্তির অঙ্কের লাঘব হয়, সে সেই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। আমি তাঁহাকে আবার দার-পরিগ্রহ করিতে বলিলাম, কারণ তিনি তখনও যুবক ও মাসিক ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, তিনি যদি হিন্দুর ঘরের একটি নিরক্ষর সরলা বালিকা পান, তবে বিবাহ করিবেন। অন্যথা ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান বালার ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। তিনি আমাকে বড় আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তাহার পরের বার কলিকাতায় গেলে প্রতিশ্রুতি মতে তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম যে তাঁহার গৃহে ফরাস বিছানা ভিন্ন কিছুই নাহি। তিনি বলিলেন সমস্ত বিলাতি উপকরণ বিক্রয় এবং বন্ধুদের বিতরণ করিয়াছেন। আহার করিলাম কলাপাতে। এই প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তেও তাঁহার পাপের মোচন হইল না। কিছু দিন পরে শুনিলাম তিনি মৃত্যুর কোমল অঙ্কে তাঁহার এই দারুণ ব্যথা জুড়াইয়াছেন।

একদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া—আমি উষার সময়ে উঠি—স্নান-কক্ষের দিকে পশ্চাৎ বারাণ্ডা দিয়া যাইতেছি, সম্মুখে এক অবগুণ্ঠনবতী পদ্মাসনা ও অধোমুখিনী হইয়া বসিয়া আছে। সেই অবগুণ্ঠন ও পরিধেয় সাড়ীর মধ্য হইতে অতুলনীয় রূপ ও যৌবন উষালোকে ফুটিয়া পড়িতেছে। "অবগুণ্ঠনবতী তুমি কে?" উত্তর—"আমি বড় হতভাগিনী।" তুমি কেন এখানে এরূপ সময়ে আসিয়া বসিয়া আছ? উত্তর—"আমি বড় দুঃখে আপনার কাছে আসিয়াছি।" তুমি কোথা হইতে আসিলে? উত্তর—"অনেক দূর হইতে আসিয়াছি।" তাহার

কণ্ঠস্বর কি মধুর! আমার স্মরণ হইল এক ব্রাহ্মণ কিছু দিন হইল রাণাঘাটের এক মোক্তার তাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়াছে বলিয়া নালিস করিয়াছিল। আমি রমণীর নামে সাক্ষী স্বরূপ ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি অমুক চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী?" উত্তর—"আমি বড় হতভাগিণী, দুঃখিনী।" আমি সক্রোধকণ্ঠে বলিলাম—"বটে! সে মোক্তার হতভাগা বুঝি তোমাকে এরূপ ভাবে এখানে আসিয়া বসিয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে। আচ্ছা, আমি এখন তাহাকে শিক্ষা দিতেছি।" তখন রমণী বসনান্তর হইতে হাত দুখানি—কি সুন্দর ক্ষুদ্র চম্পককলি সজ্জিত কনক পুষ্পপাত্রের মত ক্ষুদ্র কর!—বাহির করিয়া আমার পা দুখানি ধরিতেছিল, আমি সরিয়া পড়িলাম, এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে সম্মুখের বারাণ্ডায় লইতে বলিলাম। ইতিমধ্যে স্ত্রী ও সমস্ত গৃহের লোক জাগিয়া উঠিয়া এই অপূর্ব্ব উষা-সমাগম দেখিতে লাগিলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া সম্মুখের বারাণ্ডায় গিয়া দেখি ডাক্তারের সঙ্গে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বেড়াইতে আসিয়াছেন। রমণী দীর্ঘ সুগোল সুভঙ্গি দেহের লীলাতরঙ্গ দেখাইয়া সিঁড়ির উপর অবগুণ্ঠনে বসিয়া আছে। সুরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—"প্রভাতে এ ব্যাপারখানা কি?" আমি বলিলাম—"উষাদেবী।" সে শুনিয়া মস্তক নত করিয়া হাসিল। তাহার উপাখ্যান শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন যে তাহার স্বামী রাণাঘাটের হোটেলে আছে। সে ঘরে ঘরে তাহার উষাহরণের গীত হোমরের মত গাইয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। প্রায় দেখিতে পাই এরূপ রূপসী রমণীকে তিনি কদাকার গর্দ্দভের হস্তে, এরূপ মুক্তার মালা বানরের গলায় দিয়া থাকেন। তাই ভারতচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

মধুর চকোর সুখ চাতকে না পায়,
হায়! বিধি পাকা আম দাড়কাকে খায়!

তাহার স্বামী একটি খর্ব্বাকৃতি, শীর্ণকায়, কোটরস্থ চক্ষু, গোবর-বর্ণ এবং নিরক্ষর মুর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সে দেখিয়াই দাঁত বাহির করিয়া বলিল ঠাকুরাণীটি তাহারই হারাণ ধন। তাহার কথা শুনিয়া ও মুখভঙ্গি দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিলাম। ঠাকুরাণীটিও মাথা আরও হেঁট করিয়া সে হাসিতে যোগ দিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বসণের অবগুণ্ঠন হইতে সে হাসি, যেন শরতের শুভ্র মেঘাবৃত অস্ফুট জ্যোৎস্না! তখন আমরা তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া তাহাকে একটা যোগ শাস্ত্র বুঝাইলাম; কিন্তু কিছুতেই সে তাহার স্বামীর সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তাহার এক কথা—তাহার স্বামী তাহাকে বড় যন্ত্রণা দেয়। যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সে আর যাইবে না। তখন আমি ঠাকুরকে বলিলাম যে আমি কি করিব, জোর করিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠান আমার ক্ষমতা নাই। তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলে রমণী বলিল—"আমার সঙ্গে আপনার একজন লোক দেন। না হয়, পথে আমাকে বেইজ্জত করিবে, ধরিয়া মারিবে।" আমি ঠাকুরটিকে সাবধান করিয়া দিয়া একজন আর্দ্দালি রমণীর সঙ্গে দিলাম। তখন দম্পতী যুগল চলিয়া গেল। কাছারির সময়ে দেখি হাতা লোকাকীর্ণ। আরদালি বলিল—"সেই চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী নালিস করিতে আসিয়াছে। এমন সুন্দরী অল্প দেখা যায়, তাই রাণাঘাট ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছে।" আমি এজলাসে গিয়া অধিষ্টিত হইবা মাত্র—সাক্ষীর বাক্সে এ কি মূর্ত্তি। রূপে কাছারি কক্ষ আলোকিত হইয়াছে। তাহার এখন আর অবগুণ্ঠন নাই। তাহার বিমুক্ত দীর্ঘ কবরী তরঙ্গ খেলিয়া বিপুল শ্রোণীদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখে দুই চারি গুচ্ছ মন্মথের স্বপ্নশয্যা স্বরূপ উন্নত উরসে পড়িয়া কি শোভাই বিকাশ করিতেছে! তাহার কি সুন্দর দীঘল মুখ, কি সুন্দর চক্ষু, নাসিকা ও ওষ্ঠাধার! মদিরাক্ত চক্ষু দুটির কি ঢুলুঢুলু মদালস অরুণ আভা! গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত-ঈষদ ভিন্ন অধরোষ্ঠের অন্তরালে কুন্দ কুসুম শ্রেণী নিসৃত কি কৌমুদী আভা! পরিধান একখানি সূক্ষ্ম সাটী, বাম স্কন্ধে একখানি গামছা, সুবর্ণ-প্রভা সুতনু তৈলাক্ত। রমণী যেন স্নান করিতে যাইতেছে। হস্তে একখানি দরখাস্ত। নালিস,—তাহার স্বামী তাহাকে গোয়ালার দ্বারা মারপিট করিয়াছে। স্বামী মহাশয় মোক্তারদের পশ্চাৎ হইতে রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি আমি মারিতে পারি?" সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিল না কেবল রমণী। সে মদিরার প্রভাবে যেন কি ভাবে বিভোর হইয়া স্থির নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার স্বামীর মোকদ্দমার মত তাহার নালিসেরও প্রমাণ তলব দিয়া সেই মোকদ্দমার দিনে উহারও দিন দিলাম! রমণী চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে তীর্থযাত্রীর মত লোক ছুটিল।

পর দিন রবিবার। অপরাহ্নে আমার আফিস কক্ষে লিখিবার 'সোফার' উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া সংবাদপত্র পড়িতেছি, এমন সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেই কৌতুক-মূর্ত্তি দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। কি ঠাকুর! কি চাও? করযোড়ে উত্তর—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আজ রবিবার। সে মোক্তারটি এখানে নাই। আপনি যদি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া দুটি কথা বলেন, আমি তাহাকে লইয়া যাইতে পারি। আপনার কথায় সে নরম হইয়াছে, এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইতে একরূপ সম্মত হইয়াছে। আপনি আর একটিবার দুটি কথা বলিলে সে যাইবে।" সে কোথায়? উত্তর—এক বেশ্যালয়ে! আমি আরদালিকে তাহার

সঙ্গে দিলাম। ঠাকুরাণীটি আসিলেন। এবার তাঁহার মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি নহে। ললাট পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন। তিনি কপাট ধরিয়া দাঁড়াইলেন। এক পালা বুঝাইলাম। তাহা নিষ্ফল হইল। তিনি বলিলেন—আমার স্বামী মানুষই নহে। সে গোয়ালাদের সঙ্গে আমাকে অবৈধ কার্য্য করিতে, ঘরে বসিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে বলে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে ঘরে বসিয়া করিব কেন? আমার যেখানে খুসী যাইব।" আমি একটু বিদ্রুপাত্মক ঈষদ্ হাসি হাসিয়া বলিলাম, বাহিরে যে বৃত্তি করিতে তিনি দাঁড়াইয়াছেন, তাহা ঘরে বসিয়া করিতে পারিলে বরং সুবিধারই কথা। তখন আমি করুণ গম্ভীর কণ্ঠে আর এক পালা বুঝাইয়া বলিলাম—"আমি স্বীকার করি তুমি পরমা সুন্দরী। তুমি বাজারে গিয়া পড়িলে খুব একটা পসার হইবে। অনেক বসন্তের কোকিল যুটিবে। কিন্তু তুমি এখনই প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছ। দুই দিন পরে বসন্তের কোকিল সকল উড়িয়া যাইবে; এবং রূপের উদ্যানও শুকাইয়া যাইবে। তখন তোমার কি উপায় হইবে একবার ভাবিয়াছ কি? এ সময়ে একটী 'হাতের পাঁচ' স্বামী থাকিলে বরং সুবিধার কথা।" তখন সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি কি তবে সত্যসত্যই আমাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলেন।" তাহার মুখের, কথার ও চাহনির ভঙ্গিতে বোধ হইল যেন ঔষধ তাহাকে ধরিয়াছে। তখন আমি আরও গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম—"আমি এক শ বার বলি। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে তুমি কি সুখ শান্তি ছাড়িয়া কি নরকে ঝাঁপ দিতেছ। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে দু দিন পরে তুমি কি দুর্গতি ভোগ করিবে।" তখন সে আবার আমার দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া বলিল—"বাড়ী লইয়া আমাকে মারিলে ও অপমান করিলে আপনি যদি আমার খবর লইবেন বলেন, তবে আমি

যাইব।” আমি বলিলাম—“তুমি লেখা পড়া জান?” উত্তর—“জানি, অতি সামান্য। আপনার কাছে পত্র লিখিলে আপনি আমার নালিশ শুনিবেন?” আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম—“শুনিব।” রমণী স্থির নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“আমার বাড়ীর কাছে অমুক গ্রামে শীতের সময়ে আপনার তাঁবু পড়িয়া থাকে। আপনি সেখানে গেলে আমার খবর লইবেন। আমি কেবল আপনার আদেশে এখন স্বামীর কাছে আবার যাইতেছি।” আমি তাহাও প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং ঠাকুরটিকে খুব ধমকাইয়া তাহাকে মারিতে কি অপমান করিতে নিষেধ করিলাম। তাহার সেই এক মহাযুক্তি—“ধর্ম্মাবতার! এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি কেহ মারিতে পারে?” আমি ঈষদ হাসিয়া বলিলাম—“ঠিক কথা।” তখন রমণী আমার দিকে সকৃতজ্ঞ ভাবে চাহিয়া বিদায় হইল, এবং তাহার স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল। রাণাঘাটে একটা গল্পের ঝড় বহিল।

সপ্তাহ পরে শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে ঠাকুরাণীটি মোক্তারের ইজার চাপকান সামলা পরিয়া যেমন রাণাঘাট ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিতেছিল, অমনি তাহার স্বামী কয়েকজন গোয়ালা লইয়া গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে একটা শুম্ভ নিশুম্ভ পালা অভিনীত হইয়াছে। পর দিন কাছারিতে যাইবার সময়ে দেখি আবার চারি দিকে লোকারণ্য। এজলাসে উঠিবামাত্র ঠাকুরাণীটি আবার দরখাস্ত হস্তে বাক্সে উপস্থিত! তাহার দু নয়নে অশ্রুধারা বহিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে এজাহার দিল যে আমার আদেশমতে সে বাড়ী ফিরিয়া গেলে তাহার স্বামী তাহার গোয়ালা গাঁজাখোর ইয়ারদের আনিয়া তাহাকে খুব এক প্রস্ত মারপিট করে। শেষে তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া গোয়ালারা কেহ তাহার বুকের

উপর উঠিয়া বসে ও কেহ তাহাকে ধরে এবং তাহার স্বামী তাহার সমস্ত চুল কাটিয়া দেয়। সে মাথার কাপড় ফেলিয়া তাহার মস্তক দেখাইল। তাহার সেই দীর্ঘ চাঁচর চিকুর নিষ্ঠুরভাবে কাটা এবং তাহার সর্ব্বশরীরে প্রহারের চিহ্ন। আমি তখন তাহার স্বামীকে বলিলাম—"ঠাকুর এ কর্ম্ম তোমার!" সে নিরুত্তর রহিল। বলা বাহুল্য পরে মোকদ্দমার দিন স্বামী স্ত্রী আর কেহই উপস্থিত হইল না। শুনিলাম, হতভাগিনী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

কথায় কথায় আর একটী শোচনীয় কাহিনী স্মরণ হইল। এক দিন ডাকে রমণীর হস্তাক্ষরে লিখিত একখানি পত্র পাইলাম। তাহার মর্ম্ম—তিনি রাণাঘাটের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর কন্যা। তিনি আমার কাব্যাবলী পাঠ করিয়া আমাকে দেখিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়াছিলেন। আমি রাণাঘাটে আসিয়া এক দিন তাহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেই দিন হইতে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিনী একটি স্ত্রীলোকের ঠিকানায় পত্র লিখিলে তিনি উত্তর পাইবেন। তিনি এক মাস আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিবেন। যদি কোন সানুকুল উত্তর না পান, তবে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা থাকে তিনি তাহাই করিবেন। পত্রখানি বঙ্কিমি বাঙ্গালায় লিখিত, এবং চারি পৃষ্ঠা রমণীর প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত। তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন—"আপনার অভাগিনী কুন্দ"। বঙ্কিমবাবু শেষ জীবনে একদিন যথার্থই বলিয়াছিলেন —"নবীন! উপন্যাস লিখিয়া আমি দেশের হিত কি অহিত করিয়াছি ভাবিতেছি।" পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলাম। আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি উহার অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া নিকটস্থ গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটির অন্বেষণ করাইয়া

জানিলেন যে এই নামের একটি স্ত্রীলোক আছে, কিন্তু সে এ বিষয় কিছুই জানে না বলিয়াছে। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে শান্তিপুরের কোনও তেঁতর আমার জন্য এই ফাঁদ পাতিয়াছে। কিন্তু পত্রে এরূপ একটা প্রকৃত রমণী হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ছিল যে আমার তাহা বড় বিশ্বাস হইল না। তাহার ঠিক এক মাস পরে তিনি একদিন প্রভাতে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে পত্রখানি প্রকৃত। পূর্ব্ব রাত্রিতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর একটি বিধবা কন্যা পলায়ন করিয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোকটি সে বাড়ীর চাকরাণী ছিল। তিনি তখন এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য সেই স্ত্রীলোকটির কাছে আবার লোক পাঠাইলেন। সে তাহাকে বলিল—"তুমি কেন বারম্বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমাকে কি কেহ পাঠাইয়াছে?" তখন লোকটি আমার নাম করিলে সে বলিল—"কেন প্রথমবার এ কথা বল নাই? সে পত্র সত্য। সে উত্তরের জন্য এক মাস অপেক্ষা করিয়া কাল রাত্রিতে একটি প্রতিবাসীর সঙ্গে কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছে। আমি এখন তাহার আর কোনও খবর রাখি না।" শান্তিপুরে এরূপ ঘটনা প্রায় মধ্যে মধ্যে হইত। আমি স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীকে লইয়া সন্ধ্যার পর বসিয়া গল্প করিতেছি, একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিতেছে—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার স্ত্রীকে অমুক বাহির করিয়া লইয়াছে।" একবার স্বামীর কাতরতা সহ্য করিতে না পারিয়া ভদ্রলোকেরা সেই স্ত্রীলোকটিকে ডাকাইতে অনুরোধ করিলেন। সে নিকটস্থ এক বাড়ীতে আছে বলিয়া তাহার স্বামী বলিল। তখন রাত্রি অনুমান ৯টা। আমি একজন কনেষ্টবল স্বামীর সঙ্গে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঝন ঝন ঝনাৎ মলের শব্দে নীরব ভাগিরথী সৈকত মুখরিত করিয়া এক যুবতী রমণী আসিয়া আমাদের সমক্ষে একটি বীরা রমণীর মত দাঁড়াইল এবং গ্রীবা উচ্চ করিয়া আমাকে

জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন?" আমি বলিলাম—"তোমার স্বামী নালিস করিয়াছে তাই ডাকাইয়াছি।" উত্তর—"কোথাকার পোড়ার মুখ আমার স্বামী।" আর স্বামী মজকুর—সেও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দোসর—উপর্য্যুপরি বলিতে লাগিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার স্ত্রী!" সকলে এই দাম্পত্য প্রেমের অভিনয়ে হাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে অনেক যোগশাস্ত্র বুঝাইলাম। কিন্তু "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" সে একবার তাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার পর্য্যন্ত করিল না। সে কাছে গেলে সে ভুজঙ্গিনীর মত ফণা ধরিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। শেষে লাচার হইয়া আমরা স্বামীকে নালিস করিতে বলিলাম, এবং রমণীকে যাইতে বলিলাম। সে তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে চাহিয়া বলিল—"কোথায় যাইব। এ পোড়ারমুখো পথে আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিবে। তোমার কনেষ্টবল আমাকে যেখান হইতে আনিয়াছে সেখানে রাখিয়া আসিতে বল।" এ যেন প্রমিলার সখী 'বামী'। আমিও রামচন্দ্রের মত সভয়ে তাহার আদেশ পালন করিলাম। পর দিন স্বামী আসিয়া বলিল যে নালিস আর কি করিবে, সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

আর একটি অদ্ভুত মোকদ্দমা রাণাঘাটে পাইয়াছিলাম। এক দিন সন্ধ্যার পর শান্তিপুরের সবইনস্‌পেক্টার আসিয়া বলিল যে আমার রাণাঘাটে যাইবার বহু পূর্ব্বে এক জুয়াচোর দীর্ঘ নামধারী 'পরমহংস' সাজিয়া আসিয়া রূপাকে সোণা বানাইতে পারে, এবং দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরোগ্য করিতে পারে বলিয়া শান্তিপুরের মত স্থানের বহু লোককেও ঠকাইয়া পলায়ন করে। প্রবঞ্চিতদের মধ্যে একজন পরমহংসের ভৃত্যকে সে দিন শান্তিপুরের ষ্টীমারে দেখিয়া থানায় সংবাদ দেওয়াতে

সবইন্‌স্পেক্টর তাহাকে ধৃত করিয়া আমার আদেশের জন্য আসিয়াছে, কারণ প্রবঞ্চণের মোকদ্দমা পুলিসের গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। আমি তৎক্ষণাৎ তদন্তের আদেশ দিয়া উক্ত ভৃত্যটির নামে ওয়ারেণ্ট দিলাম। পুলিস তাহাকে চালান দিল। 'পরমহংসটি' কে, সে কিছুতেই বলিল না। তাহার একমাত্র জবাব সে এই ঘটনার কিছুই জানে না। 'না হক' লোকেরা তাহার প্রতিকূলে সাক্ষী দিতেছে। লোকটি হিন্দুস্থানী। বিচারের দিন এক পাল বেশ্যা এক বেরিষ্টার লইয়া কলিকাতা হইতে উপস্থিত। আমি তখন বুঝিলাম একটা জুয়াচোরের আড্ডায় আমার হাত পড়িয়াছে। সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশিত হইল যে "পরমহংসটি" একটি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক। সে রোগ ভাল করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ্যভাবে বহু মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ছড়াইয়াছিল, এবং অপ্রকাশ্যভাবে দু এক জনের রূপা সোণা করিয়া দিয়াছিল। সে পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃতে শাস্ত্রালাপ, এবং মৌলবিদের সঙ্গে আরবি ভাষায় আলাপ করিত, ও কোরাণ আবৃত্তি করিত। এক দিন বহুলোকে বেষ্টিত হইয়া 'পরমহংস' ঠাকুর বক মধ্যে বা বোকা মধ্যে হংসবৎ বিরাজ করিতেছেন। এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড বজরা আসিয়া লাগিল। একটি রমণী বহুমূল্য আভরণে সজ্জিতা ও বহু দাস দাসী বেষ্টিতা হইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"বাবা! আপনি আমাকে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া ও আমার স্বামীকে লক্ষপতি করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন পর্য্যন্ত আমি আপনার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি। কি সৌভাগ্য এত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনি সম্প্রতি শান্তিপুরে আসিয়াছেন লোকমুখে শুনিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও সেবা করিতে আসিয়াছি।" সে বিনাইয়া নানা ছাঁদে তাঁহার কত গুণ কীর্ত্তন করিল।

বাবাজি দর্শকগণের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন যে রমণী চন্দননগরের একজন ভাগ্যবান্ স্বর্ণবণিকের পত্নী। সে একজন রাজরাণী হইয়াও তাঁহার জন্য এত দূর আসিয়াছে বলিয়া তাহার ভক্তির প্রশংসা করিলেন, এবং পরে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। এ কথা শান্তিপুরে দাবানলবৎ প্রচার হইল, এবং ইহার পর পতঙ্গের মত শান্তিপুরবাসী লক্ষপতি হইবার জন্য বাবাজির জালে পড়িতে লাগিল। যাহা হউক ভৃত্যটিও বহুলোক হইতে কাপড় ইত্যাদি লইয়া মূল্য না দিয়া পরমহংসের সঙ্গে গা ঢাকা দিয়াছিল। দুই অভিযোগে আমি তাহাকে চারিটি বৎসর শ্রীঘর বাসের আদেশ দিলে সে স্তম্ভিত হইল। সে মনে করিয়াছিল যে যখন বেরিষ্টার আনিয়াছে সে নিশ্চয় খালাস পাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ এজলাস হইতে উঠিয়া ট্রেজারি কক্ষে গিয়া কোর্ট-সবইন্স্পেক্টারকে বলিলাম যে এই ব্যক্তি হইতে কথা বাহির করিবার এই সময়। তিনি আমার তালিম মতে তাহাকে সেই স্তম্ভিত অবস্থায় বলিলেন—"আরে পাগল, তুই কেবল পরের জন্য মারা গেলি! তুই কিরূপে ধরা পড়লি তাহা জানিস্? তুই ত সেই জুয়াচোর পরমহংসকে বাঁচাইলি, কিন্তু তোর উপপত্নীকে হাত করিবার জন্য সেই পরমহংসই হাকিমের কাছে ফয়বল্লা চিঠি দিয়া তোকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিয়াছে।" বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িল। সে বলিল—"কি! সে বদমায়েস এরূপে আমাকে ধরাইয়া দিয়াছে। আচ্ছা আমি এখন সকল কথা খুলিয়া বলিব।" আমি তাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার গৃহে গেলাম, এবং দিস্তা খানিক কাগজ তিন ঘণ্টা কাল তাহার একরার লিখিলাম। সে এক অদ্ভুত উপন্যাস। সেই পরমহংসের আসল নাম কেদারনাথ বিশ্বাস। হাওড়ার এলাকায় সালখিয়ার এক জঙ্গলে সে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বাস করে। তাহার সহচরগণ কলিকাতার রাজাবাগানে

তাহাদের উপপত্নী লইয়া থাকে। তাহারা কয়েক বৎসর যাবৎ ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হাওড়া, হুগলি, বৰ্দ্ধমান, রাজসাহী, পাবনা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় বহু স্থানে এরূপ পরমহংসগিরি করিয়া বেড়াইয়াছে। সে প্রবঞ্চিতদের নাম, ধাম এবং প্রবঞ্চনার বিষয় ও কাহিনী সবিস্তার বলিল। আমি এই কাহিনী হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে পাঠাইলাম, এবং শান্তিপুরের সেই সব-ইন্‌স্পেক্টারকে এক ওয়ারেণ্ট ও পত্রসহ হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠাইলাম। লোকটি বড়ই চতুর। সে সাল্‌খিয়া থানায় গিয়া এই সকল ঘটনা আমার উপদেশ মতে গোপন করিয়া সেখানের পুলিসের সঙ্গে প্রভাতে গল্পে গল্পে কেদারনাথের কথা তুলিলে,—দারগা সাহেব চমকিত হইলেন এবং বলিলেন—"কেন মহাশয়! কেদারনাথ একজন সম্ভ্রান্ত লোক। সে কলিকাতায় এক হাউসের মুচ্ছুদ্দি। কলিকাতা তাহার ভাল লাগে না বলিয়া সে সাল্‌খিয়া আসিয়া বাড়ী করিয়াছে এবং এখানে ইটের কারবার করে।" সব ইন্‌স্পেক্টার বলিল যে কোনও গুরুতর মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য লওয়ার বড় প্রয়োজন। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে এ লোকটি সেই কেদারনাথ কি না তাহা জানা আবশ্যক। অতএব সাল্‌খিয়ার দারগা যদি একবার তাহাকে দেখাইতে পারেন বড় ভাল হয়। তিনি বলিলেন—"তার আর ভাবনা কি? এখনি চলুন দেখাইতেছি।" তিনি তাম্রকুট যন্ত্রটির সেবা করিতে করিতে কেদার নাথের বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন—"ভায়া হে! বাড়ী আছ? কই, আমাকে যে ইট দিবে বলিয়াছিলে। কোন 'আবা' হইতে দিবে? একবার এদিকে আইস।" কেদার নাথও আর এক যন্ত্র সেবন করিতে করিতে যেই বাহির হইলেন, অমনি শান্তিপুরের যে লোকটি তাহাকে সেনাক্ত করিতে গিয়াছিল সে শান্তিপুরের দারগার কাণে কাণে বলিল যে এ সেই

পরমহংস। দারগা আর কথাটি না কহিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাহার পকেট হইতে 'হাত খড়ি' বাহির করিয়া কেদার নাথের হস্ত এই আভরণে সজ্জিত করিয়া চাবি দিল। কেদার নাথ ও তাহার বন্ধু সালখিয়ার দারগা—বলা বাহুল্য ব্যবসায়ে উভয়ের বখরা আছে—বজ্রাহত হইয়া কষায়িত লোচনে শান্তিপুরের দারগার দিকে চাহিলেন। কেদার নাথ বলিল—"তুমি কে?" উত্তর—"আমি তোমার বাবা! আমি শান্তিপুরের পুলিস সবইন্‌স্পেকটার।" প্রশ্ন—"তুমি কেন আমার এ অপমান করিলে?" উত্তর—"কেন বাবা এমন অলঙ্কারটি পরাইয়া দিলাম, তাহাতেও রাগ। শান্তিপুরে যে খেলা খেলিয়াছিলে তাহা কি ভুলিয়াছ?" সে বলিল—"আমি শান্তিপুর কখনও যাই নাই।" উত্তর—"সে কথা যাহ্! পরে বুঝা যাইবে। এখন শুভ যাত্রা কর।" প্রশ্ন—"আমাকে গ্রেপ্তার করিবার তোমার কি অধিকার?" উত্তর—"তুমি তবে নিমন্ত্রণ পত্রটি নিতান্ত না দেখিয়া ছাড়িবে না। তবে দেখ।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দেখাইল। সবইন্‌স্পেক্টার তাহাকে কনেষ্টবলের হাতে দিয়া তাহার গৃহান্বেষণে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া একটি স্ত্রীলোক একটা বোচ্‌কা গবাক্ষ পথে জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। সবইন্‌স্পেক্টার উহা খুলিলে উহাতে পরমহংসের দাড়ি, গোঁপ, পরিচ্ছদ, এবং এক রাশি বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল।

পরমহংস রাণাঘাটে উপস্থিত হইলেন। যেই আমার বারাণ্ডায় পদার্পন করিলেন, আমার হিন্দুস্থানী 'দাই' (চাকরাণী) বলিয়া উঠিল—"আরে! ইয়ে ত কৈলাসপুরী।" কৈলাসপুরী নামে এক জুয়াচোর সন্ন্যাসী চট্টগ্রামে গিয়া আমার দুই জন আত্মীয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। দাই তাহাকে দেখিয়াছিল। আমি তখন বুঝিলাম যে পরমহংসের

কর্ম্মক্ষেত্র চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি কি সত্যই কৈলাসপুরী?" সে কি ভাবিল। আমার আত্মীয় একজন এখনও তাহার ভক্ত। বোধ হয় মনে করিল সে পরিচয় দিলে আমার আত্মীয়ের খাতিরে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। আবার কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"না, আমি কৈলাসপুরী নহি।" তার পর সে সংস্কৃত আরবি বলা সকলই অস্বীকার করিল। বিচারের দিন আবার যুগল ব্যবসাজীবী বেশ্যা ও বেরিষ্টার উপস্থিত হইল। বেশ্যাদের মধ্যে যে নায়িকা, সাক্ষীরা বলিল সেই স্থবর্ণবণিক পত্নী সাজিয়া বজরা ভাসাইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিল, এবং দারগা বলিল সেই রমণীই বাবাজির সাজ সজ্জার বোচ্‌কা জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়াছিল। সে তাহার উপপত্নী। তাহার হাতের লেখা কতকগুলি প্রণয়লিপিও বোচ্‌কার মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। আমি আরও রহস্য উদ্ধার করিবার জন্য রমণীর কাছে ইহার সাহায্যকারী অপরাধিনী বলিয়া জামিন তলব করিলাম, এবং তাহা দিতে না পারাতে তাহাকে হাজতের হুকুম দিয়া পরমহংসকে আমার আফিস কক্ষে লইয়া আমার কবিত্ব ঢালিয়া বুঝাইলাম যে পত্রগুলি পড়িয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে রমণীটি তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। তাহার এত প্রেমের প্রতিদানে কি জেল? এরূপ অবস্থায় একটি পশুও তাহার প্রণয়ভাগিনীর জন্য প্রাণ দিতে চাহে। সে কি পশুরও অধম? আমার ভাষার উচ্ছাসে সে কাঁদিতে লাগিল। তাহার ভৃত্যদলের অন্যান্য লোকের নাম জানে না বলিয়া গোপন করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি দেখিতেছ শান্তিরামের কাছে মনসা আটকায় না। সে তোমাকে সাল্কিয়ার বনের গুপ্ত নিবাস হইতে শিকার করিয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আর সাক্ষীদের নাম গোপন করিয়া ফল নাই। তুমি

যদি তাহাদিগের নাম ধাম বল, ও তাহাদের ধরাইয়া দেও, তবে তোমার প্রণয়িণীকে আমি বাঁচাইতে চেষ্টা করিব, এবং তোমারও দণ্ডের বিষয় বিবেচনা করিব।" আবার রমণীর প্রেমের কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলাম। সে আবার খুব কাঁদিল। অনেক ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি তবে সকল খুলিয়া বলিব।" আমি কলম লইয়া তাহার স্বীকারোক্তি লিখিতে বসিলাম। সে চুপ করিয়া রহিল। আবার কিছুক্ষণ অধোমুখে ভাবিল। পরে বলিল—"আজ নহে। আমি সকল কথা স্মরণ করিয়া কাল বলিব।" আমি বুঝিলাম সে সময় পাইলে, তাহার প্রেমের উচ্ছ্বাস নিবিয়া গেলে, শক্ত হইয়া বসিবে। আর কিছুই বলিবে না। ফলে তাহাই হইল। পর দিন কিছুই বলিল না। তাহার সাফাই এক পাল বেশ্যার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম। তাহারা তাহার চরিত্রের সার্টিফিকেট দিল। আমি তাহাকেও চারি বৎসরের জন্য তাহার ভৃত্যের সহবাসে প্রেরণ করিলাম। সে নদীয়া জেলে গেলে, এ অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিয়া জজ মাজিষ্ট্রেটেরা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাহার পরমহংস লীলা এরূপে শেষ হইল। এ চার বৎসর কৈলাসপুরীও চট্টগ্রাম হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি সে আবার দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য অন্যান্য জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা কিছুই করিলেন না। তাঁহাদের জেলার প্রবঞ্চনাজাল বাহির হইলে একজন বাঙ্গালী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা এরূপ মহাপাতক করিবেন কেন?

মিউনিসিপেলিটি।

(১) শান্তিপুর।

এক রাণাঘাট সবডিভিসনে চারিটি মিউনিসিপেলিটি—রাণাঘাট, শান্তিপুর, উলা ও চাকদহ। রাণাঘাটের মিউনিসিপেলিটির চেয়ারমেন স্থরেন্দ্র বাবু। অপর তিনটির অধিকারী সবডিভিসনাল অফিসার। আমার চেয়ারমেনি গেজেট হইবার পূর্ব্বেই মিঃ বারনার্ড আমাকে লিখিলেন যে শান্তিপুর মিউনিসিপেলিটির অবস্থা বড় শোচনীয়। অতএব তৎক্ষণাৎ শান্তিপুর যাইয়া উহার সম্যক অবস্থা অবগত হইয়া রিপোর্ট করিতে আমাকে আদেশ করিলেন। আমিও চৈতন্যদেবের লীলাভূমি শান্তিপুর দেখিতে বড় লালায়িত। রাণাঘাটের ভার-গ্রহণ করিয়াই আমি শান্তিপুর দেখিতে গেলাম। পুণ্যতোয়া ভাগিরথী-তীরস্থিত শান্তিপুর বড় সুন্দর স্থান। বহু ভদ্রলোকের বাস, ইহার জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। পূর্ব্বে শান্তিপুর সবডিভিসনের রাজধানী ছিল। এখনও পূর্ব্বতন সবডিভিসন গৃহের গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান। তাহাতে এখন পুলিস ষ্টেসন বিরাজ করিতেছে। এই গৃহের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া ভাগিরথী প্রবাহিতা। অতএব এই গৃহের শোভার কথা কি বলিব? কি স্থান-মাহাত্ম্যে, কি আহারাদির স্থবিধায় রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ। রসজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ কারণে, বিশেষতঃ শান্তিপুরবাসিনীদের রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রাজধানী কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া অনেক সময় শান্তিপুরে কাটাইতেন। তাঁহার ও শান্তিপুর রসিকাদের মধ্যে যে সকল রসিকতার বিনিময় হইত, তাহার অনেক গল্প এখনও প্রবাদের

মত প্রচলিত। শান্তিপুর হইতে এখন গঙ্গা সরিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুরবাসিনীর রসিকতা ও ইংরাজ সভ্যতার গুণে সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নদী সরিয়া এখনও উভয়ের খাল বর্ত্তমান। কেবল রাণাঘাট রেলওয়ে ষ্টেসন বলিয়া সৌন্দর্য্য-জ্ঞানহীন কোনও অরসিক রাজধানীটি শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটে তুলিয়া লইয়াছিলেন। শান্তিপুরের এখন কিছুই নাই। যে "মতির জুড়ি" বঙ্গদেশে ছিল না, সেই মতি রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষে শান্তিপুরের স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই "শান্তিপুরী ডুরে সাড়ী সরমের অরি" এখন বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। শান্তিপুরের তন্তু সকল মেঞ্চেষ্টারের কলের আগুণে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। বিখ্যাত তন্তুবায় সকল লুপ্ত, ও তাহাদের বংশধরগণ অন্নাভাবে চাষ বা চাকরি অবলম্বন করিয়াছে। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন তন্তুবায় মাত্র এখন অনশনে কোনও মতে পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় রক্ষা করিয়াছে। আর সেই "শান্তিপুর ডুব ডুব, নদে ভেসে যায়"—সেই প্রেমের বন্যা, যাহাতে প্রাণ জুড়াইতে আমি রাণাঘাট বদলিতে আনন্দিত হইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিলাম, সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সেই সীতানাথ অদ্বৈতের সন্তানেরা আজ কেহ মিউনিসিপেল কমিশনার, কেহ অনারারি মেজিষ্ট্রেট, কেহ বা শান্তিপুরের খ্যাতনামা বদমায়েস! দাদা শিশির বাবুর অনুরোধে এক দিন তাঁহার গুরুদেব প্রভুপাদ রাধিকা প্রসন্ন গোস্বামীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ইনি কদাচিৎ শান্তিপুরে থাকেন, এবং তখনও কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আসন হইতে ঘোরতর বিপন্নবৎ উঠিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে—"আমাকে প্রণাম! আমাকে প্রণাম!"—বলিয়া গৃহের এক কোণায় গিয়া মুখ লুকাইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার পদধূলি

দিবেন না। তাঁহার ইচ্ছা যেন তিনি মাটির ভিতর প্রবেশ করেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বোধ হইল যেন সত্যসত্যই চৈতন্যদেবের পার্ষদ কাহাকেও দেখিতেছি। তাঁহার গৌর-বর্ণ, স্থূল নধর ভক্তিপূর্ণ দেহ, গোলাকার বদন মণ্ডলে প্রেমে ছল ছল আয়ত লোচন। তিনি যেন একটি আট বছরের শিশু, আর সত্যসত্যই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও অভিমানহীন। আমি বলিলাম—"প্রভু! দাদা শিশির বাবুর আদেশ মতে আমি আপনার দর্শন লাভ করিবার জন্য এত দিন লালায়িত ছিলাম। কিন্তু শান্তিপুরে আপনি থাকেন না বলিয়া আমি সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। আজ এখানে আছেন শুনিয়া আমি বড় সাধ করিয়া আসিয়াছি। আপনি কি দয়া করিয়া আমার সঙ্গে দুটি কথাও বলিবেন না?" "আমি আপনার মত লোকের সঙ্গে কি কথা বলিব?"—বলিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর কোনও কথাই কহিলেন না। আমি তখন নিরাশ হইয়া অদ্বৈত গোস্বামীর স্থাপিত বিগ্রহ দেখিতে গেলাম। যিনি সঙ্গে গিয়াছিলেন তিনি মিউনিসিপেল গোস্বামী। এ দিকের কোনও খবর রাখেন না। পশ্চাৎ হইতে কে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে এই বিগ্রহই শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর স্থাপিত। ফিরিয়া দেখিলাম প্রভু রাধিকা প্রসন্ন। তখন তিনি নিতান্ত সলজ্জভাবে বিগ্রহের সমস্ত ইতিহাস আমাকে বলিলেন। আমার শান্তিপুর দর্শন সফল হইল। আমি এক জন প্রকৃত গোস্বামী দেখিলাম। পরে ইঁহার সারল্য সম্বন্ধে এক গল্প শুনিলাম। তিনি কাহাকে চাপল্য বশতঃ কি বড় বিরক্ত হইয়া এক চড় মারিয়াছলেন। সে তাঁহার নামে নালিশ করিয়াছে। মোকদ্দমা বিচারার্থে শান্তিপুরের বেঞ্চে প্রেরিত হইয়াছে। প্রভু রাধিকা প্রসন্ন বেঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বালকের মত বলিলেন—"দোহাই আপনাদের। আমি বড়

অন্যায় করিয়াছি। আর কখনও এমন পাপ করিব না। মারিতে হয়, আমার স্ত্রীকে মারিব, অন্য কাহাকেও মারিব না।” বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটেরা হাসিয়া উঠিলেন, এবং বাদীকে ভর্ৎসনা করিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে বাধ্য করিলেন।

যে শান্তিপুরে প্রেমের বন্যা বহিত, এখন সেখানে দলাদলির বন্যা। আর বন্যা বেয়াদপির। মতি রায় শান্তিপুর এরূপ কঠোর ভাবে শাসন করিয়াছিলেন কেন, তাহা শান্তিপুরে পা দিয়াই বুঝা যায়। সেখানে এখন সকলেই প্রধান, কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। সব তিতু মিরের “গুলি খা ডালার” দল। আমি সবডিভিসনের একাধীশ্বর। আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছি। এক জন বালক ইচ্ছা করিয়া আমার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। তাহার বিশ্বাস যে সে কি একটা গৌরবের কার্য্য করিল। পশ্চাতে পেয়াদা ছিল। সে গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া তাহার গ্রীবা ধরিয়া লইয়া আসিল। আমি পদাতিককে বারণ করিতেছিলাম। ভর্ৎসনা করিয়া বালকের গ্রীবা মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার নাম ধাম সকলই জিজ্ঞাসা করিলাম। সে একটি তাঁতির ছেলে। আমি তাহাকে বলিলাম—“বা! দিব্যি ছেলে। আমার গা ঘেঁসিয়া যাওয়া তোমার বড় সাধ? আচ্ছা, তুমি আইস। তোমার যত বার ইচ্ছা গা ঘেঁসিয়া যাও।” পথে বহু লোক জড় হইল। সকলে হাসিতে লাগিল। আমি বালকের গায় হাত বুলাইয়া বেশ আদর করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। এই গল্প বিদ্যুৎ বেগে শান্তিপুরময় প্রচারিত হইল। আর আমাকে স্বাধীন-চেতা গা-ঘেঁসারা আপ্যায়িত করে নাই। বরং ইহার পর হইতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই নমস্কার করিত। এই স্বাধীনচেতাদের আদর্শ ও দলপতি একজন হাই কোর্টের উকিল। কমিশনারদের মধ্যে তাঁহার এক দল আছে। তাঁহারা শান্তিপুরে His Majesty's Opposition (রাজ-

কর্ম্মচারীদের প্রতিপক্ষ)। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে কেবল বাবু রামচরণ বসু শান্তিপুরে পুণ্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা সরিয়া যাওয়াতে শান্তিপুরে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সেজন্য 'চোরপুকুর' নামক এক পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহার তীরে সুন্দর এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মিউনিসিপেল আফিস এবং চারি দিকে মনোহর উদ্যান স্থাপিত করিয়াছেন। স্থানটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। যদিও এরূপ একটি সুন্দর অট্টালিকা মিউনিসিপেল আফিসের জন্য আবশ্যক ছিল না, পুষ্করিণীটি বড় একটি পুণ্য কার্য্য হইয়াছিল। এখন প্রতিবাসীরা বহু দূর পর্য্যন্ত তাহারই নির্ম্মল জল পান করেন। এমন পুণ্য ব্রতেও এরূপ ঘোরতর দলাদলির বিদ্বেষ উঠিয়াছিল, যে একবার স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরকে পর্য্যন্ত শান্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল। উকিল মহাশয়ের দল পরাজিত হইয়া রাম চরণ বাবু আলিপুর বদলি হইয়া গেলে, এক পাটি জুতা 'বাঁকী' করিয়া তাঁহার কাছে, ও অন্য পাটি তাঁহার ভাইস চেয়ারমেনের কাছে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এজন্য শান্তিপুরের নাম miscalled city of peace, বা অশান্তিপুর।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তীর সময় পর্য্যন্ত ও দলাদলি পূর্ণ বেগে চলিতেছিল। তাহার ফলে টেক্স দারগা ৪,০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়া আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীঘর বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং শান্তিপুরে দলাদলির আগুণ দাবানলবৎ জ্বলিতেছিল। কারণ মিউনিসিপেল কমিশনারদের মধ্যেও কেহ কেহ এই অপহৃত অর্থের অংশী ছিলেন। মিউনিসিপেলিটি দেউলিয়া হইয়াছে। ভাণ্ডার শূন্য, কার্য্যবন্ধ, কর্ম্মচারীদের মধ্যে বেতনাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। তাহার উপর উকিল মহাশয়ের সাধ হইয়াছে যে তিনি চেয়ারমেন হইয়া স্বায়ত্ত শাসনের চরম 'দীল্লিকা লাড্ড' শান্তিপুরকে ভোজন করাইবেন। আমি

সমস্ত অবস্থা খুলিয়া মেজিষ্ট্রেটকে লিখিলাম 'যা শত্রু পরে পরে'। এরূপ একটা উৎপাত আমাদের ঘাড়ের উপর না রাখিয়া উকিল মহাশয়কে একবার 'চেয়ারমেন' করিয়া দেওয়া ভাল। এ দিল্লীকা লাড্ডু তিনি নিজের উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে যে "পস্তানি পস্তাইবেন" তাহাতে এই দলাদলি নিবৃত্তি হইবে। তখন সকলে সাধিয়া আবার সবডিভিসনাল অফিসারকে চেয়ারমেন করিবে, এবং কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে চলিবে। তিনি লিখিলেন—"আমি জানি যে শান্তিপুর আপনার রাণাঘাট-শাসনের ঘোরতর অপ্রীতিকর অংশ। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি আপনাকে উহা হইতে অব্যাহতি দিতে পারি না। অতএব কি প্রণালীতে উহা পরিচালিত করিলে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মিউনিসিপেলিটি উদ্ধার লাভ করিবে আপনি তাহা স্থির করিয়া রিপোর্ট করিবেন।" আমি তখন একটি কার্য্য-প্রণালী বহু চিন্তার পর উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার কাছে দীর্ঘ রিপোর্ট করিলাম। তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া লিখিলেন যে এই প্রণালী আমি যদি শান্তিপুরের কমিশনারদের দ্বারা গ্রহণ করাইতে পারি, তবে তাঁহার বিশ্বাস যে শান্তিপুরের এত কাল পরে একটা সুদিন (red-letter day) আসিবে। তাঁহার এরূপ লিখিবার কারণ এই যে আমার প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী একটি তূণ বিশেষ। ইহাতে মিউনিসিপেলিটির সংস্কারের জন্য শাণিত শরজাল ছিল। তাই শান্তিপুরের মত স্থানের কমিশনারগণ এ সকল শর নীরবে পিঠ পাতিয়া লইবেন কি না তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল। যাহা হউক এই তূণ পৃষ্ঠে বাঁধিয়া আমি প্রথম সভায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথম একটি 'গৌরচন্দ্রিকা' পাতিলাম। বলিলাম আমি হিন্দু, কাযেই পৌত্তলিক। শ্রীভগবান্ 'অবাঙমনস-গোচর'। তাই হিন্দুরা তাঁহার শক্তির রূপ কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ

করে, এবং তাঁহার পূজা করে। শান্তিপুরের জনসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার। আমি মিউনিসিপেলিটিকে তাহাদের একটি প্রতিমা মনে করিব, এবং তাহার পূজা করিব। যাহাতে তাহাদের হিত হয় আমি তাহাই প্রস্তাব করিব। কমিশনারেরা গ্রহণ করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। না করেন, তাহা নিতান্ত গুরুতর না হইলে, সেখানেই শেষ হইবে। এই গৌরচন্দ্রিকা গাইয়া আমি সেই সংস্কার-প্রণালী (Reorganization scheme) পাঠ করিলাম। উহা তাঁহাদের মস্তকে যেন একটি বিরাট বোমের মত পতিত হইল। তাঁহারা প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে শান্তিপুরের মত স্থানে আমি প্রথম অধিবেশনে এরূপ একটা বিপ্লব উপস্থিত করিব। সকলে বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর সামলাইয়া, জনে জনে বলিলেন যে আমি একজন বিখ্যাত কবি ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া তাঁহারা আমাকে বড় ভক্তি করেন। আমার শাসনকার্য্যের মুখপাত যাহা দেখিয়াছেন, তাহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে আমি এখনও শান্তিপুর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অতএব তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ আমি কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যেন মিউনিসিপেলিটির সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। ২০ জন কুলি আছে। ইহাদের বেতন বৎসরে ২,৫০০ টাকা। ইহাদের কার্য্যের মধ্যে তাহারা কমিশনারদের বাড়ীতে চাকরের মত কার্য্য করে। আমি তাহাদের একেবারে উড়াইয়া দিয়াছি—কি সর্ব্বনাশের কথা! তাঁহারা একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে এখনই মিউনিসিপেলিটির রাস্তাঘাটের এ দুরবস্থা। ইহাদের উঠাইয়া দিলে শান্তিপুরে লোকের বাস করা অসাধ্য হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা কি কায করে? উত্তর—কাঁচা রাস্তা মেরামত করে। প্রশ্ন—গত বৎসর কাঁচা রাস্তা

মেরামতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ? উত্তর—দুই কি আড়াই হাজার টাকা হইবে। আমি তখন পূর্ব্ব বৎসরের বজেট দেখাইয়া বলিলাম যে মোটে বজেটে কাঁচা রাস্তা মেরামতের ৩০০ টাকা মাত্র ছিল। দুই আড়াই হাজার টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইল! তাঁহাদের মধ্যে একটা ঘোরতর আন্দোলন উঠিল। ঠিক যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়িয়াছে। তাঁহারা ব্যয়ের হিসাব তলব করিলেন। তাহাতে দেখা গেল ৩০০ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। তখন তাঁহারা কিছু অপ্রতিভ হইয়া স্বর বদলাইলেন। বলিলেন তাহা হউক। ইহাদের বরখাস্ত করিলে এই কাযই বা কিরূপে চলিবে। শান্তিপুরে সকল সময়ে লোক পাওয়া যায় না। আমি উহার অবস্থা জানি না। তাহাতেই এরূপ অন্যায় প্রস্তাব করিতেছি। আমি বলিলাম যে জবাব দিহি আমার। আমি যেরূপে পারি এই ৩০০ টাকায় কাজ চালাইব। আমার প্রতি তাঁহাদের অসন্তোষের তাপমান যন্ত্র ১০০ ডিগ্রি উঠিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিল-সরকারদের নির্দ্দিষ্ট বেতন উঠাইয়া দিয়া আমি তাহাদের কমিশনের ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাতেও মিউনিসিপেলিটির বৎসর প্রায় ১,৫০০ টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। ঐটি আরও সর্ব্বনেশে কথা ? ইহারা কমিশনারদের কেহ বাড়ীর গোমস্তা, কেহ আত্মীয়। এবার তাঁহাদের মুখে ক্রোধে আর কথা সরিল না। তাপমান যন্ত্র ১০৫ ডিগ্রি উঠিল। তাঁহারা বলিলেন কমিশনে সরকার শান্তিপুরে পাওয়া যাইবে না। আমি বলিলাম তাহাও জবাব দিহি আমার। না পাই, অন্যস্থান হইতে আমদানি করিব। তাঁহারা ক্রোধের অট্ট হাসি হাসিয়া উঠিলেন। তৃতীয় প্রস্তাব,—পাকা রাস্তার কার্য্য ও অন্য কার্য্য কণ্ট্রাক্টার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। এখন পরোক্ষে উহা কোনও কোনও কমিশনারের দ্বারা, বা তাঁহাদের লোকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, এবং যেখানে তাহা না হয়, কার্য্যের শেষ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময়ে

দুপয়সা পাওয়া যায়। একজন খ্যাতনামা পেনসনপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ এনজিনিয়ারও কমিশনার ছিলেন। আমি প্রস্তাব করিয়াছি এরূপ কার্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধারণে হইবে। এই দলের মধ্যে তিনি লোকটি একটুক খাঁটি। আমার এ সংস্কার প্রণালী তিনিই যাহা একটুক তখন, এবং পরে অন্তরের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন। হরি! হরি! এই উপরি পাওনাটিও গেল! তাহা হইলে দর্জ্জিবংশীয়েরা কেন 'ভোট' ভিক্ষা করিয়া কমিশনার হইবে? চতুর্থ প্রস্তাব সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। এক জন হেড কেরানি আছেন তিনি "পলাশির যুদ্ধের" পূর্ব্বে পেনসন প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়াছেন। বহুকাল ৪০ টাকা বেতনে মিউনিসিপেল আফিসের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার বয়স এখন অশীতিরও উর্দ্ধে, এবং হস্ত-কম্পনের জন্য আপনার নামটি পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারেন না। তিনি শান্তিপুর-বাসী এবং তাঁহার সুকতলার জোর আছে। আর আমি কিনা প্রস্তাব করিয়াছি এ হেন শুকদেবের বা মুখদেবের আসনটি শূন্য করিয়া কেবল ১৫ টাকা বেতনের দ্বিতীয় কেরানিটির দ্বারা আফিস চালাইব। এবার তাঁহারা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অসম্ভব! অসম্ভব! এরূপ প্রস্তাব কেবল আমার অপরিণামদর্শিতার ফল। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কি কায করেন, তখন দেখা গেল যে কিছুক্ষণ টানাপাখা-সঞ্জাত চোরপুকুরের শীতল বাতাস ভক্ষণ করা ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন না। তাঁহাকে আমার সাক্ষাতে দুই লাইন লিখিতে বলিলে তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। আমি দেখাইলাম বরাবর দ্বিতীয় কেরানিই সমস্ত কায করিতেছে। আর না, যাহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িয়াছিল, তাহারা এবার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। তাপমান যন্ত্র ১২০ ডিগ্রিতে উঠিল। উত্তাপে

গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে এবার উকিল মহাশয় প্রমুখ প্রায় সকলে গালি দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে এরূপভাবে মিউনিসিপেলিটি চলিবে না। তাঁহাদের সুনামে কলঙ্ক হইবে। অতএব এ সকল প্রস্তাব তাঁহারা কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। আমি তাহার জন্য অপ্রস্তুত ছিলাম না। আমি তূণ হইতে আমার শেষ বাণ নিক্ষেপ করিলাম। যদিও মিউনিসিপেলিটির বাৎসরিক আয় ২০,০০০, টাকা, তাহার ফণ্ডে ট্রেজারিতে মাত্র ২০ টাকা জমা আছে। তাহার দেনা ১১,০০০ টাকা, এবং কর্ম্মচারীগণ ৬ মাসের বেতন পায় নাই। আমি আমার ঘর হইতে টাকা দিয়াত মিউনিসিপেলিটি চালাইতে পারি না। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলাম যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই বার চৌদ্দ হাজার টাকা তাঁহাদের ঘর হইতে না দেন, কিম্বা আমার প্রস্তাবাবলি গ্রহণ না করেন, আমি চেয়ারমেনি ত্যাগ করিয়া তখনই মাজিষ্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করিব। টেলিগ্রাম লিখিতে ফরম চাহিলাম। তাঁহাদের চোক কপালে উঠিল। তাঁহারা টেক্স দারগাকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—বলিলেন—“সে কি! ফণ্ডে কেবল কুড়ি টাকা! ১১,০০০ টাকা দেনা! ৬ মাসের বেতন বাকী!” সে বলিল সকলই ঠিক। তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি টেলিগ্রাম লিখিতে লাগিলাম। তখন তাঁহারা চুপে চুপে পরামর্শ করিয়া, কেহ কেহ করযোড় করিয়া বলিলেন—“তবে আপনি ৬ মাস এ প্রণালীতে কার্য্য চলে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।” আমি সম্মত হইলাম, এবং তদনুসারে মন্তব্য লিখিলাম, ও মাজিষ্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ Congratulate করিয়া টেলিগ্রাফ করিলেন। পালা শেষ হইল। কমিশনারগণ বিষণ্ণ মুখে গৃহে ফিরিলেন, এবং তাহার পর উকিল মহাশয় আমাকে

'ইণ্ডিয়ান মিরার' সংবাদ পত্রে খুব এক চোট গালি দিয়া গাত্র জ্বালা নিবারণ করিলেন। লিখিলেন—"বাঙ্গলার বিখ্যাত কবিটি রাণাঘাটে একেবারে আযোগ্য (total failure) হইয়াছে। সে এমনি হৃদয়হীন যে শান্তিপুর মিউনিসিপেলিটির চেয়ারমেন হইয়াই বহুলোকের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছে।" হায়! বাঙ্গালি! ইহাই তোমার স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বার্থ-সাধন!

কিছুদিন শান্তিপুর এ আন্দোলনে "ডুব ডুব" হইয়া স্থির হইল, এবং আমার সংস্কৃত প্রণালী কলের মত চলিতেছে দেখিয়া বিপক্ষেরাও তখন সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকেরা জয়জয়কার করিতে লাগিল। প্রায় ৫,০০০৲ টাকা বাৎসরিক ব্যয় কমাইয়া ফেলিয়াছিলাম, এবং আমার প্রচলিত নূতন প্রণালী অনুসারে মিউনিসিপেল টেক্সও কলে আদায় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেনা পরিশোধ হইল, এবং কর্ম্মচারীরা বেতন মাসে মাসে আমার আগে পাইতে লাগিল। এ দিকে রাস্তা ঘাটও দেখিতে দেখিতে রূপান্তর হইল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা রাণাঘাট হইতে আহার করিয়া মাসে একবার মাত্র শান্তিপুর যাইতেন, ও মিটিঙ্গের পর চলিয়া আসিতেন। আমি সেখানে প্রথম ভাগিরথীর সৈকতে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান-বাটিকায়,এবং পরে মিউনিসিপেল আফিসের এক কক্ষে আমার থাকিবার স্থান করিলাম। মাসে দুই তিন বার যাইতাম, এবং এক কি দুই দিন থাকিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া সমস্ত কার্য্যাবলি নিজের চক্ষে দেখিয়া আসিতাম। তাহা ছাড়া এরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যে সকাল বেলার ডাকে প্রত্যেক মিউনিসিপেলিটির ওভারসিয়ার ও টেক্স দারগা হইতে দুই রিপোর্ট আসিত। তাহাতে পূর্ব্বদিন কি কার্য্য কোথায় হইল, কত টেক্স উশুল হইল, আমি রাণাঘাটে বসিয়া জানিতে পারিতাম। এ সকল রিপোর্টের

পার্শ্বে আদেশ লিখিয়া আবার উহা ফেরত পাঠাইতাম। তাহা ছাড়া ডাকে ও লোকের দ্বারা নানারূপ আদেশ বর্ষণ করিতাম। শয়ন করিতে যাইতেছি, কি শয়ন করিয়াছি, কোনও বিশেষ কথা মনে পড়িল। তখনই আলো জ্বালিয়া ভাইস চেয়ারমেনের কাছে পত্র লিখিলাম। পদাতিক কি কনেষ্টবল একজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া পত্রের উত্তর আনিল। এজন্য শান্তিপুরের লোকেরা বলিত যে আমি ঘুমাইলেও শান্তিপুর স্বপ্নে দেখি। তাহা বড় অত্যুক্তি নহে।

প্রথম দিন মিটিঙ্গে গঙ্গার চরস্থ বাটী হইতে পাল্কিতে যাইতেছি। গঙ্গা যাইতে এই বাটীর পার্শ্ব দিয়া একটি মাত্র রাস্তা আছে, তাহাতেও বিষম কাদা। এই কাদা ভাঙ্গিয়া পুর-বাসিনীরা জল আনিতে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে চতুরা একজন অবগুণ্ঠন হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো! আমাদের এ কষ্ট দেখিয়া যাও।" উপরোক্ত মিটিঙ্গের শেষে আমি সেই কথা বলিলে রমনী তাঁহাদের যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন কমিশনারগণ তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং বলিলেন যে এখানেত বরং রাস্তা আছে, অন্যান্য স্থানের স্ত্রীলোকেরা শান্তিপুরের নীচে যে একটি খাল আছে তাহার হাঁটুজল হাঁটিয়া পার হইয়া স্নান পানাদির জল আনিয়া থাকে। আমি তৎক্ষণাৎ ওভারসিয়ারকে ভর্ৎসনা করিয়া আদেশ দিলাম। সেই দিন ও রাত্রির মধ্যে উক্ত রাস্তাতে বালি ঢালিয়া দেওয়া হইল, এবং খালের উপর স্থানে স্থানে বাঁশের পুল নির্ম্মিত হইল। পর দিন প্রাতে শান্তিপুরের সিমন্তিনীরা ও তাঁহাদের সিমন্তমণিরা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মিটিঙ্গের সেই দৃঢ়তায় ও এই কার্য্যের দ্রুততায় শান্তিপুরে আমার বেশ একটুক প্রতিপত্তি হইল, এবং উহা আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যে বড় সাহায্য করিল।

আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম যে আমি শান্তিপুরের কোনও দলে যোগ দিব না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিব। তাহা হইলে শান্তিপুরের চিরপ্রসিদ্ধ দলাদলি ভাঙ্গিবে। আমি উভয় দলের সহিত সমান ভাবে ব্যবহার করিতাম। মিটিঙ্গের কোনও প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাহার ভাল মন্দ বুঝাইয়া দিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। আমার নিজের মত কিছুই প্রকাশ করিতাম না। অধিকাংশের সিদ্ধান্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্রহণ করিতাম। মিটিঙ্গের পর আমি আমার আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র দুই দলের লোক একে একে আমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। উভয় পক্ষ বলিতেন—"আমরা আপনার পক্ষে। আপনি শান্তিপুরে যেরূপ ভাল কার্য্য করিতেছেন, এমন কেহ করেন নাই। আপনার যাহা নিজের মত আমরা বুঝিতে পারি না। আপনি যদি আগে একটুক আমাদিগকে জানান, তবে অন্য পক্ষের কি সাধ্য যে তাহা অগ্রাহ্য করায়। তাহাদের অপেক্ষা আমাদের ভোট বেশী।" আমি উভয় পক্ষকে বলিতাম—"আমি জানি আপনারা সকলেই যোগ্য লোক, এবং আমার পক্ষে আছেন। তবে শান্তিপুর আপনাদের বাসস্থান। আপনারা যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন, আমার তাহাতে মতামত কি? আমি বসন্তের কোকিল, দু দিন পরে উড়িয়া যাইব। আপনারাই আপনাদের কর্ম্মের ফলভোগী হইবেন।" এরূপে কোনও দল আমাকে হস্তগত করিবার সুবিধা পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে দল ভাঙ্গিয়া গেল।

এক মাত্র অন্তরায় রহিলেন সেই উকিল মহাশয়। তিনি ও যদু বাবুর পুত্র কুমার এক দিন ঘটনাক্রমে ট্রেণে এক কক্ষে যাইতেছিলেন। তিনি আমার অজস্র নিন্দা করিতেছেন শুনিয়া কুমার ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি কে, যে একজন সমস্ত বঙ্গের পূজনীয় ব্যক্তির এরূপ

অযথা নিন্দা করিতেছ। নবীন বাবু এখানে থাকিলে তুমি লেজ গুটাইয়া দাঁত বাহির করিয়া বসিয়া থাকিতে।” তিনিও ক্ষেপিয়া বলিলেন—“তুমি কে? মুখ সামালাইয়া কথা বলিও।” তিনিও বলবান পুরুষ। কুমার তখন আস্তিন গুটাইয়া তাহার বীরদেহ প্রসারিত করিয়া বলিল—“আয়! বেটা আয়! এখনই এক লাথিতে তোরে গাড়ীর জানালা দিয়া পৃথিবী দর্শন করাই। পড়িবি ত নবীন বাবুর এলাকায়!” উকিল মহাশয় কুমার ভায়ার কৈলাসপর্ব্বতবৎ কিল ও উত্থিত গন্ধমাদনবৎ শ্রীচরণ দেখিয়া নীরব হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তথাপি ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—“উকিল কিল খাইতে দড়।” কিন্তু লাথি সম্বন্ধে তাহা বলেন নাই। যাহা হউক ইহার পর তিনি একবার কি ঘটনা উপলক্ষে রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চেয়ারমেন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার ও বার্ণার্ড সাহেবের পত্রগুলি তাঁহাকে দেখাইলাম। তখন তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তাহার পর আমি যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছি, ও কি কি কার্য্য আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সকলই তাঁহাকে বুঝাইলাম। তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“আমি বড়ই ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না। আমি এতদিনে বুঝিলাম যে শান্তিপুরের ভাগ্য এমন কার্য্য-কুশল ও হিতৈষী ব্যক্তির হস্তে পূর্ব্বে আর ন্যস্ত হয় নাই। আমার আশা হইয়াছে যে শান্তিপুরের বড় শুভ দিন উপস্থিত। আপনি যে সকল কার্য্য প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা যদি করিয়া যাইতে পারেন, তবে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। এখন হইতে আমি আপনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গুণানুরাগী হইব।” বাস্তবিক তাহাই হইলেন।

শান্তিপুর এরূপে শান্তিপুরে পরিণত হইলে, মাজিষ্ট্রেট কমিশনার আমাকে খুব বাহবা দিলেন। এখন সমস্ত কমিশনার এক প্রাণে আমার সকল কার্য্যের অনুমোদন ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। আমি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরস্থ রাস্তাটি (Strand road) অংশত নির্ম্মাণ ও সমস্ত পাকা করিলাম। পূর্ব্বে খানিকটা কদর্য্য কাঁচা রাস্তা মাত্র ছিল। হস্‌পিটালটি একটি জঘন্য জীর্ণ ভাড়াটে গৃহে ছিল। গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর স্থানে একটি সুন্দর অট্টালিকা তাহার জন্য নির্ম্মান করিলাম। হাই স্কুলটির আয়তন বৃদ্ধি করিলাম, এবং গঙ্গা সরিয়া যাওয়াতে যে জল কষ্ট দেখা দিতেছিল, তাহা নিবারণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে নূতন 'ইন্দারা' খনন করাইলাম, এবং পুরাতন 'ইন্দারা' সকল সংস্কৃত করিয়া জল উঠাইবার সুবন্দোবস্ত করিলাম।

মধ্যে একবার নূতন 'নির্ব্বাচন' বা 'ইলেকসন' হইয়াছিল। দলাদলির কর্ত্তাগিরি করিয়া যাহারা আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এই শান্তির দিনে তাঁহাদের আসন টলিল। উকিল মহাশয়ের আসনও চঞ্চল হইল। তিনি ও দু এক জন সম্মানভাজন ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি এই ইলেক্‌সন-কম্পে তাঁহাদের আসন রক্ষা করিয়া দিলাম। একজন কমিশনারকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার বিপক্ষ দল এক জীবন্ত জালজীবীকে তাঁহার প্রতিযোগী দণ্ডায়মান করিয়া দিয়াছিল। সেই 'ওয়াডে' জালজীবীর সংখ্যা এত অধিক যে তাহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শান্তিপুরে একটা রগড়ের তুফান ছুটিয়াছে। পথে ঘাটে এই গল্প ও ইহার প্রহসন। কমিশনারগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। আমি গেলে আমাকে তাঁহাদের এই অপমান কাহিনী নানা ছন্দে বিনাইয়া বলিলেন—"পূর্ব্ব পুরুষের সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া 'ওস্তাগর' (দর্জ্জির) সঙ্গে কমিটিতে

বসিতেছি। এখন জীবন্ত জেলের সঙ্গে কেমন করিয়া বসি? আপনিই বা তাহার সঙ্গে কেমন করিয়া বসিবেন, এবং আপনার শিষ্টাচার মতে একটি জেলেকে কেমন করিয়া 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন? আমি বলিলাম আমার ডেপুটিগিরি 'হজমি গুলি'! যখন বিদেশীয় ধোপা নাপিতের বংশধরগণকে সেলাম করিতে পারিতেছি, তখন আপনার দেশীয় একটি জেলেকে 'আপনি' বলিতে আমার দম আটকাইবে না। দেখিলাম ভদ্রলোকদের বড়ই সঙ্কট উপস্থিত। কমিশনারিটা ছাড়িতেও ইচ্ছা নাই অথচ জালজীবীর সাহচর্য্যই বা কিরূপে করেন? তাঁহারা আমাকে বড়ই অনুনয় করিয়া বলিলেন এই বিপদে আমি বিপদভঞ্জন না হইলে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার উপায় নাই! পরদিন 'নোটিস' ইত্যাদি উল্টাইয়া দেখিলাম যে কোনও রূপ দোষ ধরিয়া তাহার নির্ব্বাচন রহিত করিবার পথ নাই। বিপক্ষদল তাহার জাল এরূপ কৌশলে ফেলিয়াছেন যে তাহাতে চুণাপুটিরও এড়াইবার যো নাই। তখন নিজে অশ্বারোহনে সে অঞ্চলে পরিদর্শনে গিয়া জেলেপাড়ার সম্মুখের বাসা দেখিতে দেখিতে তাহাকে ডাকাইলাম। দেখিলাম সত্যই জীবন্ত পরাশর-প্রণয়িনীর বংশধর! সে আমাকে গলবস্ত্র হইয়া নমস্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাপু! তুমি নাকি মিউনিসিপেল কমিশনার হইবার দরখাস্ত করিয়াছ?" সে করযোড়ে বলিল—"কর্ত্তা! মুই উমিলোক। জেলে মানুষ। মোর কি কমিশনি সাজে? তবে বাবুরা ধরিয়া বাঁধিয়া মোরে বলে তুই কমিশনি হ। মোর কি এ কায?" আমি বলিলাম—"তাহাত নহেই। তুমি 'কমিশনি' করিলে তোমার যে ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে? তাহা পারিবে ত?" সে হা করিয়া বলিল—"হুজুর! তাহা হইলে মুই খাইবি কি? মোর ছেলেপুলে ত সব মারা যাইবে। কর্ত্তা! মুই এ কায পারিবি না।

মোরে ছাড়িয়া দেও। দোহাই তোমার।” আমি বলিলাম—“তুমি বড় বুদ্ধিমান লোক। তুমি কেন এ উৎপাতে পড়িবে; তুমি আমার সঙ্গে আইস।” আমি ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাইয়া তাহার সঙ্গে তাহার ব্যবসা সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ করিতে করিতে তাহাকে মিউনিসিপাল আফিসে আনিলাম, এবং তাহার কমিশনার হইবার ইচ্ছা নাই বলিয়া এক দরখাস্ত আদায় করিয়া, তাহার “নমিনেশন” বা নামকরণ রহিত করিলাম এবং তাহার খুব প্রশংসা করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। কমিশনারগণ এ সংবাদ শুনিয়া দলে দলে আসিলেন, এবং আনন্দের হাসিতে মিউনিসিপেল আফিস পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

—০—

(২) উলা।

‘উলোর পাগল’, এবং ‘গুপ্তিপাড়ার বানর’,—বঙ্গদেশের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ। শৈশবে পিতার বৈঠকখানা পূজার পূর্ব্বে উলো গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইত। ‘উলোর পাগল’ ও ‘গুপ্তিপাড়ার বানর’ সম্বন্ধে কত হাস্যকর উপাখ্যান শুনিতাম, ও তাহাদের মধ্যে কত রসিকতার লড়াই শুনিয়া হাসিতাম। তাহাদের কেহ কেহ আমাকে বড় আদর করিত। আমিও তাহাদের বড় ভালবাসিতাম। প্রত্যেক বৎসর পূজার পূর্ব্বে তাহাদের প্রতীক্ষায় থাকিতাম। অতএব রাণাঘাটে আসিয়া উলা দেখিতে গেলাম। আজ সে উলার কি অবস্থা! মনে করিয়াছিলাম কোথায় একটা পাগলা গারদ দেখিব; দেখিলাম একটি মহা শ্মশান! উলার আর এক নাম বীরনগর। মিউনিসিপেলিটির নাম, বোধ হয় উক্ত প্রবাদ স্মরণ করিয়া স্থানবাসীরা ‘বীরনগর মিউনিসিপেলিটি’ রাখিয়াছেন। বীরনগর এই নামের সার্থকতা কি তাহা জানি না। উলাবাসীরা

বলিলেন যে একটি রমণী ডাকাতের হস্তে বড় বীরত্ব দেখাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম বীরনগর হইয়াছে। কিন্তু এখন সেই বীরনগরের মহাবীর 'মেলেরিয়া'। সেই উলা মেলেরিয়ার রণভূমি। উলার জনসংখ্যা এক সময়ে ৩০,০০০ সহস্রেরও অধিক ছিল। মেলেরিয়ার প্রকোপে আজ উলার জনসংখ্যা ৩,৫০০ মাত্র। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও শিবালয় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত উলা আজ একটি মহাবন। বনের অন্তরালে এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড বসতির স্থান। মিউনিসিপেলিটি না থাকিলে রাস্তাগুলিনও বনদেবী গ্রাস করিতেন। উহাদের তাঁহার গ্রাস হইতে রক্ষা করাই এক মাত্র মিউনিসিপেলিটির কার্য্য। রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য বজেটে ৩০০ কি ৪০০ টাকা ধরা হইয়াছে দেখিয়া কমিশনার অষ্টমেকট (West Macott) আমার উপর খড়্গহস্ত হইলেন। কৈফিয়তের উপর তীব্র কৈফিয়ত আমার এ অপব্যয় সম্বন্ধে তলব করিয়া শেষে স্বয়ং উলায় 'উড়িলেন'। এরূপ অপব্যয়ের জন্য আমাকে আবার তিরস্কার করিলে, আমি তাঁহাকে অশ্বারোহনে উলা দেখাইতে লইলাম। দেখিতে দেখিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ফিরিয়া মিউনিসিপেল আফিসে বসিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে মিউনিসিপেল কমিশনারগণকে বলিলেন—"আপনাদের কাছে আমি দোষ স্বীকার (apologise) করিতেছি। আমি জানিতাম উলা বাঙ্গালার একটি খ্যাতনামা স্থান। ইহার যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি এখন স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলাম একটা কুলির সৈন্য রাখিলেও ইহার জঙ্গল হইতে রাস্তাঘাট রক্ষা করা অসাধ্য।"

কেবল বনদেবীর কৃপা নহে। উলায় সম্পূর্ণরূপে পানীয় জলাভাব। উলাবাসীরা প্রকাণ্ড তামার কলসীতে গাড়ী করিয়া চারি পাঁচ

মাইল ব্যবধান চূর্ণী হইতে জল লইয়া পান করেন। এরূপ ব্যয় কেবল অর্থবান লোকেই নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক উলার বিষাক্ত জল পান করেন। কোনও ভদ্রলোক উলায় গেলে উলাবাসীরা তাঁহাকে ডাবের জল খাইতে দিয়া থাকেন। আমাকেও তাহা খাইতে দিতেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা মেলেরিয়ার ভয়ে কখনও উলাতে রাত্রিবাস করিতেন না। আহার করিয়া উলায় গিয়া 'মিটিঙ্গের' পর রাণাঘাটে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু আমি উলায় মধ্যে মধ্যে থাকিতাম। শিষ্টাচার সম্বন্ধে উলা শান্তিপুরের বিপরীত। শান্তিপুরের অশিষ্টাচার প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর জামাতা আসিলেও শাশুড়ী তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে উপদেশ দেন বলিয়া জনশ্রুতি। উলার কমিশনারগণ ভদ্রতার আদর্শ। তাঁহারা আমায় এরূপ যত্ন করিতেন যে উলায় গেলে আমি যেন কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছি মনে করিতাম। তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী হইতে আমার জন্য নানারূপ আহার্য্য আসিত, এবং তাঁহারা পরম আত্মীয়ের মত আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আবদার করিয়া, আমার বাড়ীর এই জিনিসটা খাইতে হইবে বলিয়া জিদ করিয়া আহার করাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে 'ভাইস চেয়ারমেন' বাবু বারানসী বসুর আদর আমি ভুলিতে পারি নাই। তিনি এমনি সুপুরুষ, তাঁহার মূর্ত্তিখানি এমনি স্নেহ ও শিষ্টাচার মণ্ডিত, যে তাঁহাকে দেখিলেই আমার প্রাণে একটা আনন্দ উপস্থিত হইত। আমি তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মিউনিসিপেল আফিস এক খানি কুঁড়িয়া ঘর। গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বলিয়া ভ্রম হয়। কমিশনারগণ এই কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য একটি অট্টালিকার জন্য ইট কাঠ প্রস্তত করিয়াছেন, কিন্তু ওয়েষ্টমেকট তাহার নির্ম্মাণব্যয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। ওয়েষ্টমেকট বলেন যেখানে অর্থাভাবে

মিউনিসিপেলিটির উপযোগী কোনও কার্য্য হইতে পারে না, এমন কি পানীয় জলের পর্য্যন্ত অভাব, সেখানে একটা অট্টালিকা প্রস্তুত করা অর্থের গুরুতর অপব্যয় মাত্র। কথাটাও অমূলক নহে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার প্রতিবাদ করিতে আর সাহস করেন নাই। সেই ইট কাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। ওয়েষ্টমেকট তাহা বিক্রয় করিতে পীড়াপিড়ি করিতেছেন। কিন্তু যে উলাতে এত পুরাতন অট্টালিকা পড়িয়া আছে, যাহার ইট কাঠ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, সেখানে উচিত মূল্যে এ সকল কে কিনিবে। কমিশনারগণ আমাকে তাঁহাদের এই কলঙ্ক-ভঞ্জন ব্রতে ব্রতী হইতে বিশেষ অনুনয় করিলেন। কিন্তু জলকষ্ট নিবারণ আমার মতে প্রধান আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাহার কোনও উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নানারূপ মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একটাও একবাক্যে অনুমোদন করিলেন না। মিউনিসিপেল আফিসের অনতিদূরে একটি খুব বড় পুষ্করিণী রাস্তার পার্শ্বে উলায় প্রবেশ-স্থানে আমি দেখিয়াছিলাম। উহা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা বলিলেও চলে। তাহাতে নরনারী অবগাহন করেন, এবং বহু লোক তাহার জলও পান করেন। সংস্কার পূর্ব্বক আমি উহা 'রিজার্ভ' করিতে প্রস্তাব করিলাম। তাঁহারা বলিলেন উহা অসম্ভব। উহা উলার জমীদার বাবুদের পুষ্করিণী, এবং উহার ১৩ জন অংশীদার। তাঁহারা উহা কোনও মতে 'রিজার্ভ' করিতে দিবেন না। আমি এক দিন গোপনে বারানসী বাবুকে বলিলাম যে আমি উহা 'রিজার্ভ' করিয়া তাহার উত্তর পাড়ে নূতন মিউনিসিপেল আফিস নির্ম্মাণ করিব। শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন আমি যদি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারি তবে উলাতে আমার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে। তিনিও একজন জমীদার, এবং উলাতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলাম

যে আইনমতে মূল্য দিয়া উহা গ্রহণ করিতে হইলে ১০,০০০ টাকা আবশ্যক। উলার মোট আয় ন্যূনাধিক ৩,০০০ টাকা মাত্র। তিনি বলিলেন যে চেষ্টা করিলে অধিকাংশ অংশীদারদের তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিবেন, কিন্তু তিন চারি জন যাঁহাদের অংশ বেশী, কখনও সম্মত হইবেন না। যাহা হউক ক্ষুদ্র অংশীদারগণকে গোপনে সম্মত করাইবার ভার আমি তাঁহার হস্তে দিলাম। বহু পরিশ্রমে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। বলা বাহুল্য যে ইঁহাদিগকে আমারও অনেক 'হিতোপদেশ' পড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রধান দুই জন উহা পড়িবার পাত্রই নহেন। ইঁহাদের অবস্থা খুব ভাল; এবং দুজনেই উলার প্রধান জমীদার। এমন কি বারানসী বাবু ইঁহাদের কাছে এ কথা উত্থাপিত করিতেও সাহস করেন না। তিনি বলেন এ কাতাল মাছ দুটা জাল ভেদ করিয়া ছুটিলে, যাহাদের জালে ফেলিয়াছি, তাহারাও ছুটিবে। সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়। এমন সময়ে ঈশ্বর আমাদের সহায় হইলেন। এ সময়ে দ্বিতীয় জমীদার মহাশয় এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িলেন। তিনি একজন চতুর চূড়ামণি। কিন্তু আমরা 'ধর্ম্মাবতার'গণ উর্ণনাভ। দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আমাদের জাল। উহাতে অর্থী, প্রত্যর্থী কি সাক্ষীভাবে শিকার একবার পড়িলে, আমরা তাহাকে এরূপ জালে জড়িত করিতে পারি যে তাহাকে 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' বলিয়া ডাকিতে হয়। স্মরণ হয় ইনি সাক্ষীস্বরূপে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চারি দিকে আমি এরূপ ঘনঘটা সৃষ্টি করিলাম যে তিনি ভাবিলেন বজ্রটা তাঁহারই মস্তকে পড়িবে। এ সময়ে আমার ইঙ্গিতমতে বারানসী বাবু তাঁহার সমক্ষে বর্ষি ফেলিলেন, এবং তিনি উহা গিলিলেন। তখন বারানসী বাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে একেবারে রাণাঘাটে উপস্থিত হইলেন, এবং

জমীদার মহাশয় আপনি তাঁহার অংশ মিউনিসিপেলিটিকে দান করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে প্রস্তাবিত কার্য্যটি করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমি তখনই তাঁহার কাছ হইতে এক খানি দান-পত্র লেখাইয়া লইলাম। তাহার পর অন্যান্য অংশীদারগণ হইতেও সেরূপ পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া লইলাম। এই চতুর চূড়ামণি জালে পড়িয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

রাণাঘাটে এ কার্য্য সমাধা করিয়া এবং চতুর চূড়ামণিকে এখন যজ্ঞেশ্বর করিয়া আমি উলায় উপস্থিত হইলাম। প্রথম দুই একটি স্ত্রীলোক অংশীদার সম্বন্ধে যাহা কিছু গোলযোগ ছিল তাহা মিটাইয়া, আমি সন্ধ্যার সময়ে প্রধান জমীদার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি 'নবীন তপস্বিনীর' জীবন্ত জলধর। সেই মূর্ত্তি, সেই রূপ, সেই গুণ, সেই চাতুর্য্য, সেই

"মালতী মালতী মালতী ফুল,
মজালো মজালো মজালো কুল।"

হইতে 'যমেরই ভুল' পর্য্যন্ত সকলই যেন দেদীপ্যমান। বুদ্ধি, ভাষাও সেই ধরণের। কোনও কথার সরল সহজ উত্তর দেওয়া তাঁহার অভ্যাস নাই। আমি জানিতাম যে তাঁহার কাছে যদি প্রথমই গিয়া বলি যে অন্যান্য অংশীদারেরা পুষ্করিণীটি মিউনি-সিপেলিটিকে দান করিয়াছেন, কেবল তাঁহার অংশ তিনি দান করিলেই হয়, তিনি প্রাণান্তেও সম্মত হইবার পাত্র নহেন। কারণ তাহা হইলে এ সৎকার্য্যের জন্য বাহাবা তিনি থাকিতে ক্ষুদ্র অংশী-দারগণ পাইবেন। তাহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। অতএব এই তর্কটি নেপোলিয়ানের "লাইফ গার্ড" সৈন্যের মত আমার শেষাস্ত্র করিতে হইবে। আমি উলায় প্রথম গিয়া ইঁহার ও অন্যান্য প্রধান

ব্যক্তিদের বাড়ীতে একবার শিষ্টাচার রক্ষার জন্য মাত্র গিয়াছিলাম। আর যাই নাই। তাঁহার রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা। প্রথম উভয় পক্ষে শিষ্টাচারের শ্রাদ্ধ শেষ হইলে, আমি প্রথমতঃ তাঁহার উচ্চ বংশের, ও তাঁহাদের কীর্ত্তির ও বঙ্গদেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার, তাহার পর তাঁহার নিজের রূপের, গুণের, প্রতিপত্তির ও দানশীলতার কবিত্বপূর্ণ গৌরচন্দ্রিকা গাইয়া শেষ প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলাম। তিনি প্রথম চমকিয়া উঠিলেন, পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া উহার খুব প্রশংসা করিলেন। উলার জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই চেষ্টার ও আমার অন্যান্য কার্য্যের জন্য খুব ধন্যবাদ দিলেন। পরে আপত্তি আরম্ভ করিলেন। পুষ্করিণীর জল ভাল নহে, উহা নগরের এক প্রান্তে, সংস্কারে মিউনিসিপেলিটির সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় হইবে, 'রিজার্ভ' করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, করিলেও লোকের স্নানের অসহনীয় কষ্ট হইবে,—ইত্যাদি কত প্রকারের আপত্তিই উত্থাপিত করিলেন। একে একে সকল আপত্তি খণ্ডন করিলে, তিনি বারানসী বাবুর দোহাই দিতে লাগিলেন। আমি স্থানীয় লোক নহি, এ সকল আপত্তির গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছি না, বারানসী বাবু সব জানেন। বারানসী বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি আমার ষোলআনা পৃষ্ঠপোষকতা করিলে জমীদার মহাশয় মনে করিবেন যে তিনিই আমাকে এই কার্য্যে লাগাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে জমীদার মহাশয় আমার প্রস্তাবে কোনও মতে সম্মত হইবেন না। তাহা ছাড়া তাঁহার প্রকোপে পড়িয়া বারানসী বাবুর উলায় থাকা কঠিন হইয়া পড়িবে। অতএব তিনিও এক একবার জমীদার মহাশয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ কথায় সায় দিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে তিনি নিজেও এ সকল কথা আমাকে বুঝাইয়াছেন, কিন্তু উলার জলকষ্ট

নিবারণের অন্য উপায় নাই বলিয়া আমি এ কাযটিতে উলার মঙ্গলার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। জমীদার মহাশয়ের এ সকল আপত্তি খণ্ডিত হইলে, তিনি সর্ব্বশেষ বলিলেন যে এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুষ্করিণীটি মিউনিসিপেলিটিকে দান করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির অপলাপ করা হইবে। সন্ধ্যা হইতে এরূপে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' করিতে করিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল। সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। আমি তখন বুঝিলাম আর 'বিশেষণে সবিশেষ কহিয়া' কার্য্যোদ্ধার হইবে না। তখন আমি উঠিয়া, আমার দীর্ঘ দেহ আরও দীর্ঘ করিয়া, "ঘোরারাবী মহারৌদ্রী" রূপে বলিলাম—"আচ্ছা, বেশ! আপনি তবে উলাবাসীদিগকে কেমন করিয়া মেলিরিয়াদুষ্ট বিষাক্ত জল পান করাইয়া আপনার পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা করেন, তাহা আমি দেখিব। আপনি কালই সপ্তাহ মধ্যে পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া উহা পানোপযোগী করিতে নোটিশ পাইবেন।" তিনি একটুক বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিলেন পুষ্করিণীর তিনি একা মালিক নহেন। সকল অংশীদার-গণের উপরই নোটিশ দিতে হইবে। আমি তখন আরও ক্রোধ-কর্কশ কণ্ঠে বলিলাম যে অন্য অংশীদারগণের ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। তাঁহারা সকলেই সহৃদয় লোক। তাঁহারা কথাটি মাত্র না কহিয়া এই হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাদের অংশ পূর্ব্বেই দান করিয়াছেন। আমার সোলা হেট মস্তকে স্থাপন করিয়া আমি ক্রোধবেগে চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি! সকল অংশীদারগণ তাঁহাদের অংশ পূর্ব্বেই দান করিয়াছেন।" তিনি তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি! সত্য সত্যই আপনাদের অংশ আপনারা দান করিয়াছেন?" তাঁহারা সকলেই একে একে অনুকূল উত্তর দিলে, তিনি বলিলেন—"বটে! তোমরা সকলে

উদারতা দেখাইয়া, কেবল আমাকে এরূপে ইঁহার বিরাগভাজন করিলে!” তিনি উঠিয়া আসিয়া আমার দুহাত ধরিয়া বলিলেন—“আপনি আমার প্রতি রাগ করিবেন না। আমি ইহাঁদেরই জন্য এত ক্ষণ এত তর্ক করিতেছিলাম। অন্যথা এরূপ একটি দেশহিতকর কার্য্যে আমার কোনও আপত্তি নাই। আমিও আমার অংশ মিউনিসিপেলিটিকে দান করিলাম।” তখন তাঁহার বৈঠকখানায় একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। সেখানে উলার বহু ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া নীরবে এ অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। আমি সোলা হেট ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দে তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিলাম, এবং তখনই একখানি দানপত্র চেয়ারমেনের নামে লেখাইয়া লইয়া তাঁহার এবং তাঁহার পরে অন্যান্য অংশীদারগণের আবার নূতন করাইয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইলাম। এরূপে পালা শেষ হইলে আমি দাঁড়াইয়া আনন্দে অধীর হইয়া সকলকে বলিলাম—‘আপনারা এক বার হরি হরি বলুন!’ তখন আবার উভয় পক্ষের মধ্যে এক পালা শিষ্টাচারের বিনিময় হইল। তাঁহারা আমার এবং আমি তাঁহাদের খুব গুণানুবাদ করিলাম। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী উভয় পক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন রাত্রি অনুমান ১টা। আমি বিদায় চাহিলে সেই জমীদার মহাশয় বলিলেন,—“আমি জানিতাম ‘পলাশির যুদ্ধের’ কবি একজন বিচক্ষণ লোক। কিন্তু তিনি যে এরূপ চতুর তাহা জানিতাম না। এখন বলিতে কি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে এরূপ দানে কখনও সম্মত হইব না। বঙ্গদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যে আমাকে সম্মত করাইতে পারিত।” গৃহের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলে বারানসী বাবু গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—“আজ আপনি উলার কি উপকারই করিয়া গেলেন! আমার ইচ্ছা হইতেছে আপনাকে মাথায় তুলিয়া রাখি।

আপনি আজ কি অসাধারণ ক্ষমতাই দেখাইয়াছেন!" পরদিন প্রাতেই 'মিটিঙ্গ' ডাকিয়া সেই দান পত্র গ্রহণ করিলাম, এবং পুষ্করিণীর সংস্কারের ও তাহার তীরে মিউনিসিপেল আফিস নির্ম্মাণের জন্য টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলাম। প্রাতেই উভয় কার্য্যের এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। গৃহের জন্য বেশী টাকা চাহিলে পাছে ওয়েষ্টমেকট গোলযোগ করেন, তাহার এষ্টিমেট যতদূর সম্ভব কম ধরিয়াছিলাম। বারানসী বাবু বলিয়াছিলেন যে পুষ্করিণীর কার্য্য কণ্ট্রাক্টার দ্বারা না করাইয়া তিনি নিজে করাইলে, তাহা হইতে কিছু টাকা বাঁচাইয়া গৃহকার্য্যে দিতে পারিবেন। আমি কর্ত্তাদের কাছে লিখিলাম যে পুষ্করিণীটির মূল্য অন্যূন ১০,০০০৲ টাকা হইবে। উহার সংস্কারের দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ উলাবাসীর জলকষ্ট নিবারিত হইবে, এবং যখন পুরাতন ইট কাঠ বিক্রয় হইতেছে না, উহা এরূপে নষ্ট হইতে না দিয়া তাহার তীরে আফিস নির্ম্মাণ করিলে পুষ্করিণীটি সহজে 'রিজার্ভ' করা যাইতে পারিবে। আফিসের চৌকিদার পুষ্করিণীরও রক্ষক হইতে পারিবে। এবার আর ওয়েষ্টমেকট কোনও আপত্তি করিলেন না। বরং তিনি ও মেজিষ্ট্রেট আমাকে খুব লম্বা চৌড়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বিদ্যুৎবেগে কার্য্য চলিল, এবং দেখিতে দেখিতে পুষ্করিণীর সংস্কৃতি, এবং তাহার উত্তর পারে একটি সুন্দর আফিস অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। এক গুলিতে দুই পাখী মারা পড়িল। উলার আংশিক জলাভাব নিবারিত হইল, এবং কমিশনারদের বহুদিনের বাঞ্ছিত আফিস অট্টালিকাও নির্ম্মিত হইল। অট্টালিকা প্রতিষ্ঠার সময়ে বারানসী বাবু আমার পত্নী পুত্রকেও নিমন্ত্রন করিয়া লইলেন। বর্ষাকালে স্থানটির রমণীয় শোভা হইয়া থাকে। একটি বিস্তৃত সরোবর, তাহার তীরে সুন্দর অট্টালিকা চারিদিকে সুন্দর পুরাতন বৃক্ষপূর্ণ ও নূতন পুষ্প রোপিত উদ্যান।

অদূরে গঙ্গার পূর্ব্ব খাতের নিদর্শন স্বরূপ একটি বৃহৎ বিল। বর্ষায় উহা একটি বিস্তৃত ঝিলের (Lake) শোভা ধারণ করে। মুকুন্দরামের সময়ে ভাগিরথী উলার পার্শ্বে প্রবাহিতা ছিলেন এবং প্রবাদ তাঁহার শ্রীমন্ত উলায় চণ্ডী-পূজা করিয়াছিলেন।

"উলা বাহিয়া যায় কাছিমার কাছে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে।"

—:o:—

(৩) চাকদহ।

চাকদহবাসীরা গম্ভীরভাবে বলেন তাঁহাদের গ্রামের নাম 'চক্রদহ'। গঙ্গা সরিয়া গিয়া চক্রাকারে এক দহ রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'চক্রদহ', ওরফে 'চাকদহ'। ইহাই চাকদহ নামের পুরাণ বা উপপুরাণ। গঙ্গার দহ ছিল কি না তাহা মা গঙ্গাই জানেন। এখন চাকদহ তাঁহার সতিনী মা কালীর মেলেরিয়াদহ। মেলেরিয়াতে এ অঞ্চলও ধ্বংসপ্রায়। ধ্বংসাবশেষ গ্রামগুলির রক্ষার জন্য 'চক্রদহের' নিকটবর্ত্তী গ্রামচক্র একত্র করিয়া গ্রামবাসী ভদ্র-মণ্ডলী বহু চেষ্টা করিয়া একটা চক্র-মিউনিসিপেলিটি সৃষ্টি করিয়াছেন! দেবতারা এরূপে তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহারা দেবতাদের পাল্টা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন 'তিলবিমা।' মেলে-রিয়ার প্রতাপে এ সকল গ্রামের উত্তমাংশ যমালয়ে বা দেশ দেশান্তরে উড়িয়া গিয়াছে। চাকদহ উভয় ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের ও মেলেরিয়ার ষ্টেশন। মেলেরিয়া অধিকাংশ চাকদহবাসীকে তাহার ট্রেণে পুরিয়া যমনগরে লইয়া গিয়াছে। যাহা বাকি ছিল তাহাও প্রায় ইষ্ট বেঙ্গল

রেলওয়ে কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে লইয়া গিয়াছে। যাহারা অন্যত্র যাইতে অক্ষম তাহারা কোনও মতে মেলেরিয়ার সহিত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ভদ্রাসনে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। চক্রদহ এখন মহাবনে ও ব্যাঘ্রদহে পরিণত হইয়াছে। ভাইস চেয়ারমেন শ্রীনাথ বাবু বলিতেন তাঁহাদের মিউনিসিপেলিটির পোষা একটা 'ঘড়ঘড়ে বাঘ' আছে। মিউনিসিপেল রাস্তায় রাত্রিযোগে মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মিউনিসিপেলিটি এরূপ দরিদ্র যে 'ব্যাঘ্রা-চার্য্য বৃহল্লাঙ্গল' হইতে কিছু মিউনিসিপ্যাল টেক্স আদায় করা যাইতে পারে কি না চেষ্টা করিতে আমি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলাম। 'বীরনগরে' না থাকিলেও, মেলেরিয়ার এই রণক্ষেত্রে একটি প্রকৃত বীর তখন ছিল। তিনি একজন স্থানীয় ডাক্তার। তিনি একজন প্রকৃত মেলেরিয়া-জয়ী মহাবীর! এই জীবিত শবরাশির মধ্যে তাঁহার বীর অবয়ব, দৃঢ় স্বাস্থ্য, অশ্রান্ত স্ফূর্ত্তি, উদ্যম ও উৎসাহ দেখিলে আমার মনে আনন্দ হইত। গোঁড়পাড়া পূর্ব্বে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। এখন তাহা মহাবন। এক দিন ডাক্তার বাবু কাণ্ডারী হইয়া অশ্বারোহণে আমাকে এই মেলেরিয়ার পীঠস্থান দেখাইতে লইয়া গেলেন। একটি একটি বন পার হইয়া মরুভূমির মধ্যে বৃক্ষপল্লবছায়াসম্পন্ন সরোবরের মত এক একটি বসতি স্থান দেখিলাম। তাহাতে কয়েক ঘর কৃষকের বসতি মাত্র। এই মহাবনটির এক সিংহ জমীদার। তাহা না হইলে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে কেন? তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি গ্রামটির অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। 'সিংহির বাড়ী', 'সিংহির পুকুর', 'সিংহির জঙ্গল' ইত্যাদি এখনও বনাভ্যন্তরে ধ্বংসপ্রায় হইয়া আছে। বর্ত্তমান সিংহি মহাশয় মহাপুরুষ। তিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এখন 'পেনসন'রূপ পরলোক প্রাপ্ত হইয়া

কলিকাতার কোনও উপলোক শোভিত করিতেছেন। শুনিলাম তিনি জমীদারির হিসাব পত্র দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে চাকদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের ‘ওয়েটিঙ রুম’ পর্য্যন্ত পদার্পণ করেন। মেলেরিয়ার ভয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিপূর্ণ গ্রামে কখনও যান না। এক স্থানে হাই কোর্টের একজন উকিলের একটি সুন্দর চকমিলান বাড়ী দেখিলাম। প্রচীরের চূণ এখনও মলিন হয় নাই। আমি আগ্রহ সহকারে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম। ডাক্তার বাবু নিষেধ করিয়া বলিলেন উঠানে এরূপ বন যে সেখানে হাই কোর্টের উকিল মহাশয়ের স্থান এখন ব্যাঘ্র মহাশয় গ্রহণ করিয়া মক্কেল অন্বেষণে আছেন। উকিল মহাশয় দশ বৎসর যাবৎ মেলেরিয়ার ভয়ে একবার পৈত্রিক বাসস্থান দেখিতেও আসেন নাই। এরূপ স্থানে আমার এরূপ একটি বাড়ী থাকিলে, আমি প্রত্যেক শনিবার কলিকাতার কোলাহল ও পূতিগন্ধপূর্ণ ইষ্টক কাষ্ঠের সৃষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া এখানে আসিয়া প্রাণ জুড়াইতাম। যেখানে যাইতেছিলাম লোকেরা বলিতেছিল—“কর্ত্তা! কি দেখিতে আসিয়াছেন? বিধাতা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, মেলেরিয়াতে দেশ উৎসন্ন হইয়াছে।” আমি বলিলাম—“কেবল বিধাতা নহে, কলিকাতাও তোমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। যাহাকে বিধাতা ছাড়িয়াছেন, তাহাকে কলিকাতা টানিয়াছেন।” হায়! আমরা এতদূর মনুষ্যত্বে পতিত হইয়াছি, এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা আমাদের দেশের এ সর্ব্বনাশ চক্ষের উপর দেখিয়াও দেখিতেছি না। পূর্ব্বে কাহারও অবস্থা ভাল হইলে সে কিসে পাঁচ জন আশ্রিত নিরন্নকে অন্ন দিবে, কিসে গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও পথ ঘাট নির্ম্মাণ করিবে, তাহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হইত। এখন কাহারও হাতে

দুপয়সা সংস্থান হইলে সে কিরূপে কলিকাতায়, কি কোনও নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, কপি,সালগম খাইবে ও বরফ সেবন করিবে তাহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হয়। এ কারণে একদিকে শুধু কলিকাতার নহে, সর্ব্বত্র নগরের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অন্য দিকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রামসকল মেলেরিয়ার রঙ্গভূমি হইয়া মহাবনে পরিণত হইতেছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা স্থানান্তরে চলিয়া গেলে গ্রাম রক্ষা করিবে কে ? কাযেই তাহাদের স্থান মেলেরিয়া গ্রহণ করিতেছে।

রাণাঘাট হইতে একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় গিয়াছি। তিনিও একজন ডেপুটি সিংহ। তিনি কলিকাতায় একটি গোয়ালটুলিরূপ নরকে বাস করিতেছেন। উহা একটি উত্তর-গোগৃহ বিশেষ। তিনি গৃহে ছিলেন না। তাঁহার সিংহিনীর সাধ তিনি কলিকাতায় বাড়ী করিবেন। ডেপুটির পৈত্রিক বাসস্থান বড় দূরে নহে, বারাকপুরের নিকট। তিনি একজন দরিদ্রের সন্তান, মাতুলালয়ে পালিত। সিংহিনীর কলিকাতাবাসের আকাঙ্ক্ষা কেন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"গ্রামে বড় কষ্ট। একে ত মেলেরিয়া, তাহাতে ভাল ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না, ভাল খাবারও পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করা অপেক্ষা এ সকল উপদ্রব ও অভাব হইতে উদ্ধার পাইবার আমি বড় সহজ উপায় বলিয়া দিতে পারি। তিনি বড় আগ্রহের সহিত উহা কি জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম কলসি ও দড়ী। গলায় কলসি বাঁধিয়া তাঁহারা দুটি গঙ্গায় আত্ম সমর্পণ করিলে মেলেরিয়ার ভয়ও থাকিবে না, ডাক্তার কবিরাজ ও খাদ্যের ভাবনাও ভাবিতে হইবে না। ঠাকুরাণীটি আমার এরূপ সৃষ্টিছাড়া 'গ্রাম্যতা' দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। আমি তখন বুঝাইয়া বলিলাম—

"কলিকাতায় বাড়ী করা, আর গঙ্গায় ঝাপ দেওয়া একই কথা। উভয়ের পরিণাম বিলোপ। যে কলিকাতায় গবরনর জেনেরেলকে কেহ চেনে না, সে কলিকাতায় তোমায় স্বামী "চৌকিদারী কাযে পটু মফস্বলে গিনি" ডেপুটির আসিয়া থাকা, আর গলায় দড়ী দিয়া মরা, একই কথা। অন্য দিকে তোমার গ্রামে থাকিবে বলিয়া যদি বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, তুমি কলিকাতার বাড়ীর মূল্যে গ্রামে বিস্তৃত উদ্যান-সরোবর-সম্বলিত একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, এবং সেই সরোবরের স্বচ্ছ নির্ম্মল সলিলের দ্বারা, ও অবশিষ্ট অর্থে গ্রামখানির অন্য অভাব দুর করিয়া, তুমি উহাকে কেবল মেলেরিয়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে তাহা নহে, উহাকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবে। কলিকাতার মাসিক ব্যয়ে তুমি কত নিরন্ন আত্মীয় স্বজন ও গ্রাম-বাসীকে অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া পূজিতা হইবে। তোমারা প্রত্যেক বার গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের প্রত্যাশায় কত লোক পথ চাহিয়া থাকিবে, এবং যখন যাইবে, ও যত দিন থাকিবে, গ্রামে একটা দুর্গোৎসব হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি এত ধর্ম্ম, এত পুণ্য, এত প্রতিষ্ঠা, এত সুখ ছাড়িয়া কলিকাতার গোয়ালটুলিতে অধিষ্ঠিতা হইয়া মিউনিসিপেল মার্কেটের কপি সালগম ও বরফ খাওয়াই কি মোক্ষ?" এ সময়ে তাঁহার ডেপুটি মহাশয় কলিকাতার অন্যান্য 'গোগৃহে' জীর্ণ গৃহান্বেষণের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আমার এই উগ্র উপদেশ শুনিলেন, এবং আমাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভাই! তোর পায়ের ধূলা দে। আমি ইঁহার তাড়নায় আজ কয়েক দিন কলিকাতার গলি ঘুঁজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আধমরা হইয়াছি। পনর ষোল হাজার টাকাতেও কোথায় একটা জীর্ণ গৃহ পাইলাম না। তুমি যদি ইঁহার কলিকাতা-রোগটা ছাড়াইতে পার, তবে প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য

করিবে।" কিন্তু এ রোগ মেলেরিয়া হইতেও মারাত্মক। আমার চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। কিছু দিন পরে দেখিলাম উভয় পার্শ্বে শত পায়খানা-শ্রেণী-সজ্জিত এক গলিতে তিনি এক দৌলতখানা ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার টাকাতে ক্রয় করিয়া তাহার সংস্কারে আরও অর্থব্যয় করিতেছেন! আর আমি তাঁহার বন্ধু আজ পেনসন লইয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি পল্লীগ্রামের শান্তিছায়ায় একটি মৃণ্ময় কুটিরে বসিয়া এই 'মেলেরিয়া মাহাত্ম্য' ও 'কলিকাতা কলঙ্ক' রচনা করিতেছি!

কলিকাতার চারি দিকের পল্লীগ্রামে হাহাকার উঠিয়াছে মেলেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন হইল। হইবে না কেন? একদিকে রেলওয়ে জলনির্গমের পথ বন্ধ করিয়া যমালয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। তাহার উপর এই 'কলিকাতা রোগ'। গ্রাম লোকশূণ্য, স্থান জঙ্গলময়, জলাশয় শুষ্ক বা পঙ্কিল। অতএব মেলেরিয়ার অপরাধ কি? শুধু তাহাই নহে। যাহাদের মেলেরিয়া ভুলিয়াছে, বা কলিকাতা-রোগ যাহাদের অবস্থার অতীত তাহাদেরই বা অবস্থা কি? কাঁচড়াপাড়ার অনতিদূরে জাগুলি সুবর্ণপুর রাণাঘাটের এলাকায় দুটি স্বনাম প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু ভদ্রলোকের বাস। শিবিরে পৌঁছিয়া আমি গ্রাম দেখিতে গেলাম। একটি মাত্র জলাশয়। তাহা পানায় পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে পাড়ের নিকটে কলসিমাত্র ডুবিতে পারে এই মত ছিদ্র দেখা যাইতেছে, এবং উহাতে কলসি ডুবাইয়া গ্রামবাসিনীরা জল লইয়া যাইতেছে। আবার সে জলের মাহাত্ম্যই বা কি? চারি পাড়ে জঙ্গল, এবং উহা গ্রামের সাধারণ পায়খানা। বর্ষার সময়ে এই জঙ্গল ও পাড় ধৌত হইয়া পুষ্করিণীর জল কলুষিত করে। আর এই জলই গ্রামবাসীরা পান করে। মেলেরিয়ার অপরাধ কি? আমাকে দেখিয়া গ্রামের ভদ্রলোক ও

কৃষক পালে পালে আসিল। সকলে জলাশয়টি দেখাইয়া বলিল—"আমাদের জল কষ্ট একবার চক্ষে দেখিয়া লউন! এ জলাশয়টি লোকাল বোর্ডের টাকায় পরিষ্কার করাইয়া দিলে এ দুটি গ্রামের লোক জল খাইয়া বাঁচিবে।" আমি কৃষকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"তোমরা যদি একবেলা সকলে মিলিয়া এই পুষ্করিণীটি পরিষ্কার কর তাহা হইলেত আর তোমাদের জলকষ্ট থাকে না।" উত্তর—"কর্ত্তা! আমরা উমিলোক। আমরা কি এ কার্য্য করিতে পারি?" আমি বলিলাম—"ইহার জন্যত নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য আবশ্যক করে না। পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে ত ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।" তাহারা চুপ করিয়া রহিল। সাধারণের হিতের জন্য, তাহাদের আপনার ও আপনার পরিবারের জীবনের জন্য তাহারা একবেলা যে বিনা পয়সায় খাটিবে, এই গুরুতর স্বার্থত্যাগ তাহাদের দ্বারা হইবার নহে। দেশের অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিছু দূর গেলে একটি সুন্দর চকমিলান বাড়ী দেখিলাম। সেখান হইতে একটি ভদ্রলোক অকস্মাৎ বাহির হইয়া আমাকে নমস্কার করিলে সঙ্গীরা বলিলেন তিনি গৃহস্বামী। আমার বোধ হইল তিনি আকাশ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটা মহা জঙ্গল। তাহার মধ্য দিয়া একটি সরু পথ। তিনি এই পথ দিয়া নির্গত হইতে আমি তাঁহাকে দেখিতেই পাই নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনি কি আকাশ দিয়া আসিলেন? আপনার বাড়ীর সম্মুখে ত এ জঙ্গল। এ বাড়ী আমার হইলে আমি এখনই দা হস্তে এই বন কাটিয়া খাণ্ডব দাহন করিতাম।" তাহার কৈফিয়তও মেলেরিয়া। মেলেরিয়া তাঁহাদের এ দুরবস্থা ঘটাইয়াছে। জঙ্গল একবার কাটিলে উহা মেলেরিয়ার দোষে আবার গজায়। আমার বোধ হয় ইহার পর এ সকল স্থানে ভূমিকম্প হইলে, কি কোনও কুলরমণী কুলত্যাগ করিলেও ইঁহারা মেলেরিয়ার

দোষ দিবেন। আমি বলিলাম—"মেলেরিয়া আপনাদের নামে 'ডিফা-মেসনের' নালিশ করিতে পারে। সে কি বলিতে পারে না, 'দেখুন মহাশয়! ইঁহারা আমার জন্য সকল আয়োজন করিয়া এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, আমার এরূপ বাপান্ত করিতেছেন।' আপনাদের গ্রামের জলাশয়ের, এমন কি নিজের বাড়ীর পর্য্যন্ত এ অবস্থা। অতএব মেলেরিয়ার অপরাধ কি?" আমার বিশ্বাস যে এই মেলেরিয়া ও কলিকাতা-রোগে আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার পঞ্চাশ মাইল মধ্যবর্ত্তী গ্রাম সকল সুন্দরবনে পরিণত করিবে। কেবল শান্তিপুরবাসীরা মাত্র মাথা স্থির করিয়া আছে। তদ্ভিন্ন রাণাঘাট অঞ্চলের সমস্ত প্রাচীন গণ্ডগ্রাম এই উভয় রোগে প্রায় জনহীন অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে। চাকদহ মিউনিসিপেলিটি কতকগুলিন কঙ্কাল সমষ্টি মাত্র। ইহার আয় অতি অল্প। কিছুই নাই। আছে কেবল কয়েকটি রাস্তা, এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাতে একটি মিউনিসিপেল আফিস-অট্টালিকা। ইহার চারি দিকে কতকগুলি দুর্গন্ধ জল ও জঙ্গলপূর্ণ গর্ত্ত ছিল। সে গুলি ভরাইবার জন্য 'পরিদর্শক প্রভুরা' আদেশের পর আদেশ দিতেছেন। কিন্তু মিউনিসিপেলিটি তাহা ভরাইবার টাকা কোথায় পাইবে। আমি সে গুলিকে একত্র করিয়া একটি 'বিনা সুতার হার' গাঁথিয়া উহাদের একটি ক্ষুদ্র 'ঝিলে' (lake) পরিণত করিলাম, এবং একটি জীর্ণ কুড়িয়া হইতে ডিসপেনসারিটি সরাইয়া মিউনিসিপেল আফিসের এক কক্ষে আনিলাম। তাহার অপর পার্শ্বের কক্ষ আমার বাসোপযোগী করিয়া লইলাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা এই মেলেরিয়াভীতিপূর্ণ স্থানে কদাচ রাত্রিবাস করিতেন না। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে তাহা করিয়া যথাসাধ্য স্থানটির উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলাম। তবে অর্থাভাবে দুই বৎসর সময়ে বেশী কিছু করিতে পারি নাই।

রাণাঘাটের মেলা।

(১) শান্তিপুরের রাস।

ভারতচন্দ্রের প্রেমিকা বিদ্যা তাহার প্রেমিক সুন্দরকে বলিয়াছেন—

"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।"

আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজার সময়ে এই এই ভক্তির কার্য্য করিয়া কার্ত্তিক মাসে—

"ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশের রাস॥"

কালে কত কীর্ত্তি লুপ্ত হয়। বোধ হয় শান্তিপুরের এ হেন রসের 'খেঁড়ু'ও লুপ্ত হইয়াছে। কই, খেঁড়ুর নাম মাত্রও শুনি নাই। শুনিয়াছি তাহা আমার আগমনের পূর্ব্বে মিউনিসিপেল কমিশনারগণ সময়ে সময়ে গাইতেন। 'চোর পুকুর' সংস্কারের সময়ে তাহা বিশেষ-রূপে গীত হইয়াছিল। উহা পুষ্করিণীটির নামের উপযোগী গীত। কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল। আমাকে তাহা শুনিতে হয় নাই। শান্তি-পুরের খেঁড়ু শুনি নাই, শান্তিপুরের রাস দেখিয়াছি। উহা বঙ্গদেশ-বিখ্যাত। শুনিয়াছি পূর্ব্বে শান্তিপুর সীমন্তিণীদের অন্তঃপুর কপাট ও হৃদয় কপাট উভয়ই রাসের সময় খুলিয়া যাইত; তাঁহারা পালে পালে রাসদর্শনোপলক্ষে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাসপৌর্ণমাসীর শিশির-ম্লান কৌমুদীকে তাঁহাদের উচ্ছ্বরিত রূপজ্যোৎস্নায় ও হাসির ঝলকে সমুজ্জল করিতেন, এবং "রসের" ছড়াছড়ি হইত। 'খেঁড়ুর' সঙ্গে বোধ হয়

সে 'রস' ও লুপ্ত হইয়াছে, কিম্বা তাহা অনুভব করিবার আমার অবসর ও সুযোগ ঘটে নাই। যাহা হউক এ "দেশের রাস" এখনও আছে এবং উহা লক্ষ্য করিয়া যদি বিদ্যারূপসী বঙ্গদেশের রাসের এরূপ গুণানুবাদ করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি হয় নাই। সচরাচর রাসের অর্থ কৃষ্ণ একক, কিম্বা তাঁহার প্রেমবিহ্বলা রাধাসহ কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান, আর জোড়া জোড়া গোপগোপীগণ হাতাহাতি করিয়া তাঁহাদের বেড়িয়া এক কাষ্ঠ-চক্রে ঘুরিতেছেন। কল্পনার চষমায় দেখিলে বলিতে হয়, নাচিতেছেন। কোনও ব্রাহ্ম প্রচারক তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহা বর্ত্তমান ব্রজভূমি ইয়ুরোপের 'বল' বলিয়া গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের এরূপ নিগূঢ় অর্থ না বুঝিলে মানুষ ব্রাহ্মই বা হইবে কেন, এবং তাহা প্রচার না করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সার্থকতাই বা কি? তবে গীতার এক স্থানে পড়িয়াছি স্মরণ হয়,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

কিন্তু প্রচারক মহাশয় হয় ত বলিবেন এই "যন্ত্রই" ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। ঈশ্বর চষমাযোগে মুদ্রিত নয়ন দৃষ্ট হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া জাত-ও-অজাত-শ্মশ্রু বালক ও প্রচারকদের এ যন্ত্রে ঘুরাইয়া বেড়ান।

যাহা হউক শান্তিপুরে এরূপ রাস হয় না। কেবল এক বাড়ীতে হইয়া থাকে, তাহাকে তাই "চাকফেরা" গোস্বামীর বাড়ী বলে। অন্যান্য স্থানে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি সজ্জিত খাটে স্থায়ী দেবালয়ে বহু সমারোহে পূজিত হইয়া থাকেন, এবং তৃতীয় দিবস নানাবিধ পৌরাণিক ও নৌতনিক পুতুলের শ্রেণীসহ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। এই উপলক্ষে সমস্ত নগরটি আনন্দে মাতিয়া উঠে। গোস্বামীদের বাড়ীতে

বহু শিষ্যের সমাগম হইয়া থাকে, এবং দুই রাত্রি খুব নৃত্যগীত হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবস ঐ নগর-পরিভ্রমণ বা 'ভাঙ্গা রাস' দেখিতে বহুদূর হইতে লক্ষ দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে, এবং এ সময়ে ওলাদেবীর যে রাস হয় তাহা সমস্ত বঙ্গদেশ ছড়াইয়া পড়ে। অতএব বহু দর্শক "এ দেশের রাসের" রস ভোগ করিয়া যমালয়ের রসভোগ করিতে যাত্রা করেন। শুনিলাম যাত্রীগণ শান্তিপুরের খালের কলুষিত জল পান করে, এবং পথ ঘাট সমস্ত কলুষিত ও নগর দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া শান্তিপুরে বহুদিন যাবৎ সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিয়া যাইয়া থাকে। শুনিলাম ওলাদেবী আয়ান রূপ গ্রহণ করিয়া এরূপে রাধাকৃষ্ণের ও তাহার সেবকগণের প্রত্যেক বৎসর রসভঙ্গ করিয়া থাকেন। যাহাতে তাঁহার শুভাগমন না হইতে পারে শারদীয় পূজার পর হইতে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। শৌচ কার্য্যের জন্য, নগর পরিষ্কারের জন্য, এবং রোগীদের শুশ্রূষার জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিলাম, এবং খালের জল স্পর্শ পর্য্যন্ত যাহাতে যাত্রীরা করিতে না পায়, পুলিসের পাহারা নিয়োজিত করিলাম। আদেশ প্রচার করিলাম যে যাত্রীগণ গঙ্গায় ভিন্ন অবগাহন, এবং গঙ্গার জল ভিন্ন পান করিতে পারিবে না। সপ্তাহ-কাল ঘোরতর পরিশ্রমের ফলে প্রথমতঃ এই হইল যে যাত্রীগণ যেখানে সেখানে শৌচ কার্য্য করিতে ও খালের জল পান করিতে ও তাহাতে অবগাহন করিতে না পারিয়া আমাকে অভিধান বহির্ভূত ভাষায় আপ্যায়িত করিতে লাগিল। রাসের তিন দিন, বিশেষতঃ ভাঙ্গা রাসের দিন, আমি প্রায় সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে কাটাইয়াছিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর শুনিলাম অপরাহ্ণ হইতে যথারুচি এক এক বাড়ীর রাসের "মিসিল" বাহির হইত, এবং উহা চলিয়া গেলে তাহার বহুক্ষণ পরে অন্য বাড়ীর 'মিসিল' বাহির হইত। এ কারণে কোনও রূপ পুলিসের

বন্দোবস্ত অসম্ভব হইত। কোন্ বাড়ীর রাসের পর কোন্ বাড়ীর রাস বাহির হইবে তাহার এক চির প্রচলিত পদ্ধতি আছে। উহার ব্যতিক্রম হইলে ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া থাকে, কারণ এই প্রচলিত প্রথানুসারে প্রথম বাড়ীর রাস বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি দ্বিতীয় বাড়ীর রাস বাহির হয়, তবে প্রথম বাড়ীর গোস্বামী উহা তাঁহার ঘোরতর অপমান মনে করেন। অথচ অনেক সময়ে দ্বিতীয় বাড়ীর কি তাহার পরের বাড়ীর গোস্বামীকে ক্লেশ দিবার জন্য প্রথম বাড়ীর রাস বহু বিলম্বে বাহির করা হয়। আমি এ সম্বন্ধেও নূতন ব্যবস্থা করিলাম। প্রত্যেক বাড়ীর রাস কোন্ সময়ে বাহির করিতে হইবে তাহার সময় নিরূপণ করিয়া দিলাম এবং এ আদেশ পালন করাইবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে পুলিস নিয়োজিত করিলাম। 'প্রসেসন রোডের' পার্শ্বে এক স্থানে আমার শিবির স্থাপন করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার কোনও কোনও বন্ধু সপরিবার রাস দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এ শিবিরে ছিলেন। সমস্ত মিউনিসিপেল কমিশনার, অনারারি মেজিষ্ট্রেট ও শান্তিপুরের প্রধান ভদ্রলোকদিগকে লইয়া আমি শিবিরের সম্মুখে এক দরবারে যথা সময়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া 'বার' দিয়া বীরসিংহ রায়ের মত বসিলাম। প্রথমতঃ বড় গোস্বামীর বাড়ীর রাস এ পর্য্যন্ত আসিলে আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এবং যাহাতে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাদের 'সঙ' বা পুতুল সজ্জা দেখিতে পান, তজ্জন্য একটুকু অপেক্ষা করিতে অনুনয় করিয়া বলিলাম। তাহারা জানিতেন না যে উহা আমার একটা কৌশল। আমার বিনয়ে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি কোন পুতুলের নিগূঢ় অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এবং তাঁহাদের শিল্পের ও কল্পনার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া সকলেরই আরও ব্যাখ্যা

করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। কোথায় পৌরাণিক ইন্দ্রের সভা, রাবণের সীতা হরণ, লবকুশের রামায়ণ গীত ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং কোথায় বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ও পারিবারিক বিভ্রাটের প্রহসন। আমি তাহাদের কবিত্ব পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতেছি। এ দিকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বাড়ীর রাস যথা নিয়মে আসিয়া যখন আমার আদেশমতে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া পুলিস ইন্‌সপেক্‌টার আমার কর্ণে বলিলেন, তখন আমি ইঁহাদিগকে খুব আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলাম। এখন শৃঙ্খলে গাঁথা মিসিল সকল ক্রমে ক্রমে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল এবং প্রত্যেককে আমি একটুক থামাইয়া প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলাম। পূর্ব্ব বৎসর পুলিসকে নানা স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত! এই মিসিলের শৃঙ্খলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের শৃঙ্খলও চলিতে লাগিল। একাক্রমে এই দীর্ঘ রাসের শ্রেণী দেখিতে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। এখন সকলেই আমার কৌশল ও উহার সার্থকতা বুঝিলেন, এবং একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। শেষ রাস আমার শিবির পার হইয়া গেলে, আমি আবার অশ্ব-পৃষ্ঠে কোথায়ও কোনও দুর্ঘটনা হইয়াছে কি না, এবং ইহার পর কোনও বিশৃঙ্খলা হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য জ্যোৎস্নালোকে বহির্গত হইলাম। এখন যাত্রী ও দর্শক দলে আমার জয় জয়কার ধ্বনি উঠিয়াছে। আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে লোক উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে যে শান্তি-পুরে রাসের এমন সুবন্দোবস্ত কখনও হয় নাই, এবং এমন সুখে কখনও শান্তিপুর রাস কেহ দেখে নাই। ওলাউঠা কি কোনও রোগ দেখা মাত্র দেয় নাই, এবং সমস্ত নগর রাসের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ পরিষ্কার। নগরবাসীগণ ইহার জন্য সর্ব্বত্র আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধ রাত্রিতে যখন শিবিরের চন্দ্র মস্তকোপরে শার্ব্বরীর সিংহাসনে অধিষ্টিত, আমি ধীরে ধীরে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জ্যোৎস্না

প্রোদ্ভাসিত সৈকতের উদ্যান বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার একটি বেরিষ্টার বন্ধুর মিসেস, মিস্ ও বাবাগণ রাস দেখিতে আসিয়াছিল। রাস কি তাহা বুঝা দূরে থাকুক হায়! কপাল! তাহারা বাঙ্গালা পর্য্যন্ত জানে না, ছেলে মেয়েগুলি এ দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে। আমি অশ্ব হইতে নামিবামাত্র আমার গলা জড়াইয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একজন সর্ব্বশেষ জিজ্ঞাসা করিল—"আঙ্কল! (কাকা) এ যে এত লোক আসিয়াছে ইহারা সকলে কি তোমার হুকুমের অধীন?" আমি বলিলাম—"হাঁ।" সে তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ওঃ মাই! তুমি আমার 'পাপা' হইতে অনেক বড় লোক।" সকলেই বড় হাসিলাম। সুন্দরের রসহীন কাঞ্চীপুরের বিস্ময়কর বিদ্যার দেশের রাস ফুরাইল। এরূপে শান্তিপুরের রাস দুই বৎসর আমার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কমিশনারগণ বলিয়াছিলেন নিয়মিত ব্যয়ে আমি আমার প্রণালীমতে রাস নির্ব্বাহিত করিতে পারিব না। তাহা করিয়া বরং মিউনিসিপেল রাস্তার পার্শ্বে যে দোকান বসিয়াছিল এবং যাহার ভাড়া পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট ভূম্যধিকারী কমিসনারগণ লইতেন, তাহা মিউনিসিপেলিটিকে দেওয়াইয়া আমি আরও কিছু আয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলাম।

শান্তিপুরে হইয়া থাকে 'কালার রাস', আর শ্রীচৈতন্য দেবের জন্ম ও লীলাভূমি নবদ্বীপে হইয়া থাকে 'কালীর রাস'! নবদ্বীপের জগাই মাধাই এর সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক পণ্ডিত মণ্ডলীর উৎপীড়নে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন্। খৃষ্টকে তাঁহার স্বদেশীয়েরা ক্রমে হত্যা করিয়াছিল। মানুষ হিংস্র ও অধম। এরূপ অন্ধকার খনিতে মণির আবির্ভাবই শ্রীভগবানের নীতি। পণ্ডিতপুঙ্গবেরা শচীর দুলালকে সন্ন্যাসী করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার প্রেমধর্ম্মের প্রতিবাদ করিবার জন্য দোল পূর্ণিমার বাসন্তী রাত্রিতে সাত আট হাত দীর্ঘ বিরাট কালী প্রস্তুত

করিয়া পূজা করেন। ইহার নাম রাখিয়াছেন 'রাসকালী'। আমাকে একজন নবদ্বীপবাসী শান্তিপুরের রাসের সময়ে নবদ্বীপের 'রাস' দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে 'রাসকালী' বা 'রাস কেলিটি' (rascality) দেখিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।

---

(২) কুলিয়ার মেলা।

কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে শান্তিপুরের রাস, এবং পৌষের কৃষ্ণা একাদশীতে কুলিয়ার মেলা। কখনও বা একদিন এক রাত্রি আর কখনও বা তিথি দুই দিন পড়িলে এই মেলা দুই দিন দুই রাত্রি হইয়া থাকে। কুলিয়া মেলার স্থান কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনুমান দুই মাইল ব্যবধান হইবে। মেলায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার যাত্রীর সমারোহ হইয়া থাকে এবং সমস্ত দিন রাত্রি কলিকাতা ও কাঁচড়াপাড়ায় স্পেসিয়েল ট্রেণ যাতায়াত করিতে থাকে। এই দুই মাইল পথও ঘোড়ার কি গরুর গাড়ীতে যাইবার ব্যবস্থা ছিল না। আমি প্রথমতঃ এই পথটি সংস্কার করিয়া গাড়ীর উপযোগী করিলাম। মেলা স্থানটি ক্ষুদ্র বৃক্ষছায়া সমাচ্ছন্ন কানন। তাহার এক প্রান্তে চৈতন্যদেবের খ্যাতনামা ভক্ত 'গোপাল চাপলোর' সমাধি। তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে গৌর নিতাইয়ের দুইটি সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত। তাহারই নিকটে শুষ্ক যমুনার গর্ভে একটি ক্ষুদ্র বাঁওড়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ত্রিশ চল্লিশ সহস্র যাত্রী ইহাতে তাঁহাদের তৈলাক্ত দেহ প্রক্ষালন করিতেন, এবং তাহারই জল পান করিতেন, এবং মেলাস্থলে ও তাহার চারি পার্শ্বে শৌচ কার্য্য করিতেন। মেলার অধিকারী গোস্বামীরা বিদেশবাসী। তাঁহারা কেবল মেলার দিনই যাত্রীগণ হইতে টেক্স আদায় করিতে আসেন, এবং মেলার পর

দিনই অদৃশ্য হন। সমস্ত বৎসর এ স্থানটির, কি ইহার বিগ্রহের সঙ্গে আর তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না। কাযেই মেলাস্থল পরিষ্কার রাখিবার কোনওরূপ বন্দোবস্ত হয় না। অতএব স্থানটি কি নরকে পরিণত হয় তাহা সহজে অনুমেয়। এজন্য এই মেলাটিও ওলাউঠার একটা উর্ব্বর ক্ষেত্র। আমি গোস্বামী মহাশয়দের ফৌজদারি আফিস হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া মেলার পূর্ব্বে রাণাঘাটে উপস্থিত করাইলাম, এবং বহু চেষ্টায় তাঁহাদের হইতে সামান্য অর্থ আদায় করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। বাঁওড়টি পানীয় জলের জন্য 'রিজার্ভ' করিলাম, এবং তাহার অদূরে অন্য একটি পুষ্করিণী স্নানের ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য নিয়োজিত করিলাম। তাহার পাড়ে দুটি স্থানে নর নারীর স্নানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, এবং রমণীদের স্নানের স্থান ঘেরিয়া দিলাম। ঘাটে বহু কলসি রাখিয়া দিলাম যেন জল তুলিয়া স্নান ও বাসন প্রক্ষালন কার্য্য পারের উপর করিতে কোনওরূপ ক্লেশ না হয়, এবং বাঁওড়ে ও এ পুষ্করিণীতে উপযুক্ত পুলিস প্রহরী রাখিলাম। মেলার উদ্যান একটি প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে স্থিত। উদ্যানটির চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিৎদূরে নিশান পুতিয়া দিয়া তাহার অভ্যন্তরে শৌচ কার্য্য নিষেধ করিয়া দিলাম, এবং রোগীর চিকিৎসার জন্য দূরে মাঠে একটি কুটির নির্ম্মান করিয়া ঔষধ সহ একজন ডাক্তার রাখিলাম।

মেলার দিনে প্রভাতের পূর্ব্ব হইতে ট্রেণের পর ট্রেণে ও নানা দিক হইতে যাত্রীর সমাগম আরম্ভ হইল। কাঁচড়াপাড়া হইতে পথ সংস্কার করিয়া দেওয়াতে ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। দেখিতে দেখিতে স্থানটি যাত্রীতে পূর্ণ হইল। অদূরে আমার শিবির। আমি প্রাতে শিবির হইতে ধীরে ধীরে ঘোড়ায় মেলাতে আমার কার্য্য প্রণালী কিরূপ চলিতেছে দেখিতে যাইতেছি। সম্মুখে একদল রমণী যাত্রী স্নান

করিয়া যাইতেছে। একটি বুড়ী আমার প্রতি পুষ্প চন্দন বর্ষণ করিতেছে। তাহার অভিযোগ এই যে—"কোথা হইতে এক আটকুড়র বেটা হাকিম আসিয়াছে। তাহার জন্য যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে শৌচকার্য্য করিতে পারিতেছে না, বাঁওড়ে স্নান করিতে পারিতেছে না। যে দিকে যায় সে দিকে পুলিসে 'হুড়ো' দিতেছে।" আর এক সঙ্গিনী বলিলেন—"অন্যায় কি করিয়াছে? অন্যান্য বৎসর এমন সময়েই দুর্গন্ধে তিষ্ঠান যাইত না। বাঁওড়ের জলের উপর এক রাশি ময়লা ও তেল ভাসিত, এবং সেই ময়লা জল খাইতে হইত। আর এ বৎসর সমস্ত স্থানটি ও বাঁওড়টি কেমন পরিষ্কার! এদিকে কেমন সুন্দর স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে! অন্যান্য বৎসর এ পুকুরটা পর্য্যন্ত নরক হইয়া থাকিত।" আমি দেখিলাম আমার সম্বন্ধে অভিযোগ ও সমর্থন উভয়ই এক সঙ্গেই হইল। আমি ধীরে ধীরে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া ঘোড়া চালাইয়া যাইতেছি দেখিয়া বুড়ী বলিল—"এই সেই হাকিম না কি? কি সর্ব্বনাশ! ও আমার কথা শুনে নাই ত?" বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল। আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"না বাছা! আমি কিছুই শুনি নাই।" আর অবগুণ্ঠনে স্ত্রীমণ্ডলী হাসিতে লাগিল। আমি তখন ঘোড়া ছুটাইয়া মেলাক্ষেত্রে আসিয়া নামিলাম। পদব্রজে ভিড়ের মধ্য দিয়া বাঁওড়ের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখি সেখানে এক দৃশ্য। এক প্রৌঢ়া প্রহরীদের সঙ্গে একটা গজ কচ্ছপের যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহার জিদ সে বাঁওড়ে স্নান করিবে, প্রহরীরা তাহা দিবে না। সে কোমরে তাহার অঞ্চল জড়াইয়া মহিষমর্দ্দিনী সাজিয়া এক এক বার জলের দিকে ছুটিতেছে! "আটকুড়ির বেটারা! আমাকে কেমন স্নান করিতে দিবে না দেখি"—বলিয়া তাহাদের গায়ের উপর ছুটিয়া পড়িতেছে। আর তাহারা দুই হাত বিস্তার করিয়া শ্রেণীবদ্ধ দাঁড়াইয়া

"দোহাই হাকিমের! দোহাই হাকিমের!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহাদের উপর কড়া আদেশ আছে যে তাহারা কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে পারিবে না। মুখে নিষেধ করিবে মাত্র। "রেখে দে; পোড়ারমুখোরা! তোদের হাকিম! আমি ঢের হাকিম দেখেছি!"—বলিয়া রমণী একবার কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া আবার চৌকিদারদের উপর বাঘিনীর মত ছুটিয়া পড়িতেছে। আবার তাহারা নিরুপায় হইয়া "দোহাই ধর্ম্মাবতারের! দোহাই হাকিমের" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। শত শত নর নারী জল লইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া এই অভিনয় দেখিতেছে, এবং রমণীকে তিরস্কার করিতেছে। সে তাহাদের উপরও গালি বর্ষণ করিতেছে এবং বলিতেছে যে সে প্রত্যেক বৎসর মেলাতে আসিয়া এই ঘাটে স্নান করিয়া থাকে। এবারও করিবে; কোথাকার হাকিম এবং পোড়ার মুখো মিন্‌সেরা তাহাকে বারণ করে সে দেখিবে। আমি জনতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে-ছিলাম। দেখিলাম মহিষমর্দ্দিনীর দ্বারা পুলিস প্রহরীরা মর্দ্দিত হইয়া হয়রান হইয়া পড়িল। সে বারবার তাহাদের আক্রমণ করিতেছে, এবং বার বার তাহারা আমার দোহাই মাত্র দিয়া তাহাকে বারণ করিতেছে। কিছুক্ষণ এই তামাসা দেখিয়া আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—"ধর! মাগীকে ধর!" প্রহরীরা আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওই হাকিম আসিয়াছে। মাগি! দাঁড়া!" যেই তাহারা তাহাকে ধরিতে গেল, সে লোকের পায়ের ভিতর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া দৌড় মারিল। সমস্ত নরনারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং বলিল—"বাবা! এমন মেয়ে মানুষ দেখি নাই। এতগুলি পুলিসকে মাগী এতক্ষণ হেস্তনেস্ত করে এখন যেন বাঘ দেখে পালায়েছে।" প্রহরীরা তাহাকে ধরিতে ছুটিয়া যাইতেছিল, আমি নিষেধ করিলাম। আমি যাত্রীদের জিজ্ঞাসা

করিলাম এই পুষ্করিণী কেবল পানের জন্য রাখাতে তাহাদের কি কোনও কষ্ট হইতেছে। তাহারা একবাক্যে বলিল—"কিছুই না। বরং বড় ভাল হইয়াছে। এমন সুবন্দোবস্ত কুলিয়াতে কখনও হয় নাই। অন্যান্য বৎসর এই প্রাতঃকালেই এই পুষ্করিণীর জল অপেয় হইত, এবং যাত্রীদের বড়ই কষ্ট হইত।" কেবল একজন তৈলাক্ত গোস্বামী ঠাকুর বলিলেন—"বাবা! ঘাটে স্নান করিতে না দেও, যদি কোণটায় আমাকে একটুক স্নান করিতে দেও।" আমি বলিলাম চৈতন্য ভাগবতে কই গোস্বামীদের জন্য এরূপ স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা ত নাই।

আমার সকল বন্দোবস্ত কলের মত চলিতেছে দেখিয়া আমি মধ্যাহ্নে শিবিরে ফিরিলাম। অপরাহ্ণে দেখিলাম মেলাক্ষেত্রে শত শত চাদর ও সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া যাত্রীগণ হরিনাম করিতেছে। হরিনামের ধ্বনিতে স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সৌখিন হরিভক্তের দলও আসিয়াছেন, এবং সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া তাহার সম্মুখে কলিকাতার দোকানদারদের মত "সাইন বোর্ড" উড়াইয়াছেন। কোনটায় লেখা আছে—'বউবাজারের হরিবোলার দল', কোনটায় 'বাগবাজারের হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহারা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনিতে অনুরোধ করিলেন। দু চার মিনিট দাঁড়াইয়া তাঁহাদের হরিভক্তির বা ইয়ার্কির অভিনয় দেখিয়া জ্বালাতন হইয়া সন্ধ্যার সময় শিবিরে ফিরিলাম। শান্তিপুরের কীর্ত্তন শুনিতে চাহিলে আমাকে গোস্বামীরা বলিলেন মাঘ কি কোন মাসে বঙ্গদেশের বিখ্যাত কীর্ত্তনীরা অদ্বৈত প্রভুর স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে এক মাস কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাঁহারা সে সময়ে আমাকে কীর্ত্তন শুনাইবেন। আমাকে সংবাদ দিয়া মিউনিসিপেল-গোস্বামী যথা সময়ে কীর্ত্তনে আমার অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

শুনিলাম তখন বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'কীর্ত্তনীরা' গান করিতেছিল। কিন্তু শুনিয়া আমার হৃদয় প্রেম ও ভক্তিতে আর্দ্র না হইয়া বরং যৎকিঞ্চিৎ প্রেমভক্তি যাহা ছিল তাহাও শুকাইয়া উঠিল। গায়কের শরীরের কাছেও ভক্তি নাই। সে কেবল তাহার ওস্তাদি বাহির করিতেছে। আমি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল থাকিয়া উঠিয়া আসিলাম। পোড়া বাঙ্গালা দেশে কিছু একটা ভাল জিনিস দেখা দিলে তাহা দেখিতে দেখিতে 'হুজুকে' পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্য দেবের যে কীর্ত্তনে কেবল 'নদে শান্তিপুর' নহে উৎকল পর্য্যন্ত প্রেমে ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই কীর্ত্তন শেষে নেড়ানেড়ীর কীর্ত্তনে পরিণত হইয়া প্রায় ৪০০ চারি শত বৎসর একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল। আবার ইদানীং সেই কীর্ত্তনের তরঙ্গ পুনরায় বঙ্গদেশে উত্থিত হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহা ইতিমধ্যেই একটা হুজুকে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থানে উহা বদমায়েসির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুলিয়ার মেলায়ও তাহার অভাব ছিল না। অতএব বড় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিরে ফিরিয়াছিলাম।

তবে স্থানে স্থানে দরিদ্র যাত্রীগণের ভক্তি প্রণোদিত কীর্ত্তন কাণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু পুলিসের উৎপাতে আমি উহা শুনিতে পারি নাই। আমাকে দেখিলেই পুলিস পোষাকধারীরা যে "সরে দাঁড়া! সরে দাঁড়া! হাকিম!" বলিয়া লোক ঠেলিতে আরম্ভ করিত, অমনি গায়কেরা ভয়ে কীর্ত্তন বন্ধ করিত। অতএব সন্ধ্যার পরে আমি সামান্য বাঙ্গালির পোষাক পরিয়া এবং অলোয়ানে মুখ ঢাকিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে মেলায় প্রবেশ করিলাম। আমার দুই উদ্দেশ্য,—এরূপে গুপ্তভাবে পুলিস নিয়োজিত কার্য্য করিতেছে কি না তাহা দেখিব, এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন শুনিব। মরি! মরি! মেলার এখন কি অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে। সমস্ত আম্র কাননটি শত শত দীপালোকে

প্রদীপ্ত, ঘন ঘন হরিনাম ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক—সকলেরই মুখে হরিনাম! এবার কয়েক স্থানে গোপনে যাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিয়া শেষে একজন গোস্বামীর সামিয়ানার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে সেখানে যাত্রীর বড় ভিড়। আমি সেই ভিড়ে প্রবেশ করিয়া কি দৃশ্যই দেখিলাম! একজন দীর্ঘ স্থূল শ্যাম কলেবর গোস্বামী একখানি ভাগবত সম্মুখে বসিয়াছেন। তাঁহার চারি দিকে চারিজন বৈরাগী হাঁটু পাতিয়া খোল বাজাইতেছে এবং মুখে কেবল হরেক্লষ্ণ বলিয়া বোল আওড়াইতেছে। খোলেও যেন ঠিক হরেক্লষ্ণ বলিতেছে। গোস্বামী থাকিয়া থাকিয়া ভাবে মাথা নাড়িতেছেন। বাদ্য শেষ হইলে তিনি নাম কীর্ত্তন ধরিলেন। নানা-রূপ পদ যোগ করিয়া কেবল “শান্তিপুরের সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র” পদটি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল গাইলেন। তিনি একবার নমস্কার করিতেছেন, একবার জানু পাতিয়া বসিতেছেন, একবার উন্মাদের মত উঠিয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া কি মধুর কণ্ঠে “আহা! আহা!” করিতেছেন। সেই পৌষের দারুণ শীতে তাঁহার স্বেদ ধারা অশ্রুর সহিত কপোল বাহিয়া পড়িতেছে। সমবেত ভক্তগণ গড়াগড়ি দিতেছে, এবং চারি দিকে সহস্র দর্শকমণ্ডলী নীরবে এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতেছে। এতদিন পরে আমি প্রক্লত কীর্ত্তন শুনিলাম, প্রক্লত কীর্ত্তনের দৃশ্য দেখিলাম। চৈতন্যদেব কিরূপ কীর্ত্তনে পাষাণ দ্রব করিতেন তাহা বুঝিলাম। আমি আপনি আত্মহারা হইয়া এই কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আমার মস্তক হইতে আলোয়ান পড়িয়া গিয়াছিল। এক হতভাগা কনেষ্টবল আমাকে চিনিয়া ছুটিয়া আসিয়া “তফাৎ! তফাৎ!” করিয়া উঠিল, আর আমারও কীর্ত্তন শুনা ফুরাইল। শুনিলাম ইনি একজন খড়দহের গোস্বামী, নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান।

কবিগুণ্ডেই গজমুক্তা ফলে। বুঝিলাম প্রভুপাদ নিত্যানন্দের রক্তের মাহাত্ম্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সমস্ত রাত্রি এই অর্দ্ধ লক্ষ লোকের হরিনামের ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল। যাত্রীগণ সমস্ত দিন ও রাত্রি উপবাস করিয়া হরিনাম গাইয়া কাটাইল। ইহাকে কুলিয়ার 'হরি বাসর' বলে। এ ভক্তির উচ্ছ্বাসে মহাপাপিষ্টেরও হৃদয় আর্দ্র হয়। ইহাই তীর্থ দর্শনের ফল।

পর দিন প্রাতে মন্দিরের মালপো ভোগের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। গোস্বামীরা আপনার আপনার শিষ্যদের বলিদানের ছাগলের মত লইয়া গিয়া মালপো ও পয়সা আদায় করিতেছেন। একটি গরিব শিষ্যকে মালপোর মালসা হস্তে দুই গোস্বামী টানাটানি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে; এবং উভয়ে তাহাকে ও পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন দিতেছে, অর্থাৎ প্রহার করিতেছে। বহু যাত্রী হাহাকার করিতেছে ও ভর্ৎসনা করিতেছে। এরূপ গোস্বামীদের গো শব্দের অর্থ গরু। শিষ্যেরা নিতান্ত গরু না হইলে আর এরূপ নর পিশাচকে গোস্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে কেন? অথচ ব্রাহ্মণদের ন্যায় এই গোস্বামীদেরও চরম অবনতি ঘটিয়াছে। আমি দুই প্রভুকে দুই কনেষ্টবলের প্রেমালিঙ্গনে অর্পণ করিলাম, এবং বিচারার্থ আমার শিবিরে যথা সময়ে উপস্থিত করিতে আদেশ দিলাম। মেলাক্ষেত্রে এই খবর যেন তারশূন্য টেলিগ্রাফে প্রচারিত হইল। তখন পালে পালে গোস্বামীরা আসিয়া আমার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ভক্তিভাজন লোক আমার ভর্ৎসনা শুনিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের দুর্গতির কথা বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিলেন, এবং তাঁহাদের মুখ রক্ষার জন্য পাপিষ্ঠ দুটিকে ছাড়িয়া দিতে আমার দুই হাত জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তখন তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু তাঁহাদের মেলাক্ষেত্রের বাহির করিয়া

দিতে আদেশ দিলাম। মেলাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র আমার সুবন্দোবস্তের জন্য সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন হইতে কুলিয়ার হরিবাসরের মেলা ভাঙ্গিতে লাগিল।

এই মেলায় আমি খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেনের জননী দেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার দীর্ঘ তেজস্বিনী দেবী মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলাম যে এমন মাতা না হইলে এমন পুত্র হয় না। এই মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া গেল। আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলাম—"মা! কেশব বাবু আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, এবং কৃষ্ণবিহারী আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি আপনার পুত্র। আপনি আমার শিবিরে চলুন!" সঙ্গে আমার স্ত্রী নাই। বিশেষতঃ তিনি মন্দিরের নিকটে থাকিতে চাহেন বলিয়া, আমাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। শুনিলাম তিনি বৎসর বৎসর আসিয়া মন্দিরের ছায়াতে 'হরিবাসর' কাটাইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের মাতা বৈষ্ণবদের পৌত্তলিক মেলায় আসিয়াছেন—অপূর্ব্ব সমাচার। কেশব বাবু অজাতশ্মশ্রু যুবকদের পালে পালে 'নিরাকারিক' করিয়াছেন, আর তাঁহার আপনার বৃদ্ধা জননী 'সাকারিক বা পৌত্তলিক!' প্রতাপ বাবুর রচিত কেশব বাবুর জীবনীতে তাঁহার মাতার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণের বর্ণনা পাঠে অশ্রুপাত করিয়া সেইখানে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—"মাতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কে শিশু ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ব্বাণ।" দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মরা এ কথা বুঝিতেছেন না। বেদান্তমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যথা আজ অর্দ্ধেক শিক্ষিত হিন্দু খৃষ্টান হইত। কেশব বাবু তদানীন্তন খৃষ্টধর্ম্মের প্রাবল্যে বেদান্তমূল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা খৃষ্টধর্ম্মের

স্রোতে এরূপ বেগে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার "যিসাস ক্রাইষ্ট ইউরোপ ও এসিয়া" বক্তৃতার পর তাঁহার খৃষ্টান হইবার বড় বাকী নাই বলিয়া মিশনারিরা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। তাহার পর ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের আকর্ষণে পড়িয়া কেশব বাবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং রামকৃষ্ণের ধর্ম্মই 'নব বিধান' নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। একবারে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলে, ২০ বৎসর যাবৎ তিনি যাহাদের হিন্দু সমাজচ্যুত করিয়া বিজাতীয় পথে লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাকে লাঞ্ছনার এক শেষ করিবে, এবং কার্য্যও পণ্ড হইবে বুঝিয়া তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম্মে হরি, শিব, লক্ষ্মী,সরস্বতীকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্রবেশ করাইতে ছিলেন। তিনি টাউনহলের এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বলেন—"আমরা পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা (spirit) গ্রহণ করিব, এবং মূর্ত্তি (form) অস্বীকার করিব।" তিনি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার ভরসা ছিল যে মূর্ত্তিগুলি যে ধর্ম্ম শিক্ষার অক্ষর, এবং তাহাদেরও প্রয়োজন আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কে নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া এবং 'প্রকৃত-ধর্ম্ম' সংস্থাপন করিয়া হিন্দুদের গৃহে ভারতপূজিত কেশবের যুগ-অবতার বলিয়া গৃহীত ও পূজিত হইতেন। ভারতের দুরদৃষ্ট ভারতের ক্ষণজন্মা পুরুষেরা প্রায় সকলেই তাঁহাদের জীবনের কার্য্যের আরম্ভে তিরোহিত হইয়াছেন।

---

(৩) ঘোষপাড়ার মেলা।

ঘোষপাড়া কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুলিয়ার অপর দিকে অনুমান দুই মাইল ব্যবধান। উৎকৃষ্ট পাকা বাঁধা প্রশস্ত পথ— ঘোষপাড়া 'কর্ত্তাভজা' সম্প্রদায়ের পীঠস্থান। প্রবাদ এইরূপ, যে

সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব লীলাচল হইতে তিরোহিত হন, ঠিক সে সময়ে উলার কোনও পানের বরজে একটি সুন্দর অজ্ঞাতকুলশীল শিশু পাওয়া যায়। বারুই তাহাকে প্রতিপালন করে। অষ্টম বৎসর বয়সে শিশু পলায়ন করিয়া বিক্রমপুর গিয়া দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করে। তাহার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনিই বাবা আউলচাঁদ বলিয়া খ্যাত হন। তাঁহার বাইশ জন শিষ্য হয়—কর্ত্তাভজার প্রবাদ মতে, "এক গাভী তার বাইশ বাছুর"। ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল তাহাদের মধ্যে প্রধান। আউলচাঁদের তিরোধানের পর রামশরণ পাল 'কর্ত্তা' বলিয়া আউলচাঁদের সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত হন। ঘোষপাড়ায় তাঁহার ও তাঁহার পত্নী 'সতীমাইর' সমাধি আছে। তাই ঘোষপাড়া 'কর্ত্তাভজাদের' তীর্থস্থান। রামশরণ পালের পুত্র রামদুলাল পাল কতকগুলি সাঙ্কেতিক সঙ্গীত রচনা করিয়া যান। অদীক্ষিত লোক তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারে না। উহা 'কর্ত্তাভজাদের' একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বা বেদ। এখন রামশরণ পালের দুই বংশধর আছেন। দুইটিই মহা মূর্খ। তথাপি ইঁহারা উভয়ই বর্ত্তমান 'কর্ত্তা'। তাঁহারা সেই সমাধি বাড়ীতেই বাস করেন। বাড়ীর সম্মুখে একটি সুন্দর বিস্তৃত আম্র কানন। তাহারই পার্শ্বে তদপেক্ষা আধুনিক একটি লিচুবন। এই আম্র কাননে দোল পূর্ণিমার সময় তিনদিনব্যাপী মেলা মিলিয়া থাকে। আম্রকাননের অপর দিকে একটি সামান্য পুষ্করিণী। নাম 'হিম সাগর'। উহা কর্ত্তাভজাদের গঙ্গা। তাহাতে মেলার সময়ে অনুমান দুই তিন হাত পরিমাণ জল মাত্র থাকে। এই জলে ত্রিশ চল্লিশ হাজার যাত্রী অবগাহন করে, এবং সেই জলই পান করে। অতএব ঘোষপাড়ার মেলাও ওলাদেবীর একটি লীলাভূমি। মেলার পূর্ব্বে শীতের সময়ে আমি কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটস্থ ভাগিরথী সৈকতে

শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, এবং সে সময়ে এই মেলাক্ষেত্র দেখিয়া গিয়াছিলাম। অতএব মেলার পূর্ব্বে কর্ত্তাযুগলকে তলব দিয়া তাহাদের গলা টিপিয়া বহুকষ্টে ৫০০৲ টাকা আদায় করিয়া পানীয় জলের জন্য একটি সুন্দর 'ইন্দারা' কাটাইতে আরম্ভ করিলাম। গঙ্গা প্রায় দুই মাইল সরিয়া যাওয়াতে শুধু মেলায় নহে, গ্রামটিতেও অত্যন্ত জল-কষ্ট হইয়াছে! মেলার প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে গিয়া আমি সমস্ত বন্দোবস্ত নূতন ভাবে করিলাম। দোলের পূর্ব্ব দিন প্রভাতের বহুপূর্ব্ব হইতে যাত্রী সমাগম আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে ঘন ঘন 'স্পেশিয়াল' আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেলাভূমি পূর্ণ হইতে লাগিল। আমি হিমসাগরে স্নান বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহার তীরে নর নারীর স্নানের স্বতন্ত্র স্থান নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এখানেও যাত্রীগণ পুষ্করিণীতে নামিয়া স্নান করিবার জন্য পুলিসের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ করিল। তাহা নিবারণ করিলে কেহ কেহ বলিল যে হিমসাগরে স্নান করিতে 'মানস' করিয়াছে। স্নান করিতে না পারিলে ধর্ম্মে পতিত হইবে। আমি তাহাদিগকে স্নান করিতে দিলাম, এবং অবশিষ্ট যাত্রীদের জন্য হিমসাগর জল মাথায় মাত্র দিলে যথেষ্ট হইবে বলিয়া 'কর্ত্তাদের' ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কাছে ব্যবস্থা লইলাম। তথাপি যাহা জল ছিল তাহা কর্দ্দমাক্ত হইল। তখন যাত্রীগণ আপনারা পানীয় জলের জন্য 'ইন্দারায়' পালে পালে ছুটিতে লাগিল। আমি তাহাদের জলের সুগমের জন্য ভগীরথ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি ইন্দারা হইতে গঙ্গা আনিয়া ইঁহাদের কলসির মুখে উপস্থিত করিয়া দিতেছিলেন। আমি ইন্দারার পার্শ্বে একটা 'হাওজ্' (ক্ষুদ্র জলাধার) প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, এবং গোয়ালা নিয়োজিত হইয়া উহা দিন রাত্রি জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেছিল। তাহার মুখে কলের জল-স্তম্ভের মুখের মত কয়েকটি

'ট্যাপ' ছিল। তাহার মুখে কলসি বসাইয়া যাত্রীরা যথেচ্ছা জল লইয়া যাইতেছিল। জলের এই নূতন বন্দোবস্তে মেলাক্ষেত্রে একটি আনন্দের কোলাহল উঠিল। তাহার পর আরও একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। যাত্রীগণকে তিন দিন এই আম্রকাননে রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। যাত্রী যে যেখানে আসন লইয়াছে, সে সেখানেই রন্ধন করে, এবং সেখানেই গর্ত্ত করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ভাতের মণ্ড ফেলিত। উহা তিন দিনে পচিয়া মেলাস্থান দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া ওলাদেবীকে আহ্বান করিয়া আনিত। আমি এ বৎসর আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম যে তাহারা ভাতের মণ্ড হাঁড়িতে ফেলিবে, এবং সেই মণ্ড তৎক্ষণাৎ আমার নিয়োজিত কুলিরা উঠাইয়া লইয়া মেলার বহুদূরে এক গর্ত্তে পুতিয়া ফেলিবে। ইহাতে মেলাক্ষেত্র তিন দিন যাবত চমৎকার পরিষ্কার ও পবিত্র ছিল। এতদ্ভিন্ন শৌচাদির ও রোগীর জন্য ডাক্তার ও অস্থায়ী হস্‌পিটেলের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এ সকল বন্দোবস্তের ফলে এ বৎসর ওলাদেবী মেলাক্ষেত্রে দর্শন দিলেন না। অতএব কি ডাক্তার কি হাঁসপাতাল কেহই ব্যবহারে আসে নাই।

মেলার প্রথম দিবস সমস্ত অপরাহ্ন মেলার স্থান পর্য্যটন করিয়া আমার সমস্ত ব্যবস্থা কলের মত চলিতেছে দেখিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসি; আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা যদি কখনও মেলায় পদার্পণ করিতেন, ওলাদেবীর ভয়ে তাঁহারা বহুদূরে শিবির স্থাপন করিতেন। আমি লিচু বাগানের প্রান্তে এবং মেলার সীমাস্থানে তাঁবু ফেলিয়াছি। সন্ধ্যার সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিদায় দিয়া কিঞ্চিৎ রাত্রি হইলে ধড়াচূড়া ছাড়িয়া রাত্রির ব্যবস্থা কিরূপে চলিতেছে গোপনে দেখিবার জন্য সাধারণ বাঙ্গালি বেশে মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি—সম্মুখে ও কে? দোলপৌর্ণমাসীর দিগন্ত

প্রোজ্জাসী জ্যোৎস্নায় চারি দিকের বিস্তীর্ণ মাঠ ও গ্রাম্য-দৃশ্য হাসিতেছে। সম্মুখে মেলাক্ষেত্রে বৃক্ষছায়ায় জোনাকির মত অনন্ত উননের ও দীপের আলো জ্বলিতেছে। লোক কোলাহল, এবং স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিতেছে। বাসন্তী পূর্ণিমার ফুল্ল জ্যোৎস্নায় মেলাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ও কে? এ কি রমণী, না স্বয়ং বাসন্তী পূর্ণিমা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণা! রমণী আধুনিক বেশে সজ্জিতা। শুভ্র সুন্দর সাড়ীর অভ্যন্তরে সাটিনের জেকেট। দীর্ঘ দেহলতা যৌবনসুলভ কুসুম স্তবকে লীলায় শোভিতা। নিটোল দীঘল মুখ, আয়ত লোচন, ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ, সুনাসা। দেহাবয়ব কোনও দক্ষ শিল্পকর অমল সুবর্ণে গড়িয়াছে। বিপুল কবরী ন্যস্ত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি, তদুপরি শুভ্র সুন্দর-পাড়-যুক্তবসনপ্রান্তের শোভা। রমণীর সুন্দর ঈষৎ হাসি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইতেছে। রমণী একাকিনী মেলাপ্রান্তে আমার শিবির সম্মুখে অদূরে নিরেট জ্যোৎস্নার প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া একটি বালককে পুষ্পনিভ দক্ষিন কর প্রসারিত করিয়া আমার শিবির দেখাইয়া বলিতেছে—"ওই হাকিমের ডেরা। উহার পেছনে চাকরেরা আছে। ঘুরিয়া ঐ দিক দিয়া যা!" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে?"

উ। আমি যে হই!

প্র। তুমি কি যাত্রী?

উ। হাঁ, আমি যাত্রী।

প্র। তুমি এখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া কি করিতেছ?

উ। ঐ ছেলেটি হাকিমের জন্য দুধ লইয়া আসিয়াছে। কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতেছিলাম।

প্র। তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

উ। যেখানে থাকুক!

প্র। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

উ। তাহাতে আপনার প্রয়োজন?

প্র। আমি তোমার পরিচয় চাহি।

উ। আত্মপরিচয় দেওয়া আমাদের কুলধর্ম্ম নহে। নারী জাতির আবার পরিচয়ই বা কি?

রমণী ঈষৎ হাসিতে অধরোষ্ঠের গোলাপী শোভা জ্যোৎস্নালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া এ উত্তর দিল। আমি বুঝিলাম এ বঙ্কিমবাবুর বিমলাই বটে।

প্র। তোমার পরিচয় না দিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না।

উ। আপনার কি জোর করিয়া স্ত্রীলোকের পরিচয় লইবার অধিকার আছে?

প্র। যদি থাকে?

উ। তবে থাকুক। আমি চলিলাম।

আমি আমার হাতের "রাইডিং কেন" বা ঘোড়া চালাইবার ক্ষুদ্র সুন্দর ছড়িটি উঠাইয়া বলিলাম—"সাবধান্! তুমি আর এক পা এগোবে কি আমি ওই কনেষ্টবলকে তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিব।"

যুবতী ছদ্ম গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া একটুকু বক্রহাসি হাসিয়া নম্রভাবে বলিল—"আপনি কি মনে করেন আমি আপনাকে চিনি না। আমি আপনার সমস্ত বহি পড়েছি। আপনাকে একবার দেখ্‌তে আমার বহু দিনের সাধ ছিল! আপনি এই মেলায় এসেছেন শুনে, তাই আপনাকে একবার দেখ্‌তে এই মেলায় এসেছি। আপনি যতক্ষণ আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ব'সে তাঁবুর বারাণ্ডায় গল্প কচ্ছিলেন, আমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া আপনাকে দেখেছি।"

আমি বিস্মিত হইলাম। তাঁহার এখানকার ভাব ও ভাষায় আমার বোধ হইল যে, তিনি কোনও পুরমহিলা এবং একটি শিক্ষিতা রমণী। আমার তাঁবুতে আসিতে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। আমার পরিবার সঙ্গে আছে কি না তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সেই রাত্রির ট্রেণে আসিবেন বলিলে তিনি তাঁবুতে থাকিতে অসম্মতা হইলেন। বলিলেন এরূপ অবস্থায় তিনি কেমন করিয়া আসিবেন। পরিবার থাকিলে তিনি আনন্দের সহিত কবিপত্নীরও সাক্ষাৎলাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেন। আমি বলিলাম তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি একটু অপেক্ষা করিলেই স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি বলিলেন লোকে দেখিলে কি বলিবে? আমি বলিলাম যে তাঁবুর পশ্চাত দিকে এক কক্ষ আছে। কেহ আসিলে তিনি সেই কক্ষে অপেক্ষা করিতে পারিবেন। ইচ্ছা হয় সেই কক্ষের পার্শ্বের দ্বার দিয়া মেলায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। কেহ দেখিবে না। তিনি—"আপনার ভৃত্যেরা?" আমি—"তাহারা তাঁবুর পশ্চাতে থাকে।" তিনি অধোমুখে কি ভাবিলেন। এই ভাবই বা কি সুন্দর! মাথা তুলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! তবে চলুন।" উভয়ে শিবিরে আসিলাম। উজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি বড় সসম্ভ্রমে কিছু দূরে একখানি চেয়ারে বসিলেন। কিছু ক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ হইল। দেখিলাম বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা। তিনি জলের মত মাইকেলের, হেমবাবুর, ও আমার কবিতা এবং বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের স্থানে স্থানে আওড়াইলেন, এবং সমালোচনা করিলেন। কিছু জলযোগ করিতে আমি বিশেষ অনুরোধ করিলেও বড় শিষ্টাচারের সহিত তাহা অস্বীকার করিলেন। এখন আর সেই বিমলার ভাব নাই। তিনি লজ্জাশীলা, মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী,

কুলরমণী। কিন্তু আমি আবার যেই তাঁহার পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিলাম, তিনি আবার সেই প্রখরা, বাকচতুরা রসিকা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

আমি। আপনি কি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন ?

তিনি। হাঁ, কলিকাতা হইতে।

আমি। আপনি কলিকাতায় কোথায় থাকেন।

তিনি। ৭৪ নং চিৎপুর রোড। এখন পরিচয় পেলেন।

আমি। সেখানে আপনি কি করেন ?

তিনি। আপনি একজন বিখ্যাত কবি ও বিচক্ষণ হাকিম, আপনার কি বিশ্বাস হয় ?

আমি। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

তিনি। আপনার বিশ্বাস হয়েছে ত আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি ?

আমি। আপনি যখন বল্‌ছেন তখন আমি অবিশ্বাস করিবো কেন ?

তিনি। তবে বিশ্বাস করুন আমি এ জীবনে কলিকাতায় যাই নাই।

আমি অপ্রস্তত হইয়া নীরব হইলাম, ও তাঁহাকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি কে তাহা জানিবার জন্য আমি নিতান্ত লালায়িত হইয়াছি। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সেই দীঘল নিটোল মুখ, সেই দীর্ঘ দেহ ও চতুর ভাব দেখিয়া আমার এক সন্দেহ হইল যে বেশান্তরে সুসজ্জিতা তিনি সেই চক্রবর্ত্তীর কুলত্যাগিনী পত্নী নহেন ত ? তিনি অধোবদনে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। আমি বলিলাম— "তুমি কি সেই চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী ? তুমি কি রাণাঘাট থেকে এসেছ ?"

তিনি মস্তক তুলিয়া এবার খুব হাসিয়া মরালবৎ গ্রীবা ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"হাঁ গো হাঁ! আমি সেই চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী। এই দেখুন দেখি আপনি আমাকে চিনেও এতক্ষণ চিন্‌লেন না? কবি হউক, আর হাকিম হউক, পুরুষ মানুষ কিছুই নহে।"

আমি—"বটে!" বলিয়া চুপ করিয়া আবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে বাহিরে "নবীন! নবীন!" ডাক পড়িল। রমণী চকিতা হংসিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। 'হুজুর' নহে, 'ধর্ম্মাবতার' নহে, একবারে সোজাসুজি 'নবীন'—এ বাপু আবার কে? রমণীকে পশ্চাতের কক্ষে রাখিয়া আমি বাহির হইয়া দেখি—বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈলোক্য দাদা! "আমি বসে ভাব্‌ছি মালতী, এসে উপস্থিত বিদ্যা-ভূষণ!" করমর্দ্দন ও কোলাকুলির পর দাদাকে শিবিরে আনিলাম। তিনি বলিলেন তিনি বসিবেন না, মেলা দেখিতে যাইবেন। তাঁহার জন্য বিশুদ্ধ বামনের ভাজা বিশুদ্ধ লুচি ও তরকারী বিশুদ্ধ বামনের দ্বারা আনাইয়া রাখিতে হইবে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাহা খাইয়া চলিয়া যাইবেন।

আমি। ব্যাপারখানি কি দাদা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বরূপ ঘোষ-পাড়ায় অবতীর্ণ কেন?

তিনি। আরে রাখ্‌! তোর কবিগিরি রাখ্‌! এখন এ কর্‌বি কি না বল্‌?

আমি। ময়রার, লুচির, তরকারির, বাহকের বিশুদ্ধতা আমি কিরূপে পরীক্ষা কর্‌বো? এ যে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ পরীক্ষা হ'তেও কঠিন পরীক্ষা।

তিনি। ছোক্‌রা এখন হাকিমি কচ্ছিস্; আর এ সামান্য কাজটুক পার্‌বি না! বল্‌, বল্ সব তৈয়ের রাখ্‌বি?

আমি। আচ্ছা ; হুকুম তামিল করবো। কিন্তু ব্যাপারখানা কি ? তুমি মেলা দেখ্‌তে যাবে, আমি মেলার কর্ত্তা সঙ্গে গেলে যেরূপ তুমি দেখ্‌তে পাবে, একা গেলে কি পাবে ?

তিনি। তোর আর কর্ত্তাগিরি কর্ত্তে হবে না। আমি বছর বছর এ মেলায় আসি। তোর আর আমার 'গাইড' হ'তে হবে না।

আমি। সে কি ? তুমি কি দাদা তবে কর্ত্তা-ভজা ?

"তোর সে কথায় প্রয়োজন কি ?"—বলিয়া তিনি ছুটিলেন। আমি তদপেক্ষা বেগে পশ্চাৎ কক্ষে ছুটিয়া গিয়া দেখি সুন্দরী চিকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমাদের রসালাপ শুনিয়া হাসিতেছেন। আবার আমার পীড়াপিড়িতে সম্মুখের কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছিলাম যে আমার এখানে আসা উচিত হবে না। লোকটি আমাকে দেখে নাই ত ?" আমি বলিলাম তাহার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বলিলেন এরূপ অবস্থায় তিনি আর আমার স্ত্রীর সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিবেন না। এ ভদ্রলোক এখনই ফিরিয়া আসিতে পারে। বিশেষতঃ ট্রেণের সময়ও অতীত হইয়াছে। আমার স্ত্রী বোধ হয় আসিলেন না। অতএব তিনি যাইতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"আপনার মনে বোধ হয় আমার সম্বন্ধে একটা ঘৃণিত বিশ্বাস হয়েছে। হইবারই কথা। তবে এ কথা বিশ্বাস করুন যে আমি কোনও চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী নহি। আমি রাণাঘাটে কখনও যাই নাই। আপনি শত চেষ্টা করিলেও আমার পরিচয় পাবেন না। আপনি পুলিস লাগিয়ে দিয়ে আমার পরিচয় পেতে চেষ্টা করবেন না, আপনার কাছে আমার এ ভিক্ষা। আপনি কুলিয়ার মেলায় তাঁবু ফেলে থাকেন কি ?" উত্তর—হাঁ। "তবে আগামী কুলিয়ার মেলায় আমি আপনার সঙ্গে ও আপনার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আপনি তাহার পূর্ব্বে আমার

পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করিবেন না। আর আমার মত ক্ষুদ্র রমণীর পরিচয় আপনার জানিবারই বা প্রয়োজন কি ? আমার মত কত শত সহস্র রমণী আপনার কবিত্বের ও প্রতিভার পূজা করে। একবার আপনাকে দেখ্‌তে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঈশ্বর আমার সেই সাধ পূর্ণ কর্‌লেন। এ সন্ধ্যাটি আমার জীবনের একটি বড় সুখের ও গৌরবের সন্ধ্যা। আমি মনে মনে যেরূপ কল্পনা করেছিলাম তাহার অধিক দেখ্‌লাম। আমি চিরদিন আপনার পূজা কর্‌বো। আপনি দয়া ক'রে যে অপরিচিতাকে আজ এত স্নেহ কর্‌লেন।যদি তাহাকে স্মরণ রাখেন আমি আমাকে বড় ভাগ্যবতী মনে কর্‌বো। এখন বিদায় হই। আমাকে একখানি গাড়ী ডেকে দিতে আপনার আর্দ্দালিকে আদেশ করুন!" আমি বাহিরে গিয়া আর্দ্দালিকে ডাকিলাম। সে বড় চতুর লোক। তাহাকে রমণীর কথা বলিয়া বলিলাম—"আমি এমন্ অদ্ভূত মেয়ে মানুষ কখনও কল্পনা করি নাই। কোনও রূপে তাহার পরিচয় পাইতে পারিলাম না।" সে বলিল—"হুজুর! আমি এখনই তাহার পরিচয় লইয়া আসিব।" আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে রমণী অঞ্চলে গ্রীবা বেষ্টিত করিয়া ভক্তিভরে আমার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিল। তাহার ও আমার উভয়ের চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। আমার বোধ হইল যেন একটি অপ্সরা আসিয়া এ আত্মীয়তায় আমার হৃদয় বিহ্বল করিয়া চলিয়া গেল। আমি তাঁবুর বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে দেখিতে মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। কিছু ক্ষণ পরে আর্দ্দালি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হুজুর! এমন মেয়ে মানুষ আমার বাপেও দেখে নাই।" তাহার উপাখ্যান—"মেলায় প্রবেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল 'চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কে' ? আমি বলিলাম 'নেড়ি'! নেড়ি কি ? তাহার 'স্বোয়ামি'তাহার চুল কাটিয়া

দিয়াছিল। বলিল তোমার বাবু আমাকে সে 'নেড়ী' মনে করেছেন। এই দেখ—ব'লে চুলের খোঁপা খুলে দিল। এক রাশি চুল হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত গড়ায়ে পড়লো। কি চুল! তখন আমাকে টাকা একটা দিয়া গাড়ী আন্‌তে বল্‌লো। আমি বল্‌লাম—মা ঠাকুরাণ! বাবু টাকা নিতে নিষেধ করেছেন। তখন মাগি বলে কিনা—'তুমি চ'লে যাও। তোমার বাবুর কাছে আমি ভিক্ষা কর্‌তে আসি নাই।' তখন অগত্যা টাকা নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম গাড়ী কোথায় যেতে ঠিক কর্‌বো? মাগি বল্লে—'কোথায় না। শুধু গাড়ী আন্‌বে এ মাত্র। কোথায় যেতে হবে আমি ব'লে দেব।' লাচার হয়ে গাড়ী আন্‌লাম। আমার শিক্ষামতে কোচমান জিজ্ঞাসা কর্‌লো—'মা ঠাকুরাণ! গাড়ী কোথা যাবে?' মাগি বল্লে—'উত্তর মুখো।' আমাকে বিদায় দিল। আমি বল্‌লাম—'মা ঠাকুরোণ্! আপনি একা কিরূপে যাবেন? বাবু আপনাকে বাড়ী পঁহুছাইয়া দিতে আদেশ দিয়েছেন।' উত্তর—'বটে! তবে বাবুর কাছে চল।' আমি বল্‌লাম—'আচ্ছা মা ঠাকুরাণ! আমি যাচ্ছি, আপনি যান।' তখন গাড়ীতে উঠ্‌লো। আমি চুপে চুপে পেছনে গিয়া বস্‌লাম। ও মা! গাড়ী দু পা না যেতে থামায়ে গাড়ী থেকে নেমে আমাকে দেখে একেবারে রাগে গর গর ক'রে বল্‌লে--'বটে? তুমি আমার সঙ্গে চালাকি খেল্‌ছ? তোমার যিনি মুনিব, যিনি এ সবডিভিসনের হাকিম, তিনি আমার পরিচয় নিতে পারেন নাই। আর তুমি চাকর, তুমি মনে করেছ যে তুমি ফাঁকি দিয়ে আমার পরিচয় নেবে। তুমি গাড়ী চ'ড়ে যাও। আমি নিজে গাড়ী আন্‌তে পারি যাব, এবং কাল তোমার এ কীর্ত্তির কথা তাঁহাকে পত্র লিখ্‌বো।' আমি তখন ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম। মাগি যেন স্বয়ং সিংহবাহিনী! আমি চলে এলাম। যতদুর আমাকে দেখা গেল, মাগি আমার দিকে স্থির নয়নে

চেয়ে রইল। তার পর গাড়ীতে উঠ্‌লো। দেখ্‌লাম গাড়ী ষ্টেশনের রাস্তার দিকে ছুট্‌লো। বাপ! এমন মেয়ে মানুষ দেখি নি। এই ২০ বৎসর রাণাঘাটের চাকরিতে ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখেছি। এমনটা দেখিনি। মাগী দেখ্‌তে যেমন সুন্দরী, তেমনি তেজ, তেমনি চতুরা। রাসে যেরূপ শান্তিপুরের মাগীরা মেলা দেখ্‌তে পালে পালে বাহির হ'য়ে থাকে, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও সেরূপ এই মেলা দেখ্‌তে রাত্তিরে গোপনে আসে। এ তাহাদের কেউ হ'বে! কাল্ গাড়োয়ানের কাছে খবর পাওয়া যাবে। আমি তাকে ব'লে দিয়েছি। সে বেটা ভারি চালাক।" এমন সময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দাদা আসিলেন। বিশুদ্ধ বামনের ভাজা বিশুদ্ধ লুচি তরকারি বিশুদ্ধ বামনের দ্বারা আনীত কি না আগে আমার হলপান জবানবন্দি লইলেন। তাহার পর বিশুদ্ধমতে, অর্থাৎ শিবিরের শতরঞ্চির উপর বসিয়া খাইলেন, এবং চলিয়া গেলেন। আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। এক দিকে স্ত্রী আসিলেন না কেন, এক ভাবনা হইল। অন্য দিকে এ রমণী-দর্শন একটা আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত আমার মস্তক বিলোড়িত করিতেছিল। পরের বৎসরের কুলিয়ার মেলার পূর্ব্বে আমি রাণাঘাট ছাড়ি, অতএব তাহার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এখনও এত বৎসর পরে তাহার পরিচয় ও দর্শনের জন্য আমার হৃদয় আগ্রহ পূর্ণ। যদি এ জীবনী প্রকাশিত হয়, এবং তিনি আমি উভয়ে সে সময়ে জীবিত থাকি, তবে তিনি দয়া করিয়া যদি আমাকে পরিচয় দেন, এবং আর একবার সাক্ষাৎ দেন, আমি বড় সুখী হইব। সেই সন্ধ্যাটি আমার স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

রমণী চলিয়া গেলে আমি আবার সেই বাঙ্গালি পরিচ্ছদে আবৃত বদনে

মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। হিন্দু তীর্থে যাহারা যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন তাহাদিগকে পাণ্ডা বলে। ইহাদের উপদ্রবে হিন্দুর তীর্থগুলিন এক প্রকার দস্যুপুরীতে পরিণত হইয়াছে। কর্ত্তাভজাদের পাণ্ডার নাম 'মহাশয়'। এই মহাশয়েরা এক এক বৃক্ষতলায় চাঁদোয়ার মত কাপড় টাঙ্গাইয়া, এবং কাপড়ের ঘেরা দিয়া যাত্রীদল লইয়া উপবিষ্ট। একস্থানে একজন মহাশয় তাঁহার যাত্রীগণকে কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম বুঝাইতেছেন। ইহারা বোধ হয় নূতন শিকার। আমি সেই বস্ত্রের ঘেরার ভিতরে অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করিয়া যাত্রীদের পশ্চাতে বসিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিতেছেন—"মানুষ ঈশ্বরকে দেখিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। মানুষ মানুষের অধিক, কিছুই ধারণা করিতেও পারে না। অতএব সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে মানুষ মানুষভাবে কল্পনা করিয়া পূজা করে। খৃষ্টানদের যিশু খৃষ্ট মানুষ। মুসলমানদের মহম্মদও মানুষ। হিন্দুদের দেবদেবী সকলই মানুষের আকৃতিমাত্র। যদি তাহাই হইল, তবে মানুষের একটা কল্পিত আকৃতির পূজা না করিয়া একটি প্রকৃত পূজনীয় মানুষেরই পূজা করি না কেন? সেই পূজনীয় মানুষই আমাদের 'কর্ত্তা'। বাবা আউল চাঁদের শিষ্য রামশরণ পালই আমাদের সেই 'কর্ত্তা'। এরূপ একজন কর্ত্তাকে আমরা দেবতার মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি বলিয়া আমাদের সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা।" সে তাহার পর বলিতে লাগিল— "হিন্দুরা বলে একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সকলই মিথ্যা। যদি ঈশ্বর সত্য হইলেন, তিনি মিথ্যা সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্ট সৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব আমাদের মতে ঈশ্বর সত্য, তাঁহার সৃষ্টিও সত্য। সৃষ্টিতে যাহা কিছু সকলই সত্য। সকল ধর্ম্ম, সকল আচারই সত্য। আমরা এজন্য কাহারও ধর্ম্মের উপর জাতিগত

কি কুলগত আচারের উপর হস্তক্ষেপ করি না। সকল কর্ত্তাভজারা আপন আপন ধর্ম্ম ও আচারমতে চলিতে পারে, কেবল আমাদের কর্ত্তাকে মানিলেই হইল। কেবল আমাদের এই তীর্থ-স্থানে ভেদ-জ্ঞান না থাকিলেই হইল। এখানে আমারা সকলে এক কর্ত্তার উপাসক।"

আমি সমস্ত দিন দেখিয়াছি যে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে শত শত ভক্ত দুই মাইল পথ লঙ্ঘন করিয়া ঘোষপাড়ার মেলাক্ষেত্রে আসিতেছে, এবং হিমসাগরে স্নান করিয়া ভক্তিতে অধীর হইয়া রামশরণ পালের ও তাহার স্ত্রী "সতী মাইর" সমাধি দর্শন করিতেছে। আমি দেখিয়াছি যে শত শত নর নারী 'সতীমাইর' সমাধি সমীপস্থ 'দাড়িম্বতলায়' বৈষ্ণবদের মত দশাপ্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় দিন রাত্রি ধর্‌না দিয়া পড়িয়া আছে। কেহ বা অপদেবতাশ্রিত লোকের মত মাথা ঘুরাইতেছে, ও কেহ উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে। এই দাড়িম্বতলার দৃশ্য দেখিলে পাষাণের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়। দেখিয়াছি মূর্খ কর্ত্তা দুজন দুই 'গদিতে' বসিয়া আছেন, এবং সহস্র সহস্র যাত্রী তাহাদের ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া এবং প্রণামি দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর এই 'মহাশয়টির' এই সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সেই ভক্তি দৃঢ়তর হইল। আমার বোধ হইল 'কর্ত্তাভজা' রূপান্তরে হিন্দুদের 'গুরুপূজা' মাত্র। তাহাদের ধর্ম্ম বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ। যে রামশরণ পাল বেদ বেদান্ত প্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এত লোকের পূজার্হ হইয়াছিলেন, তিনি কিছু সামান্য মানুষ ছিলেন না। যথার্থই কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা না করিয়া এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি? এখন যে harmony of scripture বা ধর্ম্মের

সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে এই রামশরণ পালই তাহা সর্ব্ব প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সকল ধর্ম্মের মূল এক এবং এই সম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অধঃপতিত দেশে তিনিই তাহা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরণ পাল আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি এত দিনে কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম কি বুঝিলাম এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার শিবিরে ফিরিলাম।

আমার কোনও বন্ধুর কন্যা সেই রাত্রি ১০টার ট্রেণে মেলা দেখিতে রাণাঘাটে আসেন। সেই জন্য আমার পরিবারবর্গ রাত্রির ট্রেণে ঘোষপাড়ায় আসিতে পারেন নাই। পর দিন প্রাতের ট্রেণে অনুমান ১০ টার সময়ে মেলায় পঁহুছিলেন। তাহার পর আর এক আরব্য উপাখ্যান। পত্নীর 'গ্লেডষ্টোন বেগ' পাওয়া যাইতেছে না। তাহাতে চারি পাঁচ শত টাকার গহণা আছে। তাহার উপর সোনায় সোহাগা—বেগটিও খোলা! পত্নীর মতে ইহার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই দোষী! তাঁহার নিজের দোষ?—তাহা অসম্ভব। তিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং'। ঈশ্বরে দোষ সম্ভব, তাঁহার দোষ অসম্ভব। ইহা তাঁহার জীবনের একটা **axiom**। প্রথম দোষ রামশরণ পালের—পোড়ার মুখো সে একটা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া এই মেলা করিল কেন? তাহার পর দোষ আমার—আমি মেলায় আসিলাম কেন? আমি না আসিলে ত আর তিনি আসিতেন না। তাহার পর দোষ সঙ্গীয় লোক ও ভৃত্যদের—তাহারা 'বেগ' ফেলিয়া আসিল কেন? তিনি হলপ করিয়া বলিতে পারেন যে বেগ তিনি স্বহস্তে ট্রেণ হইতে নামাইয়াছেন। এরূপে দোষ বিতরণ ও অগ্নিবর্ষণ হইতেছে।

এ দিকে ভৃত্য একজন আমার পত্র লইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে ছুটিল, এবং যথাসময়ে সংবাদ আসিল যে ষ্টেশনে বেগ নাই। আমি অশ্ব পৃষ্ঠে তীরবেগে ছুটিলাম। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে পঁহুছিলে, ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন তিনি শেয়ালদহে আমার উপদেশমতে টেলিগ্রাফ করিয়া জানিয়াছেন যে 'বেগ' গাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তখন আবার টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলাম যে 'বেগ' খোলা তাহাতে অলঙ্কার সকলই আছে। আমি ৪টার ট্রেণে সন্ধ্যার পর শেয়ালদহে পৌছিলাম। শুনিলাম তাঁহারা ৪ টার প্রতি-ট্রেণে বেগ কাঁচড়াপাড়ায় পাঠাইয়াছেন। কি বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত! তবে নাটক নহে, প্রহসন মাত্র। আবার টেলিগ্রাফ। জানিলাম সন্ধ্যার সময়ে sealed bag (মোহরযুক্ত বেগ) কাঁচড়াপাড়া পঁহুছিয়াছে। এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব বড় সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পান-কার্য্যে আরও কিছু টাকা খোয়াইয়া, আবার পরের ট্রেণে ফিরিয়া রাত্রি ১১টার সময়ে কাঁচড়া-পাড়া পঁহুছিয়া সমোহর বেগ খুলিলাম। বড় দুঃখ দুর্গতির উপার্জ্জন। দেখিলাম সব অলঙ্কারগুলি আছে। সমস্ত দিনের অনাহারে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে শিবিরে পঁহুছিলাম। দেখিলাম স্ত্রী এখনও সেরূপ অগ্নিবৃষ্টির সহিত দোষ বিতরণে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা তিনি 'বেগ' কাঁচড়াপাড়ায় নামাইয়াছিলেন। এরূপ কথা যখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে, তখন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। উহা একটা অকাট্য সত্য। যাহা হউক এতক্ষণ বাষ্প উদ্গীরণের পর সালঙ্কার বেগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মেজাজ কিছু শীতল হইল, এবং শিবিরে বেশ একটা আনন্দোৎসব হইল। মেলায় আমার প্রভুত্ব, শিবিরে এ অভিনয়, সর্ব্বশেষ আমার ক্ষিপ্রকারিতা ও কলিকাতা প্রয়ানক্লেশে বন্ধুকন্যার হৃদয় সহানুভূতিতে অমৃত সিক্ত হইয়াছিল। সে

আমার কোলে বসিয়া কি আদর দেখাইয়া এক পাত্রে জিদ করিয়া আহার করিল। সন্ধ্যার পর মেলা দর্শন করিয়া আসিয়া লিচু বাগানে আমার গলা জড়াইয়া বহুক্ষণ বেড়াইল এবং বর্ত্তমান সভ্যযুগের স্ত্রীদিগের স্বামীর প্রতি ব্যবহারের কথা লইয়া কত সহৃদয়তার কথাই বলিল। সে বলিল এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই সে বিবাহ করিতেছে না, পাছে সেও এ যুগস্রোতে ভাসিয়া যায়। সে ভাসিয়া যায় নাই। নীলাকাশে ক্ষণপ্রভা বিকাশের ন্যায় কয়েক দিনের জন্য মাত্র আদর্শ পত্নীত্ব দেখাইয়া এ প্রতিভাশালিনী বালিকা তাহার স্বধামে চলিয়া গিয়াছে। ঘোষপাড়ার মেলার দ্বিতীয় দিনটাও এরূপে ঘটনাপূর্ণভাবে শেষ হইল।

তৃতীয় দিবস যাত্রীর ভিড় আরও অধিক হইল। প্রাতে কয়েক জন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় 'গ্রাজুয়েট', সুশিক্ষিত, ও পদস্থ। তাঁহারা সকলেই কর্ত্তাভজা। আমি মেলায় যে সকল নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছি, এবং একটা 'ইঁদারা' কাটাইয়া যেরূপ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়াছি, তাঁহারা তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন প্রায় প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাছে আসেন নাই কি আত্ম প্রকাশ করেন নাই। আমি ঘোষপাড়ার এত হিতৈষী বলিয়া তাঁহারা আমার কাছে আসিয়াছেন ও ও পরিচয় দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক সকল জাতিই আছেন। ঘোষপাড়ায় জাতিভেদ নাই। তাঁহারা সকলেই এক রন্ধনশালা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং এজন্যই বৎসর বৎসর আসেন। তান্ত্রিকদের 'চক্রে' যেরূপ জাতিভেদ নাই, সকলেই একস্থানে একত্রে গ্রহণ করে, বুঝিলাম ইঁহারাও সেরূপ করেন। ঘোষপাড়ায় যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ কোনওরূপ স্পর্শদোষ মানেন না।

ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র। 'হিমসাগর' পুষ্করিণীটির সংস্কার জন্য তাঁহারা আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এত টাকা কোথায় পাইব জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে মেলাক্ষেত্রে এমন একটি স্থবর্ণবণিক মহিলা আছেন তিনি একাই এ কার্য্যের জন্য ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কর্ত্তাদের অনুমতি ভিন্ন তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। তাঁহার অসাক্ষাতে যদি কর্ত্তাদের ডাকাইয়া আমি অনুমতি লইতে পারি, তবে আজই তিনি এ টাকা দিবেন। আমার অনুরোধমতে তাঁহারা আমাকে রামদুলাল পাল রচিত তাঁহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীত হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে শুনাইলেন। একটি অক্ষরও বুঝিলাম না। শব্দ বাঙ্গালা, কিন্তু পদের কোনও অর্থ বুঝা যায় না। তাহা বুঝিবার কি একটা সঙ্কেত আছে। কর্ত্তাভজা না হইলে অন্যের কাছে সে সঙ্কেত প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে heresy (মহাপাতক)। উহা তাঁহাদের Free Masonary, তবে এইমাত্র বলিলেন যে এ সকল সঙ্গীত চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মমূলক। রাগিনীও কেমন একঘেয়ে, কিছুক্ষণ শুনিলে আর শুনিতে ইচ্ছা করে না। তাঁহারা আবার আমায় একরাশি প্রশংসা করিয়া, এবং 'হিমসাগর' কাটাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া, চলিয়া গেলেন। আমি তখনই কর্ত্তা দুটিকে ডাকাইলাম। একজন একখণ্ড সরল যষ্টিবিশেষ, আর একজন ঠিক একটি কুর্ম্মাবতার। তাঁহারা কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। বলিলেন আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা প্রকৃত কথা নহে। তাঁহাদের অনুমতি মতে কেহ কখনও এত টাকা দিবে না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে টাকাটা তাঁহাদের হাতে দিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তাভজারা জানে যে তাঁহারা দুজনই এমন কীর্ত্তিমান পুরুষ যে তাঁহাদের হস্তে দিলে টাকাটার অধিকাংশ তাহারা স্বয়ং উদরস্থ করিবেন। ঘোরতর ভর্ৎসনা করিয়া আমি এই কৃপাপাত্র দুটিকে বিদায়

দিলাম। তিন পুরুষও হয় নাই। ইতিমধ্যেই রামশরণ পালের সন্তানদের এ অধঃপতন ঘটিয়াছে!

অপরাহ্নে মেলাক্ষেত্রে খুব কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে। একটি কীর্ত্তনের দল শিবিরে ডাকিয়া আনিতে আৰ্দ্দালিকে পাঠাইলে সে আসিয়া বলিল—"হুজুর! কেহ আসিতে চাহে না। হাকিমের নাম শুনিলে সকলে পলাইয়া যায়।" হাকিমদের জন্য কি সার্টিফিকেট! শুনিলাম একটি শিশু বড় সুন্দর কীর্ত্তন করিতেছে। আমি বুঝিলাম আমার দূত পাঠাইলে সেও পলায়ন করিবে। অতএব অন্য একটি লোককে তাহাকে আনিতে পাঠাইলাম। সে তাহাদিগকে তখনই লইয়া আসিল। শিশুটি গাইতেছে, সঙ্গে তাহার পিতা একটা গোপযন্ত্র বাজাইতেছে, ও তাহার মাতা মন্দিরা বাজাইতেছে। শিশুটির বয়স অনুমান ৮ বৎসর, শ্যামবর্ণ, গোপালবেশে সজ্জিত। পরিধান ধড়া, মাথায় চূড়া। তাহার ক্ষুদ্র মুখখানিতে কি এক স্নেহমণ্ডিত লাবণ্য আছে যে তাহাকে দেখিলে আদর করিতে ইচ্ছা করে। সে কি সুন্দর কীর্ত্তন গাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমার শিবির সমক্ষে দুই তিন সহস্র লোক সমবেত হইয়া নীরবে তাহার কীর্ত্তন শুনিতে ও নৃত্য দেখিতে লাগিল। সে একবার গর্জ্জন করিয়া, ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিয়া গাইতেছে; একবার বসন্ত কুসুম গন্ধ লুব্ধ ভ্রমরের মত গুণ গুণ অস্ফুট রবে গাহিতেছে। এক একবার তাহার পিতার কোলে, তাহার মাতার কোলে গিয়া মুখ লুকাইয়া বসিতেছে। আমি এমন সুন্দর, এমন ভাবময়, এবং এমন বিশুদ্ধ স্বরভঙ্গিপূর্ণ কীর্ত্তন আর কখনও শুনি নাই। শিবিরস্থ রমণীগণ মুগ্ধা ও স্নেহে বিগলিতা। তাহাকে শিবিরে লইতে আমাকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সে প্রথম যাইতে চাহিল না। তাহার পর তাহার মা বলিল—

"গোপাল! সেখানে তোর মা আছেন, খাবার দিবেন।" আমার অনুমতি মতে তাহার মা তাহাকে লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। আমার স্ত্রী, এমন কি সেই বন্ধু ব্রাহ্ম-বেরিষ্টার-বালিকা পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া ক্ষেপিয়া গেলেন। সে স্ত্রীকে কি মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিল— "মা কই খাবার দেও!" স্ত্রী তাহাকে কতরূপ খাদ্য দিলেন, এবং তিনি ও বন্ধু-বালিকা তাহাকে কত বুকে লইলেন, কত আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাহাকে কোনও মতে ছাড়িবেন না। আবার আমার মনে হইল ব্রজলীলা তবে অবিশ্বাস করি কেন? গোপালবেশে সজ্জিত একটি সামান্য শিশুকে লইয়া ইঁহারা যাহা করিতেছেন, স্বয়ং গোপাল ইঁহাদের সম্মুখে আসিলে ইঁহারা কি মা যশোদার ও ব্রজবালাদের অভিনয় আজ করিতেন না? আমার বোধ হইল যেন আমি সত্যসত্যই আমার নয়ন সমক্ষে ব্রজলীলার অভিনয় দেখিতেছি।

একটি অন্ধ এক কোণায় বসিয়া বালকের সংকীর্ত্তন শুনিতেছিল। একটি লোক বলিল যে সেই অন্ধটি পূর্ব্ব রাত্রিতে সতী মাইর সমাধিতে বড় সুন্দর গান করিতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি গাইতে পার?" সে বলিল—"কর্ত্তা! আমি অন্ধ, আমি কি গান করিব? বিশেষতঃ বৈরাগীদের এ গোপযন্ত্রের সঙ্গে আমরা গান করিতে পারি না।" তখন মেলা হইতে একটি সংকীর্ত্তনের দল খোল লইয়া আসিল। অন্ধ গাইতে লাগিল—"হিম সাগরে স্নান করিয়ে দাড়িম্বতলায় চল।" তাহার কি মধুর কণ্ঠ! কি ভক্তিপূর্ণ ভাব! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি কর্ত্তাভজা!" সে উত্তর করিল— "ধর্ম্মাবতার! না। আমি একটি লোকের সঙ্গে নবদ্বীপ দোল দেখিতে যাইতেছিলাম, পথে আমার সঙ্গী বলিল যে নবদ্বীপের দোল অনেকবার দেখিয়াছি; এবার চল কর্ত্তাভজাদের মেলা

দেখিয়া যাই। তাই এখানে আসি। কাল সন্ধ্যার পর যখন সতী মাইর সমাধিতে বাবুরা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, আমাকেও গাইতে বলিলেন, তাঁহারা কর্ত্তাভজা, অতএব এই গানটি রচনা করিয়া গাইয়াছিলাম।" তখন আমি তাহার রচিত আরও দুই একটি গান শুনিতে চাহিলে সে গাইতে লাগিল। কি সুন্দর রচনা ও কি সরল ভক্তির উচ্ছাস। প্রত্যেক গানের শেষে "অন্ধ দুঃখী বলে" বলিয়া কি করুণ ভণিতা আছে। প্রায় ৩০০০ যাত্রী ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া চিত্রিতবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সকলেরই চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। শিবিরস্থ রমনীরা, এমন কি ব্রাহ্ম-বেরিষ্টার-বালিকা পর্য্যন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। লোকটি বলিল তাহার বাড়ী পাবনা জেলায়। সে জন্মান্ধ। তাহার মধ্যম বয়স। অনেক গীত রচনা করিয়াছে। যে যখন আসিয়া ধরে, তখনই একটি গীত রচনা করিয়া দিয়া থাকে। তাহার গীত লেখা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে অতিশয় করুণ কণ্ঠে বলিল—"কর্ত্তা! আমি জন্মান্ধ। লেখা পড়া জানি না। কে লিখিয়া রাখিবে? তবে অন্য কেহ যদি লিখিয়া রাখিয়া থাকে বলিতে পারি না।" আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে আমার সহোদরের মত যত্ন করিয়া রাখিব, এবং তোমার সমস্ত গান লেখাইয়া লইয়া ছাপাইয়া দিব। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তোমার কীর্ত্তন শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইব। তোমার সকল অভাব আমি পূরণ করিব।" সে বলিল—"কর্ত্তার অন্ধের প্রতি এই দয়া! আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে তদপেক্ষা এ অন্ধের পক্ষে সৌভাগের কথা কি হইতে পারে? তবে আমি এখন থাকিতে পারিতেছি না। আমি কিছু দিন পরে শান্তিপুর একবার আসিব। সে সময়ে আমি কর্ত্তার সঙ্গে কিছু দিন থাকিয়া যাইব।" তাহা আর হয় নাই।

বলিয়াছি এই মেলার অব্যবহিত পরে আমি রাণাঘাট হইতে বদলি হই।

এরূপে মেলার তৃতীয় দিন শেষ হইল। এই অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা আমি যেন ইহলোকে ছিলাম না। আমি এমন মধুর প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন আর কখনও শুনি নাই। সমস্ত রাত্রি যেন স্বপ্নেও আমি সেই কীর্ত্তন শুনিতেছিলাম। পর দিন পরিবারবর্গকে রাণাঘাট পাঠাইয়া মেলাভাঙ্গার পর আমি কি কারণে কলিকাতা যাইতেছি, কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখি গাড়ী কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া সচষমা রবি ঠাকুর! উভয়ে উভয়কে এরূপ আচম্বিৎ দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত। তিনি বলিলেন—"আপনি কোথা হইতে?" আমি বলিলাম—"আপনি কোথা হইতে?" তিনি বলিলেন তিনি তাঁহার জমীদারি হইতে। আমি বলিলাম আমি আমার জমীদারি হইতে।

তিনি। জমীদারিটি আবার কি?

আমি। ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের মেলার অধ্যক্ষগিরি।

তিনি। কর্ত্তাভজাদের মেলা! শুনিয়াছি উহা বড় জঘন্য ব্যাপার!

আমি। অক্ষয় কুমার দত্তের "উপাসক সম্প্রদায়" পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু তিন দিন মেলার কর্ত্তাগিরি করিলাম, কই জ—ঘ—ন্য তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না। ব্রাহ্ম অক্ষয় কুমার দত্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মিশনারির অধিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলাম। এই বর্ণনায় তাঁহারও যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আমার একটি প্রার্থনা। আপনি আমাকে যাহা বলিলেন যদি তাহা একটুকু ক্লেশ স্বীকার করিয়া "সাধনার" জন্য লিখিয়া দেন,

তবে আমার মত অনেকেরই একটা বিষম ভ্রম ঘুচিবে। আমি বলিলাম—"সে কার্য্য আপনার। আপনার মত আমার রচনা শক্তি নাই। বিশেষতঃ ভ্রম অন্যের ঘুচিলেও ঘুচিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মদের নহে। ব্রাহ্মরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও গোঁড়া। তাহারা অন্য ধর্ম্ম মতকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে জানে না। সে উদারতা 'ভ্রাতাদের' নাই। অন্য ধর্ম্ম তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করাও তাহারা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহা না হইলে অক্ষয় কুমার দত্তের মত এমন মনীষী ব্যক্তি কেন ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এরূপ নিন্দা করিবেন? আমার একজন বাল-সুহৃদ ব্রাহ্ম প্রচারকের সঙ্গে ২০ বৎসর পরে একবার সাক্ষাৎ হইলে দেখিলাম, যদিও সে ধর্ম্ম-প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত পৈত্রিক হিন্দু ধর্ম্মটা কি তাহা সে একবার জানিতেও চেষ্টা করে নাই। এমন কি, সে গীতাখানি পর্য্যন্ত পড়ে নাই। অথচ সে হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের একজন ঘোরতর বিদ্বেষী।"

ইহার পর তিনি আমার "কুরুক্ষেত্রের" কথা তুলিয়া বলিলেন যে তিনি সম্প্রতি "কুরুক্ষেত্র" পড়িয়াছেন, এবং আমি অনুমতি দিলে তিনি 'সাধনায়' উহার সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। আমার অনুমতির প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন সকল বিষয়ে তাঁহার ও আমার যে এক মত হইবে এমন হইতে পারে না। অতএব কোনও বিষয়ে মতান্তর হইলে তিনি ভয় করেন আমি পাছে বিরক্ত হই। তাই আমার অনুমতি চাহেন। আমি বলিলাম—"রবি বাবু! যেখানে সাহিত্য উপজীবিকা,—যেখানে একখানি ভাল বহি লিখিতে পারিলে লেখক বড় মানুষ হয়,—সেখানে লেখকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ সম্ভব। আমাদের সাহিত্যসেবা উপজীবিকা নহে, (purely a work of love) অতএব আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের ত কোনও কারণ নাই। বিদ্বেষ-দুষ্ট

সমালোচনারও মূল্য নাই। উহা ঘৃণার বিষয়। সরলভাবে সমালোচনা করিয়া যে আমার দোষ দেখাইয়া দেয়, আমি তাহার কাছে বরং কৃতজ্ঞ হই। এক এক খানি বহি বাহির হইলে অনেক বন্ধু ও পাঠক এরূপ সমালোচনাপূর্ণ পত্র আমাকে লিখিয়া থাকেন। আমি তাহা যত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখি, এবং উক্ত পুস্তকের অন্য সংস্করণ ছাপিবার সময়ে আমি তাঁহাদের প্রদর্শিত দোষ সকল খুব স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি। যেটি আমার কাছেও প্রকৃত দোষ বলিয়া বোধ হয়, আমি উহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। আপনিও যদি সরলভাবে আমার দোষ দেখাইয়া দেন, আমি বিরক্ত না হইয়া আপনার কাছে ঋণী হইব। যদি আমরা পরস্পর পরস্পরের দোষ দেখাইয়া না দিয়া, কেবল মন যোগাইবার জন্য অযথা প্রশংসা ও তোষামোদ করি, তবে আমাদের বন্ধুতার সার্থকতা কি ?" তিনি বলিলেন সকলের এরূপ সহিষ্ণুতা ও উদারতা নাই। এমন কি, তাঁহারও নাই। বড় আনন্দালাপে যথা সময়ে শেয়ালদহে পঁহুছিলাম, এবং কর্ত্তাভজাদের মেলা দর্শন পর্ব্ব শেষ করিলাম।

সাহিত্য-তীর্থ-দর্শন।

রাণাঘাট-থানার অধীন বেলঘড়িয়া গ্রামে শিবিরে থাকিতে শুনিলাম তাহার নিকটেই বঙ্গের ব্রাহ্মণেতিহাসে বিখ্যাত ফুলিয়া গ্রাম। ফুলিয়ার মুখটিরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রচলিত কবিতায়—

"মুখটি কুলীন বড়, বন্দ্যোঘাটি সাদা,
সভার মধ্যে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা।"

ব্রাহ্মণদের গৌরবে গৌরবান্বিত সেই তীর্থভূমি ফুলিয়া দর্শন করিতে আমি অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলাম। কিন্তু গ্রামে পৌছিয়াই আমার মনে হইল—

"এই সে পলাশি ক্ষেত্র! এই সে প্রাঙ্গণ।"

স্থানটি দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আদিভূমি ফুলিয়ায় এখন ব্রাহ্মণের গন্ধমাত্র নাই। উহার অধিকাংশ বন ও মুসুলমানের বাসস্থান। যেখানে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালাপ হইত আজ সেখানে শিবাগর্জ্জন। সরস্বতীদেবীর স্থান এখন চামুণ্ডা মেলেরিয়াদেবী গ্রহণ করিয়াছেন। হায়! বঙ্গদেশের কি বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে। কেবল মুখটিদের পিতৃভূমি বলিয়া নহে, "ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাসই" বাঙ্গালা রামায়ণের "কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস"। বাঙ্গালা রামায়ণ যাঁহাকে অমর করিয়াছে, যে রামায়ণ বাঙ্গালির দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম্ম ও কাব্য গ্রন্থ, যাহার অমৃত পান করিয়া এই চারি শত বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের নরনারী মানুষ হইয়াছে, যাহার অমৃতের স্থান বাঙ্গালার উগ্র 'নভেল' বিষ গ্রহণ করাতে আজ সেই বঙ্গদেশের নর নারীর অধঃপতন ঘটাইতেছে, সেই রামায়ণের ও তাহার প্রণেতার জন্মস্থান এই ফুলিয়া! ব্রাহ্মণবংশের সঙ্গে কৃত্তিবাসের বংশ অন্তর্হৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা রামায়ণের ও তাহার রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ভদ্রাসন বাটীর এখন চিহ্নমাত্র নাই। এখনও

প্রবাদ এই দীর্ঘকাল পরেও সেই স্থানটির নির্দ্দেশ বিস্মৃতির তামসী গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখনও যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে কৃত্তিবাসের বাড়ীর স্থান দেখাইয়া দিবে। উহা এখন একজন দরিদ্র মুসলমান প্রজার বাঁশবন। তাহার কিঞ্চিৎ বাহিরে গঙ্গাতীরে একটা মাটির ঢিপি আছে। লোকেরা এই ঢিপিটিকে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ বলিয়া এখনও দেখাইয়া দিয়া থাকে। কৃষকেরা তাহার চারি দিক চষিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু ঢিপিটি দেবপ্রসাদ স্বরূপ ভক্তিভরে রক্ষা করিয়াছে। দরিদ্র কৃত্তিবাসের ভদ্রাসন বাড়ীরও দোলমঞ্চের এই ধ্বংসাবশিষ্ট দেখিয়া আমি ভাগিরথীর দিকে চাহিয়া কাঁদিয়াছিলাম। হায়! মা বীণাপাণি! সর্ব্বত্রই কি এইরূপ! সর্ব্বত্রই কি তুমি তোমার দরিদ্র পুত্রদের চিহ্নমাত্র রাখ নাই। এই দুইটী স্থান ক্রয় করিয়া এবং চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য আমি সহোদরসম বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ও 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক কার্য্যকুশল যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিলাম। স্মরণ হয় কৃত্তিবাসের বাড়ীর স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রামসীতার মূর্ত্তি স্থাপন করিতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়ে এই প্রস্তাব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং 'বঙ্গবাসী' লীলাময়ী ভাষায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহার পর আমি রাণাঘাট ছাড়িয়া আসি। কার্য্য কি হইয়াছে জানি না।

কৃত্তিবাসের গৃহের অদূরে আর একটী তীর্থস্থান আছে। উহার নাম 'হরিদাসের পাঠ'। প্রবাদ ২২ বাজারে হরিদাস বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া অচেতন অবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গায় ভাসিয়া এই স্থানে লাগিয়াছিল। স্থানটি গঙ্গার তীরে। তাহার পর এখানে আশ্রম করিয়া বহু বৎসর তপস্যা করে এবং দিনে লক্ষবার হরিনাম করে। সাহিত্যসেবীদের অপেক্ষা ধর্ম্মসেবীদের অদৃষ্ট ভাল। হইবারই কথা। সাহিত্যানুরাগীদের

অপেক্ষা ধর্ম্মানুরাগীরা কৃতজ্ঞ। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু 'হরিদাসের পাঠ' আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদের একটি পীঠস্থান। তাহাতে ভিখারী বৈরাগীরা একটা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। পার্শ্বে বৈরাগীদের একটা 'আখড়া' কুটীর। তাহাতে বৈরাগীরা বাস করে এবং নিত্য হরিদাসের নাম কীর্ত্তন ও বিগ্রহের পূজা করে। প্রতি বৎসর এই পীঠস্থানে বৈরাগীদের একটা বৃহৎ মেলাও হইয়া থাকে। আমি এই পীঠস্থানও দর্শন করিলাম, এবং হরিদাসের সেই আদর্শ হরিভক্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে অশ্রুবর্ষণ করিলাম। হরিদাস যেরূপ দরিদ্র ছিলেন, তাহার পীঠস্থানও দরিদ্র ভিক্ষাজীবি বৈরাগীদের কীর্ত্তি। যাহা কিছু আছে সকলই দরিদ্র। কোনও ধনবানের কৃপাকটাক্ষ এ স্থানের উপর পড়ে নাই। বাঙ্গালার ধনবানেরা এমন অমানুষ নহেন যে কখনও পড়িবে। দরিদ্রের তপস্যার স্থানটি দরিদ্ররাই এত কাল রক্ষা করিয়াছে। দরিদ্র না হইলে দরিদ্রের দুঃখ, দরিদ্রের গৌরব কে বুঝিবে? খৃষ্ট এই জন্যইত বলিয়াছিলেন—'উষ্ট্র সূচিরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহাও সম্ভব, তথাপি ধনী স্বর্গে যাইতে পারিবে না।' ঘোষপাড়ার রামশরণ পালও একজন দরিদ্র বৈরাগী ছিলেন মাত্র। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মুষ্টিমেয় লোকে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। অথচ তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার দরিদ্র ভক্তেরা কি তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছে! আর কৃত্তিবাস?—কত কোটি কোটি লোক, কত শত সহস্র ধনী নরনারী কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ পড়িয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। আর তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মস্থানের এ দুরবস্থা!

ঘোষপাড়ার মেলার পূর্ব্বে আমি একবার কাঁচড়াপাড়া আসিয়া গঙ্গার চরে শিবিরে ছিলাম। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা এই কাঁচড়াপাড়া কি

তৎসমীপবর্ত্তী ত্রিবেণী হইতে চট্টগ্রাম গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব এই উভয় স্থানের বৈদ্যদের 'কুলজিতে' তাহার কোনও উল্লেখ আছে কিনা, আমার বংশের কোনও শাখা এখনও এখানে আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য বড় আগ্রহ সহকারে এখানেও শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম! যে কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যদের একটি আদি ও গণ্ডস্থান ছিল, ফুলিয়া যেরূপ ব্রাহ্মণশূন্য কাঁচড়াপাড়াও সেরূপ প্রায় বৈদ্যশূন্য হইয়াছে। অনেক জনশূন্য বাড়ী পড়িয়া আছে। মেলেরিয়ার প্রকোপে এই গ্রামের পূর্ব্বশ্রী কিছুই নাই। কেবল পূর্ব্ব স্মৃতিটুকু মাত্র আছে। অনেক অনুসন্ধানে একজন প্রাচীন বৈদ্য মাত্র পাইলাম। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। তাঁহার শরীর ধনুর মত বাঁকিয়া গিয়াছে। তিনি যেন হামাগুড়ি দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং আমাকে কাঁচড়াপাড়ার শোককাহিনী শুনাইলেন। তিনি বলিলেন মেলেরিয়ায় ও দরিদ্রতায় স্থানীয় বৈদ্যবংশ নিঃশেষ হইয়াছে। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও গ্রামত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছেন। তিনি মাত্র 'sad historian of the pensive plain' এই শোকপূর্ণ স্থানের বিষন্ন ঐতিহাসিক আছেন। তাঁহার সেই শোক-কাহিনী শুনিয়া আমার হৃদয় বিষাদে ডুবিয়া গেল। তাহার পর গঙ্গা পার হইয়া ত্রিবেণী দর্শন করিতে গেলাম। অন্য পারে পৌঁছিয়া শুনিলাম ত্রিবেণী গ্রাম এখন গঙ্গা হইতে বহুদূরে। যাতায়াতেরও কোন সুবিধা নাই। শুনিলাম সেখানেও এখন অল্প সংখ্যক বৈদ্য পরিবার মাত্র আছেন।

আর একদিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান দেখিতে গেলাম। তাহাও কাঁচড়াপাড়ায়। যিনি এক দিন সাহঙ্কার-শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচরে।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকরে॥"

আজ সেই 'প্রভাকরের' ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থানে তাঁহার প্রভা দূরের কথা, চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার ভদ্রাসন বাটী একখানি সামান্য একতালা ঘর। যে 'প্রভাকরের' কবিতায় ত্রিশ বৎসর বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, যে স্থানে তাহা রচিত হইত, সে স্থানে এখন মাটির হাঁড়ি কলসি নির্ম্মিত হইতেছে। একজন কুম্ভকার উক্ত ভদ্রাসন বাটীর এখন অধিকারী। হাস্য-রস-রসিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হো হো হাসিতে যে স্থান মুখরিত হইত, সে স্থানে এখন হাঁড়ি কলসি নির্ম্মাণের পটাপট শব্দ হইতেছে। অথচ তাঁহার বংশ লুপ্ত হয় নাই। শুনিলাম তাঁহার ভ্রাতার সন্তানেরা আছেন। তবে তাঁহারা পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া এখন কলিকাতাবাসী! সকল কবিরা, সকল মহাপুরুষেরাই কি এরূপ সহৃদয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন? বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। তাহাতে কয়েকটি আম্রবৃক্ষ এখনও আছে। শুনিলাম এই উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র পাকা দোতালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বৈঠকখানা বাড়ী ছিল। তিনি এখানেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন, এবং 'প্রভাকরের' প্রবন্ধাবলি লিখিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ মুগ্ধ করিতেন। আমার পিতা তাঁহার কবিতার বড়ই অনুরাগী ছিলেন; এবং তাঁহার চট্টগ্রাম ভ্রমণ সময়ে আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার বেশ একটুক বন্ধুতা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে পত্র লেখালেখি হইত। পিতা অবসর পাইলেই 'প্রভাকর' পড়িতেন, এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণকে পড়িয়া শুনাইতেন। পিতা সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সুন্দর ছিলেন। তাঁহার মুখে 'প্রভাকর' পাঠ যে একবার শুনিয়াছে সে আর তাহা ভুলিতে পারিবে না। পিতার মুখে পুথি শুনিবার জন্য নরনারী সমবেত হইত, এবং আত্মহারা হইয়া শুনিত। এরূপে পিতার মুখে 'প্রভাকর' ও পুথি পাঠ, এবং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রশংসা

সর্ব্বদা শুনিয়া আমার হৃদয়ে যে কবিতার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়, এবং শৈশবেই গুপ্তজার কবিতার অনুকরণে আমি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ জন্য আমি গুপ্তজার কাছে শিষ্যবৎ ঋণী। এই জন্যই বড় আগ্রহে তাঁহার ও 'প্রভাকরের' জন্মস্থান দেখিতে আসিয়াছিলাম। এই বাগানটিও তাঁহার বংশধরেরা বিক্রয় করিয়াছেন! হা ভগবান্! তোমার মনুষ্য-সৃষ্টিতে কি সত্য সত্যই গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে? শুনিলাম ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থিতি কালেও,—তিনি কোথায় থাকিতেন তাহা কেহ জানেন কি?—কালীপূজার সময়ে আপনার বাড়ীতে আসিয়া খুব আড়ম্বরের সহিত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণীর পূজা করিতেন। মা! তোর অভয় করে সৃষ্টি, তোর বরদ করে স্থিতি, এবং তোর অসি-করে সংহার। কিন্তু কেবল দরিদ্র কবিরা কি মা! তোর অভয়-বরদ করের ছায়া হইতে বঞ্চিত? তোর অভয় বরদ করেও কি মা! তুই তাহাদিগকে দরিদ্রতা ও দেশের এরূপ অহৃদয়তা হইতে রক্ষা করিতে পারিস্ না? স্ববংশীয়েরা নিপাত হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বগ্রামবাসীরা, কি স্বদেশীয়েরা কি তাঁহার এই সামান্য জন্মস্থান ও উদ্যানটুকু তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ রক্ষা করিতে পারেন না? অথচ উভয়ের মূল্য অতি সামান্য। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহ প্রাঙ্গণে এবং উদ্যানে দাঁড়াইয়া দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার ঋণের প্রতিদানে,—কি ঋণের কি প্রতিদান!—বর্ষণ করিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে শিবিরে ফিরিলাম।

তাহার পরদিন হালিসহরে কবি ও সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান দর্শন করিতে যাই। কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহর পাশাপাশি গ্রাম বলিলেও চলে। গঙ্গা হইতে কয়েক পা গিয়াই রামপ্রসাদের জন্ম-স্থান দেখিয়া এই মহাতীর্থ স্থানকে আভূতল প্রণত হইয়া নমস্কার করিলাম, এবং তাঁহার ধূলা ললাটে মাখিলাম। আমার সঙ্গীগণ বিস্মিত

হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দরিদ্র রামপ্রসাদের ক্ষুদ্র ভদ্রাসন বাড়ীর তিনটি অতি ক্ষুদ্র ভিটা ও তৎসম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর শুষ্ক গর্ত্ত এখনও বর্ত্তমান। তাহার এক পার্শ্বে বঙ্গদেশ খ্যাত রামপ্রসাদের 'পঞ্চমুণ্ডী' সিদ্ধাসন। এইখানে শব সাধন করিয়া রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। এখনও সেই পবিত্র আসনের উপর পঞ্চবটির দুই তিনটি বৃক্ষ পবিত্র ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আর—বলিতে ঘৃণায় লজ্জায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়—এই পবিত্র পীঠস্থানে রামপ্রসাদের পশুবৎ হৃদয়হীন গ্রামবাসীরা এক প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন? আমার বোধ হইতেছিল আমি রামপ্রসাদের ক্ষুদ্র তিন খানি কুড়িয়া ঘর দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, সেই সিদ্ধাসন রামপ্রসাদ পূজার পুষ্পপাত্রে, চন্দনে, দুর্ব্বায়, তাঁহার ভক্তি সঙ্গীত গাইতে গাইতে সজ্জিত করিয়া তৈলাক্ত কলেবরে টলিতে টলিতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এবং অপর দিক হইতে বাঙ্গালির আদর্শ আজু গোস্বামী সুরাপায়ী মাতাল বলিয়া বিদ্রূপ করাতে রামপ্রসাদ ভক্তির উচ্ছ্বাসে সমস্ত ভাগিরথীর তীর ও হালিসহর গ্রাম মুখরিত করিয়া গাহিতেছেন—

"ওরে! সুরাপান করি না রে,
সুধা খাই কুতূহলে।
আজ আমার মন মেতেছে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

আমার চক্ষে দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে,—লিখিবার সময়েও আমি সেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ইতিমধ্যে হালিসহরের বহু ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। একজন বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া আমরা বঙ্গদেশের বিখ্যাত কবিকে দেখিতে আসিয়াছি।"

আমি গলদশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"আপনারা যাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সে আপনাদের এই দরিদ্র-গ্রামবাসীর একটি চরণ-ধূলার যোগ্য নহে। অথচ তাহার জন্মস্থানটির এই অবস্থা। হালিসহর যেরূপ গণ্ডগ্রাম এবং উন্নত অবস্থাপন্ন প্রত্যেক ঘর এক টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া দিলেও রামপ্রসাদের তিনখানি ক্ষুদ্র কুড়িয়া ঘর নির্ম্মিত ও এই ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি খণিত হইতে পারে, এবং এই "পঞ্চমুণ্ডী" পীঠস্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে 'প্রসাদ মাতা' নামে একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপিত ও নিত্য পূজিত হইতে পারে। বৎসর বৎসর কালী পূজার দিন একটা মেলা হইলে, তীর্থ স্থানের মত এই স্থানটুকু কত লোক দর্শন করিতে আসিবে। তাহারা কালীকে যে দর্শনী দিবে তাহার দ্বারাই এই স্থানটি একটি পবিত্র তীর্থের মত রক্ষিত হইতে পারে।" তাঁহারা বলিলেন,—হালিসহর যদি আজ রাণাঘাট সবডিভিসনের অন্তর্গত হইত, কিংবা আপনি বারাসতের সবডিভিসনাল অফিসার হইতেন, তবে এ কায সহজে হইতে পারিত। আমরা গ্রামবাসীরা এখন বৎসর বৎসর কালী পূজার দিন এখানে কালী-পূজা করিয়া রামপ্রসাদের 'কালীকীর্ত্তন' গান করিয়া থাকি। আমরা আপনার এই আক্ষেপের কথা গ্রামের সকলকে বলিব, এবং আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।" তাঁহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া এবং আমার রাণাঘাট শাসনের বহু প্রশংসা করিয়া আমাকে বড় সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। আমি গঙ্গাপার হইয়া পর্ত্তুগিস গৌরবের সমাধি বাণ্ডেলে এক বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলাম। হুগলির আরও কয়েক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত ছিলেন। যদিও হুগলি হালিসহরের অপর দিকে, তথাপি তাঁহারা কখনও রামপ্রসাদের জন্মস্থান দেখেন নাই বলিয়া লজ্জার সহিত স্বীকার

করিলেন। আমার মুখে তাহার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া বড় দুঃখ করিলেন, এবং বলিলেন শীঘ্র স্থানটি দেখিয়া তাঁহারাও আমার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবেন। হালিসহরবাসীরা কি তাঁহারা কিছু করিয়াছেন কি না জানি না! বাণ্ডেল যাইতে গঙ্গার তীরে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম যে হুগলির জনৈক খ্যাতনামা উকিল তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন আমার 'কীর্ত্তিনাশা'র নিম্নলিখিত কবিতাটি মনে পড়িল—

"কীর্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক !
ইষ্টকে উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার,—
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা,—আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে,
তাহার অদৃষ্টলিপি; ভাবি সমাচার
তব মৃদু কলকলে শুনুক শ্রবণে।"

ভাবিলাম ইঁহার অট্টালিকা দেখিতে কোনও শৃগাল কুকুরও কখন আসিবে না, আর দরিদ্র রামপ্রসাদের মাটির ক্ষুদ্র ভিটা দেখিতে আমার মত কত তীর্থযাত্রী অনন্তকাল আসিবে। ভাবিলাম ইঁহার অট্টালিকার যখন চিহ্নও থাকিবে না, তাঁহার মানব-শোণিত-শোষী উকিলি কীর্ত্তি তাঁহার সৌভাগ্য-ক্রমে যখন বিলুপ্ত হইবে, তখনও রামপ্রসাদের এই মাটির ভিটা থাকিবে, কি ভিটার স্থান থাকিবে, হয়ত তাহাতে দেবালয় নির্ম্মিত হইয়া স্থানটি সত্য সত্যই তীর্থ স্থানে পরিণত হইবে এবং রামপ্রসাদের নাম দেবনামবৎ ও তাঁহার ভক্তি সঙ্গীত

দৈব প্রসাদবৎ বঙ্গদেশের নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা বর্ষণ করিবে। যদি এই উকিল পুঙ্গব এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে তাহার অতিরিক্ত ইট কাঠে রামপ্রসাদের জন্মস্থানে একটি সামান্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটি মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তিও স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে রামপ্রসাদের কৃপা-প্রসাদে তিনি এই উকিলি গতি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া হয়ত সদ্গতি প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহার অট্টালিকার অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র মন্দির তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া তাঁহার নাম একটি পুণ্যস্মৃতি সংযুক্ত করিয়া দিত। রামপ্রসাদ আমার গ্রামবাসী হইলে আমি একক এ স্থানটি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতাম।

বঙ্গদেশে, বিশেষ হুজুগের পীঠভূমি কলিকাতায় 'শোক সভার', 'স্মৃতি-সভার' বিকল্পে 'স্মরণ-সভার' ধুম পড়িয়া গিয়াছে। 'সাহিত্য পরিষৎ', 'সাহিত্য সভা' ও 'সাহিত্য সম্মিলনীর' ত ছড়াছড়ি। সে দিন দেখিলাম কলিকাতার রঙ্গালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক 'স্মৃতিসভা' হইয়া গিয়াছে। যখন কাযের মধ্যে বাঙ্গালীর একমাত্র কার্য্য বক্তৃতা, তখন 'শ্রুতিসভা' বলিলে বোধ হয় অধিক সঙ্গত হয়। যদি এরূপে সভার ও বক্তৃতার দ্বারা ইঁহাদের শ্রাদ্ধ না করিয়া এ সকল সভা ও বক্তৃতা-কারীরা ইঁহাদের ও বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের জন্মস্থানগুলি রক্ষা করিয়া তথায় বৎসর বৎসর সাহিত্যসেবীরা সমবেত হইয়া একটা দেবপূজার উৎসবের মত উৎসব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়, এবং সম্মিলনের কার্য্যও হয়। বঙ্গ সাহিত্যেরও গৌরব ও উন্নতি সাধিত হয়। বৈষ্ণব কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির জন্মস্থানটি দরিদ্র বৈরাগীরা এরূপ তীর্থস্থানে পরিণত করিয়া তাহাতে বৎসর বৎসর উৎসব করে। আমরা ইংরাজি

সভ্যতার ও শিক্ষার কল্যাণে এই 'স্বদেশী' পুণ্যপথটিও হারাইয়া এখন হৃদয়হীন ও হাস্যকর 'শোকসভার' ও 'স্মৃতিসভার' ছড়াছড়ি করিতেছি। মধুসূদনের দেশীয় যশোরবাসীরা তাঁহার জন্মস্থানে পূর্ব্ব প্রথামতে বার্ষিক উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ও তদীয় বঙ্গদর্শনের ও উপন্যাসাবলীর জন্মস্থান তাঁহার নৈহাটিস্থ বৈঠকখানা বাড়ীটি রক্ষা করিয়া, তাহাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া, 'শোকসভা' বা 'স্মৃতিসভাটা' সেখানে করিলে বোধ হয় উহা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ও বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে অধিক তৃপ্তিকর হইবে। নৈহাটি গঙ্গাতীরে, এবং কলিকাতা হইতে ঘণ্টা খানেকের পথ। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীও রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে। রেলসংলগ্ন কি না জানি না। না হইলেও বীরসিংহ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার জন্মস্থানে সহজে একটা বাৎসরিক উৎসব করিতে পারেন। 'সাহিত্য পরিষৎ' বঙ্গ সাহিত্যের এই তীর্থ স্থানগুলির সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ করিবেন কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য তাঁহাদের আর কিছু নাই। বৎসর বৎসর বঙ্গের এই অমর বরপুত্রদের পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া তাঁহাদের চরণতলে যাহার যথাসাধ্য প্রণামী দিলে, এই অর্থের দ্বারা এই তীর্থগুলি রক্ষিত হইতে পারিবে। বঙ্গসাহিত্যসেবীদের ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সম্মিলনের ও বঙ্গ সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে? বৈরাগীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাহিত্যসেবীরা ভারতচন্দ্রের, মুকুন্দরামের, রামপ্রসাদের, কৃত্তিবাসের, কাশীদাসের, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, মধুসূদনের, দীনবন্ধুর, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান সংরক্ষণ ব্রতে ব্রতী হইলে কেবল বঙ্গ সাহিত্য গৌরবান্বিত হইবে এমন নহে, আমরাও মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব।

মেজিষ্ট্রেট মিশনারি।

"The force of nature could no further go.
To make a third she joined the other two."

মেজিষ্ট্রেট দেখিয়াছি—ভীষণং ভীষণানাং।
মিশনারি দেখিয়াছি—মধুরং মধুরানাং॥

কিন্তু মেজিষ্ট্রেট-মিশনারি কি কেহ দেখিয়াছ? এক ভৃত্যকে মুনিব মধুসিংহের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। সে নাম ভুলিয়া গিয়াছে। এই মাত্র মনে আছে যে নামটির প্রথম ভাগ মিষ্ট, দ্বিতীয় ভাগ ভীষণ। সে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল 'গুড় ব্যাঘ্রের' বাড়ী কোথায়! মেজিষ্ট্রেট-মিশনারিও এক প্রকার 'গুড়-ব্যাঘ্র'। জন্ম পত্রিকায় আমার বন্ধুর স্থানে শনি। এ জীবনে আমার যত দুর্গতি, যত বিপদ ঘটিয়াছে, সকলই সুবন্ধুকৃত। যেখানে গিয়াছি সেখানেই বন্ধু একজন 'আত্মারাম সরকার' সাজিয়া পৃষ্ঠদংশনের দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। যে কয়েক দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি সে সকলের নায়ক কালাচাঁদ,—ঢোড়া সাপ! রাণাঘাটে যাঁহার দস্তে পড়িয়াছিলাম, তিনি গোরাচাঁদ—জাতি সর্প। রাণাঘাটে পৌঁছিয়াই শুনিলাম যে একজন ভূতপূর্ব্ব নামজাদা দুর্দ্দান্ত মেজিষ্ট্রেট মিশনারি হইয়া রাণাঘাটে আসিতেছেন। তিনি যে যেখানে মেজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার প্রচণ্ড শাসনের ফলে সে সকল স্থানের মাটি পর্য্যন্ত এখনও তাঁহার নামে ভয়ে কম্পিত হয়। তাহার পর পুলিসের কর্ত্তাগিরি করিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ঢেকি স্বর্গে গেলেও বাড়ী বাঁধে। তিনি সেখানে গিয়া পুলিসের কর্ত্তা হন। কিন্তু ভারতের

'নবাব'দিগের সেখানে নিশ্বাস বহিবে কেন ? এখানের মুগুর, সেখানের কুকুর। এখানের লীলা, সেখানে প্রহসন হইয়া পড়ে। কাযেই বিলাতের জল বাতাস ভারতের দুরন্ত মেজিষ্ট্রেটকে মিশনারি করিয়া যেখানের মাল আবার সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছে! সত্য কি মিথ্যা জানি না, গল্প উঠিয়াছে যে কে একজন নিঃসন্তান ধনী মরিবার সময়ে তাঁহার বিপুল অর্থ খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে মিশনারিরা যে ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে তাহাতে কোনও ফল হইতেছে না। তিনি একজন ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ লোক, অতএব তিনি নূতন ভাবে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারত উদ্ধার করিবেন। মুমূর্ষু তাহাতে লক্ষ টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে, এবং তিনি সেই অর্থ লইয়া মেজিষ্ট্রেট-মিশনারি সাজিয়া আসিতেছেন, এবং পাল চৌধুরীদের বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। অপূর্ব্ব সংবাদ! সেই দুর্দ্দান্ত মেজিষ্ট্রেট মিশনারি; আর তাঁহার প্রচারের স্থান রাণাঘাটে! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার অধীনে ডেপুটিগিরি আরম্ভ করিয়াছি। তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিতেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কমিশনার থাকিতে আমাকে একবার রাণাঘাটে আনিতে আশা দিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার দুর্ব্বাসা প্রকৃতি স্মরণ করিয়া আমার মনে ঘোরতর আশঙ্কা হইল। ধর্ম্ম প্রচারার্থ এ শুভাগমন সংবাদ দিলেন কে,—না যিনি উক্ত প্রভুর সর্ব্বজন অভিশপ্ত এবং সর্ব্ব জন ভীতিপ্রদ গোয়েন্দা বা চুক্‌লিখোর ছিলেন, তিনি। যেমন দেবতা, তেমন বাহন। বুঝিলাম প্রভু যেমন মিশনারি, ইনি তাঁহার উপযুক্ত 'সুসমাচার' (gospel) বাহক! ইনি আমাকে এক পত্রও দেখাইলেন। প্রভু লিখিয়াছেন আমি রাণাঘাটের সবডিভিসনাল

অফিসার শুনিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তথাপি আমার আশঙ্কা কেমন আরও বৃদ্ধি হইল।

আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি রাণাঘাটে অবতীর্ণ হইয়া বারবণিতাদের ভূতপূর্ব্ব প্রমোদ-ভবন একটা বাগান-বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি এখন প্রৌঢ়, কিন্তু এখনও তাঁহার সেই উগ্র মেজিষ্ট্রেটি মূর্ত্তি। তাহাতে মিশনারির গন্ধ মাত্র নাই। তিনি আসিয়াই আমাকে পত্র লিখিলেন যে নিকটস্থ উদ্যান হইতে ভোঁদড় (wizard) আসিয়া তাঁহার মুর্গি হত্যা করিয়াছে, অতএব এই খুনের প্রতিবিধান করিতে হইবে। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। সেই ভোঁদড়ের নামে সমন ওয়ারেণ্ট কিছুই চলে না। সে যে নিকটস্থ উদ্যানে তাহার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের এ 'নব-বিধানের' এরূপে বিঘ্ন করিতেছে তাহারও প্রমাণাভাব। পুলিস ইন্‌স্পেক্টারকে ডাকিলাম। তিনি বলিলেন অজ্ঞাত ভেঁাদড় শাসন বা মুর্গি 'মার্ডার' (murder) তাঁহার শ্রবনীয় অপরাধ (cognizable crime) নহে। তখন পার্শ্বস্থ উদ্যান স্বামীকে ডাকিলাম। তিনি not guilty (নির্দ্দোষী) বলিয়া কবুল জবাব দিয়া বলিলেন—"মহাশয় খেঁাড়া আসিয়াই সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার কাছেও এক পত্র লিখিয়াছে। আমি ভেঁাদড় বেটাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? সেই অজ্ঞাত নামা ভেঁাদড়ের কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না।" অথচ কিছু না করিলে তখনই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যটার আরম্ভ আমার উপরেই হইবে। অতএব উদ্যান স্বামীকে অনুনয় করিয়া তাঁহার উদ্যানের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ দিলাম, এবং প্রভুর কাছে মুর্গি হত্যার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। আবার পরদিন প্রাতে পত্র আসিল—"খবরদার! আবার আজ রাত্রিতে

ভোঁদড় আমার মুর্গি মারিয়াছে।” এবার আমি সঙ্কল্প করিলাম যে ভোঁদড়কুল নির্ম্মূল করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্মের ‘প্রতিনিধি বলিদানের’ (vicarious sacrifice) একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতকে দেখাইব। তাঁহাকে লিখিলাম যে আমি উক্তরূপ আদেশ পুলিসকে দিয়াছি। তিনি পুলিসের মহাপ্রভু ছিলেন। তিনি জানেন যে পুলিসে আদেশ প্রেরণ করা ইংরাজ রাজ্যের চরম সাধন। পুলিসের ভয়েই হউক, আর যে কারণেই হউক ভোঁদড় পর্ব্ব এখানে শেষ হইল। তাহার পর বনগাঁয়ের বদমায়েস পর্ব্ব আরম্ভ হইল। তাহা পূর্ব্বে আখ্যায়িত করিয়াছি। একা মেজিষ্ট্রেট কি একা কমিশনারই আমার ডেপুটি লীলা শেষ করিতে পারে। আর আমার গৃহ দ্বারে একাধারে মেজিষ্ট্রেট-কমিশনার-লেঃ গবর্ণরের সম্মিলিত ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। পৌত্তলিক আমার হিন্দুর ধর্ম্মেও এরূপ সম্মিলিত ত্রিমূর্ত্তি নাই। সম্মিলিত দুই মূর্ত্তির অধিক এই পৌত্তলিকদের কল্পনা উঠে নাই। অতএব আমার অবস্থা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার হুকুম তামিলের জন্য আমার একটা স্বতন্ত্র দপ্তর খুলিতে হইল। তিনি কখন লেখেন রাণাঘাটের ইন্দারার কাছে কতগুলি লোক বসিয়া আছে। অবশ্য তাহাদের উদ্দেশ্য উহার জল নষ্ট করিবে। আমি তাহার কি প্রতিবিধান করিলাম তিনি তাহার কৈফিয়ত চাহেন। কখনও দোকানদারগণ দোকান-ঘরের সম্মুখে তাহাদের চিরপ্রথা অনুসারে ড্রেণের উপর তক্তা দিয়া দোকান পাতিয়াছে বলিয়া আমার কৈফিয়ত তলব হইল। একবার রাণাঘাটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইল। মেলেরিয়া দেবীর উপর ওলাদেবী এরূপে সময়ে সময়ে তাঁহার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি তাহা নিবারণের জন্য অশেষ চেষ্টা করিলাম। প্রায় দেড় মাস চলিয়া গেল কিছুই হইল না। তাহার পর পুলিস রিপোর্ট

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে বহুদূরে নদীয়ার এলাকায় প্রথম ওলাউঠা আরম্ভ হইয়া উহা যেন চূর্ণীর স্রোতের সঙ্গে ক্রমে পরবর্ত্তী গ্রামসমূহে ও রাণাঘাটে ভাসিয়া আসিয়াছে। আরও দেখিলাম যতদূর স্থান ব্যাপিয়া চূর্ণীর জল ব্যবহৃত হইতেছে ততদূর স্থান ব্যাপিয়াই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব। তখন আমি চূর্ণীর তীরে পুলিসের পাহারা বসাইয়া দিয়া তাহার জলস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলাম। রাণাঘাটের লোক ক্ষেপিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র বাবু তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া আমার কাছে আসিলেন, এবং চূর্ণীর জল-ব্যবহার বন্ধ করাতে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে বলিলেন। তিনি বলিলেন কেবল ওলাউঠা-দূষিত কাপড় প্রক্ষালন বন্ধ করিলে জল-দোষ দূর হইবে। কিন্তু কোন্ কাপড় এরূপ দূষিত, এবং কোন্ কাপড় নহে, তাহা পুলিস কিরূপে জানিবে? তাহা ছাড়া রমণীগণ আপনার বসনের মধ্যে কাপড় লুকাইয়া লইয়া গিয়া নদীতে প্রক্ষালন করিয়া সমস্ত নদীর জল বিষাক্ত করে, পুলিস তাহা নিবারণ করিতে গিয়া কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিলে একটা খণ্ড প্রলয় হইবে। তিনি তথাপি আমার বক্তৃতার ও বিশ্বাসের প্রতিকূলে লোক-তাড়নায় প্রভুর কাছে আমার বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। আমার কৈফিয়ত তলব হইল, এবং তাহা প্রদত্ত হইল। তিনি তথাপি মেজিষ্ট্রেট কলিন (Collin) সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিয়া আনাইয়া লইলেন। আমি গাড়ী করিয়া তাঁহাকে আমার সমস্ত বন্দোবস্ত দেখাইলাম ও সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন—"মানুষের যাহা সাধ্য আপনি সকলই করিয়াছেন। তথাপি ইনি এ গোলযোগ করিতেছেন কেন?" ইনি 'সার্ভিসে' থাকিতে তাঁহার সঙ্গে কলিনের পরিচয় ছিল কিনা আমি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তিনি কি

এখনও সেইরূপই আছেন ?" আমি বলিলাম ।"ঠিক সেরূপ, কেবল অফিসিয়েল দায়িত্বশূন্য ।"কলিন আর তাঁহার গৃহে না গিয়া ১০টার ট্রেণে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। প্রভু তাহার পর ওয়েষ্টমেকটকে টেলিগ্রাম করাইয়া আনাইয়া লইলেন। মিউনিসিপেল কমিটি বসিল, আমার ও রাণাঘাটের চেয়ারমেন সুরেন্দ্র বাবুর কৈফিয়ত তলব হইল। আমরা বলিলাম যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা ওলাদেবীর সহিত যেরূপ যুদ্ধ সম্ভব আমরা তাহা দুজনে পরামর্শ করিয়া করিয়াছি। সুরেন্দ্র বাবুও এখন চূর্ণীর জল বন্ধের উপকারিত্ব অনুভব করিয়াছেন। কারণ সেই হইতে ওলাউঠা দিন দিন কমিতেছে। প্রভু কিছু ফাঁক পাইলেন না। তখন তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"মিঃ ওয়েষ্টমেকট ! ইঁহারা দুজন আমার পুত্রের ঘোরতর অপমান করিয়াছেন। আমার পুত্র এক রোগীর চিকিৎসা করিতেছিল। ইঁহারা তাহাকে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদের নিয়োজিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে দিয়াছেন। তোমার কাছে আমি ইহার প্রতিবিধান চাহি।" আমারা বলিলাম আমারা ইহার কিছুই জানি না। হোমিওপেথিক ডাক্তার একজন নিযুক্ত করিয়াছি মাত্র, কারণ অনেকে ওলাউঠায় হোমিওপেথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। যাহার খুসি সে তাহাকে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইতেছে। তখন গরিব 'হৈমবতী' বেচারিকে তলব হইল। মিশনারি প্রভু তাহাকে দেখিয়া গিলিয়া ফেলিতে চাহিলেন। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল যে সাহেবের পুত্র যে সেই রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাহা রোগী কি সাহেবের পুত্র কেহই তাহাকে জানান নাই। পুত্র পিতার মত ক্রোধের ও জিদের অবতার নহেন। তিনিও তাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে ওয়েষ্টমেকট—"তবে আর কার্য্য নাই" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া

একেবারে রেলওয়ে ষ্টেসনে গেলেন। আমাকে ট্রেণে উঠিয়া বলিলেন যে তিনি প্রভুর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বড় ভয়ানক লোক (terrible man)। অতএব আমাকে খুব সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাহার দু চার দিন পরে আমি শিবিরে যাইতেছি; প্রভুও কোথায় যাইতেছিলেন। ষ্টেসনে আমাকে দেখিয়া তিনি একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমাকে বলিলেন—"তুমি এখনও চূর্ণীর জল বন্ধ রাখিয়াছ?" আমি বলিলাম—"ওলাউঠা জল-বন্ধের পর হইতে কমিয়া দুই তিন দিন যাবৎ অদৃশ্য হইয়াছে। অতএব আরও দুই চার দিন বুঝিয়া আমি নদীর জল ব্যবহার করিতে দিব।" ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রেণে উঠিয়া বলিলেন—"তুমি রাণাঘাটের লোকের উপর যে অত্যাচার করিতেছ আমি লেঃ গবর্ণর সার চার্লস্ ইলিয়টকে জানাইব।"

রাণাঘাটে আসিয়া অন্য এক বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি এক 'হস্পিটাল' খুলিলেন। তাঁহার পুত্র তাহার ডাক্তার। তাঁহার কন্যা ও তিনি ধর্ম্ম প্রচারার্থ তেলী মালীর বাড়ী পবিত্র করিতে লাগিলেন, কারণ ভদ্র সমাজকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার আশা নাই। সময়ে সময়ে কন্যা একাকিনী যাইতেন। আমার আর এক উৎপাত বাড়িল। কোথায় ইহার সহিত কোনও তেলী মালী ব্যবহারে পান হইতে চুণ খসিলে প্রভু রাণাঘাটে একটা আগুণ জ্বালাইবেন। সত্য সত্যই এক বাড়ী হইতে তাঁহাকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যাহা হউক এ অবধি প্রথমতঃ কন্যার, পরে তাঁহার নিজের প্রচারকতা বন্ধ হইল। আমারও নিশ্বাস পড়িল। হস্‌পিটলের কার্য্য চলিল। লোকে বলিতে লাগিল যে তাঁহার পুত্রের হাত পাকাইবার জন্য তিনি এ ফিকির বাহির করিয়াছেন। বাঙ্গালি

হুজুগ-প্রিয় জাতি। বিলাত হইতে সাহেব আসিয়া বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেছে শুনিয়া বহুদূর হইতে পর্য্যন্ত প্রথমতঃ শত শত রোগী আসিতে লাগিল। "তোমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ, কিন্তু ভবরোগের চিকিৎসার কি করিতেছ?"—এরূপ বহুবিধ মহামূল্য প্রশ্নাবলী প্রেস্‌কিপসনের পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে ছাপা আছে, এবং উহা এক চোঙ্গাতে দেওয়া হইয়া থাকে। শেষে প্রচার কার্য্যটা এই চোঙ্গার দ্বারা চলিতে লাগিল। ইহাতে আর এক উৎপাত সৃষ্টি হইল। চূর্ণীর ফেরিঘাটের জন্য ফেরিওয়ালাকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে বৎসর ৫০০০৲ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। যত লোক হাট বাজার এবং মোকদ্দমা ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে রাণাঘাট আসিত, কি স্থানান্তরে যাইত, তাহারা ভবরোগের ঔষধির এক এক শিশি কি চোঙ্গা পকেটে করিয়া আসিয়া সাহেবের ডাক্তারখানায় যাইতেছে বলিয়া বিনা পয়সায় পার হইতে চাহিত। যাহারা সত্য সত্যই ছাপা প্রেস্‌কিপসন দেখাইত, ফেরিওয়ালা প্রভুর ভয়ে তাহাদের ছাড়িয়া দিত। তাহার প্রভুর ক্ষতি হইতে লাগিল, এবং সে আমার কাছে বার বার নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। পরে ফাকা শিশি পকেটে কি হাতে লইয়া বহু লোক এরূপ ফাকি খেলিতে লাগিল। ঘাটওয়ালা তাহাদের বিনা পয়সায় ছাড়িতে আপত্তি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দুষ্ট কেহ কেহ গিয়া সাহেবকে বলিল যে তাহারা ফেরিওয়ালার উৎপীড়নে ভব-রোগের ঔষধির জন্য আসিতে পারিতেছে না। সে মুক্তির পথে মহা কণ্টক হইয়াছে, এবং ভবরোগের রোগীদের কাছে 'ডবল টোল' আদায় করিতেছে। তাহারা গাইল—

"সাহেব দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা বোলে কর্ত্তা ডাকি হে তোমারে।

কড়ি নাহি যার,
তুমি কর তারে পার,
আমি দিন ভিখারী, নাহিক কড়ি, দেখ চোঙ্গা ঝেড়ে।"

বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িয়া হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রভু তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া প্রথম ফেরিওয়ালার উপর, তাহার পর পুলিসের উপর, সর্ব্বশেষ আমার গৃহের সম্মুখে আসিয়া আমার উপর প্রজ্বলিত হুতাশন বর্ষণ করিলেন। আমাকে আবার ধমকাইলেন—"তোমার নাকের উপর ফেরিওয়ালা জোর করিয়া টোলের অতিরিক্ত পয়সা লইয়া লোকের উপর এরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, আর তুমি কিছুই করিতেছ না। অথচ তুমি আমারই কাছে কায শিক্ষা করিয়াছিলে। হুঁ হুঁ, তুমি নিশ্চিত জানিও এই কথা আমার বন্ধু সার চার্ল্স্ ইলিয়ট শুনিবেন।" অশ্বে কষাঘাত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ফেরিওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া আমার বারাণ্ডায় কাতাল মাছের মত ধপাস্ করিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই হুজুর! খোঁড়া সাহেব আমার সর্ব্বনাশ করিল। আমাকে রক্ষা কর। ফেরি এস্তাফা লইয়া গরিব আমার পরিবারকে বাঁচাও। সমস্ত লোক এখন চোঙ্গা কি শিশি হাতে করিয়া বিনা পয়সায় পার হইতে চাহে।" তাহার এ ভব-রোগের চিকিৎসার জন্য আমি তাহাকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে দরখাস্ত করিতে বলিলাম। সে চলিয়া গেলে পুলিশ সবইন্সপেক্টার আসিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমার উপায় কি? খোঁড়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আমাকে যেধমকান ধমকাইয়াছে, আমার পিলাই উলটাইয়া দিয়াছে।" আমি 'পিলাই'টি আবার সোজা করিয়া দিয়া বলিলাম ধমকটা এত্তেলার মত আমার কাছে লিখাইয়া পাঠাইলে আমি তদন্তের আদেশ দিব, কারণ অপহরণ (extortion) পুলিস শ্রবণযোগ্য

অপরাধ নহে। তিনি বলিলেন—"খোঁড়া তাহাও নিষেধ করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে সে নিজে মেজিষ্ট্রেটের কাছে লিখিবে।" আমি তখন প্রভু আমার কাছে ঐরূপ বলিয়াছেন বলিয়া তদন্তের আদেশ দিলাম। তাহার পরদিনই মেজিষ্ট্রেট এ সম্বন্ধে এক রিপোর্ট চাহিলেন। বলা বাহুল্য প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাছে আমার জন্য পুষ্প চন্দন পাঠাইয়াছেন। তখন যিনি মেজিষ্ট্রেট তিনি প্রভুর কিরূপ আত্মীয় ছিলেন। প্রভু দেমাক করিয়া আমাকে ধমকাইয়া বলিতেন যে মেজিষ্ট্রেটের জন্য তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা এক শয্যা প্রস্তুত থাকে। আমি মেজিষ্ট্রেটকে উত্তরে পুলিসকে তদন্তের আদেশ দিয়াছি বলিয়া লিখিলাম এবং ফেরিওয়ালা যে খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে বিনা পয়সায় পার করিয়া দিতে চাহে না, বরং ঘাট এস্তাফা দিতে চাহে, তাহাও লিখিলাম। পুলিস বলা বাহুল্য ভয়ে ফেরিওয়ালাকে চালান দিল। আট জন সাক্ষীর জবানবন্দি করিলাম কেহ তাহার প্রতিকূলে একটা কথাও কহিল না। নূতন সাক্ষী পাঠাইতে পুলিসের উপর এক কড়া হুকুম পাঠাইলাম। সবইন্‌সপেক্টার আসিয়া বলিল যে সাহেবের কাছে যাহারা ডবল টোল লওয়ার কথা বলিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে চিনেন না। অতএব সবইন্‌সপেক্টার কেমন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ করিবে। সে গ্রামকে গ্রাম জবানবন্দি করিয়াছে, কেহ ফেরিওয়ালার বিপক্ষে কিছুই বলে না। তথাপি আমার আদেশ মতে পুলিস ঐরূপ রিপোর্ট করিয়া, যাহারা সাহেবের ভবরোগের ঔষধ সেবন করিয়াছে, এমন আটজন সাক্ষী পাঠাইল। তাহারা বরং বিবাদীকে সার্টিফিকেট দিল। আমি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলাম। প্রভু তখনই বোধ হয় আমার প্রতিকূলে মেজিষ্ট্রেটের কাছে পত্র লিখিয়াছিলেন, কারণ পর দিনের ডাকে এই মোকদ্দমার নথি তলবের আদেশ আসিল। উহা প্রেরিত হইল।

মেজিষ্ট্রেট কথাটি না কহিয়া উহা তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠাইলেন। ভবরোগ চিকিৎসার পালা এখানে সাঙ্গ হইল।

কিন্তু "মেজিষ্ট্রেটি-মিশনের" কার্য্য ফুরাইল না। শুনিয়াছিলাম সার চার্লস্ ইলিয়ট আদর করিয়া এ পথে যাতায়াতের সময়ে প্রভুর এই কীর্ত্তি পার্শ্বদগণকে দেখাইতেন। তিনি মেজিষ্ট্রেট থাকিবার সময়ে যাহারা তাঁহার 'গোয়েন্দা' ছিল, এখন মিশন কার্য্যে তাহারা সকলে যোগ দিয়াছে, এবং গোপনে যাতায়াত করে বলিয়া রাণাঘাটে জনরব উঠিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে প্রভুও গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা। রাণাঘাট বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল বলিয়া তিনি অলক্ষ্যভাবে কার্য্য করিবার জন্য এখানে আসন পাতিয়াছেন। তিনি দুর্মুখ, 'নেশেনাল কন্‌গ্রেস' তাঁহার সীতা। অবশ্য এ সকল কথা দেবনিন্দা বা ধর্ম্মযাজকের নিন্দা ; এ সকল বঙ্গদেশের 'ফেরিসি' ও 'সেডুসিদের' কার্য্য। তাহা সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, রাণাঘাটেও তাঁহার একটি গুপ্তচর ছিল। সে লোকটি রাণাঘাটের সর্ব্বজন ঘৃণিত। সে তাঁহার দ্বারা এ পদে বরিত হইয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। এ লোকটি কবিকঙ্কণের "ভাঁড়ুদত্ত"। শুনিয়াছি সে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে বরাবর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া খুব তৈল মর্দ্দন করিত, এবং তাঁহার সঙ্গে তাহার পরম আত্মীয়তার এ প্রমাণ দিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিত। প্রথম দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া 'ভাঁড়ুদত্ত' যখন তৈল মর্দ্দন অতিরিক্ত রকম করিয়া গেল, আমার মনে কেমন সন্দেহ হইল। আমি সুরেন্দ্র বাবুকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আপনি কি এক দিনেই লোকটাকে চিনিয়া ফেলিলেন ?" তিনি তখন আমাকে তাহার উপাখ্যান বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। অথচ লোকটি রাণাঘাটের একটি

ভদ্র পরিবারের লোক। বৃদ্ধ এবং দুরবস্থাগ্রস্ত। কর্ম্মের অক্ষম হইলেও সুরেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া তাহাকে কোনও মতে মিউনিসিপেল আফিসের একটা চাকরিতে রাখিয়াছেন। 'ভারু' বুঝিল যে আমার কাছে তাহার ভারুগিরির সুবিধা হইবে না। সে সময়ে প্রভু রাণাঘাটে উদিত হইলেন। তাহার গোয়েন্দা-প্রিয়তা দেশ প্রচলিত। সে তখনই সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। সে প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্লে তাঁহার দরবারে যাইত, এবং রাণাঘাটের সকল নরনারীর সুনামের শ্রাদ্ধ করিয়া আসিত। বলা বাহুল্য আমার প্রতি তাহার বিশেষ সুনজর। তাহার চুকলিতে অন্য পরে কি কথা স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি এক এক দিন মিশনারি প্রভুর দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আসিয়া বলিতেন—"মহাশয়! আর পারিলাম না; এ বেটাকে তাড়াইতে হইল। সে মিউনিসিপেল আফিসের কথা খোঁড়ার কাছে চুকলি কাটিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু বড় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। আবার 'ভারু' গিয়া তাঁহার কাছে কাঁদা কাটা করিলে, বিশেষতঃ চাকরি লইলে সে সপরিবার তাঁহার স্কন্ধে পড়িবে বলিলে, তিনি তাহাকে গালি দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। আমাকে হাত করিবার জন্য সে সময়ে সময়ে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতার, এবং সেখানে তৎকর্তৃক আমার গুণানুবাদের কথা এরূপ-ভাবে বলিত—"দেখ, ভাল নহে। আমাকে হাতে না রাখিলে তুমি বিপদে পড়িবে।" আমার পূর্ব্ববর্ত্তী চাকদহ মিউনিসিপেল আফিসে তাহার এক অকর্ম্মণ্য পুত্রকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বিদায় দিয়াছি। ভারুর আক্রোশ আমার উপর চরম সীমায় উঠিয়াছে। এমন সময়ে আবার রাণাঘাটের কমিশনারগণ তাহাকেও তাড়াইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া তাহার বেতন কমাইলেন। ইহাতে অবশ্য সুরেন্দ্রবাবুর

ইঙ্গিত ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন তখন 'ভারু' জব্দ হইয়া তাহার চুকলি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। "কুকুরের পুচ্ছ কভু সোজা হয় না।" সে বরং প্রভুকে বুঝাইয়া দিল, সে কেবল তাঁহাকে সকল খবর দেয় বলিয়া তাহার অন্ন মারা যাইতেছে। অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া প্রভু আমাকে তৎক্ষণাৎ তলব দিলেন। আমি গেলে, গর্জ্জন করিয়া 'ভারুর' বেতন সম্বন্ধে কি করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আমি রাণাঘাটের চেয়ারমেন নহি, আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার কিছু করিবার ক্ষমতাও নাই। "ক্ষমতা নাই!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন—"অথচ তুমি আমার কাছে কায শিখিয়াছিলে। আমি তোমার জন্য লজ্জিত হইলাম। তোমার হাতে পেনেল কোড আছে, তোমার ক্ষমতা নাই! I want সুবিচার (আমি সুবিচার চাহি)। গরীব 'ভারু' কার্য্যের অক্ষম হইয়া থাকে, তাঁহারা তাহাকে পদচ্যুত করুক দেখি। তাহার বেতন ৫৲ টাকা কমাইবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। তুমি না দেখ, আমি দেখিব তাহারা কেমন করিয়া এমন 'অবিচার' করে।" আমি আর কথাটি না কহিয়া চলিয়া আসিলাম। সুরেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"বেটার কিছুতেই শিক্ষা হইল না। চাকরিটি গেলে উপবাসে মরিবে। খোঁড়া আমাকে ডাকিয়া লইয়াও খুব ধমকাইয়াছে।" আমি কিছু না লিখিয়া ভারুর বেতন-কর্ত্তনের মন্তব্য উপর দিকে প্রেরণ করিলাম। এবার প্রভু নিজে মেজিষ্ট্রেট গেরেটের ও ওয়েষ্টমেকটের কাছে গিয়া দরবার করিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহারা অস্ত্র চালাইবার কোনও ফাক পাইলেন না। 'ভারুর' মাহিয়ানা ৫৲ টাকা কমিয়া গেল। তাহার উপর ভারু রাণাঘাটের লোকের উপহাসে ক্ষেপিয়া উঠিল।

কিছু দিন পরে ভারু তাহার প্রতিহিংসার সুযোগ পাইল। যিনি অগ্রণী হইয়া তাহার বেতন কমাইয়াছিলেন, তিনি কলিকাতার গ্রেহেম (Graham) কোম্পানির চাকর। রাণাঘাটেও তিনি এক কেরোসিনের (depot) দোকান করিয়াছেন। সম্প্রতি রাণাঘাট ষ্টেশনে গ্রেহেম কোম্পানি একটা tank (বড় গর্ত্ত) করিয়া তাহাতে কেরোসিন তৈল রাখিবার এবং পাইপের দ্বারা তাঁহার দোকানে তৈল যোগাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ প্রস্তাব অন্য ষ্টেশনেও হইয়াছে। 'ভারু' বুঝিল এই তাহার মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। সে প্রভুকে যাইয়া বলিল—"এবার হুজুর! রাণাঘাটের সর্ব্বনাশ! সহরের মধ্যস্থলে কেরোসিনের 'ডিপো' খুলিয়াছে এবং ষ্টেশনে 'টেঙ্ক' করিতেছে। ডিপোতে আগুন লাগিলে আমাদের গরিবদের বাড়ী ঘর ত থাকিবেই না, রাণাঘাট শুদ্ধ উড়িয়া যাইবে। হুজুর রক্ষা না করিলে আর এবার রাণাঘাটের রক্ষা নাই। সহরময় হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।" যেই বলা, অমনি প্রভু ধনুর্ব্বাণ হস্তে ডনকুইকসটের মত সেই ডিপোর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আমি বেলঘড়িয়া শিবিরে বসিয়া আছি। সেখানে আমার মস্তকে পত্র-রূপী এক অস্ত্র পতিত হইল। তাহাতে বিক্রপাত্মক ভাষায় লেখা আছে —"এ কি শুনিতেছি! রাণাঘাটের মর্ম্মস্থলে এক কেরোসিনের 'ডিপো' স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাতে তৈল যোগাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে এক 'টেঙ্ক' হইতেছে। ব্যাপারখানি কি আমি তৎক্ষণাৎ জানিতে চাহি।" আমি লিখিলাম আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না। রাণাঘাটে ফিরিয়া তদন্ত করিয়া তাঁহাকে জানাইব। ইদানীং তাঁহার ও আমার সম্বন্ধটা আরও কিছু ঘোরালরূপ ধারণ করিয়াছিল। তিনি এখন বাইবেল ছাড়িয়া পূর্ণমাত্রায় পেনেল কোডের মিশনারি সাজিয়াছেন, এবং পদে পদে লোকের গ্রীবাচ্ছেদ করিতে আমার উপর পীড়াপিড়ি

করিতেছেন। আর তাঁহার মন যোগাইয়া কার্য্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য বুঝিয়া আমি এখন আর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছি না। যাহা হউক রাণাঘাটে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম যে সেই 'ভারুদত্তের' মহা শত্রু মিউনিসিপেল কমিশনার দুই বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপেলিটির অনুমতি লইয়া এবং তাঁহাদের অনুমোদন মতে 'ডিপো' গৃহ প্রস্তুত করিয়া কেরোসিনের ব্যবসা করিতেছে। ষ্টেসনে কোনও 'টেঙ্কের' নাম গন্ধ নাই। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন যে তিনি তাহার কোনও খবরই রাখেন না। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে তাঁহার উপরও 'ডিপো' উঠাইয়া দেওয়ার জন্য মহা চোটপাট হইতেছে। তিনি ভয়ে প্রভুর পত্রের উত্তর, কি তাঁহাকে নিজে দেখা দেন নাই। অবস্থা বড় বিষম হইয়া উঠিয়াছে। তবে তাঁহার সার চার্লস ইলিয়টের ভয় নাই। আমি বুঝিলাম আমি আর রাণাঘাটে থাকিতে পারিতেছি না। অতএব একবার শেষ পরীক্ষার জন্য নিজে তাঁহার কাছে উপরোক্ত কথা বলিতে গেলাম। আমি বলিলাম যে মিউনিসিপেলিটির অনুমতি মতে স্থাপিত উহা দুই বৎসরের পুরাতন 'ডিপো'। আমি রাণাঘাটে আসিবার পূর্ব্বে স্থাপিত। আর ষ্টেশনে কই 'টেঙ্কের' কোনও চিহ্ন মাত্র নাই। আমার বোধ হইল তাঁহার ক্রোধের পিণ্ডটা বোমের মত বিরাট শব্দে ফাটিয়া গেল! তিনি তীরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিবৃষ্টি করিয়া বলিলেন— "আমি জানি তুমি কিছুই করিবে না। আমি জানি রাণাঘাটে দুই বৎসর যাবৎ মেজিষ্ট্রেট নাই, মিউনিসিপেলিটি নাই, পুলিস নাই। লোক যাহা খুসি তাহাই করিতেছে। অথচ তুমি আমার শিষ্য। আমি জানি গেরেট ও ওয়েষ্টমেকট কিছুই করিবে না। আমি এবার স্বয়ং সার চার্লস ইলিয়টের কাছে যাইব, এবং ইহার একটা চূড়ান্ত করিয়া আসিব। গুডবাই!" আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার

প্রত্যেক মূহুর্ত্ত বোধ হইতেছিল যে তিনি আমাকে আক্রমণ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মটা হস্তদ্বারা প্রচার করিবেন। তিনি ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন, আমি স্থির অবিচলভাবে তাঁহার এ ব্রহ্মাস্ত্র বুক পাতিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলাম, এবং তখনই রাণাঘাট-পালা শেষ করিলাম। তখনই চিফ সেক্রেটারী কটন সাহেবকে পত্র লিখিলাম যে আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একমাত্র পুত্রকেও ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতায় রাখিয়াছি। তিনি পূর্ব্বে একবার আমাকে আলিপুর লইতে চাহিয়াছিলেন, আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহা অস্বীকার করিয়াছিলাম। তিনি যদি এখন দয়া করিয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান, তবে আমি বড় উপকৃত হইব। বুধবার এ পত্র লিখিলাম। রবিবার প্রাতে প্রেসিডেন্সি কমিশনারের পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট আমাকে সংবাদ দিলেন আমি আলিপুর বদলি হইয়াছি। পত্নীর কলিকাতা-বাস বহু দিনের সাধ। তিনি আমাকে জোর করিয়া সেই প্রাতের গাড়ীতে কটন সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে পাঠাইলেন। কটনের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র প্রভুর সঙ্গে আমার কি গোলযোগ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন—রাণাঘাট বাঙ্গালিদের একমাত্র prize station (পুরস্কারের স্থান)। অতএব তিনি সেখানে প্রভুর ইচ্ছামতে ইংরাজ না দিয়া একজন বাঙ্গালি সিবিলিয়ান দিয়াছেন। তিনি প্রভুর মন যোগাইয়া থাকিতে পারিবেন ত? আমি বলিলাম—পারিবেন, যদি তিনি রাণাঘাটের শাসনভার প্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তিনি ঈষদ্ হাসিয়া বলিলেন—Nabin, you forget that he is a Missionary (নবীন! তুমি ভুলিতেছ যে তিনি একজন মিশনারি)। আমি বলিলাম—and you fotget that he was a Magistrate (আর আপনি

ভুলিতেছেন যে তিনি একজন ভূতপূর্ব্ব মেজিষ্ট্রেট)। তিনি এবার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তিনি তোমার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি সার চালর্স ইলিয়টের মন তোমার সম্বন্ধে বিষাক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রাণাঘাটে রামশঙ্কর, রামচরণ দিন রাত্রি খাটিয়াছে, আর তুমি ১২টার সময়ে কাছারি যাও, এবং ৩টার মধ্যে চলিয়া আইস। এক তক্তপোষের উপর শুইয়া তুমি সমস্ত দিন কেবল তামাক খাও আর কবিতা লেখ।" আমি বলিলাম—"আমি যে ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কাছারিতে থাকি তাহা সত্য। আপনি স্বয়ং কি সার চালর্স ইলিয়ট গিয়া দেখুন আমার কোনও কার্য্য পড়িয়া আছে কি না। আর অন্য অভিযোগের এক তৃতীয়াংশ মাত্র সত্য। আমার গৃহের এক মাইলের মধ্যেও তক্তপোষ নাই। আমি এ জীবনে তামাক খাই নাই। অবশ্য সময়ে সময়ে কবিতা লেখার কোমল অভিযোগ (soft impeachment) আমি স্বীকার করি।" তিনি বিষণ্ণ-মুখে বলিলেন—"তিনি তোমার সম্বন্ধে সার চালর্স ইলিয়টকে যেরূপ কুসংস্কারাপন্ন (prejudiced) করিয়াছেন, আমার আশঙ্কা তোমার 'প্রোমশনের' বিঘ্ন হইবে।" আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম—"আপনি কি আমাকে এরূপ অবিচার হইতে রক্ষা করিবেন না ?" তিনি করুণকণ্ঠে বলিলেন—"আমি চেষ্টা করিব। কিন্তু সার চার্লস্ ইলিয়ট কি প্রকৃতির লোক তুমি জান, এবং তিনি একজন উঁহার পরম বন্ধু।" আমি মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে বিদায় হইয়া রাণাঘাটে আসিলাম।

পরের বুধবারের গেজেটে আমার আলিপুর বদলি প্রকাশিত হইল। ইদানীং প্রভু গেরেটকে হাত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে আমার সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করিতেন, এবং আমার প্রত্যেক কার্য্যের অনুমোদন ও

প্রশংসা করিতেন। কিন্তু এ ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে আসিয়া নোয়াখালির মানিনীর মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আফিস পরিদর্শন করিয়া আমার কাছে এক তীব্র মন্তব্য পাঠাইয়া এক রাশি কৈফিয়ত চাহিলেন। আমি বুঝিলাম যে রাণাঘাট পালার শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। আমি তাঁহার প্রত্যেক কথা খণ্ডন করিয়া উত্তর দিয়াছি। উহা পূর্ব্বদিন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। বুধবার গেজেট দেখিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে তাঁহার ও প্রভুর ঘটিত সমস্ত কথা আমি মিঃ কটনের কাছে লিখিয়া বদলি হইয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লিখিয়াছেন যে তিনি পরদিন প্রাতের ট্রেণে আমার কৈফিয়ত পরীক্ষা করিতে রাণাঘাটে আসিবেন। আমি যথাশাস্ত্র ষ্টেশনে গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াই গম্ভীর মুখে বলিলেন— "আপনার এই অকস্মাৎ বদলিতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইহার কারণ কি, তাহা আপনি কি কিছু জানেন ?" আমি বলিলাম—"আমার নিজের ও আমার পুত্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমি কলিকাতায় বদলি প্রার্থনা করিয়া কটন সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি যদি আর কিছু লিখিয়া থাকি, তিনি কটন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" তিনি বলিলেন যে তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন। আমার গাড়ীতে এবার কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া উঠিয়া আমার সঙ্গে যাইবার সময়ে পথে প্রভুর সঙ্গে আমার মনোবাদের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম তিনি প্রায় সকলই জানেন। আমি যখন রাণাঘাট ছাড়িয়া যাইতেছি তখন আর সে সকল কথা বলিতে চাহি না। তিনি বলিলেন তিনি আমাকে বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং বড় জিদ করিতে লাগিলেন। আমি তখন 'ভারুদত্তের' নাম চাপিয়া রাখিয়া তাহার শেষ

প্রালার কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি নামটিও জিদ করিয়া শুনিয়া লইলেন, এবং কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন— "আমি যে কৈফিয়ত তলব করিয়াছি ভরসা করি আপনি তজ্জন্য আমার প্রতি কোনরূপ অন্যায় ধারণা মনে স্থান দেন নাই। আইন সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ আপনার কৈফিয়তের দ্বারা আমার নিজের অনেক ভ্রম ধারণা সংশোধিত হইয়াছে, এবং আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।" আমি বলিলাম— "আমি কিছুই মনে করি নাই।" আইন বিষয়ে মতভেদ না হইলে ইংরাজ রাজ্যে এরূপ আপিলের উপর আপিল থাকিবে কেন? তিনি কাছারিতে বসিয়া বহুক্ষণ নানা বিষয়ে বিশেষতঃ বাঙ্গালি সিবিলিয়ানদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। কৈফিয়ত পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধে আর একটি কথাও কহিলেন না। তিনি লোকেল বোর্ড আফিসে বসিয়া আহার করিতে ও দিন কাটাইতে আমার অনুমতি চাহিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম যে প্রভুর আশ্রমে না গিয়া তিনি কেন এখানে আহার ও বিশ্রাম করিবেন। তাহাতে তাঁহার বড় কষ্ট হইবে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন যে তিনি কোনও একটা মালগাড়ীর 'গার্ডরুমে' চলিয়া যাইবেন। ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে তখন কোনও মালের গাড়ী যাইবে না। তিনি 'ওয়েটিং রুমে' থাকিতে চাহিলেন। আমি জিদ করাতে নিতান্ত অনিচ্ছায় শেষে প্রভুর ঘরে গেলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম আমি বদলি হইয়াছি। তিনি যদি এখন প্রভুর ক্রোধের 'থারমমেটারটা' নামাইয়া দেন, তবে আমি বড় উপকৃত হইব। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে তিনি চেষ্টা করিবেন। আমি ৪টার সময়ে তাঁহাকে বিদায় দিতে সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আবার ষ্টেশনে গেলাম। তিনি সুরেন্দ্র বাবুকে

বিদায় দিয়া আমাকে গাড়ীর কাছে লইয়া বলিলেন—"আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আপনি এ সকল কথা ভুলিয়া যান, এবং আমরা বন্ধুভাবে বিদায় হই (let us part as friends)। আমি আপনার মত কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী আর পাইব না। আমি আশা করি আপনি আপনার নূতন কার্য্যক্ষেত্র আলিপুরেও এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তাঁহার অধীনে যে এতদিন সুখে কার্য্য করিয়াছি, এবং তিনি এতকাল যে প্রভুর প্রকোপ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ও আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, তাহার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। হাতে হাত থাকিতে ট্রেণ খুলিল। আমি দুই এক পা ট্রেণের সঙ্গে গিয়া তাঁহার কাছে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যতদূর দেখা গেল তিনি ললাটে হস্ত দিয়া "গুড বাই! গুড বাই!" করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু দূরে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেছিলেন। আমি ফিরিয়া গেলে বলিলেন—"বেটা খুব নরম হইয়াছে। খোঁড়াকে জব্দ করিয়া অন্য কোনও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপে গৌরবে রাণাঘাট হইতে যাইতে পারিত না। আপনি চলিলেন। খোঁড়ার সমস্ত আক্রোশ আমার উপর পড়িবে। আমাকেও রাণাঘাট হইতে পলাইতে হইবে।"

এ দিকে আমার বদলির গেজেটে রাণাঘাট সবডিভিসন ব্যাপিয়া তোলপাড় পড়িয়াছে। শান্তিপুর, উলা ও চাকদহের মিউনিসিপেল কমিশনার ও অনারারি মেজিষ্ট্রেটগণ দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া এই অকস্মাৎ বদলির কারণ কি জানিতে আসিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সেই হাই কোর্টের উকিল মহাশয় পর্য্যন্ত আসিলেন, এবং শান্তিপুর মিউনিসিপেল কমিটীতে আমার গুণকীর্ত্তন করিয়া আমার নির্ম্মিত শান্তিপুর চিকিৎসালয়ে আমার প্রতিকৃতি রাখিতে প্রস্তাব

করিলেন। উহা একবাক্যে গৃহীত হইল। আমি তাঁহাকে আমার স্থানে চেয়ারমেন করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন—"সাধারণ ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, 'অফিসিয়েল চেয়ারমেন' কেহও আপনার স্থান পূরণ করিতে পারিবে না। আপনি বড় অসময়ে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। আর একটি বৎসর থাকিয়া আপনার প্রস্তাবিত খালটি কাটিয়া শান্তিপুরের জলকষ্ট দূর করিয়া গেলে, আমরা সন্তোষের সহিত আপনাকে বিদায় দিতাম। এ কার্য্যটি আর হইবে না। এ কার্য্য-কৌশল ও শক্তি আর কাহারও নাই।" শান্তিপুর 'ষ্ট্রাণ্ডের' নীচে যে খাল আছে, আমি উহা কাটাইয়া গঙ্গার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এ কার্য্যটি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই। উলার কমিশনারগণও আমার নির্ম্মিত আফিস গৃহে আমার প্রতিকৃতি রাখিতে প্রস্তাব করিলেন। এই দুই স্থানেই আমার 'ব্রোমাইড' ছবি আছে। সে দিন মাত্র শুনিলাম যে বর্ত্তমান কীর্ত্তিমান সবডিভিসনাল অফিসার উলার আফিস হইতে উহা সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কমিশনারগণের সহিত, বিশেষতঃ বারানসী বাবুর সহিত, তাঁহার হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংরেজ ও বাঙ্গালিতে প্রভেদ এই। পূর্ব্ববর্ত্তীর কার্য্যপ্রণালী ও কীর্ত্তি পরবর্ত্তী ইংরেজ অফিসার রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, এবং বঙ্গচন্দ্র উহা ধ্বংস করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে চাহে। চাকদহের কমিশনারগণও সেই ঝিলটিকে আমার নামে নামাঙ্কিত করেন।

আমার পরবর্ত্তী আসিলেন। আমি তখন রাণাঘাটের মেলেরিয়া দেবীর চরণে শেষ উপহার দিতেছিলাম। জ্বরে পড়িয়া আছি। তাঁহাকে বলিলাম যে আমি তাঁহার জন্য লিখিত-মন্তব্য নিয়ম মতে রাখিয়া যাইতে অক্ষম। অতএব প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহাকে জ্বরশয্যা হইতে সমস্ত

সবডিভিসনের অবস্থা এবং আমার কার্য্যপ্রণালী বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন তিনি ঠিক আমার প্রণালী মতে কার্য্য করিবেন। সর্ব্বশেষ রাণাঘাট শাসনের বিঘ্ন (difficulty) কি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, বিঘ্ন একমাত্র মহাপ্রভু। আমি তাঁহাকে প্রজার গ্রীবা কাটিতে না দিয়া আপনার গ্রীবা দিয়াছি। পরবর্ত্তী কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে। পরদিন প্রাতের ট্রেণে দুই বৎসর মাত্র অবস্থিতির পর বড় অনিচ্ছায় এই মিশনারি প্রভুর উৎপীড়নে রাণাঘাট ছাড়িলাম। ষ্টেশনে রাণাঘাটের ও উলার ভদ্রমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু ত সঙ্গে কলিকাতায় চলিলেন। পথে চাকদহের কমিশনার ও অনারারি মেজিষ্ট্রেটগণ আমার গলায় ফুলের মালা ও হাতে ফুলের তোড়া দিয়া বরের মত সাজাইয়া দিলেন। তাঁহারাও আমার কক্ষে কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত গিয়া আমাকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় দিলেন। সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহারা বলিলেন যে রাণাঘাট সবডিভিসনকে এরূপ কাঁদাইয়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহ যাইতে পারেন নাই। ইহাঁদের বিদায় দিয়া ডাকের চিঠিপত্র খুলিতে গিয়া দেখি যে শান্তিপুরের এক নামজাদা ডাক্তার হইতে একখানি পত্রসহ একটি ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার আসিয়াছে। ইনি রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনাল অফিসার একজনকে বিপদস্থ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমার সহিত কখনও সাক্ষাৎ করেন নাই। শান্তিপুরে শুনিতাম তিনি আমার কার্য্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতেন, কখন কখন প্রশংসা করিতেন। রামচরণ বাবুর সেই জুতা-উপহার স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, আমার জন্যও কিছু পুষ্প চন্দন আসিয়াছে। পত্রখানি বড় শঙ্কিত হৃদয়ে খুলিলাম। তাহাতে লেখা আছে যে তিনি একজন স্বাধীনচেতা লোক, কখনও কোন সবডিভিসনাল অফিসারের খোসামুদি

তিনি করেন নাই। বরং এক জনকে বিপদস্থ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর যাবৎ আমার কার্য্যাবলী দূরে থাকিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, ও সময়ে সময়ে আমি শুনিয়া থাকিব আমার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু আজ শান্তিপুরের আবালবৃদ্ধবণিতার অশ্রুজলে তাঁহার হৃদয়ও দ্রব হইয়াছে। অতএব তিনিও অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। তিনি আমার কার্য্যাবলীর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া শেষে খালটি কাটিয়া গেলাম না বলিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্মরেন্দ্র বাবু পত্র শুনিয়া বলিলেন—"যখন এ লোকটি পর্য্যন্ত আপনার এত প্রশংসা করিয়াছে, তখন আর আপনাকে মন্দ বলিবার লোক রাণাঘাট সবডিভিসনে নাই।" তাহার পর পুস্তকখানি খুলিয়া দেখিলাম, যে সবডিভিসনাল অফিসারের সঙ্গে তাহার মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল, এ তাঁহারই সম্বন্ধে এক তীব্র বিদ্রুপাত্মক কবিতা। দেখিলাম লোকটির বেশ রসিকতা আছে, এবং লিখিবার শক্তিও আছে। এই কবিতা প্রচারে ক্ষেপিয়া উক্ত সবডিভিসনাল অফিসার এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ইহাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করেন, এবং তাহাতে অপদস্থ ও 'ডিগ্রেড' হইয়া রাণাঘাট হইতে বদলি হন। সে অবধি এই লোকটি রাণাঘাট সবডিভিসনাল অফিসারের পক্ষে এক প্রকার 'জুজু' ভীতি সঞ্চারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতাটি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত।